বাঙালি মুসলিম ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে

মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর অবদান

আবুল কালাম মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ

বাঙালি মুসলিম ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর অবদান

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাঙালি মুসলিম ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর অবদান

ড. আবুল কালাম মুহম্মদ আব্দুল্লাহ

বাংলা একাডেমী ঢাকা

www.pathagar.com

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪১৬ / জুন ২০০৯
বাএ ৪৭৫৯
(অর্থবর্ষ ২০০৮ - ২০০৯ পাঠ্যপুস্তক : মাসাআবা উপবিভাগ : ১১)

মুদ্রণ সংখ্যা : ১২৫০

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
মানবিকীবিদ্যা, সামাজিকবিজ্ঞান, আইন ও বাণিজ্য উপবিভাগ

প্রকাশক
ড. আবদুল ওয়াহাব
পরিচালক
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী ঢাকা ১০০০

মুদ্রক
মোবারক হোসেন
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস ঢাকা

প্রচ্ছদ
মুকাদ্দিম পৃ

মূল্য
একশত আশি টাকা মাত্র

BANGALI MUSLIM DHARMIYA O SONSKRITIK JIBANE MOULANA MOHAMMAD AKRAM KHANR ABADAN (Coulribations of Moulana Mohammad Akrom Khan to the Religiuns and cultural life of Benglali Muslims) by Dr. A. K. M. Abdulla. Published by Dr. Abdul Wahab. Director, Textbook Division, Bangla Academy, Dhaka-1000, Bangladesh. First Published : June 2009. Price : Taka 180.00 only.

ISBN 984 - 07 - 4768-1

www.pathagar.com

উৎসর্গ

বাবা মরহুম মাওলানা ছালামত উল্লাহ

মা হাফেজা খাতুন- কে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

মানুষ পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে প্রভাবিত হয়ে থাকে। মাওলানা আকরম খাঁ'র ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয় নি। তাঁর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ভাবনা ছিল যুগ, পরিবেশ ও সমাজেরই সৃষ্টি। পরিবেশ ও পরিস্থিতি তাঁকে ওহাবিতেও পরিণত করেছিল। আবার তাঁকে মু'তাযিলাবাদের দিকেও ঠেলে দিয়েছিল।

মাওলানার জন্ম হয় সীমান্তের মুজাহিদ তথা ওহাবি পরিবারে, যাঁরা দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন সৈয়দ আহমদ শহীদ ও ইসমাঈল শহীদের মতবাদ থেকে। সৈয়দ আহমদ শহীদ ও ইসমাঈল শহীদ ছিলেন 'গয়ের মুকাল্লিদ' অর্থাৎ ফকিহদের মতামতের ঊর্ধ্বে উঠে সরাসরি হাদিস ও কুরআন থেকে শরিয়তের আহকাম উদ্‌ঘাটনের পক্ষপাতী। মাওলানা আকরম খাঁও পারিবারিক ও তদানীন্তন স্থানীয় সমাজের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে ঐ ওহাবি তথা মোহাম্মদী, অন্য শব্দে 'আহলে হাদিস' মতবাদ গ্রহণ করেছিলেন এবং তদনুযায়ী 'গয়ের তকলিদে'র দীক্ষাও তিনি প্রথম জীবনে প্রচার করেছিলেন। এই মনোবৃত্তি নিয়েই তাঁর প্রথম পত্রিকাকে 'মোহাম্মদী' নামে তিনি আখ্যায়িত করেছিলেন।

কিন্তু পরিস্থিতি ও যুগের চাহিদা তাঁকে মতবাদের এই ময়দানে থেমে থাকতে দেয় নি। তিনি চোখ মেলে দেখলেন, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিম সমাজ ইসলামের বিভিন্ন প্রচলিত ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট নয়। তারা ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করছে। বিষয়গুলোর বিশ্লেষণ বিজ্ঞানসম্মত ও আধুনিক রুচি মোতাবেক নয় বলে তারা নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় জিন, শয়তান, ফিরিশ্‌তা, সুদ, সঙ্গীত, রাসুলে করিমের একাধিক পত্নী গ্রহণ, তাঁর বক্ষ বিদারণ, সশরীরে মিরাজ গমন, জিব্রাইলের মারফত তাঁর ওহি প্রাপ্তি, ইসলামে মুসলমানের চার বিয়ে করার অনুমতি। এইসব বিষয়ের ব্যাখ্যা এবং তার পিছনে নিহিত যেসব যুক্তি আলিম সমাজ পেশ করেছিলেন, সেগুলো আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের আস্থা প্রতিষ্ঠায় ছিল অকার্যকর।

অন্যদিকে, বিধর্মীদের দিক থেকেও ইসলামের এইসব বিধানকে সামাজিক ও তমদ্দুনিক জীবনের পক্ষে অসংগত বলে নানা অভিযোগ উত্থাপিত হচ্ছিল।

এইসব প্রশ্ন মাওলানা আকরম খাঁ'কে ভাবিয়ে তুলেছিল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, ওহাবি ইমামরা যে ইজতিহাদের কথা শুনিয়ে থাকেন, তা বুদ্ধিবাদভিত্তিক নয়; বরং ওহিভিত্তিক। তিনি আরও দেখলেন, আহলে হাদিসগণ কুরআনের আক্ষরিক অর্থে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখছেন, ভাবার্থ গ্রহণে তারা মোটেও রাজি নন। এমনি অবস্থায় ওহাবি মতবাদ দিয়ে আধুনিক শিক্ষিতদের জ্ঞানপিপাসা মেটানো অথবা বিধর্মীদের অভিযোগ খণ্ডন করা সম্ভব নয়। এখানেই তাঁর পূর্ববর্তী চিন্তায় চিড় ধরে। তিনি নতুন করে ভাবতে লাগলেন, এসব সমস্যার সুরাহা করতে হলে ওহি-যুক্তির পাশাপাশি মুতাযিলাদের বুদ্ধিবাদের আশ্রয় নিতে হবে। এখানেই তাঁর চিন্তাধারা নতুন মোড় নেয়। এখান থেকেই তিনি মুতাযিলি ভাবাপন্ন হয়ে মুজতাহিদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

www.pathagar.com

এই যে তাঁর মতবাদের বিবর্তন এটাকে তাঁর আনকোরা নতুন মতবাদ বলা যাবে, না-কি তাঁর পূর্ববর্তীদের মত তাঁকে এদিকে আসার হাতছানি দিয়েছিলো। নিঃসন্দেহে বলা চলে, এ পথে তিনি প্রথম ব্যক্তি নন। তাঁর পূর্বে এই পথ মাড়িয়েছেন স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ, সৈয়দ আমীর আলী, মুফতি মোহাম্মদ আবদুহু ও তাঁর শিষ্য রশীদ রেজা। তাঁরাই সর্বপ্রথম ইসলামের নানা বিতর্কমূলক বিষয়কে যুক্তি ও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত করার প্রয়াস চালান। মাওলানা আকরম খাঁ সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হন স্যার সৈয়দের *তফসীরুল কুরআন* এবং মুফতি আবদুহু ও তদীয় শিষ্য রশীদ রেজার *তাফসীর আল-মানারের* প্রতি তাঁর পূর্বসূরিগণ এ কন্টকাকীর্ণ ও বিপদসঙ্কুল পথে পা বাড়িয়ে যেরূপ অসুবিধায় পড়েছিলেন, মানুষের কোপদৃষ্টিতে পড়েছিলেন, মাওলানা আকরম খাঁ'র ভাগ্যেও তা-ই জুটেছিল। এই নতুন পথে পদার্পণ করতে গিয়ে তাঁদের সবারই কিছু না কিছু পদস্খলন হয়েছিল। কিন্তু এটা অস্বীকার করার জো নেই যে, তাঁদের আধুনিক মতবাদে এবং বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যায় বহু বিধর্মীর অভিযোগ খণ্ডিত হয়। বহু আধুনিক শিক্ষিত মুসলমানের ইমানের ভিত্তিই দৃঢ় হয়। মাওলানা আকরম খাঁ ও তাঁর পূর্ববর্তীদের এই নতুন ইসলামি দর্শনে মুসলিম দুনিয়া বিশেষভাবে উপকৃত হয়। মুসলমানরা আধুনিক যুক্তিবাদের সাথে পরিচিত হয়। তাঁদের মতবাদ জনপ্রিয়তা লাভে সক্ষম না হলেও আধুনিক শিক্ষিত সমাজে তা অবশ্যই আলোড়ন সৃষ্টি করে। দিন যতই এগুচ্ছে, ততই তাঁদের মতবাদ প্রসার লাভ করছে।

এখানে প্রশ্ন জাগে, মাওলানা আকরম খাঁ কি ধর্মীয় ক্ষেত্রে মৌলিক চিন্তাবিদ নন, তাঁর সবকিছুই কি স্যার সৈয়দ আমীর আলী ও মুফতি আবদুহু থেকে ধার করা? ব্যাপারটা কিছুটা জটিল। কারণ, পূর্ববর্তীদের ধ্যান-ধারণা ছাড়া কোন মনীষী কি অভিনব মতবাদ দিতে পেরেছিলেন? আকরম খাঁ পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করলেও তিনি পূর্ববর্তীদের মতবাদের সাথে সবক্ষেত্রে সায় দেন নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি নিজস্ব ও স্বতন্ত্র মতামত উপস্থাপন করেছেন। বিভিন্ন বিষয়কে বিজ্ঞানসম্মত করার ক্ষেত্রে হাদিস ও কুরআনের নতুন নতুন ব্যাখ্যা প্রয়োগ করেছেন এটাই তাঁর স্বাতন্ত্র্য।

মাওলানা লক্ষ্য করলেন যে, বাংলায় ইসলামি সংস্কৃতি ও মুসলিম সংস্কৃতি একাকার হয়ে আছে। সাধারণ মুসলমানরা এমন অনেক মুসলিম কৃষ্টিকে ইসলামি কৃষ্টি বলে মনে করছে, যা মূলত ইসলামি কৃষ্টি নয়, ইসলামি সংস্কৃতি নয়; বরঞ্চ সেগুলো হিন্দু ধর্মের ছোঁয়া লেগে অথবা ইরানে প্রচলিত বিভিন্ন রসম-রিওয়াজের সূত্র ধরে বাংলার মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করেছে। যেমন– মাতম, ছিয়ম, সেহলাম প্রথা, শবে বরাত পালন, মোমবাতি প্রজ্বলন করা, কবরে সিজদা করা, কবর পাকা করা, কবরের মৃত ব্যক্তির নামে মান্নত করা, পির-মুরিদি প্রথা, পির-আওলিয়ার জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী ও ওরস উৎসব পালন ইত্যাদি বিষয়গুলো মুসলিম সমাজে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কার্য বলে পরিগণিত হয়ে আসছে। কিন্তু মাওলানার মতে, এসব বিদআত। এগুলোর মূলোৎপাটনের জন্য তিনি আজীবন চেষ্টা করেন এবং কিছুটা সফলকামও হন।

এছাড়া, মুসলিম সমাজে এমন কিছু রীতিনীতি আছে যা একাধারে ধর্মীয়ও বটে আবার সাংস্কৃতিকও বটে। যেমন সমাজে প্রচলিত পর্দাপ্রথা, বাল্যবিবাহ, বিয়ে-শাদির

www.pathagar.com

রসম-রিওয়াজ, এসব ক্ষেত্রেও এমন অনেক রীতিনীতি অনুপ্রবেশ করেছে যা মাওলানার মতে ইসলামসম্মত নয়। তিনি সূক্ষ্ম তাহকিক বিশ্লেষণ করে অনুপ্রবিষ্ট দোষ-ত্রুটি উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেন। পর্দাপ্রথার দোহাই দিয়ে মুসলিম সমাজ যে অবরোধ প্রথা জিইয়ে রেখেছে, বাল্যবিবাহ ধর্মে বৈধ বলে যে অজুহাত দাঁড় করানো হচ্ছে মাওলানা ধর্মের আলোকে এবং যুক্তির ভিত্তিতে সেসব সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেন। এ সাংস্কৃতিক চিন্তাধারায়ও মাওলানা সাহেব প্রথম ব্যক্তি নন। উত্তর ভারতে শাহ ওয়ালী উল্লাহ ও তাঁর সাহেবজাদাগণ, তাঁদের পথের পথিক সৈয়দ আহমদ শহীদ ও ইসমাঈল শহীদ, বাংলার হাজী শরীয়ত উল্লাহ, বাংলার ধর্মপ্রচারক মাওলানা কারামত আলী জৈনপুরী, হাফেজ আহমদ জৈনপুরী, মাওলানা আবদুল আউয়াল জৈনপুরী প্রমূখ এক্ষেত্রে ইতোপূর্বেই অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এতদঞ্চলে ইসলামের তাবলিগে আলিম সমাজ এবং সাধক পির-ফকিরগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলে তাসাউফ তথা সুফিবাদের একটি ধারা গড়ে ওঠে। এতে মানুষের আত্মশুদ্ধির পথ প্রশস্ত হয়। এঁদের ভূমিকা ছিল প্রচারকের। কিন্তু সমাজ সংস্কারে মাওলানা আকরম খাঁ'র ভূমিকা ছিল একজন সমাজনেতার, একজন বিজ্ঞ পণ্ডিতের এবং একজন দক্ষ ধর্ম-দার্শনিকের। তিনি এ ক্ষেত্রে মুসলিম সমাজে স্থায়ী বুনিয়াদ স্থাপনে ও প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হন। এই গ্রন্থটিকে ৫টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে আকরম খাঁ'র মানসিক গঠন, বিবর্তন ও তার ফলাফল বিবৃত করতে গিয়ে তাঁর আদ্যোপান্ত জীবনী ও কার্যাবলীর উপর আলোকপাত করা হয়েছে, সাংবাদিক, ও রাজনৈতিক জীবন ও ভাষা আন্দোলন সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত ধারণা দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাঁর ধর্মীয় ভাবধারা আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে সাংস্কৃতিক ধ্যান-ধারণা, চতুর্থ অধ্যায়ে সমসাময়িক 'আলিমগণের সাথে চিন্তাধারার মিল ও গরমিল এবং পঞ্চম অধ্যায়ে বঙ্গীয় সমাজ-জীবনে তাঁর চিন্তাধারার প্রভাবের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

প্রতিটি অধ্যায়, উপ-অধ্যায়, শিরোনামের অধীনে মাওলানার উদ্ধৃতির পাশাপাশি অন্যান্য মনীষীদের লেখারও হুবহু উদ্ধৃতি স্থান লাভ করেছে। আলোচনাকে অধিকতর বোধগম্য করার লক্ষ্যে কোনো কোনো বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করতে হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে মওলানা আকরম খাঁ'র ব্যবহৃত শব্দ ও বানান হুবহু রাখা হয়েছে।

এই গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও এর মাইক্রো ফিল্ম বিভাগ, পাবলিক লাইব্রেরি, ন্যাশনাল আর্কাইভস, বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমী লাইব্রেরি, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট লাইব্রেরি, ঢাকার পাবলিক লাইব্রেরি, রাজশাহীর বরেন্দ্র মিউজিয়াম, চট্টগ্রামের মিউনিসিপ্যাল লাইব্রেরি, ময়মনসিংহের মুসলিম ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রামের মুসলিম ইনস্টিটিউট ও পাবলিক লাইব্রেরি, ঢাকার ইসলামিক ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগার, 'আলিয়া মাদ্রাসা লাইব্রেরি, সিলেটের মুসলিম সাহিত্য সংসদ লাইব্রেরি, বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল লাইব্রেরি, তথ্য অধিদপ্তর লাইব্রেরি, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ ও অন্যান্য সংস্থা থেকে তথ্য সংগ্রহ

www.pathagar.com

করেছি। বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট, সরকারি নথিপত্র ও জাতীয় সংসদের কার্যবিবরণীসহ বিভিন্ন লেখকের মূল্যবান বইপুস্তক, শিক্ষা সংক্রান্ত সাময়িকী ও পত্র পত্রিকার সাহায্য সহযোগিতা নিয়েছি। এসব বিভাগ ও গ্রন্থাগার সমূহের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ তথ্য সংগ্রহে আমাকে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন। তাই সামগ্রিকভাবে আমি শ্রদ্ধেয় পূর্বসূরীদের নিকট আমার অপরিশোধ্য ঋণ অকুণ্ঠ চিত্তে শ্রদ্ধাভরে স্বীকার করছি।

পাণ্ডুলিপিটি পুস্তকাকারে প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক মহোদয়কে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

যেসব পূর্বসূরী গবেষক বাংলার মুসলিম সমাজের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস নিয়ে এ যাবত গবেষণা করেছেন, তাঁদের রচনাবলী থেকেও আমি যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি। এ জন্য তাঁদের নিকট আমি ঋণী।

আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা-নির্দেশক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. এ. বি. এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরীর অনুপ্রেরণায় আমি এই গ্রন্থ রচনার কাজে উদ্বুদ্ধ হয়েছি। শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি আমাকে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে গ্রন্থের কাজ ত্বরান্বিত করার ব্যাপারে সহায়তা করেছেন। তাঁর এ ঋণ আমি কোনদিন শোধ করতে পারবো না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু ও ফার্সি বিভাগের অধ্যাপক বিশিষ্ট গবেষক বহু গ্রন্থ প্রণেতা শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মরহুম ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ তাঁর মূল্যবান উপদেশ ও পরামর্শ দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাদি দিয়ে আমার এ কাজ যথেষ্ট সহায়তা করেছেন । তাঁর নিকটও আমি কৃতজ্ঞ।

মাওলানা আকরম খাঁ সম্পর্কিত তথ্যের জন্য আমি দেশের আনাচে-কানাচে গিয়েছি, অনেকেই সাগ্রহে আমার তথ্য সংগ্রহে সহায়তা করেছেন। অনেকে চিঠিপত্রের মাধ্যমেও তথ্য পাঠিয়েছেন। এজন্য তাঁদেরকেও আমার মোবারকবাদ। সাভারে অবস্থানরত মাওলানার কনিষ্ঠ পুত্র কামরুল আনাম খাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

সাভার বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সম্মানিত অধ্যক্ষ মরহুম সাদ জগলুল আমাকে গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করার সুযোগ দিয়েছেন। এজন্য আমি শ্রদ্ধার সাথে কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁকে স্মরণ করছি।

আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা মরহুম মাওলানা ছালামত উল্লাহ যাঁর লালিত স্নেহ ও উৎসাহে আমার উচ্চ শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছিল, যাঁর প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে আজ আমি এখানে। মনে পড়ে আমার পিএইচ .ডি. ডিগ্রি লাভের ঘোষণা যখন হয়, তখন তিনি ঢাকাস্থ বাংলাদেশ হাসপাতালের বেডে অসুস্থ। খবর পেয়ে তিনি অত্যন্ত খুশি হলেন এবং দোয়া করলেন। এরপর তিনি সুস্থ হয়ে প্রায় দু'বছর জীবিত ছিলেন। আজ পাণ্ডুলিপিটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হচ্ছে। অথচ যিনি সবচেয়ে বেশি খুশি হতেন তিনি আজ নেই। মহান আল্লাহর দরবারে তাঁর মাগফিরাত কামনা করছি। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করুন, আমীন।

www.pathagar.com

এমন একজনের কথা এখন বলছি যাঁর স্নেহের পরশে কেটেছে আমার শিশুকাল, যাঁর হাতের স্নেহের ছোঁয়া না পেলে আমি এই পৃথিবীর আলো বাতাস দেখতাম না। তিনি হলেন আমার মমতাময়ী মাতা যিনি সারাটা জীবন দিয়েই গেলেন, পাওয়ার আশা করেন নি। তাঁর ঋণ কোনো দিন শোধ হওয়ার নয়। এই মুহূর্তে তাঁর প্রতি আমার ভালোবাসা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।

আমার উচ্চ শিক্ষা নেয়ার পেছনে যার কথা না বললে শূন্যতা থেকেই যাবে সে হলো আমার অনুজ আবদুল ওয়াহেদ। যে আমাকে উচ্চ শিক্ষা নেয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে সাহস যুগিয়েছে। তাকেও এই মুহূর্তে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমার স্ত্রী রেহানা আহমেদ রাখি আমার থিসিস চলাকালীন সময় অসীম ধৈর্যের সাথে আমার সংসারের হাল ও সন্তানদের দায়িত্বভার নিজ তত্ত্বাবধানে রেখে আমার উৎসাহকে বাধামুক্ত রেখে নিরন্তর আমাকে সহায়তা করায় উপকৃত হয়েছি। তাঁকে শুধু ধন্যবাদ দিয়েই শেষ না করে বলবো আমি তাঁর নিকট ঋণী। আমার স্নেহের সন্তান সাইকি, জাকি ও সাদির কথা- এরা সকলেই তখন একেবারেই ছোট। পিতা হিসাবে তাদের প্রতি আমার যতটুকু যত্ন নেয়া উচিত ছিল তা আর হয়ে ওঠেনি। এদের প্রতি রইল আমার দোয়া ও ভালবাসা।

আসলে এ দুরূহ কাজে যতটুকু সময় ও শ্রম এবং মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল, সময় ও পরিবেশ ছিল তার প্রতিকূলে। কারণ এ কাজের মাঝপথে আমার ভাগিনা মাসুদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স শেষ বর্ষের মেধাবী ছাত্র শিক্ষা সফরে গিয়ে কাপ্তাই লেকে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে.....রাজেউন)। তার অকাল মৃত্যুর এই শোকাবহ ঘটনায় আমাদের পুরো পরিবার কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। আমাদের চলার পথ থমকে দাঁড়ায়। নশ্বর পৃথিবীর সবই যেন মরীচিকা। মনে পড়ে কুরআনের মহাসত্যবাণী 'মৃত্যু যখন আসবে নির্দিষ্ট সময় তা সংঘটিত হবে'। এটাকে মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। আল্লাহ তাকে জান্নাতবাসী করুন, আমীন। এরপর যতটুকু সময় দিতে পেরেছি তা যদি পাঠক ও আগামী প্রজন্মের কাজে আসে নিজেকে ধন্য ও সার্থক মনে করব।

এ গ্রন্থটি একটি গবেষণাধর্মী গ্রন্থ, গবেষকের কাজ যেখানে যে তথ্যটি যে ভাবে রয়েছে তা সে ভাবে উপস্থাপন করা, আমি সে কাজটি করেছি মাত্র। তবে এ কথা সত্য তার ধর্মীয় মতাদর্শের কোনো কোনো ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ও জমহুরে ওলামায়ে কিরামের মতের গরমিল রয়েছে।

মাওলানা সাহেবের ধর্ম-দর্শন ও সংস্কৃতি-দর্শন কতটুকু নিখুঁত ছিল বা কতটুকু ত্রুটিপূর্ণ ছিল, চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ করা সহজসাধ্য নয়। তাঁর রচনাবলী ও তাঁর জীবনচরিত সামনে রেখে আমরা তাঁর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক চিন্তাধারার উপর আলোকপাত করার প্রয়াস পেয়েছি।

এ গ্রন্থে আলোচিত কোনো বিষয়ের উপর আমার ব্যক্তিগত কোনো মতামত দেয়া হয়নি, পূর্বসুরিদের মতামত তুলে ধরেছি মাত্র। উদ্দেশ্য ইসলামের এমন কিছু বিষয়

www.pathagar.com

রয়েছে, যা নিয়ে ইসলামিক চিন্তাবিদ ও উলামায়ে কিরামদের মধ্যে কিছুটা মত পার্থক্য রয়েছে। অথচ বর্তমান যুগ জিজ্ঞাসার আলোকে এগুলোর চূড়ান্ত সমাধান প্রয়োজন। বর্তমান আকাশ সাংস্কৃতির পৃথিবী দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। নতুন নতুন বিষয় ও সমস্যা আসছে। এর সমাধানে বিদগ্ধ ইসলামি চিন্তাবিদ ও গবেষকদের এগিয়ে আসা সময়ের চাহিদা এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য বটে।

সুহৃদ পাঠক বন্ধুরা এ পুস্তকের যে কোনো ত্রুটি বিচ্যুতির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তা গৃহীত হবে এবং এর পরবর্তী সংস্করণে তা দূরীকরণের চেষ্টা করা হবে।

আবুল কালাম মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ

www.pathagar.com

সূচিপত্র

মুখবন্ধ		
প্রথম অধ্যায় :	জীবন ও মানসিক বিবর্তন	১
দ্বিতীয় অধ্যায় :	ধর্মীয় ভাবধারা	১৫৪
তৃতীয় অধ্যায় :	সাংস্কৃতিক ধ্যান-ধারণা	২৩৬
চতুর্থ অধ্যায় :	সমসাময়িক আলিমদের সাথে মাওলানার চিন্তাধারার মিল ও অমিল	৩০০
পঞ্চম অধ্যায় :	বঙ্গীয় সমাজ জীবনে চিন্তাধারার প্রভাব	৩৩২
উপসংহার		৩৩৭
জীবনপঞ্জি		৩৪৫
পরিশিষ্ট		৩৪৯
গ্রন্থপঞ্জি		৩৬২
আলোকচিত্র		৩৭০

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়
জীবন ও মানসিক বিবর্তন্

পূর্বাভাস

পৃথিবীতে যুগে যুগে এমন কিছু ক্ষণজন্মা মনীষী জন্মগ্রহণ করেন, যাঁরা তাঁদের সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে সুধীসমাজে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয় হয়ে থাকেন। উপমহাদেশের রাজনীতিতে বহু মনীষীর আবির্ভাব হয়েছিল। উনিশ শতকের ক্রান্তিলগ্ন থেকে বিশ শতকের সত্তর দশক পর্যন্ত যাঁরা দেশের স্বাধীনতা ও স্বাধিকার আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন, মাওলানা[১] মোহাম্মদ[২] আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮) ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ একটি নাম, এক শতাব্দীর ইতিহাস। ১৭৫৭ সালে পলাশীর আম্রকাননে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের মাধ্যমে এতদঞ্চলের মুসলমানদের পতনের সূচনা হয়েছিল। জাতির ইতিহাসে সে পরাজয় ছিল অনাকাঙ্ক্ষিত। ফলে, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দেখা দেয় পঙ্গুত্ব। প্রয়োজন দেখা দেয় সঠিক দিক-নির্দেশনার। তাই এগিয়ে এলেন মাওলানা আকরম খাঁ-সহ আরো অনেকে। আজীবন মাওলানা কোনো অন্যায়-অসত্যের সাথে সমঝোতা করেন নি। মানবকল্যাণই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য। জাতির এ ক্রান্তিলগ্নে মাওলানা যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন, তারই পরিপ্রেক্ষিতে এতদঞ্চলের মুসলমানদের জীবনে আবার ফিরে আসে নব-প্রেরণা, নব-উদ্দীপনা।

বিভ্রান্তির বেড়াজাল ছিন্ন করে বিচ্যুতির মোহ থেকে ইসলামকে আপন মহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে পৃথিবীতে আবির্ভাব ঘটেছে বহু মনীষীর।[৩] যেমন খলিফা

---

১. মাওলানা। (مولانا) অর্থ আমাদের প্রভু। শব্দটি و - ل - ی ধাতু হতে গঠিত একটি পদ। অর্থ অভিভাবক, জিম্মাদার। 'মাওলা' শব্দের ভিন্ন ভিন্ন রূপ এবং প্রত্যয়যুক্ত শব্দ সচরাচর পদবি সম্মানসূচক সম্বোধনের শব্দরূপে ব্যবহার মুসলিম জগতের বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত আছে। যথা মাওলায়া, আমাদের প্রভু', মাওলাবী অর্থ মহানুভব (বিশেষত ভারতবর্ষে, বিদ্বান এবং দরবেশদের সম্পর্কে), সম্মানসূচকভাবে আমাদের প্রভু অর্থে, পাক-ভারতে কুরআন ও হাদিস সম্পর্কে উচ্চতর জ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তিকে মাওলানা বলা হয়। উল্লেখ্য, মোহাম্মদ আকরম খাঁ'র ক্ষেত্রে প্রায় সর্বত্রই 'মাওলানা' ম-এর পর আকার (া) ছাড়া বানান পরিলক্ষিত হয়। লেখক, গবেষক এবং সাংবাদিক সবাই ঐ বানানই ব্যবহার করে আসছেন। ইসলামি বিশ্বকোষে 'মাওলানা' বানান ম-এর পরে আকারযোগে সন্নিবেশিত হয়েছে। আরবি উচ্চারণে আকারযোগে পড়াই বিশুদ্ধ মনে করে বর্তমান অভিসন্দর্ভে 'মাওলানা' বানানই সংযোজিত হলো।
সংক্ষিপ্ত ইসলামি বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮২, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৬।

২. মাওলানা আকরম খাঁ'র আসল নাম 'মোহাম্মদ', ডাক নাম আকরম', উপাধি খাঁ।
মুহিউদ্দীন খান, অন্তরঙ্গ আলোকে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, দৈনিক আজাদ, ১৮ই আগস্ট, ১৯৭৭।

৩. এস. এ সিদ্দিকী, বার এট্ ল, ভুলে যাওয়া ইতিহাস, চট্রগ্রাম, আল-হেলাল প্রকাশনী, ১৯৯২ এর ভূমিকা দ্রঃ।

www.pathagar.com

উমর বিন্ আবদুল আযীয (রহঃ)[৪], ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী[৫], ইব্‌নে তাইমিয়া[৬], মুজাদ্দিদে আলফেসানী[৭], শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ[৮], সৈয়দ জামাল উদ্দীন আফগানী[৯], মুফতী মুহাম্মদ আবদুহু[১০], স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ[১১], মাওলানা শওকত আলি[১২], মাওলানা মোহাম্মদ আলি[১৩], এমনি আরও অনেকেই তুলে ধরেছেন বৈপ্লবিক চেতনার ঝাণ্ডা।

---

৪. উমর বিন আবদুল আযীয, বনি উমাইয়া বংশের ৮ম খলিফা। দ্বিতীয় উমর নামেও পরিচিত। মাত্র ২ বছর ৬ মাস খিলাফতের দায়িত্ব পালন করার পর ১০১ হিজরিতে বিষপান করিয়ে তাঁকে শহীদ করা হয়।
বাংলা বিশ্বকোষ, নওরোজ কিতাবিস্তান ও গ্রীন বুক হাউস লিঃ ১৯৭২, ঢাকা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৫।

৫. আর্-রাযী (الرازی) ফাখ্‌র আল-দীন আবু আব্দ আল্লাহ মুহাম্মদ ইবন উমার ইবন আল-হুসায়ন। বিখ্যাত ধর্মতত্ত্ববিদ ও ধর্মীয় দার্শনিক। তিনি ৫৪৩ অথবা ৫৪৪/১১৪৯ খ্রি. আল-রায- এ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিষ প্রয়োগে ৬০৬/১২০৯ সনে হিরাতে ইন্তিকাল করেন।
সংক্ষিপ্ত ইসলামি বিশ্ব কোষ, প্রাগুক্ত।

৬. ইব্‌ন তাইমিয়া, (১২৬৩-১৩২৮) সিরীয় মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদ। পূর্ণ নাম তাকী উদ্‌দীন আবুল আব্বাস আহমদ ইব্‌ন আবদুল হালীম ইব্‌ন তাইমিয়া আল্-হাররামী আল-হাম্বলী। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৫০০। তিনি ওহাবি মতাবলম্বী ছিলেন। বাংলা বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১৭।

৭. আহমদ, শায়খ, মুজাদ্দিদ আলফ-ই-সানী (র.)। তাঁর প্রকৃত নাম আবু আল-বারাকাত যাদ্‌র আল-দীন। তিনি খলিফা উমর আল-ফারুক-এর বংশধর। হিজরি ৯৭১, 14, শাওয়াল ১৫৬৪ খ্রি. ২৬ মে, শুক্রবার ভারতের পূর্ব পাঞ্জাবের অন্তর্গত সারহিন্দ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ৬৩ বছর বয়সে ১০৩৪ হিজরির ২৮ সফর ১৬২৪ খ্রি. ৩০ নভেম্বর ইন্তিকাল করেন। তাঁর বিশিষ্ট দু'টি গ্রন্থ, ১. মাবদা ও মাআদ এবং ২. মাআরিফা-ই-লাদুন্নীয়া।
সংক্ষিপ্ত ইসলামি বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯০।

৮. শাহ ওয়ালী উল্লাহ, ভারত উপমহাদেশে মোগল বাদশাহী পতনের যুগে খ্রিষ্টিয় অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে হিজরি ১১১৪ সন মোতাবিক ১৭০২ বা ১৭০৩ সালে দিল্লীর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম আবূ আল-ফায়াদ আহমাদ কুত্‌ব আল-দীন। তিনি প্রায় দুশ' গ্রন্থ রচনা করেন। ইসলামি শিক্ষার প্রচার-প্রসারে তাঁর পরিবারের অবদান অনস্বীকার্য। তিনি ১৭৬২ সালে ইন্তিকাল করেন।

৯. জামাল আল-দীন আল-আফগানিআল-সায়্যাদ মুহাম্মদ ইব্‌ন সাফদার ছিলেন উনিশ শতকে মুসলিম বিশ্বের প্যান ইসলামিজমের রূপকার। ১২৫৪/১৮৩৮-৯ আফগানিস্তানের কাবুল জেলার কানার-এর নিকট আসআদাবাদে তাঁর জন্ম। ১৮৯৭ সালের ৯ মার্চ তিনি ইন্তিকাল করেন।
প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২৯-৩০।

১০. মুহাম্মদ আবদুহু ১৮৪৯ নিম্ন মিসরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯০৫ খ্রি. ইন্তিকাল করেন। তিনি মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিক ও মিসরের আধুনিকতাবাদী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি একই নামে আল-উরওয়া, আল-বুছকা নামে একটি সমিতির গোড়াপত্তন এবং সমিতির মুখপত্র প্রকাশ করেন।
প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩০-৩১।

১১. আহ্‌মাদ খান সায়্যিদ ১৮১৭ খ্রি. ১৭ অক্টোবর দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯৮ খ্রি. তিনি ইন্তিকাল করেন। আলীগড় অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ পরে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি প্রতিষ্ঠাতা। উর্দু ভাষায় বুদ্ধিবৃত্তিক 'তাফসির আল-কুরআন' তিনি রচনা করেন।
প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৫-৮৬।

১২. শওকত আলী, মাওলানা (১৮৭৩-১৯৩৮)। ১৯০৬-এ ঢাকায় মুসলিম লীগের সংগঠন হতে আরম্ভ করে ১৯৩৭-এ মুসলিম লীগের অধিবেশন পর্যন্ত মুসলমানদের প্রতিটি দাবির প্রতি বলিষ্ঠ সমর্থন জানান। তিনি এবং তাঁর অনুজ আলী ভ্রাতৃদ্বয়' নামে সমধিক প্রসিদ্ধ।
বাংলা বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৩.

১৩. মুহাম্মদ আলী, মাওলানা (১৮৭৮-১৯৩১)। পাক-ভারতের উত্তর প্রদেশের রামপুর রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতীয় মুসলিম লীগের (১৯০৬) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৯২৩ সালে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। ১৯৩১ সালে লন্ডনের গোলটেবিল বৈঠকে তিনি বলেছিলেন, "আমি পরাধীন

www.pathagar.com

ইসলামকে তাঁরা মানবতার কল্যাণ ছাড়া অন্য কোনো স্বার্থে ব্যবহৃত হতে দেন নি। ইসলামের প্রাণশক্তিকে যাঁরা সজীব ও উন্নীত করে তুলেছেন, তাঁদেরই অন্যতম অবিভক্ত বাংলার প্রাণপুরুষ মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ। তিনি উপমহাদেশের স্বাধীনতা, রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও সংহতি প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুসমাজ, সর্বোপরি ইসলামের অপব্যাখ্যাকারী এই তিন শক্তির বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম করে তিনি জাতির জন্য প্রশস্ত করেছিলেন মুক্তির পথ। কুশিক্ষা ও অজ্ঞানতার অন্ধকার হতে মুসলমানদের রক্ষা করার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা ছিল নিরলস। ইসলামি জীবনবিধানভিত্তিক একটি রাষ্ট্র গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। সত্যিকার ইসলামি তাহযিব-তমদ্দুন ও নৈতিক চেতনায় উদ্দীপ্ত করার জন্য দেশের একপ্রান্ত হতে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত তিনি ঘুরে বেড়ান। পৌত্তলিকতা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবিত মুসলিম জাতির জন্য তিনি চেয়েছিলেন একটি নতুন আবাসভূমি, যেখানে কায়েম হবে আল্লাহর বিধান, প্রতিষ্ঠিত হবে ইসলামি শরি'য়তভিত্তিক খিলাফত, আদল- ইনসাফভিত্তিক সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনব্যবস্থা। তাই, সামগ্রিক বিবেচনায় বলা যায়, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন উপমহাদেশের মুসলমানদেরকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করে স্বাধীনতার দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ'র ভূমিকা ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়। মরহুম আবুল মনসুর আহমদের ভাষায় :

> মওলানা আকরম খাঁ একটি ব্যক্তিমাত্র ছিলেন না, অন্যান্য অনেক নেতার মত তিনি শুধুমাত্র একটি প্রতিষ্ঠানও ছিলেন না, তিনি ছিলেন একটি যুগের প্রতিনিধি-যুগের প্রতীক।[১৪]

জন্ম

মুসলিম বাংলার গণজাগরণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী, সাংবাদিক, দিকপাল, ত্যাগী ও নিষ্ঠাবান রাজনীতিবিদ, ইসলামি চিন্তাবিদ আরবি, ফার্সি, উর্দু, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় সুপণ্ডিত, সুসাহিত্যিক মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ। ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে মতান্তরে ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দের ৭ জুন, মোতাবেক ১২৭৫ বঙ্গাব্দের ২৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৩ সফর ১২৮৬ হিজরি শুক্রবার[১৫] সুবহি সাদিকের সময়।

দেশে ফিরিয়া যাইব না।" উল্লেখ্য, তিনি ইংলন্ডেই ইন্তিকাল করেন। মসজিদুল আকসার পাশে তাঁকে দাফন করা হয়। প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৯৬।

১৪. আবু জাফর (সম্পাদিত), জাতীয় জাগরণে আকরম খাঁ এবং মুহাম্মদির ভূমিকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃ. ২৯৪।

১৫. Kased Ali, Md., Maulana Muhammad Akram Khan (1868-1968), His Life And Works. Ph.D. Thesis, Department Of Arabic & Persian, University Of Calcutta, India 1989, Chapter Ji, P-30.
মাওলানা আকরম খাঁ'র জন্ম তারিখ সম্পর্কে একাধিক মতও পরিলক্ষিত হয়।
বিশিষ্ট গবেষক প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ড. আনিসুজ্জমান, খুরশিদ আহমদ, এনায়েত রসুল, এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত ইসলামি বিশ্বকোষে ১৮৬৯ সালকে মাওলানার জন্ম তারিখ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

বর্তমান পশ্চিম বাংলার বশিরহাট মহকুমার অন্তর্গত চব্বিশ পরগণা জেলার হাকিমপুর গ্রামে এক ঐতিহ্যবাহী আলিম ও মুজাহিদ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

বংশপরিচয়

মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ জন্মসূত্রেই জিহাদী প্রেরণায় উজ্জীবিত ছিলেন। কারণ, ১৮৩১ সালে বালাকোট যুদ্ধে তাঁর পূর্বপুরুষদের একজন শহীদের মর্যাদা লাভ করেন।[১৬] তাঁর পিতা মাওলানা আবদুল বারী সৈয়দ আহমদ শহীদের মুজাহিদ আন্দোলনে শরিক হন।[১৭] তিনি গাজী[১৮] হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। এছাড়া

ইসলামি বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, পৃ. ৫।

ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০, পৃ. ৩৮৪।

এক বর্ণনাতে আকরম খাঁ'র জন্ম সাল ১৮৭৫ বলেও উল্লেখিত আছে।

Bibliography on the works of Maulana Mohammad Akram Khan. By Md. Shamsul Haq. Diploma course in library science, Dhaka University 1960-1961 অশোক কুন্ড তাঁর 'সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জিতে' ১৮৭৭ উল্লেখ করেছেন. তবে বাংলা বিশ্বকোষ, বাংলা একাডেমী প্রকাশিত জীবনী গ্রন্থমালা, দৈনিক আজাদের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকীর বিভিন্ন বিশেষ সংখ্যায়, বিশেষ করে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ'র জীবদ্দশায় প্রকাশিত ডা. আবুল কাসেম প্রণীত 'বাঙলার প্রতিভা' নামক গ্রন্থে এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের গবেষক জনাব এ. টি. এম. আতিকুর রহমানের 'বাংলার রাজনীতিতে মওলানা আকরম খাঁ' গবেষণা সন্দর্ভে ১৮৬৮ সালকেই জন্ম সাল হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলা বিশ্বকোষ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭২, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৮।

১৬. তাঁর কবর ঐতিহাসিক বালাকোটে বিদ্যমান। পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পেশাওয়ার বিভাগের হাযারা জেলার মনসেরা তহসিল হতে ৩২ মাইল দূরে কাগান উপত্যকার মুটে অবস্থিত একটি বড় গ্রামের নাম বালাকোট। ১৮৩১ সালের মে মাসের ৬ তারিখে শিখদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এটাই বালাকোটের যুদ্ধ নামে খ্যাত।

বাংলা বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪২৫।

বালাকোটের শহীদদের সম্পর্কে আবুল হাসান আলী নদভী বলেন :

بالاکوٹ کے معرکہ میں وہ پاک نفوس شہید ہوئے جو عالم انسانیت کیلئے رونق و زینت اور مسلمان کیلئے شرف و عزت اور خیر و برکت کا باعث تھے۔

"বালাকোটের যুদ্ধে ঐ সমস্ত পবিত্র আত্মা শাহাদাত বরণ করেছেন, যারা ছিলেন বিশ্ব-মানবতার জন্য উজ্জ্বল অলংকারস্বরূপ এবং মুসলমানদের জন্য ছিলেন উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন রহমতের আধার।"

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, জব ঈমান-কি বাহার আয়ী, লক্ষ্মৌ, ১৯৭৪, পৃ. ২৬৬।

১৭. সৈয়দ ইলমুল্লাহর পৌত্র এবং সৈয়দ মুহাম্মদ ইরফানের পুত্র সৈয়দ আহমদ ১৭৮৬ সালে যুক্ত প্রদেশের রায়বেরিলিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইমাম হাসানের বংশে অধঃস্তন ৩৪তম পুরুষ। ১৮৩১ সালের ৬ মে পাঞ্জাবের হাজারা জেলার বালাকোট নামক স্থানে শিখ সৈন্যের হাতে শহীদ হন। তাওয়ারিখে হাযারা বর্ণনা মতে, সৈয়দ আহমদ এবং একশত সত্তরজন গাজী বালাকোটে গুলির আঘাতে শহীদ হন। একটি গুলি ডান হাতে এবং অন্যটি বুকের বাম পাশে লাগলে সৈয়দ আহমদ সেখানেই ভূপাতিত হন। উল্লেখ্য, পাঠান মুসলমানদের মধ্যে পায়েন্দা খান ও নজফ খান নামক বিশ্বাসঘাতকদের সহায়তায় শিখ যুবরাজ শের সিংহের নেতৃত্বে বার হাজার শিখ সৈন্য এ অভিযান পরিচালনা করে.

মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫, পৃ. ১৩, ২০।

www.pathagar.com

তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা[১৯] ছিল আকরম খাঁ'র পার্শ্ববর্তী গ্রামে।[২০] তাই, পারিবারিক সূত্রেই জিহাদী প্রেরণার উত্তরাধিকারী হওয়ায় এই জিহাদী-চেতনা তাঁর মাঝেও পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তী জীবনে বিজাতীয় ভাবধারার বিরুদ্ধে তিনি কলম-সৈনিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তিনি দেশের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত সফর করে অসাধারণ সাংগঠনিক শক্তির মাধ্যমে উপমহাদেশের স্বাধীনতাকামী মানুষের নেতৃত্ব দেন।

মাওলানা আকরম খাঁ'র পিতা মধ্যবঙ্গের খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামি চিন্তাবিদ এবং নামজাদা কামিল পীর ছিলেন।[২১] পিতামহ তোরাব আলি ওয়াহাবি আন্দোলনের[২২] অন্যতম নেতারূপে বিখ্যাত ছিলেন। এই তোরাব আলি খাঁ'র পিতা আলি খাঁ ও তাঁর পিতামহ নাসির উদ্দীন খাঁ-ও স্বদেশপ্রেমিক লোক ছিলেন। নাসির উদ্দীন খাঁ'র পিতা কামাল খাঁ-ই এই বংশের আদিপুরুষ হিসেবে পরিচিত। মাওলানা সাহেবের পূর্বপুরুষ কামাল উদ্দীন খাঁ'র পিতা জামাল উদ্দীন খাঁ সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। তিনি সম্রাট তুঘলকের রাজত্বকালে (১৩২৫-৫১ খ্রিঃ) সেখান থেকে হাকিমপুর এসে বসবাস

---

১৮. গাজী, মূলত আরব দেশে যে ব্যক্তি গাযওয়া (বেদুইন আক্রমণ) পরিচালনা করতো তাকে 'গাজী বলা হতো। পরবর্তীকালে যে ব্যক্তি কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করে বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় দান করতো তাকে 'গাজী' উপাধি দান করা হতো। বাংলা বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৮-৯।

১৯. তিতুমীর ওরফে নিসার আলী (১৭৮২-১৮৩১) বাংলায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের নেতা। ১৮৩১ সালে লর্ড বেন্টিংক তাঁর বিরুদ্ধে একটি নিয়মিত সিপাহী স্থল ও গোলন্দাজ বাহিনী পাঠালে তারা নারিকেলবাড়িয়াস্থ তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা কামানের গোলায় উড়িয়ে দেয়। অধিকাংশ অনুচরসহ তিনি যুদ্ধে শহীদ হন। ৩৫০ জন সৈন্য ধরা পড়ে।

২০. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮০, পৃ. ৩৮৪।

২১. মাওলানা আব্দুল বারী সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর খলিফা ছিলেন। আতিক সাহেব ও আবু জাফরের গ্রন্থে আব্দুল বারীর পিতা তোরাব আলী সাহেবকে তিতুমীরের শিষ্য হিসেবে দেখান হয়েছে। তথ্যটি ভুল। কারণ, আকরম খাঁ'র পিতা আব্দুল বারী ও তিতুমীর উভয়েই ছিলেন সৈয়দ আহমদের শিষ্য। তার প্রমাণ হিসেবে বলা যায়, সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী বাংলাদেশের খলিফাগণের প্রতি নিম্নরূপ নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন :

"আমি পাটনায় পৌঁছে মাওলানা আব্দুল বারী খাঁ (মাওলানা আকরম খাঁ'র পিতা) মাওলানা মুহাম্মদ হোসেন, মাওলানা হাজী শরী'য়তুল্লাহ, মাওলানা সাইয়েদ নিসার আলী তিতুমীর, সুফী খোদাদাদ সিদ্দিকী, মাওলানা কারামত আলীকে খবর দিব। আমার কোলকাতা পৌঁছার দিন-তারিখ তোমরা তাদের কাছে জানতে পারবে।"

আব্বাস আলী খান, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ২১১-১১২.

২২. ওয়াহহাবী (وهابى) শব্দে প্রথমে যথার্থভাবে এক আরব মুসলমানকে চিহ্নিত করা হয়েছিল। শব্দটির উৎপত্তি হচ্ছে সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতার নাম শেখ আব্দুল ওয়াহাব (১১১৫-১২০১ হিজরী, ১৭০৭-১৭৮৭)। তিনি গত শতাব্দীর প্রথমভাগে আরব দেশের নজদ অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শিক্ষা ছিল হযরতের জীবদ্দশায় ও তাঁর পরে খেলাফতের আমলে ইসলামের যে রূপ ছিল তারই অনুসারী হওয়া।

আবদুল মওদুদ, ওহাবী আন্দোলন, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৮.

ড. মঈনুদ্দীন আহমদ খান এ আন্দোলনের মূলকথা চিত্রিত করেছেন এভাবে, ক. আল্লাহ ছাড়া উপাস্য নাই; খ. আলকুরআনের নির্দেশ ও রসুলের সুন্নত বা জীবনপন্থাই একমাত্র অনুসরণীয়; গ. আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করা যাবে না; ঘ. যে-কোনো বেদাত থেকে সতর্ক ও সচেতন থাকতে হবে.....।

মঈনুদ্দীন আহমদ খান, মুসলিম ধর্মসংস্কার আন্দোলন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১।

www.pathagar.com

জাগানো অসম্ভব। শিক্ষাবঞ্চিত দরিদ্র্য মুসলমান সমাজের অভাব-অভিযোগ তুলে ধরার লক্ষ্যে তাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ও অন্ধ কুসংস্কার দূর করার জন্য প্রয়োজন একটি পত্রিকা।[৬৯]

তখনকার পরিস্থিতি এত উন্নত ছিল না। মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায় সামান্য তুচ্ছ ব্যাপার নিয়েও অনেক সময় একে অপরের বিরুদ্ধে বিষোদগার করতো। বিশেষ করে, হিন্দুদের গো-কুরবানী বন্ধ আন্দোলন, মসজিদের সামনে বাদ্য বাজানো এবং হকি খেলা নিয়ে এককালে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে যে অশান্তির সৃষ্টি হয়েছিল বর্তমান তরুণ সমাজের তা জানা না থাকারই কথা। মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তখন একটি সাপ্তাহিক কাগজ যে কত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, তা আজকের পরিস্থিতিতে বুঝা দুষ্কর। *সাপ্তাহিক মোহাম্মদী*[৭০] এই সময়ে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণে হিন্দু সমাজের মালিকানায় পরিচালিত ও প্রকাশিত বহুসংখ্যক পত্র-পত্রিকার বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম করেছিল।

সাপ্তাহিক মোহাম্মদীকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত প্রায় নিঃসঙ্গ যাত্রীরূপেই পথ চলতে হয়েছে। এই নিঃসঙ্গ পথটিও নিষ্কণ্টক ছিল না। যাত্রাপথে নানা ধরনের বাধা এসেছে। একদিকে ইংরেজ শাসকদের অনুদার মনোভাব, অন্যদিকে মুসলমানদের পত্র-পত্রিকা পাঠের অমনোযোগিতা, বিজ্ঞাপনের অভাব ইত্যাদি কারণে সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিবেশের সৃষ্টিহয়। কিন্তু যুবক আকরম খাঁ অসীম সাহস ও মনোবল নিয়ে চলার পথে কণ্টকাকীর্ণ সমস্ত বাধাকে উপেক্ষা করে সম্মুখে এগিয়ে যান। কোনো প্রতিকূল পরিবেশেই তিনি হিম্মত হারান নি। এভাবে তিনি রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জিহাদে বিজয়ী সিপাহসালার হিসেবে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

পত্রিকা সম্পাদনায় তিনি কঠোর পরিশ্রম করতেন। সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখতে বসে অনেক সময় তিনি আহার-নিদ্রা ভুলে যেতেন। পত্রিকা পরিচালনার জন্য তাঁর পুঁজি ছিল যৎসামান্য। কোনো প্রকারে কাগজ ক্রয় ও পত্রিকা মুদ্রণের কাজ চালাতেন। অন্যান্য আবশ্যকীয় খরচও কোনো রকমে চালাতেন। চীনা বাজার থেকে ট্রাক ও কুলির

---

৬৯. বার্ষিক সওগাত, কোলকাতা, ১৩৩৩ সন, পৃ. ১৬৮।

৭০. আনিসুজ্জামান রচিত মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র ও মুস্তাফা নূরউল ইসলাম রচিত সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত উভয় গ্রন্থে সাপ্তাহিক মোহাম্মদির প্রথম প্রকাশকাল ১৯০৮ উল্লেখ করা হয়েছে। মোটামুটি একই তথ্য উভয় গ্রন্থে দেয়া হয়েছে যে, মাঝে-মাঝে পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ থাকে, কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পরও কোলকাতায় এর প্রকাশ অব্যাহত ছিল। মোহাম্মদ আকরম খাঁ পত্রিকাটি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সম্পাদক ছিলেন, পরে নাজির আহমদ চৌধুরী ও খায়রুল আনাম খাঁ সম্পাদক হন। কিন্তু বাংলা বিশ্বকোষ (১৯৭৬, ঢাকা, পৃ ১৫৩) 'মুহাম্মদি' ভুক্তিতে এইরূপ তথ্য দিয়েছে, বিখ্যাত ব্যবসায়ী হাজী আবদুল্লাহর অর্থানুকূল্যে ইহা প্রথমে মাসিক-পত্রের আকারে প্রকাশিত হয় এবং পরে কিছুদিন পাক্ষিক আকারে প্রকাশিত হইয়া ১৯০২ খ্রী সাপ্তাহিক পত্রিকার আকার ধারণ করে। ১৯২১-২২ সালে কিছুকাল সাপ্তাহিক মোহাম্মদীর সঙ্গে দৈনিক মোহাম্মদিও প্রকাশিত হয়েছিল। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ইহার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক এবং পরে ফজলুল হক সেলবর্ষী, নজীর আহমদ চৌধুরী, আবুল কালাম শামসুদ্দীনসহ আরও কয়েকজন খ্যাতিমান সাংবাদিক মোহাম্মদির সম্পাদকীয় দায়িত্ব পালন করেন। ..... দেশ বিভাগের পর মওলানা আকরম খাঁ'র জ্যেষ্ঠ পুত্র খায়রুল আনাম খাঁ কোলকাতা হতে মোহাম্মদি প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৬, পৃ. ১৫৮।

www.pathagar.com

খরচ দিয়ে কাগজ আনা কষ্টসাধ্য ছিল। তাই, তিনি কাগজ ক্রয় করে নিজে মাথায় করে পত্রিকা অফিসে নিয়ে আসতেন। এতে বিন্দুমাত্রও সংকোচ করেন নি।[৭১]

এ সময় উপমহাদেশের কয়েকজন খ্যাতনামা রাজনীতিবিদ ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী নেতা মাওলানা মোহাম্মদ আলি, মাওলানা শওকত আলি, মাওলানা আবুল কালাম *আজাদ*[৭২] মাওলানা মনিরুজ্জমান এসলামাবাদী[৭৩] আকরম খাঁ'র প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেন। ১৯১১ সালে মাওলানা মোহাম্মদ আলির প্রতিষ্ঠিত ইংরেজি *সাপ্তাহিক কমরেড,* ১৯১২ সালে মাওলানা আবুল কালাম *আজাদ* প্রতিষ্ঠিত *আল হিলাল, সাপ্তাহিক মোহাম্মদীর* প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করে।[৭৪] মাওলানা এ দু'টি পত্রিকার সহযোগিতা পেয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে পত্রিকার মান বৃদ্ধির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকেন। পত্রিকাটি অল্পদিনের মধ্যে প্রথম শ্রেণির সাহিত্য ও ইসলাম বিষয়ক সাময়িকী হিসেবে প্রসিদ্ধি অর্জনে সক্ষম হয়। তৎকালীন সময়ে পত্রিকাটিকে কেন্দ্র করেই মুসলিম সমাজের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অগ্রযাত্রা আরম্ভ হয়। তরুণ সমাজ সোনালী স্বপ্নের সন্ধান পায়।

বাংলার বিরাট মুসলিম সমাজের মধ্যে তখন *মোসলেম হিতৈষী* ও *মিহির* ছিল একমাত্র সংবাদপত্র। হিন্দু সম্প্রদায় কর্তৃক প্রকাশিত বহুসংখ্যক সংবাদপত্রের তুলনায় এগুলো ছিল খুবই নগণ্য। গ্রাহক সংখ্যাও ছিল অত্যন্ত সীমিত।[৭৫] অপরদিকে, *আনন্দবাজার পত্রিকা, বসুমতী, প্রবাসী* প্রভৃতির কোনো কোনো ভূমিকা, মতামত এমনকি ভাষাও মুসলমানরা পছন্দ করতে পারেন নি।[৭৬] রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, নানাবিধ প্রশ্নে হিন্দু মুসলমানদের পৃথক পৃথক দৃষ্টিভিঙ্গি ছিল। হিন্দু কর্তৃক পরিচালিত পত্রিকাগুলোর বিভিন্ন বক্তব্যের জবাব দেয়ার দায়িত্ব পালন করতো

---

৭১. আবু জাফর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪

৭২. তিনি (১৮৮৮-১৯৫৮) পবিত্র মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাল্য নাম ফিরোজ, তরুণ বয়সের নাম মহিউদ্দীন আহমদ। পরে আবুল কালাম আজাদ হিসেবে পরিচিত। শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিক এ ব্যক্তিত্ব আজাদী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনবার তিনি ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। সম্পাদনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 'তরজুমানুল কুরআন' তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি।
বাংলা বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, প্রগুক্ত, পৃঃ ১৭৩.
আবদুর রাকিব, সংগ্রামী নায়ক আবুল কালাম আযাদ, মল্লিক ব্রাদার্স, কলেজ স্ট্রীট, কোলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ৪০।

৭৩. তিনি ১৮৭৫ সালে চট্রগ্রামের পটিয়া থানার আড়ালিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫০ সালের ২৪ অক্টোবর ইন্তিকাল করেন। চট্রগ্রামের অপর নাম ইসলামাবাদ। কর্মজীবনে তাই তিনি 'ইসলামাবাদী' খেতাবে সমধিক প্রসিদ্ধ। আমৃত্যু তিনি বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখেন। সাপ্তাহিক ও দৈনিক ছোলতান এবং আমীর-এর সম্পাদক ছিলেন। তিনি প্যান ইসলামে বিশ্বাসী ছিলেন।
মুহাম্মদ আবদুল হাই, সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৫৬, পৃ. ৯৭-৯৯।

৭৪. জীবনী গ্রন্থমালা-১, বাংলা একাডেমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

৭৫. বিশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রকাশিত মুসলিম বঙ্গের বিখ্যাত মুখপাত্র। শেখ আবদুর রহীম পত্রিকাগুলোর সম্পাদক ছিলেন।

৭৬. বসুমতী-২৬ মাঘ, ১৩০৬ সনে এবং প্রবাসী-আশ্বিন, ১৩১৫ সনে প্রকাশিত হয়।
ড. ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙ্গালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯৫-৯৬।

www.pathagar.com

সাপ্তাহিক মোহাম্মদী এবং ১৯০২ সালে প্রতিষ্ঠিত *মাসিক মোহাম্মদী*। এ সময় মুসলিম জনগণ অবহেলিত ছিল।

মাওলানা আকরম খাঁ ও তাঁর পত্রিকার এই বলিষ্ঠ ভূমিকা কারো কাছে সাম্প্রদায়িক বিবেচিত হতে পারে। এ প্রসঙ্গে জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলি আহসান বলেন:

> অনেক সময় তিনি (আকরম খাঁ) অতিরিক্তভাবে সাম্প্রদায়িক হয়েছেন। তিনি সাম্প্রদায়িক হিন্দুর বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক মুসলমান হয়েছেন। অনেক দূরবর্তী হলেও আমরা এখনও অনুভব করতে পারি যে, সেই মুহূর্তে মুসলমানদের অস্তিত্বের জন্য এই সাম্প্রদায়িকতার প্রয়োজন ছিল।[৭৭]

আকরম খাঁ *সাপ্তাহিক মোহাম্মদীর* মাধ্যমে বহু মুসলমান তরুণকে সাংবাদিকতা পেশায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। অনেক তরুণ সাংবাদিকতা পেশায় প্রবেশের সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। এঁদের মধ্যে মোহাম্মদ মোদাব্বের, আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্নের নাম উল্লেখযোগ্য।

স্মরণযোগ্য যে, সে সময় উপমহাদেশের রাজনীতির অঙ্গন ছিল খুবই উত্তপ্ত। তাই, মাওলানা সাংবাদিকতার পাশাপাশি দেশ সেবার বৃহত্তর ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে রাজনীতির অঙ্গনেও সক্রিয় হয়েছিলেন। এজন্য তিনি পত্রিকা সম্পাদনার কাজে যথেষ্ট সময় দিতে পারতেন না। প্রথমে নাজির আহমদ চৌধুরী, ফজলুল হক সেলবর্ষী ও পরে আবুল কালাম শামসুদ্দীন *সাপ্তাহিক মোহাম্মদী* সম্পাদনায় সহায়তা করেন।[৭৮]

১৯২৫ সালে প্রকাশিত *সাপ্তাহিক হানাফী*[৭৯] নামক পত্রিকা *সাপ্তাহিক মোহাম্মদীর* সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। কিন্তু *সাপ্তাহিক মোহাম্মদীর* যুক্তিবাদী ও বিশ্লেষণধর্মী রচনার মোকাবেলায় *হানাফী* তেমন জনপ্রিয় হতে পারেনি। *মোহাম্মদী* অনেক বেশি জনপ্রিয় ছিল। বাংলার মফস্বল অঞ্চলে এমন স্থান কমই ছিল, যেখানে *সাপ্তাহিক মোহাম্মদীর* অনুপ্রবেশ ঘটে নি। সাধনা ও অধ্যবসায়ের ফলে বাংলা ও ইংরেজিতে আকরম খাঁ যে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন, উক্ত পত্রিকার লালিত্যময় ভাষা তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

কোলকাতার মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ১৯৩৪ সালে লীগ বিজয়ী হয়েছিল। ১৯৩৫ সালে আবার লীগ বিজয়ের গৌরব অর্জন করে। কোলকাতা শহর ও শহরতলীর মুসলমানরা আনন্দ-উল্লাসে ফেটে পড়েন। এই বিজয়কে উপলক্ষ করে *মোহাম্মদীর* বিশেষ সংখ্যা বের হয়। *সাপ্তাহিক মোহাম্মদীর* এ সংখ্যা এত বেশি বিক্রি হয় যে, প্রেস

---

৭৭. বই, আষাঢ়, ১৩৯০, পৃ. ৩।

৭৮. জীবনী গ্রন্থমালা-১, বাংলা একাডেমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

৭৯. এটি ধর্ম বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা। ১৯২৬ সালে হানাফী সম্প্রদায়ের মুখপত্ররূপে কোলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন মাওলানা মুহাম্মদ রুহুল আমীন। পরে মোহাম্মদ আবদুল হাকীম ও চৌধুরী মোহাম্মদ শামসুর রহমান সম্পাদনা করেন।
মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৬।
আবুল কালাম শামসুদ্দীন, অতীত দিনের স্মৃতি, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. ১৫০।

www.pathagar.com

ছেপে কুলিয়ে উঠতে পারছিল না। *সাপ্তাহিক মোহাম্মদীর* ভূমিকা সম্পর্কে বিশিষ্ট গবেষক ও প্রথিতযশা লেখক ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ বলেন :

> বাংলাদেশের বিকৃত ইসলাম জীবনের প্রারম্ভ থেকেই মওলানা সাহেবকে পীড়া দিত। স্যার সৈয়দ আহমদ ও তাঁর সহযোগীগণ যেভাবে *তাহযিবুল আখলাক* পত্রিকার মাধ্যমে উত্তর ভারতের সমাজ সংস্কারে ব্রতী হন, তেমনি মাওলানা সাহেবও মোহাম্মদীর পাতায় পাতায়, ছত্রে ছত্রে তৎকালীন মুসলিম বাংলার সামাজিক গলদ শোধরাবার চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ ও মাওলানা কারামত আলির যথার্থ উত্তরসূরী।[৮০]

১৯২৬ সালে কোলকাতা ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা শুরু হয়। *মোহাম্মদী* ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে দাঙ্গার বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন আরম্ভ করে, সমাজের দুষ্ট লোকদের দমনের জন্য তীব্রভাবে আঘাত হানে। অবশেষে এই হীন চক্রান্ত নস্যাত হয়।

মোহাম্মদ মোদাব্বেরের ভাষায়:

> এই সাপ্তাহিক মোহাম্মদী পত্রিকা বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত বাঙ্গালী মুসলমানদের জীবনকাঠির কাজ করেছে।[৮১]

মাওলানা আকরম খাঁ পাশ্চাত্যের অনুসারী ছিলেন না, আবার তিনি অনুকরণপ্রিয়ও ছিলেন না। তিনি ছিলেন নতুন ও পুরাতনের সমন্বয়কারী। এর মাঝেই তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন মুক্তির পথ।

আল-এসলাম প্রকাশ

১৯১৪, মতান্তরে ১৯১৫ সাল মোতাবেক ১৩২২-২৩ সনের বৈশাখ মাসে *আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা*'র মুখপত্র হিসেবে *আল-এসলাম'* নামক আরও একটি মাসিক পত্রিকা মাওলানা আকরম খাঁ'র সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। সহকারি হিসেবে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মাওলানা ফখরুদ্দিন আহমদ নিযামপুরী, ফজলুল হক সেলবর্ষী সম্পাদনা বিভাগে কাজ করেন। বিশিষ্ট লেখকদের লেখা এতে প্রকাশিত হতো।[৮২] মাওলানা কাইসার নদভী আল্-এসলাম সম্পর্কে বলেন :

> ইহাতে (আল-এসলামে) বাংলা ভাষার সকল খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও লেখকের মূল্যবান রচনাবলী প্রকাশিত হইত। ড. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. কাজী মোতাহার হোসেন, কাজী নজরুল ইসলাম, কবি গোলাম মোস্তফা, মাওলানা মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, আবদুল মালিক চৌধুরী, কাজী ইমদাদুল

---

৮০. ড. মুহম্মদ আবদুল্লাহ্, মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮০, পৃ. ৪০২।

৮১. মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতা ও আবুল কালাম শামসুদ্দীন, ঢাকা-১৯৮৩, পৃ. ৩৪।

৮২. পত্রিকাটি ছয় বছরকাল চালু ছিল। পত্রিকার উপজীব্য বিষয়াবলী মুসলিম ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি, শিক্ষা এবং বাংলা ভাষা, সাহিত্য, স্বধর্ম, স্বজাতি, স্বদেশ এবং মাতৃভাষার সেবা করার নিমিত্তেই আল-এসলামের প্রকাশ। বাঙ্গালী মুসলমান পাঠক সমাজে পত্রিকাটি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং মুসলিম জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সম্পাদক মোহাম্মদ আকরম খাঁ, পরে মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান এসলামাবাদী।
মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৫।

www.pathagar.com

হক, শাহাদাত হোসেন, মোজাম্মেল হক, আকবর উদ্দীন, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলি, আবুল মনসুর আহমদ, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, শেখ হবিবুর রহমান, শেখ ফজলুল করীম, কায়কোবাদ, এয়াকুব আলি চৌধুরী, সৈয়দ এমদাদ আলি, আবুল কালাম শামসুদ্দীন প্রমুখ তাহাদের অন্যতম। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেবের ব্যাপক তৎপরতা সমগ্র বাংলায় বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টিকরে এবং দিকে দিকে তাহার ব্যক্তিত্বের সাড়া পড়ে যায়।[৮৩]

মাওলানা আকরম খাঁ এ পত্রিকাটিতে তাঁর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা স্বাধীনভাবে প্রকাশের সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি এই পত্রিকার মাধ্যমে মুসলিম জনগণকে ইসলামের মূল ভাবধারায় উজ্জীবিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। মুসলমানদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও জাতীয় জাগরণে পত্রিকাটি বিশেষ অবদান রাখে। মাওলানা একই আদর্শে উদ্বুদ্ধ খ্যাতনামা বিশিষ্ট লেখকবৃন্দকে এ পত্রিকায় সংঘবদ্ধ করারও সুযোগ পেয়েছিলেন। দীর্ঘ ছয় বছর যাবৎ পত্রিকাটি সফলভাবে প্রকাশিত হয়।[৮৪]

আল-এসলাম প্রকাশের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল ইসলাম ধর্মতত্ত্বের আলোচনা, ইসলামের মাহাত্ম্য প্রচার, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা উপস্থাপিত সংশয়বাদীদের যুক্তি খণ্ডন, সমাজ সংস্কার, অন্ধবিশ্বাসীদের মূলোৎপাটন এবং ধর্ম সম্বন্ধে অনুশীলন ও গবেষণা, মুসলিম ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষ্টিষ, শিক্ষা, সভ্যতা, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ইত্যাদি সর্বশ্রেণীর প্রবন্ধ *আল-এসলামে* প্রকাশিত হতো। বাঙালি মুসলিম সমাজে আল-এসলাম বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং মুসলিম জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জানা যায় যে, ১৯১৭ সালে আল-এসলামের প্রচার সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫০০।[৮৫]

দৈনিক যামানা

১৯২০ সালে ভারতব্যাপী মুসলমান ও হিন্দুদের যুক্ত আন্দোলন *খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন*[৮৬] (Non-violence and non-co-operation) শুরু হয়। আকরম খাঁ খিলাফত আন্দোলনকে জোরদার করার লক্ষ্যে এর মুখপত্র হিসেবে ২১ মে মতান্তরে ১৪ মে, ও ২৪ মে তাঁর সম্পাদনায় *যামানা* নামক একটি উর্দু দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের বাণী উর্দুভাষীদের কাছে পৌঁছানোই এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।[৮৭] এ পত্রিকায় লিখতেন প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, আলি ভ্রাতৃদ্বয়, মাওলানা যফর আলি খাঁ[৮৮], মাওলানা হাসরত মুহানী[৮৯],

---

৮৩. জীবনী গ্রন্থমালা-১, বাংলা একাডেমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।
আবু জাফর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬।

৮৪. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৯।

৮৫. ড. সুনীল কান্তি দে, আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা, কোলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ১০।

৮৬. কাসেদ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

৮৭. মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক, জীবনী গ্রন্থমালা- ১, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯০.

৮৮. মাওলানা যফর আলী খাঁ ১৮৭৩ সালে শিয়ালকোট জেলার ওযিরাবাদ তহসীলের কোটমহরথ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন প্রখ্যাত কবি, সাংবাদিক ও আজাদী আন্দোলনের অগ্রদূত ছিলেন। ১৯৫৬ সালের ২৭শে নভেম্বর তিনি ইনতেকাল করেন।
ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৯।

www.pathagar.com

মাওলানা আযাদ সুবহানী, মাওলানা মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী ও মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকী প্রমুখ।

যামানার প্রথম সংখ্যার প্রথম সম্পাদকীয় (ہم اور ہمارے اصولین) আমরা ও আমাদের নীতি-নির্ধারণ শীর্ষক নিবন্ধে আকরম খাঁ *দৈনিক যামানার* উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন :

> আমাদের নীতি কি? এ প্রশ্নের উত্তরে শুধু এইটুকু বলা যথেষ্ট মনে করি যে, আজ হইতে তেরশত বছর পূর্বে আকায়ে নামদার হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছ.) এরশাদ করেছেন-
>
> تركت فيكم امرين كتاب الله وسنة رسوله অর্থাৎ আমি তোমাদের জন্য দুইটি জিনিস রাখিয়া যাইতেছি। একটি আল্লাহর কিতাব, অপরটি তাঁহার রছুলের ছুন্নত। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা দৃঢ়ভাবে উহা ধরিয়া রাখিবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের ক্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিবে না। ...... অনুসারীদের পক্ষে উহা ব্যতীত আর অন্য কোনো নীতিরই অনুসরণ করা সম্ভব নয় ....।[৯০] নিজেদের ব্যাপারে আমরা কেবল এইটুকু বলা যথেষ্ট মনে করি যে, আমরা একদিকে মুসলমান, অপরপক্ষে হিন্দুস্থানীও বটে। তাই, আমাদের পবিত্র ধর্মের খেদমত এবং প্রিয় দেশের কল্যাণ সাধনের প্রচেষ্টা 'যামানা'র নীতিগত দায়িত্ব। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ইহাও স্পষ্ট করিয়া দেওয়া প্রয়োজন যে, আমরা এছলামী ভ্রাতৃত্ব ও ধর্মীয় সম্পর্কের বন্ধনকে সকল সময় দেশের সীমারেখা হইতে মুক্ত মনে করি।[৯১]

মাওলানা আকরম খাঁ সুস্পষ্টভাবে স্বধর্ম ও স্বজাতির দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সাথে সাথে বিশ্ব ইসলামি ভ্রাতৃত্ববোধের প্রতিও ইংগিত করে উক্ত সম্পাদকীয়ের শেষে বলেন :

> যদি ভৌগোলিক সংকীর্ণ সীমারেখাতে আমাদের ভ্রাতৃত্ব সীমিত হইয়া পড়ে এবং এছলামী ভ্রাতৃত্বের গতিধারা তরঙ্গময় সমুদ্র ও গগনচুম্বী পর্বতকে অতিক্রম করিয়া বিশ্বের আনাচে-কানাচে انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم. অর্থাৎ, মোমেন মাত্রই একে অপরের ভ্রাতা স্বরূপ .....। গোটা বিশ্বের প্রতিটি এলাকা হউক উহা নিউজিল্যান্ডের অন্ধকারময় কন্টকাকীর্ণ বরফের দেশ কিংবা উত্তপ্ত মরুভূমি যেখানে একটিমাত্র কলেমা ....। এই ধ্বনি উত্থিত হইতেছে সেখানে কলেমা গো প্রত্যেক লোক আমাদের ভাই-ইহা অকাট্য সত্য এবং আল্লাহ ও রাছুলের নির্ধারিত পরস্পরের সকল অঙ্গীকার ও দায়িত্ব আমাদের পরস্পরের উপর অর্পিত।[৯২]

এ জন্যই তিনি স্বদেশ থেকে অনেক দূরে তুর্কি খলিফার স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। ইসলামি ভ্রাতৃত্ববন্ধনকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে

---

৮৯. মাওলানা হাসরত মুহানী ১৮৭৫ খ্রি. উন্নাও জেলার (ইউপি) মুহান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আযাদী আন্দোলনের নেতা, প্রখ্যাত কবি, সাংবাদিক ও সূফী ছিলেন। ১৯৫১ সালে ইনতেকাল করেন।
প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১০।

৯০. আবু জাফর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪৯-৫১।

৯১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫১।

৯২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫১-৬৫২।

www.pathagar.com

ত্রিপলি ও বলকান যুদ্ধের সময় ভারতের বিভিন্ন এলাকা থেকে একলক্ষ টাকা সংগ্রহ করে মুমূর্ষু-পীড়িত ও নির্যাতিতদের সেবায় তিনি তুর্কি ফান্ডে জমা করেন। তুরস্কে মুসলমানদের বিপদের সময়ও তাঁর পত্রিকার মাধ্যমে প্রায় ৪০ হাজার টাকা সংগ্রহ করে তুরস্কে পাঠান।[৯৩]

*যামানা*র মাধ্যমে তিনি উর্দুভাষী মুসলমানদের নিকট রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচার করার সুযোগ পান। এ সময় তিনি একাধারে *সাপ্তাহিক মোহাম্মদী, দৈনিক যামানা* ও *দৈনিক সেবক*–এ তিনটি পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে রাজনৈতিক প্রচারণা ও স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেন।

উল্লেখ্য, খিলাফত ও গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে *'দৈনিক যামানা'* ও *দৈনিক সেবক* প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক ১৯২২ সালে আন্দোলন প্রত্যাহার করার ফলে পত্রিকা দু'টির জনপ্রিয়তা কমে যায়। ১৯২২ সালের মাঝামাঝি সময়ে *দৈনিক সেবক* বন্ধ হয়ে যায়। এর বছরখানেক পর, সম্ভবত ১৯২৩ সালের দিকে *দৈনিক যামানার* প্রকাশনাও মাওলানা বন্ধ করে দেন।[৯৪]

সেবক

উর্দু দৈনিক *যামানা* প্রকাশের পরপরই মাওলানা *সেবক* নামে আর একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। প্রথমে সাপ্তাহিক হিসেবে প্রকাশ হলেও ১৯২১ সালের ১ ডিসেম্বর পত্রিকাটিকে তিনি দৈনিকে রূপান্তরিত করেন। প্রকাশনার মাত্র ১০ দিন পরই ১০ ডিসেম্বর 'অগ্রসর! অগ্রসর!' শিরোনামে উত্তেজনামূলক সরকারবিরোধী একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করায় সরকার কর্তৃক পত্রিকার প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়, জামানত তলব করা হয় এবং মাওলানাকে গ্রেফতার করে কারাগারে প্রেরণ করা হয়। কোলকাতার তৎকালীন প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট মি. সুইনহোর বিচারে তিনি এক বছরের জন্য দণ্ডিত হন। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে তাঁকে রাখা হয়।[৯৫] এ সময় সেবক পত্রিকাটি কিছুকাল বন্ধ থাকে।

সমগ্র ভারতে অসহযোগ আন্দোলনের অজুহাতে সে সময় মহাত্মা গান্ধীসহ ভারতের উল্লেখযোগ্য বেশির ভাগ নেতাই গ্রেফতার হন। আকরম খাঁ অহিংস অসহযোগের নীতি অনুসারে কংগ্রেস নেতাদের সাথে আত্মপক্ষ সমর্থন না করে জেলখানায় বন্দী জীবন গ্রহণ করেন। সরকার তাঁকে শরীরী সংগ্রাম থেকে নিষ্ক্রিয় করার জন্য বন্দী করেছেন। কিন্তু সংগ্রামী বীর আকরম খাঁ জেলখানায় কলম সৈনিকের ভূমিকা গ্রহণ করেন।

তিনি কারাগারের বন্দী শিবিরে বসে পবিত্র কুরআনের *আমপারার* অনুবাদ করেন। এটি *কারাগারের সওগাত* (আমপারার অনুবাদ) নামে খ্যাত। কারাগারে প্রেরিত হওয়ার পর তিনি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে পত্রিকায় যোগদান করার অনুরোধ করেন। তিনি ১৯২২ সালের জুন মাসে সেবকের সম্পাদনা বিভাগে যোগদান করেন।

---

৯৩. বলকান যুদ্ধ (১৯১২-১৩) ইউরোপ তুরস্ক দখলের লক্ষ্যে পরিচালিত দু'টি স্বল্পকালীন যুদ্ধ। এ যুদ্ধের ফলে ১ম বিশ্বযুদ্ধের পথ সুগম হয়।
বাংলা বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৮।

৯৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১-১০২

৯৫. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, বঙ্গীয় রাজনীতিতে ওলামার ভূমিকা, ই. ফা. বা, ১৯৯৫, পৃ. ৫৬।

www.pathagar.com

কিন্তু নজরুল বেশি দিন সেবকে ছিলেন না। অতঃপর আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মোহাম্মদ মোদাব্বের, অদ্বৈত মল্লবর্মন *সেবকের* সম্পাদনা বিভাগে যোগ দেন। *সেবকের* উপর সরকারী নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হলে *সাপ্তাহিক মোহাম্মদীকে* দৈনিকে রূপান্তরিত করে প্রকাশনা শুরু হয়। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলিকে *দৈনিক মোহাম্মদীর* ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের দায়িত্ব দেয়া হয়। এক পর্যায়ে কবি কাজী নজরুল ইসলামও *দৈনিক মোহাম্মদীতে* যোগ দেন। তিনি *কাতুকুতু* নামে ব্যঙ্গ রসাত্মক কলাম লিখতেন। আবুল কালাম শামসুদ্দীন *'হরেক রকম'* নামে ব্যঙ্গ রসাত্মক কলাম লিখতেন।[৯৬]

ইতিমধ্যে *সেবক*-এর উপর থেকে সরকারি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। আবার *সেবকের* প্রকাশনা শুরু হয়। এ সময় *সেবক*-এ মোহাম্মদ মোদাব্বের ও অদ্বৈত মল্লবর্মন প্রমুখ কাজ করতেন। কিন্তু সঠিক পরিচালনার অভাবে কাগজের জনপ্রিয়তা কমে যায়। পত্রিকাটি টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হলে একদিন কারাগার থেকে লিখিত নির্দেশের মাধ্যমে মাওলানা পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ করে দেন।[৯৭]

দৈনিক মোহাম্মদী

১৯২২ সালে *দৈনিক মোহাম্মদী* প্রকাশিত হয়।[৯৮] পূর্বেই বলা হয়েছে অসহযোগ আন্দোলনের কারণে কংগ্রেস নেতাদের সাথে আকরম খাঁও বন্দী হন। সরকারবিরোধী সম্পাদকীয় লেখার অজুহাতে *সেবক* পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়া হয়। *সেবকের* উপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হলে *সাপ্তাহিক মোহাম্মদীকে* দৈনিকে রূপান্তরিত করে প্রকাশনা আরম্ভ হয়।[৯৯] তখন মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলি, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মঈনউদ্দীন ও কাজী নজরুল ইসলামসহ আরও অনেকেই *মোহাম্মদীতে* কর্মরত ছিলেন। *কাতুকুতু* নামক ব্যঙ্গরসাত্মক কলাম লিখে নজরুল ইসলাম *মোহাম্মদীকে* সাধারণ মানুষের হৃদয়গ্রাহী পত্রিকা হিসেবে তুলে ধরেন।[১০০] অবশ্য, এ পত্রিকার স্থায়িত্বকাল খুব বেশি ছিল না। কোলকাতা থেকে আকরম খাঁ'র সম্পাদনায় পত্রিকাটি বের হতো সত্য, আসলে এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ ওয়াজেদ

---

৯৬. Abu Jafar, Moulana Akram Khan, A Versatile Genius, Dhaka, Islamic Foundation Bangladesh, P. 36-37.

৯৭. জীবনী গ্রন্থমালা-১, বাংলা একাডেমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯-২০।

৯৮. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৫।
সহ-উদ্ধৃতি, বশীর আল্‌হেলাল, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস (বাংলা একাডেমী, ঢাকা), পৃ. ১৫৯।

৯৯. সেবক বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সেবকের স্থলে নতুন নামে একটি দৈনিক বের করার কথা কর্তৃপক্ষ চিন্তা করেন। কিন্তু তখন ব্রিটিশবিরোধী পত্রিকার ডিক্লারেশন পাওয়া ছিল দুষ্কর। তার পরিবর্তে সাপ্তাহিক মুহাম্মদির দৈনিক সংস্করণ বের করতে আইনগত কোনো বাধা ছিল না। সে জন্যই সেবকের স্থলে দৈনিক মুহাম্মদি চালু হয়।
জীবনী গ্রন্থমালা-১, বাংলা একাডেমী, প্রাগুক্ত, ১৯৮৭, পৃ. ১৯।

১০০. কাতুকুতুর হেডিং ছিল নিম্নরূপ :
নেহারি নেহরু মতিলাল।
বানর-আঁখি অতিলাল!'
'ফিজির হিজিবিজ।'
'জাপানের চা-পান'।
আবুল কালাম শামসুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০।

www.pathagar.com

আলি। কিন্তু মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলির নাম কাগজের কোথাও উল্লেখ থাকতো না। সম্পাদক হিসেবে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (কারাগারে) উল্লেখ থাকতো। আবুল কালাম শামসুদ্দীনের প্রচেষ্টায় *দৈনিক মোহাম্মদীতেও* ব্যঙ্গরসাত্মক হরেক রকম কলাম চালু হয়। এতে অন্যান্য কাগজে প্রকাশিত মতামত ও সংবাদের ওপর ব্যঙ্গবাণ বর্ষিত হতো। বিশেষ করে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন *নায়ক* পত্রিকার সম্পাদক এবং *স্বরাজ* পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন স্বনামধন্য বিপ্লবী নলিনী কিশোর গুহ। উভয়েই ছিলেন ভাল লেখক। তবুও মাঝে মাঝে তাদের কোনো কোনো লেখায় স্ববিরোধী বক্তব্য ফুটে উঠতো। তারই সুযোগ *মোহাম্মদী* গ্রহণ করতো।

দৈনিক মোহাম্মদীকে লক্ষ্য করে *নায়ক* পত্রিকার সম্পাদকীয়তে একদিন একটি লেখা বের হয় এভাবে:

> একটা মাথাকাটা সহযোগী আমাদের বড় পিছনে লাগিয়াছে। মনে হইতেছে, ঘুঘু দেখিয়াছে কিন্তু ফাঁদ দেখে নাই। বদরং চালাইও না–ভালো হইবে না।[১০১]

সে সময় মোহাম্মদীর ব্যঙ্গরসাত্মক কলাম লিখতেন প্রখ্যাত সাংবাদিক আবুল কালাম শামসুদ্দীন। তিনি *নায়কের* এই কুৎসিত ইঙ্গিতের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেন। অবশ্য, ভাষা কিছুটা অশ্লীল ছিল। মাওলানা আকরম খাঁ সে সময় আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে আটক ছিলেন। তিনি *মোহাম্মদীর* কলমযুদ্ধের এতটা সীমাতিক্রম মোটেও পছন্দ করেন নি। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলিকে জেল থেকে লিখে পাঠান-

> তোমাদের কাগুজে লড়াই ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয়। আমার কাগজকে মেছোহাটা করলে চলবে না।[১০২]

এরপর মোহাম্মদীর আক্রমণাত্মক ভঙ্গিকে অনেকটা শিথিল করা হয়।

সাপ্তাহিক কমরেড

বাংলা, উর্দুর পাশাপাশি একটি ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশ করার জন্য মাওলানা সাহেব বহুদিন থেকে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন। ১৯৪৩ সালে উপমহাদেশের রাজনীতি স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের দিকে রূপান্তরিত হলে তিনি ইংরেজি *সাপ্তাহিক কমরেড* পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটির সর্বপ্রথম মালিক ছিলেন মাওলানা মোহাম্মদ আলি। তিনি খাজা নূরুদ্দীনের[১০৩] নিকট স্বত্ব বিক্রি করে দিলে আকরম খাঁ'র দ্বিতীয় ছেলে

---

১০১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।
১০২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯।
১০৩. মাওলানা মুহাম্মদ আলী রায়পুরী সুন্নী সম্প্রায়ভুক্ত উপমহাদেশের খিলাফত ও আজাদী আন্দোলনের প্রখ্যাত নেতা ছিলেন। 'কমরেড' ছিল তাঁর প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা। সাহিত্য ক্ষেত্রে এই পত্রিকাটি ছিল উপমহাদেশের অন্যতম প্রধান ও প্রখ্যাত ইংরেজি সাপ্তাহিক। অল্প সময়ের মধ্যে পত্রিকাটি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জনে সক্ষম হয়। কমরেড শুধু ভারতের হিন্দু-মুসলমানরাই পড়তো না, ইউরোপের শ্বেতাঙ্গদের কাছেও ছিল জনপ্রিয়। বড়লাট হার্ডিঞ্জের স্ত্রীও 'কমরেড'-এর নিয়মিত পাঠক ছিলেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে মুহাম্মদ আলীর জ্ঞানের সুনিপুণতা প্রকাশ পায়। তাঁর মৃত্যুলগ্নে বোম্বের Times of India-এর সম্পাদক লোভট ক্রেজার বলেন, ইংরেজি ভাষার উপর তাঁর চমৎকার দখল ছিল। কোনো ভারতীয় তো দূরের কথা, বোধ হয় খুব কম সংখ্যক ইংরেজও তার চাইতে ভাল ইংরেজি লিখতে পারতেন না।
ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মওলানা মোহাম্মদ আলী জওহর, ই. ফা. বা. ১৯৮৭, পৃ. ১৪।
Khawja Nuruddin, brother-in-law of Khawja Najimuddin,

www.pathagar.com

সদরুল আনাম খাঁ পত্রিকার স্বত্ব ক্রয় করেন। *কমরেড* পত্রিকার সম্পাদনা আকরম খাঁ কোলকাতা *আজাদ* অফিস থেকে আরম্ভ করলেও পরবর্তীকালে মুজিবর রহমান খাঁ'র সম্পাদনায় বের হতো। ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন[১০৪] *কমরেড* সম্পাদনায় ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। আকরম খাঁ *'মুসলিম ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাস'* সম্পর্কীয় অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন। সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন ইংরেজি অনুবাদ করে লেখাগুলো কমরেডে ছাপাতেন। সে সময় কোলকাতা থেকে *স্টার অব ইন্ডিয়া, মর্নিং নিউজ* ইত্যাদি ইংরেজি পত্রিকাও বেরুতো।[১০৫]

প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আকরম খাঁ ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ না পেলেও ব্যক্তিগত অধ্যবসায় ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইংরেজিতেও তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল। তাঁর ইংরেজি জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় *কমরেড* সম্পাদনাকালে। ড. সাজ্জাদ হোসায়েন বলেন :

> "Comrade-এ ছাপাবার আগে প্রতিটি প্রবন্ধ মওলানাকে পড়ে শোনাতে হতো। এই সময় দেখেছি, শব্দ প্রয়োগ সম্পর্কে তাঁর সূক্ষ্ম সচেতনতা, ভুল বা অসার্থক প্রতিশব্দ ব্যবহারের ত্রুটি তিনি সহজেই ধরে ফেলতেন..."[১০৬]

ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন আরও বলেন :

১৯৪৫ বা ৪৬ সালে মওলানা 'জাতীয়তাবাদ' সম্পর্কে একটি নিবন্ধ রচনা করেন। ইংরেজি *নেশন* কথাটির উৎপত্তি এবং অর্থ সম্পর্কে তাঁর কৌতূহল এবং তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি দেখে আমি স্বভাবতই আশ্চর্য হই। তাঁর বয়স তখন সত্তরের কাছাকাছি, কিন্তু সেই বয়সেও তিনি সব রকমের এনসাইক্লোপেডিয়া, অভিধান এবং শব্দকোষ ঘেটে *নেশন* শব্দটির অর্থ বের করার চেষ্টা করেন। এই ঘটনা আমার জন্য চিরকাল আদর্শ হয়ে থাকবে।[১০৭]

তিনি আরও বলেন :

> আকরম খাঁ'র পাণ্ডিত্য কত গভীর, এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তাঁর *মোস্তফা চরিত*। এই গ্রন্থে মওলানা অনেক উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন বহু প্রাচীন ইংরেজি গ্রন্থ থেকে।[১০৮] ইংরেজি ভাষায় দখল না থাকলে এটা সম্ভব হতো না। *কমরেড* পরিচালনার ভার বহুলাংশে আমার উপর ন্যস্ত ছিল। এই পত্রিকায় প্রকাশের জন্য মাওলানার মুসলিম ভারতের তামদ্দুনিক ইতিহাস সম্পর্কিত প্রবন্ধমালার ইংরেজি

Moulana Akram Khan, A Versatile Genius, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka, Page No-32

১০৪. তিনি ১৯২০ সালের ১৪ই জানুয়ারি যশোরের আলোকদিয়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজশাহী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন। মক্কা শরীফের উম্মুল কোরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির প্রফেসরও ছিলেন। তিনি বাংলাদেশী মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি সাহিত্যের উপর প্রথম পিএইচ.ডি ডিগ্রিধারী। ১৯৯৫ সালের ১২ জানুয়ারি তিনি ইন্তিকাল করেন।
অধ্যাপক তাজাম্মুল হোসেন, আল্লামা ইকবাল সংসদ পত্রিকা, জানুয়ারি-মার্চ, ৯৫, পৃ. ৭।

১০৫. মোহাম্মদ কাসেদ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।

১০৬. Abu Jafar, Moulana Akram Khan, a Versatile Genius, Islamic Foundation Bangladesh, 1984, Page-33.

১০৭. আবু জাফর সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ.- ১৩১।

১০৮. মোস্তফা চরিত গ্রন্থটি মাওলানা রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'তাফছীরুল কোরআনের পর সর্ববৃহৎ গ্রন্থ।

www.pathagar.com

অনুবাদকর্মের ভার আমার উপর ছিল। এই প্রবন্ধমালায় দেশের ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর পাণ্ডিত্য কত গভীর ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়।[১০৯]

মাসিক মোহাম্মদী

মাওলানা আকরম খাঁ মুসলমান সমাজের পত্র-পত্রিকার দৈন্যতা দেখে মুসলিম জাগরণের কণ্ঠস্বর হিসেবে ১৯২৭ সালের ৬ নভেম্বর মুসলিম বাংলার বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা মাসিক মোহাম্মদী ২য় পর্যায় প্রকাশনা আরম্ভ করেন।[১১০] প্রথম পর্যায়ে *মাসিক মোহাম্মদী* ১৯০৩ সালের ১৮ আগস্ট প্রকাশিত হয়।[১১১] অবশ্য, এর পূর্বেই মুন্সী মোহাম্মদ রিয়াজ উদ্দীন আহমদের *সুধাকর*[১১২] ও ইসলাম প্রচারক মুন্সী অবদুর রহীমের *মুসলিম হিতৈষী*, সৈয়দ এমদাদ আলির *নবনূর*, মীর মশারফ হোসেনের *হিতকরী* এ সমস্ত সাময়িকী প্রকাশিত হয়। এগুলো বেশির ভাগই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান বা সমাজ সংস্কারমূলক এবং কিছুটা সাহিত্যের বিষয়াবলী নিয়ে প্রকাশ হয়েছিল। রাজনৈতিক ও জাতীয় জাগরণমূলক কোনো পত্র-পত্রিকা তখন পর্যন্ত প্রকাশ পেয়েছিল কি-না জানা যায় নি।[১১৩]

মাসিক মোহাম্মদীই সম্ভবত প্রথম রাজনৈতিক ও জাতীয় জাগরণের বাণী নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯২৬ সালে কোলকাতা এবং অন্যান্য স্থানে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলে মাওলানা মোহাম্মদীর মাধ্যমে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তীব্রভাবে আঘাত হানেন। এ জন্য আকরম খাঁ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে দাঙ্গার জন্য দায়ী করেন। তাঁর লেখনীর শাণিত আঘাতে ক্ষিপ্ত

---

১০৯. আবু জাফর, প্রাগুক্ত, পৃ.-১৩২।

১১০. দ্বিতীয় পর্যায়ে মাসিক মুহাম্মদি খায়রুল আনাম খাঁ কর্তৃক মুহাম্মদি প্রেস, ২৯ আপার সার্কুলার রোড, কোলকাতা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। পরে ৮৬-এ, লোয়ার সার্কুলার রোডে কার্যালয় স্থানান্তরিত হয়। একবিংশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা (কার্তিক ১৩৫৪) বের হবার পর দু'বছরের জন্য পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ থাকে। একবিংশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা (অগ্রহায়ণ ১৩৫৬) থেকে আবার প্রকাশ পায় ঢাকেশ্বরী রোড, ঢাকা থেকে।
জীবনী গ্রন্থমালা-১, বাংলা একাডেমী, প্রাগুক্ত,পৃ. ২০।

১১১. The monthly was first printed in August 18, 1903 by Monshi Karim Boksh from I Hook Lane, Tantibagan, Calcutta and published by its proprietor Muhammad Akkas Ali. The Editor of the paper was Moulana Akram Khan. Al-Haj Abdullah became its proprietor from the second issue. After the fifth issue (January 19. 1904) perhaps the paper ceased publication and reappeared on November 6, 1927.
আরও তথ্য দ্রঃ, আহলে হাদিস আন্দোলন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৬, টীকা-৫।

১১২. ১৮৮৯ সালে সুধাকর পত্রিকা বের হয়। এই পত্রিকার মাধ্যমে বাংলা ভাষায় বাঙালি মুসলমানদের ধর্মের মহিমা, তত্ত্ব-জাতীয় তাহযিব-তমদ্দুন, নিজস্ব ঐতিহ্য ও গৌরব সম্বন্ধে অবহিত ও সচেতন করে তোলা হয়েছিল। সেকালের দিকদর্শন, বঙ্গদর্শন, হিতকরী, তত্ত্ববোধিনী-এসব পত্রিকায় যে-সব ইসলামবিরোধী ও মুসলমানদের প্রতি অবজ্ঞামূলক লেখা বের হতো, সুধাকর ও তৎসংশ্লিষ্ট মুসলিম মনীষীরা তার যোগ্য জবাব দিতে কসুর করতেন না। সুধাকর অনুসৃত সাহিত্যই প্রকৃত প্রস্তাবে মুসলিম চেতনা সৃষ্টিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। বাঙালি মুসলিম জীবনের ঘোর দুর্দিনে এরাই জাতিকে নিজেদের চিনতে ও জাতিকে ঘরমুখো করতে সাহায্য করেছিলেন।
মুস্তফা নুর-উল-ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৯।

১১৩. মাসিক মুহাম্মদী, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ. ২-৩।

www.pathagar.com

হয়ে সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন কুচক্রী মহল আকরম খাঁ'কে ব্যঙ্গ করে *আক্রমণ খাঁ*[১১৪] বলেও অভিহিত করতে থাকে।

নানা প্রতিকূলতার বিরুদ্ধেও মাওলানা তাঁর লেখনী দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে *মোহাম্মদীর* মাধ্যমে পৌঁছাতে সক্ষম হন। *মোহাম্মদীর* জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। তাঁর প্রবন্ধে প্রগতিবাদ ও যুক্তিনির্ভর বাস্তবমুখিতার ছাপ ছিল, কিন্তু অতীতের অন্ধ অনুকরণ বা পাশ্চাত্যের অনুসরণের তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর দৃষ্টিভিঙ্গি ছিল প্রাচীনপন্থী এবং আধুনিকপন্থীদের গোঁড়া মতবাদকে পরিবর্তন করে সঠিক পথনির্দেশনা দেয়া, অতীতের সূত্র ধরে আধুনিকতাকে কাজে লাগিয়ে জাতির মুক্তির পথকে অন্বেষণ করা। এই পত্রিকাটি প্রধানত সাহিত্য পত্রিকা হলেও মুসলিম জাগরণের বিশেষ বাহন হিসেবে প্রকাশিত হয়। এ জন্য পত্রিকার প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক তাঁর আত্মনিবেদনে লিখেছেন:

> বিভিন্ন ভাবধারার সমবায়ে এবং পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে মোছলেম বঙ্গের স্তরে স্ত রে আজ এক অভিনব জীবন সাধনা জাগিয়া উঠিয়াছে। একদিকে পুরাতনের মায়া, অন্যদিকে আধুনিকতার মোহ। ...... পুরাতনের সকল সঞ্চয়কে এক্ষেত্রে আঁকড়াইয়া ধরিয়া কেবল প্রবণতার অভিব্যক্তি বা রূঢ় ভাষার স্মরণ গ্রহণ দ্বারা আধুনিকতার প্রবাহকে যাহারা প্রতিহত করিতে চাহিতেছেন–এছলামকে যথাযথরূপে বড় করিয়া দেখিবার ও দেখাইবার মত বড় নজর ও বড় দেমাগ হইতে তাহাদিগের অনেকেই আজ বঞ্চিত! এছলামকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দলিয়া মথিয়া নিজেদের সঙ্কীর্ণ চিন্তা দৃষ্টির সহিত সামঞ্জস্য করিয়া রাখিতে আজ তাহারা ব্যতিব্যস্ত। .... । সেই কালের সুখস্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত দেখার উদ্দেশ্যে জীবন সায়াহ্নে *মাসিক মোহাম্মদীর* এই নতুন সাধনা–এ সাধনা সিদ্ধলাভ করুক। এ স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হউক।[১১৫]

ঐ সময় মুসলমান লেখকদের উৎসাহ-উদ্দীপনার এবং সাহিত্যচর্চার তেমন কোনো ক্ষেত্র ছিল না। *মাসিক মোহাম্মদী* প্রকাশের ফলে মুসলমানদের সাহিত্যচর্চার সুবর্ণ সুযোগের দ্বার উন্মোচিত হয়। ইসলামি তাহযিব-তমদ্দুন, ইতিহাস, ধর্ম-দর্শন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে মাতৃভাষায় নিজস্ব চিন্তাধারা ও ধ্যান-ধারণার সুযোগ দিয়ে মুসলিম সাহিত্যসেবীদের অগ্রযাত্রা প্রশস্ত করে *মোহাম্মদী* ।

মাসিক প্রবাসীতে দীর্ঘদিন যাবৎ মুসলমানদের ঈমান, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক পরিপন্থী বক্তব্য ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়ে আসছিল। কিন্তু এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা জবাব দেওয়ার মত মুসলমানদের তেমন কোনো পত্রিকা ছিল না। বিশেষ করে বন্দে মাতরম *সঙ্গীত ও শ্রী পদ্ম* প্রতীক নিয়ে যে সমস্ত প্রবন্ধ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-এর *মাসিক প্রবাসীতে'* প্রকাশিত হতো, আকরম খাঁ যুক্তির কষ্টিপাথরে তেজস্বী লেখনীর মাধ্যমে সে-সব প্রবন্ধের অসারতা প্রমাণ করতেন। কোলকাতার প্রবাসীগোষ্ঠীই শুধু নয়, ঢাকার প্রগতিশীল নামধারী *শিখা* গোষ্ঠীর বিরুদ্ধেও মাওলানা মোহাম্মদী তে তীব্র ভাষায় লেখা প্রকাশ করেছিলেন।

---

১১৪. বুদ্ধিজীবী হিন্দুরা তাঁকে সস্নেহে ও সকৌতুকে আক্রমণ খাঁ' বলে অভিহিত করতেন। কেননা, তিনি লা-পরোয়া হয়ে এসময় ব্রিটিশ সরকারকে আক্রমণ করতেন.
অধ্যাপক মনসুর উদ্দীন, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০।

১১৫. মাসিক মুহাম্মদী, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ. ২-৩।

www.pathagar.com

কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় মনোগ্রামে *শ্রী পদ্ম* সংযুক্ত করে। এতে মুসলমান ছাত্ররা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তারা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তের তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানান। *মোহাম্মদী* পত্রিকা এ আন্দোলনকে সমর্থন করে ছাত্রদের পক্ষে জোরালো লেখা প্রকাশ করে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। স্বয়ং আকরম খাঁ *মোহাম্মদীতে* কয়েকটি প্রবন্ধ স্বনামে লিখে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেই এর জন্য দায়ী করেন।[১১৬]

মাওলানা *মাসিক মোহাম্মদীর* মাধ্যমে একদল আত্মসচেতন লেখক তৈরি করতে চেয়েছিলেন। তাই *মাসিক মোহাম্মদীকে*[১১৭] কেন্দ্র করে মুসলমানদের একদল লেখক গড়ে ওঠেছিল। এর ক্রমধারা ফলে ফুলে বিকশিত হয়ে বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে আছে। বাংলার অনেকেই আকরম খাঁ'র প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শিষ্য। এ জন্যেই তাঁকে মুসলিম সাংবাদিকতার জনক বলা হয়।

প্রবাসী পত্রিকা *শ্রীপদ্মের* সমর্থনে বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করতে থাকে। *প্রবাসীর* প্রত্যেকটি প্রবন্ধের *মাসিক মোহাম্মদী* অত্যন্ত জোরালো ও যুক্তিনির্ভর জবাব দেয়। *মাসিক মোহাম্মদীর* তেজস্বী ও যুক্তিনির্ভর লেখা ও ছাত্রদের তীব্র আন্দোলনের ফলে বিশ্ববিদ্যালয় মনোগ্রাম থেকে *শ্রী* পদ্মবাদ দেওয়া হয়। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁদের সিদ্ধান্ত পাল্টাতে বাধ্য হন। আকরম খাঁ ও মোহাম্মদী যুগান্তকারী বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করেছিল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাই *মাসিক মোহাম্মদীর* লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল। মুসলমান ছাত্রদের সাথে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিমাতাসুলভ আচরণের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের *জন্য* মাসিক মোহাম্মদীর *বিশ্ববিদ্যালয় সংখ্যা* প্রকাশিত হয়। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে মুসলিমবিরোধী ভাবধারা বাংলা ও ভারতীয় সংস্কৃতি এবং জাতীয়তার নামে হিন্দু সংস্কৃতিকে মুসলমান ছেলেদের কিশোর মনে গেঁথে দেবার অপচেষ্টা বিশ্ববিদ্যালয় অন্যায়ভাবে চালিয়ে যাচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথের মত কবিও এ প্রকার উক্তি করতে দ্বিধা করেন নি:

> মুসলমানরা ধর্মে ইসলামানুসারী হলেও জাতিতে তারা হিন্দু। কাজেই তারা হিন্দু মুসলমান।[১১৮]

বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে এই *মুসলমান হিন্দু* সৃষ্টির চেষ্টাই অব্যাহতগতিতে শুরু হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে। মুসলমান তরুণদের একদল এ প্ররোচনায় এতই প্রভাবিত হয়েছিল যে, এদের অগ্রজ মুসলমান অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর এক প্রবন্ধে নিঃসঙ্কোচে লিখেই ফেলেছেন:

---

১১৬. জীবনী গ্রন্থমালা-১, বাংলা একাডেমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

১১৭. প্রথম সংখ্যার সূচীপত্র, আল্লাহর কালাম, রসুলের বাণী, স্বাগত (কবিতা)-কাজী কাদের নওয়াজ, এছলামের আদর্শ-ওমর খাইয়াম, কাজী নওয়াজ খোদা। ভারত বর্ষ, এস ওয়াজেদ আলী, এছলাম ও শাসন অধিকার, মোঃ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মহাপয়গাম (কবিতা), শাহাদাত হোসেন, খ্রিষ্টান লেখকগণের ভ্রান্তি, ক্রন্দসী (কবিতা), গোলাম মোস্তফা, আহমদ ছাদ পাশা..... কাটাফুল (উপন্যাস) ইত্যাদি।
জীবনী গ্রন্থমালা-১, বাংলা একাডেমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

১১৮. আবুল কালাম শামসুদ্দীন, অতীত দিনের স্মৃতি, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ ১৭৯।

www.pathagar.com

এদেশী মুসলমানরা হচ্ছে হিন্দু-মুসলমান।[১১৯]

মাসিক মোহাম্মদীর বিশ্ববিদ্যালয় সংখ্যা[১২০] ছিল এই মারাত্মক প্রচারণারই প্রতিবাদ। এ সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ উত্থিত হয়। স্বয়ং দীনেশচন্দ্র সেন প্রতিবাদ পাঠান। *মাসিক মোহাম্মদীতে* তা প্রকাশ করে উত্তর দেওয়া হয়, কিন্তু দীনেশ বাবু পাল্টা উত্তর আর দেন নি। *মাসিক মোহাম্মদীতে* আকরম খাঁ'র গবেষণাধর্মী ও জাতীয় জাগরণমূলক অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, যা মুসলিম বঙ্গের সামাজিক, সাহিত্যিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনায় গবেষকদের জন্য তথ্যভাণ্ডার হয়ে রয়েছে। *মোহাম্মদী তে* প্রকাশিত মাওলানার বিশ্লেষণধর্মী ও তথ্যনির্ভর লেখাগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে নিঃসন্দেহে বলা যায়, বাংলার সাহিত্যভাণ্ডার শুধু সমৃদ্ধই হবে না, আমাদের উত্তরসূরি গবেষকদের জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

মাসিক মোহাম্মদীতে[১২১] প্রকাশিত আকরম খাঁ'র কিছু লেখার শিরোনাম নিম্নরূপ :

১. এছলামের আদর্শ, ২. এছলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার, ৩. নব-পর্যয় না নব-পর্য্যায়, ৪. রমজানের সাধনা, ৫. সমস্যা ও সমাধান, ৬. জয় মোহাম্মদ, জয় মোস্তফা, ৭. মোহছেন স্মরণে, ৮. জ্ওয়াত ছাবাত, ৯. ব্যাক্ টু-দি কোরআন, ১০. বর্তমান হেজাজ, ১১. মাওলানা ওবায়দুল্লাহ, ১২. মোস্তফা চরিতের বৈশিষ্ট্য, ১৩. বারোয়ারী ইত্যাদি।[১২২]

মাসিক মোহাম্মদীর সম্পাদক হিসেবে আকরম খাঁ সম্পাদকীয় লিখতেন। তাঁর লেখায় স্বদেশ, সমাজ ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীর আলোচনা থাকতো। 'মাসিক মোহাম্মদীর আলোচনা' শীর্ষক বিভাগে মাওলানা তৎকালীন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জটিল বিষয়াবলী ও সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহের উপর প্রামাণ্য দলিলসহ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা পেশ করতেন। ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত *স্বরাজ* শীর্ষক আলোচনায় মাওলানা হিন্দুসভা কর্তৃক *হিন্দু স্বরাজ* প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টার

---

১১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯।

১২০. শতাধিক পৃ.র এ সংখ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিমবিরোধী বিভিন্ন কার্যক্রমের তীব্র সমালোচনা করে অনেকগুলো প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।
প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮।

১২১. মাসিক মোহাম্মদ সম্পর্কে আনিসুজ্জামান রচিত মুসলিম বাংলার সামাজিক পত্র গ্রন্থে বলা হয় :
(ক) মোহাম্মদ আকরম খাঁ সম্পাদিত এই পত্রিকা ১৯০৩ সালের ১৮ই আগস্ট প্রথম প্রকাশিত হয়। পঞ্চম সংখ্যার ১৯ জানুয়ারি (১৯০৪) পর আর বেরিয়েছিল কি-না জানা যায়নি। ১৯২৭ সালে মাসিক মুহাম্মদি পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে। (খ) মোহাম্মদ আকরম খাঁ সম্পাদিত এই পত্রিকার কার্তিক ১৩৩৪ চিহ্নিত প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ৬ নভেম্বর, ১৯২৭, প্রকাশিত হয়, কোলকাতা থেকে। একবিংশ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা কার্তিক ১৩৫৪, বের হবার থেকে আবার প্রকাশ পায় ঢাকেশ্বরী রোড়, ঢাকা থেকে। কিন্তু বাংলা বিশ্বকোষের ৩৬ পৃ. মাসিক মুহাম্মদি ভুক্তিতে এই তথ্য দেওয়া হয়- ১৯২৮ হইতে প্রকাশিত বাংলা মাসিক সাহিত্য পত্র .... মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ..... কোলকাতা হইতে এই মাসিক পত্র প্রকাশ করেন।
বশীর আল্ হেলাল, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, পৃ. ১৫৮-৫৯।

১২২. মাসিক মোহাম্মদি, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৩৪ বাং
মাসিক মোহাম্মদি, ১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ১৩৩৫ বাং
মাসিক মোহাম্মদি, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৩৫ বাং
মাসিক মোহাম্মদি, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৩৫ বাং
মাসিক মোহাম্মদি, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৩৬ বাং

www.pathagar.com

কঠোর সমালোচনা করে মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার দেওয়ার জন্য হিন্দু সমাজের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলেন:

> ফাঁকি দিয়া স্বর্গ লাভ একালে আর সম্ভবপর হইবে না। ইংরেজরা মুষ্টিগত অধিকারগুলো আদায় করিতে চাও নিজেদের মুষ্টিগত অধিকারগুলো তাহার হকদারকে ছাড়িয়া দাও। দেশকে বড় করিতে চাও, মনকে আগে বড় করিয়া লও।[১২৩]

আকরম খাঁ কেবলমাত্র হিন্দুদের সমালোচনাই করেন নি। স্বজাতি মুসলমানদেরও তীব্র সমালোচনা করে *মাসিক মোহাম্মদীর অদূরদর্শিতার পরিণাম* শীর্ষক আলোচনায় বলেন:

> গত ২৪ বৎসর ধরিয়া হিন্দুর যাত্রা ভঙ্গের চেষ্টাই আমরা করিয়া আসিয়াছি। নিজেদের যাত্রা শুরু করার ভাবনা ভাবার সময় আমাদের কোনো দিনই ঘটে নাই। ...... স্রোতের প্রতিকূলে অন্ধের মত নিজেদের শক্তির অনর্থক অপচয় না করিয়া আমাদের উচিত ছিল, খাল কাটিয়া সেই স্রোতকে নিজেদের অনুকূলরূপে পরিচালিত করা, ...। আমরা বলি হিন্দুর সঙ্গে সহযোগিতা করিতে নারাজ থাক, বেশ কথা– মানুষের মত অগ্রসর হও, সহযোগিতা না করিয়া প্রতিযোগিতা কর।[১২৪]

মাওলানা মুসলমানদের হিংসাত্মক মনোভাব না রেখে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মনিয়োগ করার আহবান জানিয়েছিলেন। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল স্বতন্ত্র মুসলিম রাজনৈতিক দল গঠন করা। ১৯৩৫ সালের শেষদিকে ঢাকার নওয়াব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে বাংলার বিশিষ্ট মুসলমান নেতৃবৃন্দ মুসলমানদের একটি প্রতিনিধিত্বমূলক শক্তিশালী দল গড়ে তুলতে সচেষ্ট হলে মাওলানা *মোহাম্মদী তে* প্রকাশিত *মোছলেম বঙ্গের সংহতি সাধনা* শীর্ষক এক আলোচনায় এ ধরনের প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানান। ১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে *সম্মিলিত মুসলিম দল* বা *ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি* আত্মপ্রকাশ করলে *অমৃত বাজার, আনন্দ বাজার* ইত্যাদি পত্রিকা কটাক্ষ করে বিরূপ সমালোচনা করে। মুসলমানগণ যেন বিভ্রান্ত না হয়, সে জন্য মাওলানা মোহাম্মদীর *সম্মিলিত মোছলেম দল* শীর্ষক আলোচনায় ঐ সকল পত্রিকার সমালোচনার দাঁতভাঙ্গা জবাব দেন এবং মুসলমানদের কাছে এই নতুন পার্টির প্রয়োজনীয়তা ও আবশ্যকতা তুলে ধরেন।[১২৫] *মাসিক মোহাম্মদী* ছিল মুসলিম নবজাগরণের পত্রিকা, তাই মাওলানার প্রত্যেকটি লেখা ছিল খুবই যুক্তিপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ। *প্রবাসী*তে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে ধরনের আলোচনা করতেন, মোহাম্মদীর ধরনও ছিল ঠিক তেমনি উচ্চশ্রেণীর ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ। এ ছাড়া সাহিত্য প্রসঙ্গ, চিন্তাধারা, পুস্তক সমালোচনা, সংকলন শীর্ষক কয়েকটি বিভাগও এতে নিয়মিত প্রকাশিত হতো। এগুলোতে থাকতো চিন্তা-ভাবনার প্রচুর খোরাক। এছাড়া সচিত্র প্রবন্ধও প্রায় প্রতি মাসেই দু'একটা বেরুতো। ফলে, *মাসিক মোহাম্মদী* তখনকার প্রথম শ্রেণির মাসিকগুলোর অন্যতম হয়ে উঠতে পেরেছিল।[১২৬]

---

১২৩. মাসিক মোহাম্মদি, কোলকাতা, পৌষ, ১৩৩৪, পৃ. ১৯৮-২০০।
১২৪. প্রাগুক্ত, আষাঢ়, ১৩৩৭, পৃ. ৭১৬-১৭।
১২৫. মাসিক মোহাম্মদি, প্রাগুক্ত, শ্রাবণ, পৃ. ৭২৫-২৭।
১২৬. আবুল কালাম শামসুদ্দীন,প্রাগুক্ত, ঢাকা, পৃ. ১৫৪।

www.pathagar.com

দৈনিক আজাদ প্রকাশের পটভূমি

মুসলিম বাংলার *প্রাচীনতম* বাংলা *দৈনিক আজাদ* প্রকাশিত হয়েছিল উপমহাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলন, ইংরেজবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুসলিম নবজাগরণের পটভূমিতে ঐতিহাসিক সময়-সন্ধিক্ষণে। *দৈনিক আজাদ*-এর ঐতিহাসিক ভূমিকা ও অবদানের মূল্যায়নে একটি সাধারণ দৈনিক সংবাদপত্র হিসেবে বিচার করলেই চলবে না। এই পত্রিকার আদর্শ, উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যের কথাও বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। বস্তুতপক্ষে, *দৈনিক আজাদ* ছিল তৎকালীন উপমহাদেশের বিশেষ করে তদানীন্তন আসাম ও বাংলার মুসলমানদের মুখপত্র, নবজাগরণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনে স্বাধীনতা সংগ্রামের বাণী বাহক এবং হাতিয়ার। সাংবাদিকতার ইতিহাসে *দৈনিক আজাদ* অতুলনীয়।

মাওলানা আকরম খাঁ *দৈনিক আজাদ* নিয়ে সাংবাদিকতার জগতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এ ক্ষেত্রে মুসলমানদের ভূমিকা ছিল শূন্যের কোঠায়। ১৯২৬ সালে কোলকাতা থেকে মুসলমানদের সর্বপ্রথম দৈনিক পত্রিকা *ছোলতান*[১২৭] প্রকাশিত হয়। মাত্র পাঁচ বছর পরই (১৯৩১ সালে) বন্ধ হয়ে যায়। সে সময় সারা দেশে মুসলিম সমাজের পত্রিকা বলতে *স্টার অব ইন্ডিয়া* এবং *আসরে জদীদ* ছাড়া অন্য কোনো দৈনিক পত্রিকা ছিল না। এছাড়া দু'চারটি সাময়িকী থাকলেও, তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। অপরদিকে, কংগ্রেসপন্থী তথা হিন্দুদের জন্য ছিল *অমৃত বাজার, আনন্দ বাজার, যুগান্তর, দৈনিক বসুমতী, সত্যযুগ, সেবক* ইত্যাদি। এছাড়াও তাদের অনেকগুলো মাসিক ও পাক্ষিক পত্রিকা ছিল।[১২৮]

উল্লেখ্য, প্রায় অর্ধশত বছরেরও অধিককালের মধ্যে মুসলিম সম্পাদিত ও পরিচালিত মাসিক, সাপ্তাহিক, এমনকি দৈনিক পত্রিকাও অনেক প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সেগুলো নানা কারণে দীর্ঘস্থায়িত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয় নি। অবশ্য, মাওলানা আকরম খাঁ'র *সাপ্তাহিক মোহাম্মদী* ও *মাসিক মোহাম্মদী* এবং মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন সম্পাদিত *সওগাত* এর ব্যতিক্রম। *দৈনিক আজাদ* প্রতিষ্ঠার পটভূমি আলোচনা করতে গিয়ে *আজাদ* সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন বলেন :

> বাংলার মুসলিম সাংবাদিকতার পরিচয় দিতে বসে এ কথা না বললে সম্ভবত বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যে, *আজাদ* থেকেই বাংলায় মুসলিম দৈনিকের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। ১৯৪০ সাল থেকেই এর সম্পাদনার ভার পড়ে এই প্রবন্ধের লেখকের উপর এবং তা অব্যাহত থাকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত। এর আগেও অবশ্য দৈনিক প্রকাশের চেষ্টা হয়েছে। *হাবলুল মতীন*-ই সম্ভবত প্রথম মুসলিম বাঙলা দৈনিক। আগা মঈদুল ইসলাম এর পরিচালক এবং আবদুল গফুর সিদ্দিকী সম্পাদক ছিলেন। সম্ভবত এই স্বল্পায়ু কাগজখানি ১৯০৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর ১৯১৯ সালে মুজফফর আহমদ, নজরুল ইসলাম ও ফজলুল হক সেলবর্সির সম্পাদনায় *দৈনিক নবযুগ* প্রকাশিত হয়। তবে এরও ছিল

---

১২৭. ছোলতান পত্রিকার মালিক ছিলেন মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ও মৌলবী ইছমাঈল হোসেন সিরাজী।
আবুল মনসুর আহমদ, আত্মকথা, ঢাকা, ১৯৭৮, পৃ. ৩৩৪।

১২৮. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৯।

www.pathagar.com

তীব্রোজ্জ্বল কিন্তু স্বল্পায়ু জীবন। এরপর দৈনিক সেবক, *দৈনিক মোহাম্মদী*, দৈনিক সোলতান, দৈনিক তরককী, দৈনিক নবযুগ, দৈনিক কৃষক, দৈনিক ইত্তেহাদ প্রকাশিত হয়েছে বটে, কিন্তু তাদেরও দীর্ঘস্থায়িত্ব সম্ভব হয় নি।[১২৯]

একথা সত্য, মুন্সী মোহাম্মদ রিয়াজুদ্দীন আহমেদ ও শেখ অবদুর রহীম নিঃসন্দেহে বাংলার মুসলিম সাংবাদিকতার দিকপাল, কিন্তু সংবাদপত্রকে সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন এবং এর মাধ্যমে মুসলিম বাংলার চিন্তা-চৈতনায় নব ধারণা যোগাতে শুরু করেন প্রধানত মাওলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ এবং মুজিবুর রহমান। মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ও মুজিবুর রহমান মুসলিম সাংবাদিকতাকে শুধু পেশা হিসেবেই গ্রহণ করেন নি; বরং সমগ্র বাংলার মানুষের মনে নবজাগরণও সৃষ্টিকরেছেন। সাংবাদিকতায় মুসলমানদেরকে আর উপেক্ষা করার কোনো উপায় ছিল না। এসবই পূর্বসূরিদের অবদান।

এঁদের পরবর্তী সাংবাদিকদের মধ্যে মওলবী আহমেদ আলি, আবদুল মতীন চৌধুরী, কাজী নজরুল ইসলাম, আবুল মনসুর আহমদ, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলি, নাজীর আহমেদ চৌধুরী, মোহাম্মদ আবদুল হাকীম, আবু লোহানী ও ফজলুল হক সেলবর্ষীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে, আবুল মনসুর আহমদ ও মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলি সংবাদপত্র-সাহিত্যে যে সুচিন্তিত ও সুলিখিত অবদান রেখে গেছেন, তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এঁদেরই উত্তরাধিকারী হয়ে পরে যে-সব সাংবাদিক বাংলার সাংবাদিকতায় এলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মুজিবুর রহমান খাঁ, মোহাম্মদ মোদাব্বের, মকবুল হোসাইন চৌধুরী এবং শামসুর রহমান প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯২৬ সালে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ নিখিল ভারত কংগ্রেসের (বাংলা শাখার) সভাপতি নির্বাচিত হন। মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত নেহেরু, সুভাষচন্দ্র বোস, শরৎচন্দ্র বোস, ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রমুখের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল । তিনি কংগ্রেসকে সত্যিকারের একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবেই গণ্য করতেন। কিন্তু পদে পদে তাঁকে বাধার সম্মুখীন হতে হয়। স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী ও মোতিলাল নেহেরুর আচরণ তাঁকে ক্ষুব্ধ করে তোলে।[১৩০] তাই, তিনি ১৯২৭ সালে কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেন।

১৯৩৬ সালে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ মুসলিম লীগ পুনর্গঠন উপলক্ষে কোলকাতায় আসেন। বাংলাদেশে মুসলিম লীগ পুনর্গঠন সম্পর্কে মাওলানা আকরম খাঁ'র সঙ্গেও তিনি বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা করেন। মুসলিম লীগের বাণী বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি বাংলা দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করার জন্যও তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেন। অপরদিকে, দীর্ঘ ৩৫ বছর সাংবাদিকতার সাথে যুক্ত থাকায় এবং বাংলার মুসলমানদের আস্থা অর্জন করায় বিভিন্ন স্থান থেকে একটি বাংলা দৈনিক প্রকাশ করার জন্য বহুদিন থেকে তাঁকে অনুরোধ জানানো হয়। সাংবাদিক হিসেবে পত্রিকা বের করার প্রবল ইচ্ছা থাকলেও সামর্থ্য তাঁর ছিল না। ১৯২২-২৩ সালে *দৈনিক সেবক, দৈনিক মোহাম্মদী প্র*কাশ করে মাওলানা আর্থিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত

---

১২৯. মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮-২৯।
১৩০. আবু জাফর (সম্পাদিত), মওলানা আকরম খাঁ, প্রাগুক্ত পৃঃ ২২৬।

www.pathagar.com

হয়েছিলেন বিধায় শঙ্কিত ছিলেন। এছাড়া দৈনিক পত্রিকা বের করার জন্য উন্নতমানের যে প্রেস প্রয়োজন, তাও *মোহাম্মদী*-এর ছিল না। এমনকি, নতুন প্রেস ক্রয় করার মত আর্থিক সামর্থ্যও তখন তাঁর ছিল না। সম্ভবত এ জন্যই মাওলানা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। ঠিক এই সময় *অমৃত বাজার* পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তাঁদের *পুরোনো রোটারী মেশিন* বিক্রির সিদ্ধান্ত নিলে মাওলানা অল্প দামে মেশিনটি ক্রয় করেন। এতে *আজাদ* বের করার পথ অনেকটা সুগম হয়। পত্রিকা বের করার লক্ষ্যে আকরম খাঁ *হিন্দুস্তান কো-অপরেটিভ ব্যাংকে* তার বাড়ি বন্ধক দিয়ে ১৮ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন।[১৩১] এদিকে, ১৯৩৫ সালের নির্বাচনের পর বাংলায় কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রী ছিলেন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক। তিনিও একটি বাংলা দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করার কথা ভাবছিলেন।

তিনি অবগত হন, আকরম খাঁ পত্রিকা বের করবেন। তাই তিনি গবর্নমেন্ট থেকে ৩০ হাজার টাকা *আজাদ*-এর জন্য বরাদ্দ করেন।[১৩২] মুসলিম জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার দৃঢ় শপথ নিয়ে ১৯৩৬ সালের ৩১ অক্টোবর পবিত্র শবে বরাতের দিনে এতদঞ্চলের মুসলিম মিল্লাতের দীর্ঘদিনের 'কাঙ্ক্ষিত সাড়াজাগানো বিখ্যাত দৈনিক *আজাদ* আত্মপ্রকাশ করে।[১৩৩] *আজাদ* প্রকাশকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমি বিশ্লেষণ করে *আজাদ* সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন লিখেছেন :

> সে সময়ে মুসলিম লীগের নবজন্ম লাভের ফলে ভারতের মুসলিম রাজনীতিতে যে উৎসাহ-উদ্দীপনার জোয়ার এসেছিল তাতে দেশের বিভিন্ন স্থান ও মহল থেকে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ'র কাছে অবিলম্বে একখানা দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশ করার তাগিদ অনবরত আসছিল। ..... মওলানার সম্পাদনায় *দৈনিক আজাদ* প্রকাশিত হল নির্দিষ্ট দিনে। সম্পাদনা বিভাগে মওলানা ছাড়া রইলেন নজীর আহমদ চৌধুরী, সাপ্তাহিকের ভার রইল নজীর আহমদ চৌধুরীর উপরে। মাসিকের ভার ছিল আমার উপর। তা তো রইলই, তার উপর আমাকেও আজাদের সম্পাদনা বিভাগের কাজে টেনে নেয়া হল।...... আমরা নতুন কাগজে নব-উৎসাহ নিয়েই কাজে আত্মনিয়োগ করলাম। কি করে *আজাদ* বাংলার মুসলিম সমাজের কর্ম-প্রবাহে নব-উদ্দীপনা নিয়ে আসতে পারে এই ছিল আমাদের ধ্যান-জ্ঞান।... সত্যিই *আজাদ* বাংলার মুসলিম সমাজের উৎসাহ-উদ্দীপনার যে জোয়ার এনেছিল, তা ছিল অভূতপূর্ব। অল্পদিনের মধ্যেই *আজাদ* মুসলিম বাংলার জাতীয় দৈনিক মুখপত্র হয়ে উঠল। বাঙলা আসামের সুদূরপ্রান্ত থেকে এ কাগজের চাহিদার খবর আসতে লাগলো। *আজাদকে* প্রথম শ্রেণির কাগজে পরিণত করার জন্য মওলানার এবং আমাদের উৎসাহ ও কর্মতৎপরতার অন্ত ছিল না। এ কাগজের নিউজ এডিটর করা হয়েছিল মোহাম্মদ মোদাব্বেরকে। তিনি এ কাগজকে সংবাদ প্রকাশের দিক দিয়ে সমৃদ্ধ-এর গেট্‌আপকে মনোরম করে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন।'[১৩৪]

---

১৩১. Moulana Akram Khan, A Versatile Genius, Dhaka, 1984, Page-38.
১৩২. Ibid.
১৩৩. মোঃ কাসেদ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪।
১৩৪. আবুল কালাম সামসুদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭-৮৮।

www.pathagar.com

বস্তুত এই আজাদে'ই মুসলিম বাংলার সিংহদ্বার খুলে দেয়। এই পত্রিকা বাংলার মুসলিম সমাজে অভূতপূর্ব উৎসাহ-উদ্দীপনার জোয়ার বয়ে এনেছিল। বাংলা, আসাম ও বার্মার মুসলিম জনসাধারণের কর্মপ্রবাহেও এই পত্রিকা নব-উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলে।

আজাদ প্রকাশের পটভূমি বর্ণনা দিতে গিয়ে পত্রিকার প্রথম বার্তা সম্পাদক সাহিত্যিক ও সাংবাদিক মোহাম্মদ মোদাব্বের লিখেছেন:

> ১৯৩৫ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। অবশ্য, এ কে ফজলুল হক সাহেব মনে করেছিলেন যে, তাঁর প্রজা পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারবে। কিন্তু তা সম্ভবপর হয় নি। এ জন্য যে, মুসলিম লীগের হাতে মোহাম্মদীর মত একটি শক্তিশালী হাতিয়ার ছিল। নির্বাচনের পর যখন লীগ প্রজা কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হল, তখন একটি শক্তিশালী দৈনিকের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারলেন ফজলুল হক সাহেব। তাঁর দ্বারা উৎসাহিত হয়ে মওলানা আকরম খাঁ ১৯৩৬ সালের ৩১ অক্টোবর তারিখে *দৈনিক আজাদ* বের করলেন। এই *আজাদ* পত্রিকাই মুসলিম জাতীয় ইতিহাসের দিকদর্শন।....... এবার মনে হল মুসলমান জাতি নতুন জীবন ফিরে পেল। মুসলিম লীগ মুসলমান জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী নিয়ে এগিয়ে চললো, *আজাদ* জাতির সামনে তুলে ধরলো এক নতুন আদর্শ। মি. জিন্নাহর নেতৃত্ব ও আজাদের সমর্থন উপমহাদেশে এক অপ্রতিরোধ্য আন্দোলনের সূত্রপাত করলো। যার ফলশ্রুতি পাকিস্তান।[১৩৫]

মাওলানা আকরম খাঁ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে কংগ্রেসের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কংগ্রেস কর্তৃক নেহেরু রিপোর্ট প্রকাশের পর তিনি দেখলেন যে, ভবিষ্যতের স্বাধীন ভারতে মুসলমানদের উপর অবিচারের ইংগিত রয়েছে। তাই, তিনি ১৯২৯ সালে কংগ্রেস ত্যাগ করেন। মুসলমান স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সাপ্তাহিক পত্রিকা যথেষ্ট ছিল না। কংগ্রেস ও হিন্দু প্রভাবিত দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা শুধু বাংলা ভাষাতেই ছিলো দু'ডজনের উপর। মুসলমানদের একটি পত্রিকাও নেই। এই দুঃখজনক অবস্থার অবসান আশু প্রয়োজন। এই প্রেরণা নিয়েই *দৈনিক আজাদ*-এর যাত্রা শুরু। *দৈনিক আজাদ* যে লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অঙ্গীকার সামনে নিয়ে যাত্রা শুরু করে, *দৈনিক আজাদের* প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধে তার অঙ্গীকার লক্ষণীয় :

> বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, মোছলেম বঙ্গের জাতীয় জীবনের একমাত্র অবলম্বন হইতেছে কয়েকখানা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। এই শোচনীয় দৈন্যের অনুভূতি মোছলেম বঙ্গের জাতীয় অন্তরকে যাতনা দিয়া আসিতেছে বহুদিন হইতে। তিন কোটি মুসলমানের সত্যকার সেবক ও নিরপেক্ষ প্রতিনিধিরূপে *দৈনিক আজাদ* হাতে করিয়া সমাজের খেদমতে উপস্থিত হইতে পারিলাম। তাই মোছলেম বঙ্গের জাতীয় জীবনের এই শুভ প্রভাতে সর্বপ্রথমে আল্লার হুজুরে অবনত মস্তকে অন্তরের

সহঃ দ্রঃ মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতা ও আবুল কালাম শামসুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

১৩৫. মোহাম্মদ মোদাব্বের, মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, সচিত্র বাংলাদেশ, ১৬ অক্টোবর, ১৯৮০, পৃ. অনুল্লেখিত।

www.pathagar.com

> কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।...... *দৈনিক আজাদ* সত্যিকার *আজাদী*র নির্বিঘ্ন ও নির্ভীক অগ্রদূত হিসেবে, বাঙ্গালী মুসলমানের ভিতর বাহিরের সব অশুভ বন্ধন-পাশকে ছিন্ন করিয়া তাহাকে মুক্তির মঙ্গল কার্যে পরিচালিত করিতে সমর্থ হউক।.... আমাদের একমাত্র আদর্শ ইসলাম এবং একমাত্র নীতি কোরআনের শাশ্বত ও স্বর্গীয় বিধান। এই নীতি ও এই আদর্শের অনুসরণ করাই হইবে আজাদের সমস্ত জীবনের সর্বপ্রধান সাধনা। এই আদর্শের অনুপ্রেরণায় আমরা স্বদেশের মুক্তিকামী, তাহার পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের একান্ত অভিলাষী। এই আদর্শের আলোকে বুঝিয়াছি যে, পরাধীনতা অপেক্ষা ঘৃণিত অভিশাপ মানব জীবনের পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না।.... স্বদেশ বলিতে আমরা দেশের ধূলামাটি, বন-জঙ্গল, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত অথবা তাহার মুষ্টিমেয় অভিজাত শ্রেণিকে বুঝিনা। আমাদের মতে, দেশ মানে দেশের মানুষ। সুতরাং দেশের মুক্তি বলিতে আমরা বুঝি দেশবাসী, মানুষ সাধারণের সার্বত্রিক ও সার্বজনীন মুক্তি। আমাদের মতে, বিদেশী শাসন-শোষণের পরিবর্তে স্বদেশী শাসন-শোষণের প্রতিষ্ঠায় আর সত্যকার স্বাধীনতায় আকাশ-পাতাল প্রভেদ।[১৩৬]

সত্যি, ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে *দৈনিক আজাদ*-এর আবির্ভাব। তবুও বলতে হবে, দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীরও অধিককাল ধওে *দৈনিক আজাদ* তার প্রতিষ্ঠাকালীন অঙ্গীকার সমুন্নত রেখে জাতির সামনে ভাস্বর। মুসলমান প্রতিষ্ঠিত বাংলা দৈনিকের মধ্যে এটাই সম্ভবত প্রাচীনতম দৈনিক। বাংলার মুসলমানদের স্বতন্ত্র ভাষা ছিল, আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু ব্যক্ত করার মত কোনো মাধ্যম ছিল না। বাংলার মানুষের সুপ্ত মনের আকুতি প্রকাশ এবং ভাষা দেওয়ার জন্য, বিশ্বের দরবারে তাকে তুলে ধরবার প্রত্যয় নিয়ে জাতীয় সচেতনতার প্রতিভূ ও পরিপূরক হিসেবেই *আজাদে'র* আত্মপ্রকাশ। বাংলার মুসলিম সমাজ নিজ দেশেও পরবাসী। সংখ্যাধিক্য হয়েও সংখ্যালঘুদের অনেক পেছনে, সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী হয়েও আত্মবিস্মৃত। এই সংকটাপন্ন অবস্থায়, *দৈনিক আজাদ*কে জন্মলগ্ন থেকেই ত্রিশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছে-

এক. শাসক শ্রেণি,

দুই. প্রতিবেশী সমাজ,

তিন. নিজ সমাজ।

অর্থাৎ দেশের শাসকদের কাছে মুসলমানদের অভাব-অভিযোগ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা তুলে ধরতে হয়েছে। শিক্ষা-দীক্ষায়, ধনে-মানে অগ্রসর ও প্রতিপত্তিশালী প্রতিবেশী সমাজের ও প্রতিকূলতার মোকাবিলা, অন্যদিকে নিজ সমাজের আপামর জনসাধারণকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে নিজেদের হক ও দাবি-দাওয়া সম্বন্ধে সচেতন, সজাগ, আত্মপ্রত্যয়ী ও সংগ্রামী করে তুলতে হয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই তিন ভূমিকা *আজাদ* সার্থক ও সফলভাবে পালন করেছে। তাই আজাদের ঐতিহাসিক অবদান অনন্য। উপমহাদেশের মুসলমানরা এভাবে আজাদের কাছে ঋণী।

---

১৩৬. দৈনিক আজাদ, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩১শে অক্টোবর, ১৯৩৬.

www.pathagar.com

সাহিত্যিক আকবর উদ্দীনের নিম্নের উদ্ধৃতি বিষয়টি অনুধাবনের জন্য সহায়ক হবে:

> ১৯৩০-৩৫ সালের পরে যাঁরা জন্মেছেন তাঁর পূর্বের অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাঁরা ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে অথবা অজ্ঞতার দরুন এই উপমহাদেশীয় ইতিহাসের সবচাইতে বড় ট্রাজেডী ধর্মভিত্তিক বহুবিভক্ত, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিকে উপলব্ধি করতে পারেন নি এবং সেই ট্রাজেডীর ফলশ্রুতি হয়েছিল- পাকিস্তান। আর পাকিস্তান হয়েছিল বলেই অর্থাৎ উপমহাদেশ দ্বিধাবিভক্ত হয়েছিল বলেই, স্বাধীন বাংলাদেশের উদ্ভব হয়েছে।[১৩৭]

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, ব্রিটিশ ভারতে উপমহাদেশের সব ধর্ম-সম্প্রদায়ের লোকই শাসিত, শোষিত, বঞ্চিত, অত্যাচারিত ও নিপীড়িত হয়েছে। ঐতিহাসিক কারণেই মুসলমান জনগোষ্ঠী পশ্চাৎপদ থাকায় তাদের ইংরেজবিরোধী মনোভাব স্পষ্টতর এবং দীর্ঘায়ু লাভ করে। তাই তুলনামূলকভাবে শাসন, শোষণ, অত্যাচার ও নিপীড়নের মাত্রাটা তাদের উপর বেশি ছিল। *আজাদ'ই* সর্বপ্রথম ব্রিটিশ শাসকদের এই নিপীড়ন-নীতির বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানায়। পলাশী যুদ্ধের পর ইংরেজ শাসকবর্গ মুসলমানদের ধ্বংস করার অশুভ পাঁয়তারা আরম্ভ করে। ইংরেজ কর্তৃক এই উপমহাদেশ দখল করার পর হিন্দুরা ইংরেজিকে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করে। কিন্তু মুসলমানরা মনে-প্রাণে ইংরেজিকে গ্রহণ করতে পারেনি। ফলে শিক্ষা-দীক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে সর্বত্র হিন্দুরা প্রাধান্য বিস্তার করে। এর ফলে মুসলমানদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার লিখেছেন :

> সরকারী চাকরির উচ্চতম স্তরের বেলায় মুসলমানদের অভিযোগের বড় একটা কারণ নেই, কেননা, ১৮৬৯ সালে এপ্রিলে যেখানে আনুপাতিক হার ছিল মুসলমান একজন আর হিন্দু দুইজন; আর বর্তমান হার হচ্ছে মুসলমান একজন, হিন্দু তিনজন। দ্বিতীয় স্তরে ঐ সময়ের হার ছিল মুসলমান দুইজন আর হিন্দু নয় জন; এখনকার হার হচ্ছে মুসলমান একজন আর হিন্দু দশজন। তৃতীয় স্তরের চাকরিতে ঐ সময়ের হার ছিল মুসলমান এবং হিন্দু ও ইংরেজ মিলে চব্বিশজন। অধস্তন স্তরে ১৮৬৯ সালে মুসলমান চারজন আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের মিলিত সংখ্যা ছিল ত্রিশজন; আর বর্তমানে এই হার দাঁড়িয়েছে মুসলমান চারজন অন্যান্য সম্প্রদায় ঊনচল্লিশজন। শিক্ষানবিশিষ্ট পর্যায়ে ঐ সময়ের হার ছিল মোট আটাশটির মধ্যে দুইজন মুসলমান; আর বর্তমানে সেখানে একটিও মুসলমান নেই।[১৩৮]

মুসলমানরা ব্রিটিশ শাসন মেনে নিতে পারে নি। ইংরেজ শাসকরাও তাদেরকে বিশ্বাস করে নি। হিন্দুরা ব্রিটিশ শাসন মেনে কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে। স্বাভাবিক কারণেই ইংরেজ শাসকরা হিন্দুদেরকে বিশ্বাস করে এবং তাদেরকে অনুগ্রহ করে। ১৮১৩ সালে সিলেক্ট কমিটির এক প্রশ্নের জবাবে স্যার জন ম্যালকম বলেন:

---

১৩৭. আকবর উদ্দীন, মাওলানা আকরম খাঁ'র কাল ও তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা (সংকলন, আবু জাফর); মওলানা আকরম খাঁ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮৬), পৃ. ৫০।

১৩৮. ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬-৪৭।

www.pathagar.com

আমাদের প্রতি হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের অনুরক্তি আমাদের ভারত সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার প্রধান উৎস।[১৩৯]

চাকরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ইংরেজ, মুসলমান ও হিন্দু সমান অধিকারী হলেও নিম্নের সারণীতে বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। গেজেটটি এখানে প্রদত্ত হলো :

বাংলায় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা বন্টনের খতিয়ান : এপ্রিল, ১৮৭১[১৪০]

বিবরন	ইউরোপীয়ান	হিন্দু	মুসলমান	মোট
চুক্তিবদ্ধ সিভিল সার্ভিস (মহামান্য রানি কর্তৃক ইংল্যান্ড থেকে নিয়োগপত্র প্রদত্ত)	২৬০	০	০	২৬০
রেগুলেশন বহির্ভূত জেলাসমূহে বিচার বিভাগীয় অফিসার	৪৭	০	০	৪৭
এক্সট্রা অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার	২৬	৭	০	৩৩
ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ইনকামট্যাক্স এসেসর	১১	৪৩	৬	৬০
রেজিস্ট্রেশন ডিপার্টমেন্ট	৩৩	২৫	২	৬০
স্মল কজ কোর্টের জজ এবং সাব-অর্ডিনেট জজ	১৪	২৫	৮	৪৭
মুন্সেফ	-	১৭৮	৩৮	২১৬
পুলিশ বিভাগ, সকল গ্রেডের গেজেটেড অফিসার	১০৬	৩	০	১০৯
গণপূর্ত বিভাগ, ইঞ্জিনিয়ারিং এস্টাবলিশমেন্ট	১৫৪	১৯	০	১৭৩
গণপূর্ত বিভাগ, সাব-অর্ডিনেট এস্টাবলিশমেন্ট	৭২	১২৫	৪	২০১
গণপূর্ত বিভাগ, একাউন্ট, এস্টাবলিশমেন্ট	২২	৫৪	০	৭৬
মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্ট, মেডিক্যাল কলেজ, জেলখানায়, দাতব্য চিকিৎসালয়ে, স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও রোগ প্রতিষেধক বিভাগে নিযুক্ত কর্মচারী এবং জেলা মেডিক্যাল অফিসার ইত্যাদি	৮৯	৬৫	৪	১৫৮
জনশিক্ষা বিভাগ	৩৮	১৪	১	৫৩
শুল্ক, নৌ-চলাচল, জরিপ, আফিম নিয়ন্ত্রণ ইত্যাকার বিভিন্ন বিভাগ	৪১২	১০	০	৪২২
মোট	১,৩৩৮	৬৮১	৯২	২,১১১

ইংরেজ শাসকগণ প্রথম থেকেই মুসলমানদেরকে অবিশ্বাস করতে থাকে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৭৬৭ সালের ২৮ নভেম্বর ওয়ারেন হেস্টিংসের নিকট এক পত্রে ক্লাইভ লিখেছেন :

> ইহা আপনি ধ্রুব সত্য বলে গ্রহণ করতে পারেন যে, আমাদের নিকট হতে সহৃদয় ব্যবহার পেলেও মুসলমানগণ কখনও আমাদের প্রতি তাহাদের মনোভাব পরিবর্তন করিবে না। তাহাদের নিজেদের বিপদের আশঙ্কাই কেবল তাহাদিগকে চুক্তি বজায় রাখিতে বাধ্য করতে পারে।[১৪১]

১৩৯. এম. এ. রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।
১৪০. ডব্লিও. ডব্লিও. হান্টার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮।
১৪১. এ, আর, মল্লিক, ব্রিটিশ পলিসি স্টুয়ার্ডস দি মুসলিম, পৃ. ১৪৩।

www.pathagar.com

১৮১৩ সালে ক্যাপ্টেন টি, মাকান মন্তব্য করেন :

মুসলমানগণ অপেক্ষা হিন্দুগণ ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অধিকতর বিশ্বস্ত।[১৪২]

১৮৩৮ সালে *ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া* নামক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সংবাদপত্র মুসলমানদের ব্রিটিশবিরোধী মনোভাবের উল্লেখ করে বলে:

> একটি মুসলমান সংবাদপত্র ব্রিটিশ সরকারের এইরূপ তীব্র সমালোচনা করিয়াছে যে, মনে হয় ইহা সিন্ধু নদের অপর পারে অবস্থিত আমাদের শত্রুদের স্বার্থের নিকট নিজেকে বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে। ইহা সন্তোষ প্রকাশ করে যে, কোনো হিন্দু পত্রিকা আলোচনার ন্যায্য অধিকারের মাত্রা লংঘন করে নাই এবং ইহারা সব সময় সরকারের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করিয়াছে। হান্টার লিখেছেন, ইংরেজ সরকার সশস্ত্র রাজদ্রোহীদের সহিত কোনোরূপ আপোষ করিতে পারে না। যাহারা অস্ত্রের সাহায্য মীমাংসা করিতে চায় তাহাদিগকে অস্ত্রের দ্বারাই শায়েস্তা করা হইবে। তিনি বলেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য মুসলমানদিগকে সৈন্যবাহিনী ও উচ্চ রাজপদগুলি হইতে অপসারিত করা প্রয়োজন ছিল। তিনি স্বীকার করেন যে, এই নীতির ফলে মুসলমানগণ দুর্দশাগ্রস্ত হয়।[১৪৩]

ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর এই নীতির ফলে রাজ্যহারা স্বদেশে পরবাসী মুসলমানরা যেমন শিক্ষা-দীক্ষা, চাকরি-বাকরি ও সামাজিক ক্ষেত্রে পঙ্গু হয়ে যায়, সে ক্ষেত্রে একটি দৈনিক পত্রিকা পরিচালনা দুরূহ ও দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। এই কঠিন কাজটি সম্পাদন করেছেন মাওলানা আকরম খাঁ *আজাদ* পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে।

উল্লেখ্য, উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এতদঞ্চলে সংবাদপত্র ও সাময়িকীর সূত্রপাত হয়। ১৮০০ সালে উইলিয়াম কেরীর *সমাচার দর্পণ*, ১৮২১ সালে রামমোহন রায়ের *ব্রাহ্মণ সেবাধি*, ১৮২৯ সালে *সমবাদ কৌমুদী*, ১৮২২ সালে ভবানী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *সমাচার চন্দ্রিকা* এবং ঈশ্বচন্দ্র গুপ্তের *'সম্বাদ প্রভাকর'* প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া আরও কিছু সংবাদপত্র এবং সাময়িকীরও জন্ম হয়। মুসলমানরা উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে সাংবাদিকতা শুরু করেন। ১৮৯০ সালে মীর মশাররফ হোসেন *আজিজুল নেহার* ও *হিতকরী* নামে দু'টি সাময়িকী বের করেন। অবশ্য খুব স্বল্প সময়েই সাময়িকী দু'টি বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৮৩ সালে মৌলবী নঈম উদ্দীনের সম্পাদনায় *আখবার-ই-ইসলামিয়া* নামক একটি মাসিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ঠিক একই সময়ে আবদুল হামিদ খাঁ'র সম্পাদনায় টাঙ্গাইলে *আহমদী* নামেও একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের হয়। ১৮৮৯ সালে মুন্সী রিয়াজ উদ্দীন ও শেখ অবদুর রহীমের সম্পাদনায় *সুধাকর* নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। অবশ্য সুধাকর পরে ১৮৮৯ সালে *মাসিক মিহির* নামে রূপান্তরিত হয়। একই সময় *ইসলাম প্রচারক* ও *হাফিজ* নামে আরও দু'টি মাসিক পত্রিকা মুন্‌শী রিয়াজ উদ্দীন ও শায়খ অবদুর রহীমের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ১৮৯৮ সালে *কোহিনুর* নামে কোলকাতায় মাসিক পত্রিকা প্রকাশ হয়। ১৮৯০ সালে রাজশাহীতে *নূর-উল-ইসলাম* পত্রিকা মির্জা ইউসুফ আলির সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। তাঁর উদ্যোগে ১৯০৩ সালে কোলকাতায় *ছোলতান* নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা মাওলানা মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদীর সম্পাদনায় বের হয়। ১৯১৩

---

১৪২. এম, এ, রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬।

১৪৩. এ, আর, মল্লিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩।

www.pathagar.com

সালে কোলকাতায় প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা *আল্ ইসলাম* -এর সম্পাদনাও তিনি করেন।[১৪৪]

দেখা যায়, বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে নবনূর, *সাপ্তাহিক মোহাম্মদী, মাসিক মোহাম্মদী, হানাফী, মোসলেম, মুসলিম হিতৈষী, ধূমকেতু, নবযুগ, লাঙ্গল, খাদেম,* এবং *সওগাত*-সহ আরও কিছু পত্রিকা প্রকাশিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে কোলকাতায় ইংরেজি পত্রিকার সূত্রপাত হয়। মুসলমানদের প্রথম ইংরেজি পত্রিকা সাপ্তাহিক *মোহামেডান অবজার্ভার* (Muhammedan Observer) ১৮৯০ সালে কোলকাতায় প্রকাশিত হয়। এরপর *মুসলিম ক্রনিকল* Muslim Chronicle) ও *মুসলিম স্টান্ডার্ড* (Muslim Standard) নামে আরও দু'টি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের হয়। ১৯০৬ সালে ব্যারিস্টার আবদুর রসূল *দি মুসলমান* (The Mussalman) নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এর সম্পাদক ছিলেন মৌলবী মুজিবুর রহমান।[১৪৫] দৈনিক পত্রিকার মধ্যে *দৈনিক সোলতান, দৈনিক আমীর, বঙ্গনূর, তকবির* এবং সর্বশেষ মাওলানা আকরম খাঁ'র *দৈনিক আজাদ* ১৯৩৬ সালের ৩১ অক্টোবর বের হয়। তবে, একমাত্র *আজাদ* ছাড়া কোনো পত্রিকাই বেশি দিন টিকেনি। *আজাদ*-ই দীর্ঘস্থায়ী হয়। বাংলাদেশে মুসলিম ঐতিহ্য ও জাতীয়তা প্রচারের কাজে *দৈনিক আজাদ* গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পত্রিকাগুলো মূলত মুসলিম ইতিহাস, ঐতিহ্য, মুসলমানদের পুনর্জাগরণ, সমাজ সংস্কার, প্রজাদের উপর জমিদার শ্রেণির শোষণের দৌরাত্ম্য, তিতুমীরের সংগ্রাম, ইসলামি শিক্ষা ও আদর্শ, অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিতদের ধর্মান্ধতা, ধর্মের নামে অধর্মের অনুপ্রবেশসহ যাবতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে শাণিত কলম ধারণ করে।

আজাদ পত্রিকা মুসলমানদের দাবিদাওয়া, অভাব-অভিযোগের কথা বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরে। মুসলমানদের জন্য চাকরি নিশ্চিত করার দাবিও তোলে। এর প্রেক্ষিতে শতকরা ৪৫ ভাগ চাকরি সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়।

সাম্প্রদায়িক কথাটি তখনই চালু হয়। মুসলমানরা যাই বলতো হিন্দুরা তাকেই সাম্প্রদায়িক বলে আখ্যা দিত। হিন্দুদের পত্র-পত্রিকায় এ নিয়ে প্রচুর লেখা বের হতো। *আজাদ* পত্রিকা এগুলোর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।[১৪৬] মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবিকে শুধু সাম্প্রদায়িক রূপেই চিহ্নিত করে নি, এইসবের বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতাও সৃষ্টি করা হয়েছিল। তাই *আজাদ*-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়েছিল :

> হিন্দুস্থান হিন্দুর দেশ, হিন্দু ধর্ম, সংস্কৃতি ও ভাষাই এখানে প্রবল হইয়া থাকিবে। অন্য কোনো ধর্মের, সংস্কৃতির বা সাহিত্যের স্থান হিন্দুর এই পবিত্র আর্যাবর্তে হইতে পারিবে না বলিয়াও দাম্ভিক স্বরে ঘোষণা প্রচার করা হইতেছে।[১৪৭]

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও গবেষক মঈনুদ্দীন আহমদ খান বলেন:

---

১৪৪. এম. এ. রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০-২১।
১৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০-২১।
১৪৬. বিচিত্রা, ঈদ সংখ্যা, ১৯৭৭।
মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।
১৪৭. দৈনিক আজাদ, ৩ নভেম্বর, ১৯৩৬ সাল।

www.pathagar.com

তদুপরি হিন্দু জমিদারদের অধীনে মুসলিম প্রজারা দুর্গাপূজা, কালীপূজা ও সরস্বতী পূজা উপলক্ষে চাঁদা প্রদান করতে বাধ্য ছিল।[১৪৭ক]

১৯৩৬ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে প্রচারিত ঘোষণায় বলা হয়েছিল :

Hindusthan is primarily for the Hindus, who live for the preservation and development of Aryan culture and Hindu dharma. In Hindusthan the national race, religion and language out to be that of the Hindus.[১৪৮]

হিন্দু মহাসভার উপরোক্ত দাবির প্রতিবাদে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে সেদিন *দৈনিক আজাদ*কে সাম্প্রদায়িক সংগ্রাম ও তার মূল কারণ শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলতে হয়েছে:

হিন্দুর স্পষ্ট দাবী, হিন্দুস্থান হিন্দুর দেশ। হিন্দুর ভাব, হিন্দুর জ্ঞান, হিন্দুর কর্ম, হিন্দুর আচার-ব্যবহার ও হিন্দুর আদেশ-নির্দেশের নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়াই মুসলমানগণকে এদেশে বসবাস করিতে হইবে।..... এই আত্মহত্যার নির্দেশ শিরোধার্য করিয়া লইতে মোছলেম বঙ্গের জাতীয় মন কঠোরভাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করিতেছে। বাংলার মুসলমানও অন্যদিকে দৃঢ়তার সহিত নিজের বাঁচিয়া থাকিবার দাবী উপস্থিত করিতেছে- জাতি হিসেবে। অর্থাৎ মোছলেম জাতীয়তার অস্তিত্বটাই নির্ভর করিতেছে তাহার ভাবগত, কর্মগত, অতীতের ইতিহাসগত এবং ভবিষ্যতের জীবন স্বপ্নগত যে সব বৈশিষ্ট্যের উপর মুসলমান সেগুলি রক্ষা করিয়া চলিতে চায়-সসম্মানে, সগৌরবে, স্বাধিকারে এবং সচলে ও সবলে।[১৪৯]

রাজনীতিবিদ মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ তাঁর স্মৃতিচারণে লিখেছেন :

কংগ্রেস সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের কতিপয় সাংস্কৃতিক মতবাদকে জাতীয় মতবাদ বলে নির্বিবাদে গ্রহণ করে। কিন্তু সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের কোনো সাংস্কৃতিক মতবাদ কংগ্রেসকে গ্রহণের দাবী জানানো হলে তা সাম্প্রদায়িক মতবাদ বলে অগ্রাহ্য করা হতো। মূলত এ থেকেই কংগ্রেসে হিন্দু ও মুসলমান নেতাদের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টিহয়। ধীরে ধীরে এ মতভেদই মতবিরোধে পরিণত হয়।[১৫০]

দৈনিক আজাদ ছিল জাতি ধর্ম নির্বিশেষে উৎপীড়িতদের মুক্তিকামী পত্রিকা। *দৈনিক আজাদ*কে অভিনন্দন জানিয়ে তৎকালীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরেবাংলা এ. কে ফজলুল হক বলেছিলেন:

মুমূর্ষু রোগীকে বাঁচাইতে হইলে যেমন অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও ঔষধের আবশ্যক, মৃতপ্রায় সমাজকে বাঁচাইতে হইলে তেমনি আবশ্যক শক্তিশালী সংবাদপত্রের। বাংলার নিপীড়িত জাতিগুলি যখন অত্যাচারের চাপে ওষ্ঠাগত প্রাণ হইয়া মুক্তি

১৪৭ক. মঈনুদ্দীন আহমদ খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩।

১৪৮. অর্থাৎ "হিন্দুস্থান প্রধানত হিন্দুদের জন্য আর্য সংস্কৃতি ও হিন্দু ধর্মের রক্ষা ও বিকাশের নিমিত্ত যাহারা জীবন ধারণ করে। হিন্দুস্থানের রেস্ (জাতি) ধর্ম ও ভাষাই জাতীয় রেস, ধর্ম ও ভাষা হওয়া উচিত।"
প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩, পৃ. অনুঃ।
মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭।

১৪৯. দৈনিক আজাদ, ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৩৬।

১৫০. মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।

www.pathagar.com

> লাভের জন্য আকুলতা প্রকাশ করিতেছিল। সেই সন্ধিক্ষণে আশার দীপ্ত মশাল হস্তে হইল আজাদের আবির্ভাব। *আজাদ* বাহির হইল। সঙ্গে সঙ্গে কোটি কোটি মৌনমূক জনসাধারণ কণ্ঠে ভাষা পাইল, বুকে পাইল আশা। বন্দী আবার জিন্দানখানার আগল ভাঙ্গিয়া বাহির হইল। মুক্তির নির্মল আলোকে.....।[১৫১]

বস্তুত, দারিদ্র্য দূর করা এবং অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন ছাড়া যে সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর তথা বাংলার মুসলমানদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার- এই সত্য *দৈনিক আজাদ* বিভাগ-পূর্বকালেই তুলে ধরেছে। তাই, *দৈনিক আজাদ* -এর সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছিল :

> যুদ্ধোত্তর দুনিয়ার প্রতিযোগিতায় দারিদ্র্যপীড়িত মুসলমান জাতিকে হেলাফেলা করিয়া দুদশটা চাকুরী দিয়া তাকে সর্বনাশ হইতে রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। একটি সুকল্পিত পরিকল্পনা খাড়া করিয়া অত্যন্ত সতর্কতার সহিত তাহা বাস্তবক্ষেত্রে কার্যকরী করিয়া তুলিতে হইবে। দারিদ্র্যের কবল হইতে এই জাতিকে উদ্ধার করিতে না পারিলে ভবিষ্যতের ভয়াবহ অন্ধকারে এই জাতি বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। আর সেই বিলুপ্তির জন্য ভবিষ্যৎ জমানার ইতিহাস লেখক বর্তমান জাতির নেতাগণকে অপরাধীরূপে অভিযুক্ত করিবেন।[১৫২]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে উপমহাদেশের এবং বিশেষত বাংলার অনগ্রসর ও দারিদ্র্যপীড়িত, শোষিত-বঞ্চিত মুসলমানদের মুখপত্ররূপে কথা বললেও ধর্ম সম্প্রদায় নির্বিশেষে এখানকার সব বঞ্চিত জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাও 'দৈনিক আজাদে' ভাষা পেয়েছে। জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি সম্পর্কে *আজাদ* ভারত-*আজাদ* পাকিস্তান' শীর্ষক সম্পাকীয়তে বলা হয়েছে :

> *আজাদ* পাকিস্তান ও *আজাদ* ভারতের শাসনে আজ রাষ্ট্র গঠনের বিপুল কর্তব্য রহিয়াছে। রাষ্ট্রের প্রতিটি অধিবাসী যাহাতে খাইয়া পরিয়া মানুষের মত বাঁচিতে পারে এবং নিজের জীবন অবাধভাবে ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম তাহারই ব্যবস্থা আজ স্বাধীন রাষ্ট্রকে করিতে হইবে।[১৫৩]

অন্য একটি সম্পাদকীয়তে বলেছে :

> ক্ষুধার্ত এবং অভাবগ্রস্ত মানুষকে শুধু মৃত নীতিকথার পুঁথি-কংকাল দেখাইয়া আর শান্ত করা যাইবে না। কথার সাথে সর্বাধিক জোরে আজ দারিদ্র্য এবং অভাবকে আক্রমণ করিতে হইবে। 'এছলাম কিতাবে এবং মুসলমানকে কবরে' রাখিয়া কমিউনিজমের অনুপ্রবেশ ও আক্রমণ বন্ধ করা অসম্ভব। ক্ষুধাহীন, শোষণহীন, মুক্ত, উদার এছলামী সমাজ ব্যবস্থায় মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।[১৫৪]

আরেকটি সম্পাদকীয়ের অংশবিশেষ নিম্নরূপ :

> খাদ্য সংকট রোধের ব্যাপারে সরকারী শাসনযন্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে।..... গদী সংরক্ষণ ও গদী দখল লইয়া রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে প্রাণান্তকর টানাটানি ধস্তাধস্তি চলিতেছে।[১৫৫]

---

১৫১. এ, কে, ফজলুল হক, প্রধানমন্ত্রী, বাংলা, ১লা নভেম্বর, ১৯৩৮।
মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯-১০।

১৫২. দৈনিক আজাদ, ২০শে মার্চ, ১৯৪৫ (সম্পাদকীয় কলাম)।

১৫৩. দৈনিক আজাদ, ১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭ সাল।

১৫৪. প্রাগুক্ত, ৭ মে, ১৯৫৪।

১৫৫. প্রাগুক্ত, ২২ মে, ১৯৫৬।

www.pathagar.com

আজাদে আরো বলা হয় :

> নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বাজারদর ক্রমে বাড়িয়া চলিয়াছে।.........। স্বাভাবিকভাবেই নাগরিক মহলে একটা দুশ্চিন্তার সৃষ্টি হইয়াছে।[১৫৬]

সংবাদপত্রকে চতুর্থ রাষ্ট্র বলে অভিহিত করা হয়। রাষ্ট্রের সুপরিচালন ও সুনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সংবাদপত্রের দায়িত্ব অপরিসীম। যদিও রাষ্ট্র পরিচালনায় ও নিয়ন্ত্রণের উপর সংবাদপত্রের প্রত্যক্ষ হাত নেই। কিন্তু রাষ্ট্রের কর্ণধারদের কাজকে সংবাদপত্র প্রভাবিত ও যুক্তিসহ পরামর্শ দিতে পারে। এই ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের দায়িত্বের কথা ওঠে। আর সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছে *দৈনিক আজাদ* । বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার ১২ বছর পূর্বে পাকিস্তান আমলেই পূর্ব পাকিস্তানের অধিকার বঞ্চিত মানুষের উন্নয়নে অধিকতর জোর দেওয়ার জন্য সাহসী ভূমিকা পালন করতে *আজাদ* বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করে নি। *দৈনিক আজাদের* পাকিস্তান ও শিল্পোন্নয়ন শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধে জোরালোভাবে বলা হয়েছে :

> পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা হু-হু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে। উপযুক্ত পরিমাণ চাষের জমি এখানে সকল চাষীকে দেওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং বেকার সমস্যার সমাধান এবং জীবিকার জন্য এখানে কলকারখানা বাড়াইতে হইবে। এ কাজে জাপানের অভিজ্ঞতা আমাদিগকে কাজে লাগাইতে হইবে। জাপানও একদিন দরিদ্র দেশ ছিল। তার জনগণের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। কিন্তু নানা প্রকার শিল্প বাণিজ্য গড়িয়া তুলিয়া জাপান তার দেশের মানুষের জীবিকা ও অর্থাগমের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। তাহারা তাহাদের দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনশক্তি কাজে লাগাইয়াই আজ বড় হইয়াছে। আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনশক্তিকে কাজে লাগাইতেই হইবে। এভাবেই সুখী, সমৃদ্ধ ও শিল্পায়িত পাকিস্তানের স্বপ্ন সার্থক হইবে।[১৫৭]

সর্বপ্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে *দৈনিক আজাদ* ছিল সোচ্চার। জমিদার উচ্ছেদের পক্ষে সাধু সাবধান শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখার জন্য *দৈনিক আজাদ-কে* আর্থিক ক্ষতিও স্বীকার করতে হয়। এ প্রসঙ্গে *আজাদ* সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন লিখেছেন :

> পূর্ব পাকিস্তানের আইন সভার (লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলি) নয়াবাড়ী তখনও তৈরী হয় নাই। তাই জগন্নাথ হলেই সাময়িকভাবে আইন সভার অধিবেশন হয়ে চলছিল। আইন সভায় সে সময়ে জমিদারী উচ্ছেদ সম্পর্কে আলোচনা তীব্র হয়ে ওঠেছিল। জমিদার শ্রেণির লোকেরা যাতে এ-সম্পর্কে তাদের স্বার্থবিরোধী আইন গৃহীত না হতে পারে, সে জন্য নানাপ্রকার প্রকাশ্য ও গোপন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন বলে আমার মনে হয়েছিল। তাই সাধু সাবধান শীর্ষক *আজাদ*-এর এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আমি সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলাম। লেখাটা নিয়ে আইন সভায় তীব্র প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। শুধু তাই নয়, আজাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও গৃহীত হয়। আজাদের পরিষদ রিপোর্টারের প্রবেশাধিকার নাকচ এবং সরকারী বিজ্ঞাপন থেকে *আজাদকে* বঞ্চিত করা হয়। এরপর দীর্ঘদিন *আজাদ* সম্পর্কে এই ব্যবস্থা বহাল রাখা হয়। তার ফলে আজাদের আর্থিক অবস্থার

---

১৫৬. প্রাগুক্ত, ২১ জানুয়ারি, ১৯৫৯।
১৫৭. দৈনিক আজাদ, ৩১শে মার্চ, ১৯৫৯ সাল।

www.pathagar.com

অবনতি ঘটে। তবে জনপ্রিয়তা এর ফলে বেড়েই গিয়েছিল বলে মনে হয়েছিল।[১৫৮]

বিভাগ-পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তান থেকে কয়েকটি বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। যেমন- *দৈনিক সংবাদ, ইত্তেফাক, ইনসাফ, মিল্লাত, নাজাত, আমার দেশ, পয়গাম, জেহাদ।* এগুলো সবই ছিল বাংলা দৈনিক। ইংরেজি দৈনিকের মধ্যে *পাকিস্তান অবজারভার* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া চট্টগ্রাম থেকেও কিছু ইংরেজি ও বাংলা দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। যেমন- *পূর্ব পাকিস্তান, দৈনিক আজাদ, জামানা, ইস্টার্ন একসমিনার, ইউনিটি* ইত্যাদি। তবে, এ কথা সত্য *দৈনিক আজাদ* এ দেশের গণমানুষের মুখপত্ররূপে যতখানি মুখ্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে, অন্য কোনো পত্রিকার পক্ষে ততটুকু সম্ভব হয় নি। *দৈনিক আজাদ* সাবেক পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির কথা বলেছে, পাশাপাশি পূর্বাঞ্চলের জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার এবং শোষণ-বঞ্চনার অবসান ঘটানোর কথা সোচ্চার কণ্ঠে উচ্চারণ করেছে। গণতন্ত্রের ঐতিহ্য শীর্ষক এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয় :

> *আজাদ* পাকিস্তান আজ তার গণতান্ত্রিক জীবনের প্রাথমিক অধ্যায় অতিক্রম করিতেছে। পূর্ব পাকিস্তানের আগামী সাধারণ নির্বাচন ঐদিক হইতে একটি পরীক্ষা হিসেবেও বিবেচিত হইবে। আমরা নবলব্ধ গণতান্ত্রিক অধিকারের মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে পারি কি-না, এই নির্বাচন দুনিয়ার নিকট সুস্পষ্ট করিয়া তুলিবে। মনে রাখিতে হইবে, আজাদি লাভের পর ইহাই প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন। সুতরাং আমাদের রাজনীতির ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি এরই ভিতর দিয়া ধ্বনিত হইবে।[১৫৯]

১৯৩৬ সালের ৩১ অক্টোবর থেকে ১৯৪৮ সালের ১২ অক্টোবর পর্যন্ত প্রায় ১২ বছর *দৈনিক আজাদ* কোলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। দেশ বিভাগের পর (পাকিস্তান ও ভারত) এক সপ্তাহ পত্রিকা বন্ধ থাকে। ১৯ অক্টোবর তারিখ পুনরায় ঢাকা থেকে *দৈনিক আজাদ* প্রকাশিত হয়।[১৬০] *দৈনিক আজাদ* আমাদের জাতীয় জীবনে আবেহায়ত-এর কাজ করেছে।

আজ থেকে প্রায় ৬০ বছর আগে *দৈনিক আজাদ*-এর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু এই পত্রিকার ভূমিকা ও অবদানের সাথে জড়িত রয়েছে উপমহাদেশের এক শতাব্দীর রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বিশেষ করে মুসলিম রেনেসাঁ আন্দোলনের ও বাংলার মুসলমানদের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের ইতিহাস।

দৈনিক আজাদ একটি সংবাদপত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও জন্মলগ্ন থেকেই একটি অঙ্গীকার নিয়ে মুসলিম জনগণের নিকট আবির্ভূত হয়েছিল। রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণে ইসলামি আদর্শ, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠায়, যাবতীয় অন্যায় ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, ধর্মের নামে অন্ধ অনুকরণের বিরুদ্ধে, ব্রিটিশ শাসকদের অত্যাচার, প্রতিবেশী হিন্দু মহাজন ও জমিদারদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে সর্বোপরি স্বদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলিম জনগোষ্ঠীর উজ্জীবন ও অস্তিত্ব রক্ষার প্রচেষ্টায় *দৈনিক আজাদ* শাণিত লেখনীর মাধ্যমে অবদান রেখেছে। বাস্তবক্ষেত্রেও তা-

---

১৫৮. অতীত দিনের স্মৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২১।
১৫৯. দৈনিক আজাদ, 'গণতন্ত্রের ঐতিহ্য' শীর্ষক প্রবন্ধ, ২রা জানুয়ারি, ১৯৫৪।
১৬০. মোঃ কাসেদ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭।

www.pathagar.com

ই ঘটেছে। *দৈনিক আজাদ* তার অঙ্গীকারকে সমুন্নত রাখতে সক্ষম হয়েছে। *দৈনিক আজাদ*-এর এই সফলতা যাঁর জন্য তিনি মুসলিম বাংলার দিকপাল সাংবাদিকতার জনক মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ। তিনি ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, সমাজ-সংস্কারক, প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ, বিজ্ঞ পণ্ডিত। তাঁর প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা নিছক একটি সংবাদপত্র ছিল না, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মুখপত্র এবং স্বাধিকার আদায়েরও বিপ্লবী হাতিয়ার ছিলো।

আজাদ অফিসকে কেন্দ্র করে তখন কোলকাতা ও ঢাকায় সৃষ্টিহয়েছে একদল সাংবাদিক, জন্ম নিয়েছে বহু সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন। আকরম খাঁ'র ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন কর্মধারায় প্রসারিত এবং বিকশিত ছিল। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট আলিম, রাজনৈতিক নেতা, আদর্শবাদী সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। এই তিনটি কারণে একদিন কোলকাতার *দৈনিক আজাদ* অফিসে বিচিত্র ধরনের মানুষ, নেতা ও কর্মীর মিলনক্ষেত্র হয়ে ওঠেছিল।

ইংরেজিতে একটি কথা আছে: All roads lead to Rome.[১৬১] –সব রাস্তা অবশেষে রোমে গিয়ে পৌঁছায়।

এক সময় এমন ছিল, কোলকাতার *আজাদ* অফিস আলিম, রাজনীতিক এবং সাহিত্যিকদের জন্য হয়ে ওঠেছিল সমকালীন বাংলার সর্বপ্রধান আকর্ষণীয় কেন্দ্র। বাংলায় এমন কোনো রাজনৈতিক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও আলিম ছিলেন না, যিনি একবার *আজাদ* অফিসে হাজিরা দেন নি। বলা যেতে পারে, *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির* বেসরকারী কার্যালয় ছিল তখন *আজাদ* অফিস। *পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির* শুধু প্রাণকেন্দ্র নয়, অফিস বলতেও সবকিছুই ছিল *আজাদ* অফিস।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে ফ্যাসিবাদবিরোধী বামপন্থী হিন্দু সাহিত্যিকরাও *আজাদ* অফিসে ঘন ঘন আসতেন। এ সময়েই Anti-fascist Literary Association পরে Progressive Writers Association অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে ওঠে। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সমিতির সভাপতি। আজাদের এক সময়ের সম্পাদক মুজিবুর রহমান খাঁ ছিলেন এই সমিতির সহ-সভাপতি। এই সমিতি সম্পর্কে মুজিবুর রহমান খাঁ নিজেই বলেছেন :

আমি মওলানা সাহেবের সানন্দ সমর্থন পেয়েছিলাম।[১৬২]

কোলকাতায় বিভাগ-পূর্ব ও বিভাগোত্তর সময় *আজাদ*-এর উপর হামলা

স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলিম লীগ ও পাকিস্তানের পক্ষে প্রচার কার্যে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা ছিল *দৈনিক আজাদ*-এর। তাই, *আজাদী* হাসিলের পরক্ষণেই উগ্রবাদী হিন্দুরা মুসলিম বাংলার কণ্ঠস্বর *দৈনিক আজাদ-এর* উপর রাতের অন্ধকারে হামলা পরিচালনা করে *আজাদ* অফিসের্ব যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করে। এ সম্পর্কে আবুল মনসুর আহমদ বলেন:

পাকিস্তানী প্রচারকদের মধ্যে *আজাদ* পত্রিকা অগ্রগণ্য। হিন্দুরা স্বভাবতঃই আজাদের উপর সবচেয়ে বেশি বিক্ষুব্ধ ছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই

---

১৬১. আবু জাফর, মওলানা আকরম খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮।
১৬২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১।

www.pathagar.com

কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিল। পনের দিন যাইতে না যাইতেই ২রা সেপ্টেম্বর রাত্রে *আজাদ* বাহির হইতে পারিল না। হিন্দু সাংবাদিকরাই উদ্যোগী হইয়া সভা ডাকিলেন। অমৃত বাজার পত্রিকার চিত্তরঞ্জন এভিনিউস্থ সিটি অফিসে সম্পাদকদের এক বৈঠক হইল। প্রায় পঁচিশজন সম্পাদক বৈঠকে যোগ দিলাম। সর্বসম্মতিক্রমে গুণ্ডাদের নিন্দা করা হইল। *অমৃত বাজার*-এর মি. তুষার কান্তি ঘোষ, *স্টেটস্‌ম্যানের* মি. আয়ান স্টিফেন, *স্বরাজের* শ্রীযুক্ত সত্যেন মজুমদার, *আনন্দ বাজার*-এর শ্রীযুক্ত চপলকান্ত ভট্টাচার্য ও *ইত্তেহাদের* আমিসহ সকল সম্পাদকের স্বাক্ষরে এক আবেদন প্রচার করা হইল। ফলে *আজাদ* নিয়মিত প্রকাশিত হইতে থাকিল। ইতিমধ্যে মহাত্মাজী অনশন-ব্রত গ্রহণ করায় দাঙ্গা প্রশমিত হইল। ৪ সেপ্টেম্বর সুহরাওয়ার্দী সাহেবের হাতে কমলার রস খাইয়া তিনি অনশন ভাঙ্গিলেন। মোটামুটি শান্তি স্থাপিত হইল। ঈদ ও দুর্গাপূজা আসন্ন বলিয়া উভয় পর্ব যাতে শান্তিপূর্ণভাবে সমাধা হয় তার জন্য লেখক-সাহিত্যিকদের পক্ষ হইতে মি. তারাশঙ্কর ব্যানার্জি, মি. পংকজ কুমার মল্লিক ও আমি একটি যুক্ত আবেদন প্রচার করিলাম।[১৬৩]

বিভাগোত্তরকালেই *আজাদ* সরকারি কোপানলে পড়েছিল

নির্ভীক ও স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার অপরাধে ব্রিটিশ-পাকিস্তান উভয় শাসনামলেই *আজাদ*কে সরকারি কোপদৃষ্টিতে পড়ে যথেষ্ট ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। তবুও *আজাদ* পিছপা হয় নি। ১৯৩১ সালের ভারতীয় প্রেস আইনের জরুরি ক্ষমতাবলে বাঙলার গবর্নমেন্ট আজাদের মুদ্রাকর ও প্রকাশকের নিকট ২০০০ টাকা জামানত তলব করেন। ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর *আজাদ* অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়।[১৬৪] চট্টগ্রামের এক নিরীহ অভিযোগপত্র প্রকাশের অপরাধে ভারত রক্ষা আইনে *আজাদ*'কে অভিযুক্ত করে পাঁচদিন পত্রিকা বন্ধ রাখা হয়। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর মুসলিম লীগ আমলেও *আজাদ*কে গচ্চা দিতে হয়। এ *আজাদ*ই ছিল মুসলিম লীগের মুখপত্র। অবিভক্ত বাংলার মুসলমানদের ঘরে ঘরে মুসলিম লীগের বাণী পৌঁছে দেওয়ার জন্য *আজাদ* যে ভূমিকা পালন করেছে তা সর্বজনবিদিত। অথচ সে *দৈনিক আজাদ* কে মুসলিম লীগ সরকারের আমলে 'বুঝহ লোক যে জান সন্ধান' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রকাশ করার অপরাধে তিন বছর কোনো বিজ্ঞাপন দেয়া হয় নি।[১৬৫] এর দ্বারা প্রমাণিত হয় *দৈনিক আজাদ* দলীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে দেশ, জাতি ও নীতি-আদর্শকে সবচে বেশি প্রাধান্য দিতো। তাই মুসলিম লীগ সরকারের ভ্রষ্টনীতির বিরুদ্ধে *আজাদ* প্রয়োজনে কঠোর সমালোচনা করেছে। সেকালে *আজাদ* ছিল জাতির দিকদর্শন ও পথপ্রদর্শক।

উল্লেখ্য যে, ১৯৩৬ সালে প্রথম *দৈনিক আজাদ* প্রকাশিত হয়। এর ধারাবাহিকতা ১৯৯৫ সালের ১৮ আগস্ট পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ১৯৬৮ ও ৬৯ সালে এর সার্কুলেশন

---

১৬৩. আবুল মনসুর আহমদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, সৃজন প্রকাশনী লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ২০৮।

১৬৪. মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ, মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতা ও আবুল কালাম শামসুদ্দীন, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ১০৩।

১৬৫. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

প্রায় এক লাখে উন্নীত হয় বলেও জানা যায়। হিসেবে দেখা যায়, *আজাদ* প্রায় ৬০ বছর প্রকাশিত হয়েছে।[১৬৬]

খ. রাজনীতি

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মাওলানা আকরম খাঁ ছিলেন দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম, মুসলিম নব-জাগরণের অন্যতম দিশারী। ত্যাগী ও নিষ্ঠাবান রাজনীতিবিদ কায়েদে আযম[১৬৭]-এর সুযোগ্য সহকর্মী, সাংবাদিকতার দিকপাল, শীর্ষস্থানীয় বাংলা সাহিত্যিক। লেখক, সাংবাদিক হিসেবে তাঁর যতটা পরিচিতি, তার চেয়ে বেশি পরিচিতি একজন দেশপ্রেমিক ও নিবেদিতপ্রাণ রাজনীতিবিদ হিসেবে। তিনি সফল রাজনৈতিক নেতা হিসেবে এদেশে যুগ যুগ ধরে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর সাংবাদিকতা আসলে তাঁর রাজনৈতিক সত্তারই বহিঃপ্রকাশ। দেশ ও রাজ্যহারা মুসলিম জাতি যখন আপন জাতিসত্তা ভুলে গিয়ে বিজাতীয় ভাবধারায় নিমজ্জিত, এমনি এক সংকটাপন্ন অবস্থায় মাওলানা আকরম খাঁ এলেন নকিবের বেশে। তাঁর রাজনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম জাগরণ। মূলত মুসলিম জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে মধ্য ভাগ পর্যন্ত উপমহাদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে-সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে, তার প্রায় প্রত্যেকটির সাথে আকরম খাঁ'র নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

মাওলানা আকরম খাঁ'র রাজনৈতিক জীবন

সাংবাদিকতার মধ্য দিয়ে আকরম খাঁ'র কর্মজীবন শুরু। তিনি দেশ ও সমাজ সম্পর্কেও অত্যন্ত রাজনীতি-সচেতন ছিলেন। কোলকাতা মাদ্রাসার ছাত্র থাকাকালীনই তাঁর মধ্যে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে। ১৮৮৬ সালে নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় 'মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স'। বার্ষিক এ সম্মেলন শেষে নেতৃবৃন্দ ঢাকার শাহবাগে এক রাজনৈতিক সভায় মিলিত হয়ে 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠনে মতৈক্যে পৌঁছেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঐ তারিখেই আনুষ্ঠানিকভাবে মুসলিম লীগ নামক রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ ঘটে।[১৬৮] মূলত তখন থেকেই মাওলানার মনে রাজনীতির ছাপ পড়ে।

---

১৬৬. মোহাম্মদ কামরুল আনাম খাঁ, মাওলানার কনিষ্ঠ পুত্র, আজাদের এক সময়ের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, সাক্ষাৎকার, ৩/২/৯৭ ইং, সাভার, আনন্দপুর, ঢাকা।

১৬৭. কায়েদ আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ (১৮৭৬-১৯৪৮)। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম গভর্নর জেনারেল। করাচীতে তাঁর জন্ম। কবি সরোজিনী নাইডু তাঁকে 'হিন্দু-মুসলিম মিলনের অগ্রদূত' আখ্যা দেন। তিনি ১৯২৯-৩০ সালে মুসলমানদের যাবতীয় অধিকারসম্বলিত ঐতিহাসিক চৌদ্দ দফা উপস্থাপন করেন।
বাংলা বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪০।
শৈলেশ কুমার বন্দোপাধ্যায়, জিন্না-পাকিস্তান-নতুন ভাবনা, মিত্র ঘোষ পাবলিক হেলথ প্রা. লি. কোলকাতা, ১৪০০ সন, পৃ. ৬১।

১৬৮. উল্লেখ্য, উক্ত রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে ছিল :
ক) ভারতের মুসলমানদের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্যের ভাব উজ্জীবিত করা এবং সরকারের কোনো ব্যবস্থার উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো ভুল বুঝাবুঝির উদ্ভব হলে তা দূর করা,

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে[১৬৯] অংশগ্রহণের মাধ্যমেই তিনি রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েন। মোহাম্মদ মোদাব্বেরের ভাষায়:

> মাওলানা আকরম খাঁ'র রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় ১৯০৬ সাল থেকে। স্যার সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগের গোড়াপত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি লীগে যোগদান করেন। রাজনৈতিক জীবন শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুঝতে পারলেন যে, অচেতন মুসলিম সমাজকে সচেতন করার জন্য সবচে বড় হাতিয়ার সংবাদপত্র। ইতিমধ্যে মাওলানার বাগ্মিতার কথা সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল, ক্ষুরধার লেখনীর কথা কারও অজানা ছিল না।[১৭০]

একথা সত্য, আকরম খাঁ'র রাজনৈতিক জীবন ছিল বিভিন্নমুখী। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের[১৭১] ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কংগ্রেস নেহেরু রিপোর্ট প্রকাশ করার পর তিনি দেখলেন যে, ভবিষ্যতের স্বাধীন ভারতে মুসলমানদের উপর অবিচারের ইঙ্গিত রয়েছে। তাই, তিনি ১৯২৯ সালে কংগ্রেস ত্যাগ করেন। তিনি মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ও দৈনিকসহ প্রায় ডজনখানেক পত্রিকার সম্পাদনার মাধ্যমে মুসলমানদের জাতীয় চেতনাকে জাগ্রত করতে থাকেন। নেহেরু রিপোর্টের বিশেষ বিশেষ দিক ছিলো নিম্নরূপ :

১. সমগ্র ভারতে যুক্ত মিশ্র নির্বাচন হবে।

২. গণপরিষদে (কেন্দ্রীয় আইনসভা) কোনো আসন সংরক্ষিত থাকবে না, তবে যেসব প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘু তাদের জন্য এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের হিন্দুদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে। এ ধরনের আসন সংরক্ষণ শুধু ঐসব

খ) ভারতের মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার, স্বার্থ সংরক্ষণ ও সংহত করা এবং তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সরকারের নিকট জোরালোভাবে উপস্থাপন করা,

গ) ভারতের মুসলমানদের মধ্যে ভিন্ন সম্প্রদায় সম্পর্কে কোনো কারণে উত্তেজনা সৃষ্টি হলে তাতে বাধা প্রদান করা।

মুহম্মদ ইনাম-উল হক, ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ.-১৪৪।

১৬৯. উপমহাদেশের রাজনীতিতে বঙ্গভঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এটি একদিকে ব্রিটিশদের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বোঝা লাঘবে সহায়তা করেছে। নবগঠিত পূর্ববঙ্গের জনগণের শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক ও শান্তি-শৃঙ্খলা পুনর্বহালে অবদান রেখেছে। অপরদিকে এ ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের বিরোধিতার দরুন সৃষ্ট আন্দোলনের সূচনা হয়েছে এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন প্রত্যোক্ষ রূপ গ্রহণ করেছে। এ ঘটনা হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক অসদ্ভাবের সৃষ্টি করলেও বঙ্গভঙ্গ রদ-এর কারণে আযাদী আন্দোলনকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যায়।
প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০।

১৭০. মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতা ও আবুল কালাম শামসুদ্দীন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩, পৃ. ৩৪।

১৭১. চিত্তরঞ্জন দাশ, দেশবন্ধু (১৮৭০-১৯২৫)। তিনি ছিলেন ভারতের বিখ্যাত আইনজীবী, দেশপ্রেমিক ও রাজনীতিবিদ। আদি নিবাস ঢাকার বিক্রমপুরস্থ তেলিরবাগ গ্রামে। তিনি মহাত্মা গান্ধীর সাথে মতানৈক্যের কারণে 'স্বরাজ পার্টি' গঠন করেন। 'দি ওয়ে টু স্বরাজ' তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। তদানীন্তন সময়ে গরীবদেরকে কয়েক লাখ টাকা দান করায় 'দেশবন্ধু' খেতাবে ভূষিত হন। 'চিত্তরঞ্জন সেবা সদন' তাঁর প্রতিষ্ঠিত হাসপাতাল। আইন সভায়ও তিনি চাকরিতে মুসলমানদের ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব দানের পক্ষে ছিলেন।
বাংলা বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৯।

www.pathagar.com

প্রদেশের মুসলমান জনগোষ্ঠীর সংখ্যানুপাতে হবে যেখানে তারা সংখ্যালঘু এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অমুসলমান জনগোষ্ঠীর সংখ্যানুপাতে। যেসব প্রদেশে হিন্দু বা মুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে, সেখানে তারা ইচ্ছা করলে বাড়তি আসনের জন্যও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে।

৩. ক. পাঞ্জাব ও বাংলাদেশে কোনো সম্প্রদায়ের জন্য কোনো আসন সংরক্ষিত থাকবে না।

খ. পাঞ্জাব ও বাংলাদেশ ব্যতীত অন্যান্য প্রদেশে মুসলমান সংখ্যালঘুদের জন্য জনসংখ্যানুপাতে আসন সংরক্ষিত থাকবে এবং তৎসঙ্গে বাড়তি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অধিকারও থাকবে।

গ. উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অমুসলমানদের জন্য অনুরূপ আসন সংরক্ষিত থাকবে এবং তৎসঙ্গে বাড়তি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অধিকারও থাকবে।

৪. যেসব প্রদেশে আসন সংরক্ষিত রাখা হয়েছে তা সেখানে দশ বছরের জন্য বলবৎ থাকবে।

৫. সিন্ধুকে বোম্বে থেকে পৃথক করে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রদেশে রূপান্তরিত করা হবে, তবে অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করে আলাদা প্রদেশে কার্যকরী হবে।

৬. উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং এ ধরনের গঠিত নতুন প্রদেশসমূহ অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় সরকার গঠন করবে।[১৭২]

নেহেরু রিপোর্টে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের, অর্থাৎ বাংলা ও পাঞ্জাবের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে কার্যকর করা এবং সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানে শাসনতান্ত্রিক সংশোধন জারি উল্লেখটুকু পর্যন্ত করা হয় নি। দিল্লী প্রস্তাবের যে-সব ধারা কংগ্রেসের সাধারণ সভায় গ্রহণ করার জন্য পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু সবার অগ্রে ছিলেন, তাঁর রিপোর্টে সে-সব ধারাকে একেবারে নাকচ করে দেওয়া হয়।

তবুও জিন্নাহ'র মুসলিম লীগ আশা করে যে, প্রয়োজনীয় সংশোধন করে নেহেরু রিপোর্ট গ্রহণ করা যেতে পারে। কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলি জিন্নাহ তাতে নিম্নরূপ সংশোধন প্রস্তাব করেন:

১. অবশিষ্ট সব ক্ষমতা প্রদেশগুলোকে দিয়ে দেওয়া।

২. কেন্দ্রে মুসলমানদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত রাখা।

৩. বাংলা ও পাঞ্জাবের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে কার্যকর করার জন্য প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার ভিত্তিতে নির্বাচন করা, অথবা কাউন্সিলসমূহে মুসলমানদের আসনসমূহ তাদের সংখ্যার অনুপাতে সংরক্ষণ করা।[১৭৩]

এরপরও সমস্যার সমাধান হয় নি। কংগ্রেস ও কনভেনশন থেকে নিরাশ মুহাম্মদ আলি জিন্নাহ ১৯২৯ সালের ১ জানুয়ারি দিল্লীতে আল্ মুসলিম পার্টিস কনফারেন্স' আহবান করেন। কনফারেন্সে মুসলিম জাতির স্বার্থসম্বলিত ১৪টি প্রস্তাব স্যার শফি পেশ করেন। এটাই ঐতিহাসিক দিল্লী প্রস্তাব নামে খ্যাত। প্রস্তাবগুলো ছিল নিম্নরূপ:

---

১৭২. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮-৮৯।
১৭৩. ড. আবু সাঈদ নূর উদ্দীন, মহাকবি ইকবাল, আল্লামা ইকবাল সংসদ, ১৯৯৬, পৃ. ১৯৮।

www.pathagar.com

১. ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের গঠন ফেডারেল পদ্ধতির এবং অনুল্লিখিত ক্ষমতা (Residuary Powers) থাকবে প্রদেশের হাতে।
২. সব প্রদেশকে একই প্রকারের স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে।
৩. দেশের প্রত্যেক প্রদেশের আইন পরিষদে ও অন্যান্য নির্বাচিত সংস্থায় সংখ্যালঘুদের যথেষ্ট প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে, এবং এই প্রতিনিধিত্ব যাতে আবার সংখ্যাগুরুকে সংখ্যালঘুতে পরিণত না করে সেদিকেও নজর দিতে হবে।
৪. কেন্দ্রীয় পরিষদে মুসলিম প্রতিনিধিত্ব মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের কম হতে পারবে না।
৫. বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব হবে বর্তমানের ন্যায় পৃথক নির্বাচনের দ্বারা, তবে যে কোনো সম্প্রদায় যে কোনো সময় ইচ্ছা করলে যেন পৃথক নির্বাচন বাদ দিয়ে যুক্ত নির্বাচনে যেতে পারে।
৬. ভূখণ্ডগত কোনো পুনর্গঠন কখনও প্রয়োজন হলে তা এমনভাবে হতে পারবে না যদ্দারা পাঞ্জাব, বাংলা ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা ক্ষুণ্ন হয়।
৭. সমস্ত সম্প্রদায়কে তাদের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা–অর্থাৎ বিশ্বাস, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন, প্রচার সংস্থা গঠন ও ধর্মীয় শিক্ষার স্বাধীনতা দিতে হবে।
৮. কোনো আইন বা প্রস্তাব বা এর কোনো অংশবিশেষ কোনো আইন পরিষদ বা কোনো নির্বাচিত সংস্থায় পাস হতে পারবে না, যদি উপস্থিত কোনো সম্প্রদায়ের তিন-চতুর্থাংশ সদস্য সে আইন বা প্রস্তাব তাদের সম্প্রদায়ের স্বার্থহানিকর বিবেচনা করে বাধা প্রদান করতে পারে বা এর বিকল্প হিসেবে এসব বিষয়ে সমাধানের পন্থা অবলম্বন করতে পারে।
৯. বোম্বে প্রেসিডেন্সি থেকে সিন্ধুকে পৃথক করতে হবে।
১০. অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানেও সংস্কার (১৯১৯ সালের মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার) চালু করতে হবে।
১১. সমস্ত রাষ্ট্রীয় ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের চাকরিতে যোগ্যতার মাপকাঠির প্রতি নজর রেখে অন্যান্য ভারতীয়দের ন্যায় মুসলমানদেরকে পর্যাপ্ত অংশ প্রদান করার মতো আইন শাসনতন্ত্রে থাকতে হবে।
১২. মুসলমানদের সংস্কৃতি সংরক্ষণ, মুসলমানদের শিক্ষা, ভাষা, ধর্ম, ব্যক্তিগত আইন এবং মুসলমানদের দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, রাষ্ট্র ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদানসমূহে তাদের ন্যায্য পাওনা নিশ্চিত করার মতো যথেষ্ট আইন শাসনতন্ত্রে থাকতে হবে।
১৩. ন্যূনপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ আনুপাতিক হারে মুসলমান মন্ত্রী ছাড়া কোনো কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা গঠনকরা যাবে না।
১৪. ফেডারেশনে অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের সম্মতি ছাড়া কেন্দ্রীয় আইনসভা কর্তৃক শাসনতন্ত্রে কোনো পরিবর্তন করা যাবে না।[১৭৪]

---

১৭৪. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭, পৃ. ৭৪।

www.pathagar.com

উল্লেখ্য, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবাধ আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবিকে, অধিকার আদায়ের দাবিকে অনেকেই বিকৃত রূপ দিয়ে সাম্প্রদায়িকতা বলে আখ্যায়িত করতো। অথচ এই দাবি ছিল ঐতিহাসিক কারণে বাস্তবতার নিরিখে, পশ্চাৎপদ ও অনগ্রসর বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায়ের দাবি। কেউ কেউ এই দাবিকে সাম্প্রদায়িক রং দিয়ে চিহ্নিত করার অপচেষ্টা করেছে। মনে রাখা প্রয়োজন, আত্মপরিচয়ের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধভাবে ন্যায়সঙ্গত দাবি ও অধিকার আদায়ের প্রচেষ্টা চালানো আর 'সাম্প্রদায়িকতা' এক কথা নয়। মূলত সম্প্রদায়গত আত্মপরিচয় নিয়ে সংঘবদ্ধ হয়ে অন্য সম্প্রদায়কে ঘৃণা করা কিংবা তার ওপর অত্যাচার-নিপীড়ন চালানোর নামই 'সাম্প্রদায়িকতা'। এই ভারতবর্ষে কারা সবচেয়ে অত্যাচারিত, নির্যাতিত ও বঞ্চিত, সাম্প্রদায়িকতাকে কারা লালন করেছে, ইতিহাসই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তবুও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অপবাদ এই জন্য আনা সহজ ছিল, তারা ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবোধকে প্রাধান্য দিয়েছিল এবং ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলো মুসলিম লীগের পতাকা তলে।

পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানদের ভবিষ্যত চিন্তায় মাওলানা আকরম খাঁ'কে আন্দোলনে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করে। ব্রিটিশ ভারতীয় সরকার প্রধানত প্রশাসনিক কারণকেই বঙ্গভঙ্গের মূল যুক্তি হিসেবে উপস্থাপন করলেও ব্যারিস্টার আবদুল রসুলের [১৭৫]ন্যায় আকরম খাঁ'রও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এর কারণ রাজনৈতিক । তিনি মনে করতেন:

> উদীয়মান বাঙালি জাতির রাজনৈতিক শক্তিকে দ্বিধাবিভক্ত করে ফেলার জন্যই গভর্নমেন্ট দুরভিসন্ধিমূলক বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ করা আবশ্যক বলে করেছে, সুতরাং তাহার প্রতিবাদ হওয়া উচিত।[১৭৬]

বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে অংশ নিয়ে আকরম খাঁ ভারতের অনেক প্রভাবশালী জননেতার সংস্পর্শে আসার সুযোগ লাভ করেন। তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গণেশ দেউস্কর, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ প্রমুখ প্রভাবশালী নেতার সহকর্মীরূপে এ আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। এ সময় তিনি বিজাতীয় দ্রব্য পরিহার করে স্বদেশীয় দ্রব্য ব্যবহারের জন্য দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে প্রয়াসী হন। তাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতা জনগণকে মুগ্ধ করে তুলতো। তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় নেতা হিসেবেও পরিচিতি লাভ করেন। মাওলানা আকরম খাঁ প্রথমে বঙ্গ বিভাগের কিছুটা বিরোধিতা করলেও পরে বঙ্গভঙ্গের পক্ষে জোর সমর্থন করেন।[১৭৭]

---

১৭৫. ব্যারিস্টার আবদুল রসুল, (১৮৭২-১৯১৭)। প্রসিদ্ধ বাঙালি মুসলিম জননায়ক। কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার গুনিয়াক গ্রামে তাঁর জন্ম। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রথম মুসলমান সভাপতি। পরে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপ্রতি। প্রথম বাঙালি বি.সি.এল 'দি মুসলমান' সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনে অংশ নেন।

১৭৬. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, আবদুর রসূল, বার্ষিক মোহাম্মদী, কোলকাতা, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৬২।

১৭৭. বঙ্গ ভঙ্গের প্রথমে যাঁরা বিরোধিতা করেন, তাঁরা হলেন, মনিরুজ্জামান, আকরম খাঁ, আবদুল গফুর সিদ্দিকী, লেয়াকত হোসেন, মাঃ ওয়াহেদ প্রমুখ।
ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬, পৃ.: ১৬।

www.pathagar.com

১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর দিল্লী দরবারে সম্রাট পঞ্চম জর্জ কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা হলে কংগ্রেসের রাজনীতিতে অংশগ্রহণকারী মুসলমান নেতৃবৃন্দ মুসলিম লীগের সঙ্গে যুক্ত হতে শুরু করেন।[১৭৮]

১৯১২ সালের ২ মার্চ কোলকাতায় ডালহৌসি ইনস্টিটিউটে নওয়াব সলীমুল্লাহর[১৭৯] সভাপতিত্বে 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি মুসলিম কনফারেন্স' অনুষ্ঠিত হয়। [১৮০] এ কনফারেন্সে দুই বঙ্গের মুসলিম লীগকে একত্র করে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি মুসলিম লীগ গঠন করা হয়। এর পরেই মাওলানা আকরম খাঁ-সহ অনেক মুসলমান কংগ্রেসের সদস্যপদ থেকে ইস্ত ফা দিয়ে মুসলিম লীগের সঙ্গে যুক্ত হন এবং হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি স্থাপন করার প্রচেষ্টা চালান।

১৯১৫ সালের জানুয়ারিতে নওয়াব সলীমুল্লাহ মৃত্যুবরণ করলে বাংলায় মুসলিম লীগ অনেকটা নিষ্প্রাণ হয়ে যায়। এ সংকটকালীন অবস্থায় আকরম খাঁ মুসলিম লীগের হাল ধরেন। তিনি মুসলিম লীগের হিন্দু-মুসলিম সহযোগিতা ও ব্রিটিশবিরোধী রাজনীতিকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯১৬ সালে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের গৃহীত যুক্ত শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা 'ঐতিহাসিক লক্ষ্ণৌ চুক্তি' নামে অভিহিত হয়।[১৮১] এ চুক্তিতে বাংলা থেকে অবদুল রসুল, এ. কে. ফজলুল হক, আবুল কাশেম প্রমুখের সাথে আকরম খাঁও উপস্থিত ছিলেন।[১৮২] মাওলানা আকরম খাঁ লক্ষ্ণৌ চুক্তির আসন-সংখ্যাগত দিকের চেয়ে সম্প্রদায়গত রক্ষাকবচের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়ে লক্ষ্ণৌ চুক্তি সমর্থন করেন।

১৯১৪ সালে বৃটেন-জার্মানির যুদ্ধে তুরস্ক জার্মানির পক্ষাবলম্বন করলে ভারতীয় মুসলমানদের অধিকাংশই তুর্কি খিলাফতের ভবিষ্যত সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে খিলাফত রক্ষার প্রশ্নে ব্রিটিশবিরোধিতার পথ গ্রহণ করে। [১৮৩] এ পরিস্থিতিতে আকরম খাঁ বাংলায় খিলাফতের পক্ষে জনমত গঠনে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯১৯ সালে লক্ষ্ণৌতে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের বৈঠকে সর্বভারতীয় খিলাফত কমিটি গঠিত হয়। আকরম খাঁ বাংলায় খিলাফত কমিটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন।[১৮৪] ১৯১৯ সালের ১৭ অক্টোবর কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটির কর্মসূচি হিসেবে সমগ্র ভারতে খেলাফত দিবস পালিত হয়। ১৯২১ সালের ১৭ জানুয়ারি আকরম খাঁ'র সভাপতিত্বে কোলকাতা মির্জাপুর স্কয়ারে স্কুল-কলেজ বর্জনকারী ছাত্রদের এক বিরাট

---

১৭৮. মুনতাসীর মামুন (সম্পাদিত) বঙ্গভঙ্গ (ঢাকা, ১৯৮১), পৃ. ১১।

১৭৯. সলীমুল্লাহ, খাজা, স্যার, নওয়াব বাহাদুর (১৮৬৬-১৯১৫) জনদরদী মুসলমান নেতা ছিলেন। ঢাকার নওয়াব খাজা আহসানুল্লাহর পুত্র। মুসলিম লীগ গঠনের নেতৃত্ব দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২১), প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোক্তা।
উল্লেখ্য, ভারতীয় উপমহাদেশের তদানীন্তন গভর্নর ডালহৌসীর নামানুসারে 'ডালহৌসী ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠিত হয়।
বাংলা বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫০।

১৮০. ঢাকা প্রকাশ, ১০ই মার্চ, ১৯১২, পৃ. ৩।

১৮১. ড. এম. এ. রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৯, পৃ. ১৭৯-৮০।

১৮২. বাংলাদেশের পক্ষে প্রথমে কমিটিতে ১১ জন সভ্য ছিলেন. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯।

১৮৩. বদরুদ্দীন উমর, ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন, ঢাকা-১৯৮৭, পৃ.-৯৮।

১৮৪. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ,, প্রাগুক্ত, পৃ.-৫২।

www.pathagar.com

সভায় তিনি জ্বালাময়ী বক্তৃতা করেন। অসহযোগের নিদর্শনস্বরূপ তিনি বিলেতি পণ্য বর্জন করে দেশীয় পণ্য ব্যবহারের পরামর্শ দেন। এজন্য তিনি স্বদেশী খিলাফত স্টোর্স লিঃ[১৮৫] নামক একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তিনি ছিলেন এ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম পরিচালক। এদিকে, জালিয়ানওয়ালাবাগের[১৮৬] পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড সারা ভারতের হিন্দু-মুসলমানকে ক্ষিপ্ত করে তোলে।[১৮৭] এর পরে খিলাফত কংগ্রেসী আন্দোলন ভারতীয় হিন্দু মুসলমানদের মিলিত মুক্তিআন্দোলনে রূপ নেয়। মাওলানা আবুল কালাম *আজাদ* ব্রিটিশ সরকারের সাথে তরকে মু'যামেলাত বা অসহযোগিতা করার প্রস্তাব ঘোষণা করেন। মহাত্মা গান্ধী মাওলানা আজাদের এই প্রস্তাবে সায় দিয়ে বিবৃতি দেন। ব্রিটিশ সরকারকে বাগে আনতে হলে ভারতবাসীর এই প্রস্তাব কার্যকর করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।[১৮৮] খিলাফত আন্দোলনে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মহাত্মা গান্ধী ২৩ কোটি ভারতীয় হিন্দুর প্রতি আহবান জানান। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে দেশে হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হয়। ১৯২১ সালের শেষের দিকে খিলাফত ও কংগ্রেসের মাওলানা আবুল কালাম *আজাদ*, চিত্তরঞ্জন দাশ, মাওলানা আকরম খাঁ, পীর বাদশা মিঞা, মাওলানা আহমদ আলি, ওয়াজেদ আলি খান পন্নী, সুভাষচন্দ্র বসু, জে এম সেনগুপ্ত, প্রফেসর জে, এল ব্যানার্জী, বি, এল, শামসুল, সৈয়দ জালালুদ্দীন হাশেমী, কিরণ শংকর রায় প্রমুখ দেশবরেণ্য নেতাকে অন্তরীণ করা হয়।[১৮৯] অসহযোগ আন্দোলনকে জোরদার করার উদ্দেশ্যে মাওলানা দৈনিক সেবক পত্রিকা বের করেন। কিন্তু একটি উত্তেজনাকর প্রবন্ধ লেখার কারণে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় এবং পত্রিকার জামানত তলব করা হয়। *সেই সময় দৈনিক মোহাম্মদী* ছাড়াও উর্দু *দৈনিক যমানা* প্রকাশিত হতো। ১৯২২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি যুক্ত প্রদেশের চৌরিচৌরার[১৯০] পুলিশ স্টেশনে এক মর্মান্তিক ঘটনায় কয়েকজন পুলিশ অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যাওয়ায় মহাত্মা

---

১৮৫. স্বদেশী খিলাফত স্টোর্সের অন্যান্য পরিচালক- মিঞা মোহাম্মদ, হাজী জান মোহাম্মদ, ছোটনী সওদাগর, সভাপতি সেন্ট্রাল খিলাফত কমিটি বোম্বাই, মাওলানা শওকত আলী সেক্রেটারি, সেন্ট্রাল খিলাফত কমিটি বোম্বাই, ওয়াজেদ আলী খান পন্নী, জমিদার করটিয়া, ময়মনসিংহ, সিদ্দিক আহমদ চৌধুরী, সওদাগর, মোহাম্মদ ইউশা খাঁ, সওদাগর, জিতেন্দ্রলাল ব্যানার্জি উকিল, মোঃ নুরুল হক চৌঃ উকিল, মাওঃ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী একস্ অফিসিও।
আল এছলাম (মাসিক), কোলকাতা, কার্তিক, ১৩২৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪০০।
আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা ও মুসলিম সমাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।

১৮৬. জালিয়ানওয়ালাবাগ, পূর্ব পাঞ্জাবের অমৃতসর শহরের মধ্যস্থিত একটি প্রাচীরবেষ্টিত বাগান। ব্রিটিশ ভারতের বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ড কুখ্যাত রাউলাট আইন বিধিবদ্ধ করলে এর প্রতিবাদে ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল প্রায় ২৫ হাজার মতান্তরে ১০ হাজার লোক অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে একত্রিত হয়।

১৮৭. আবুল কালাম শামসুদ্দীন, অতীত দিনের স্মৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ.-৫১।

১৮৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।

১৮৯. রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, প্রাগুক্ত, পৃ.-৫৩-৫৪।

১৯০. ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যুক্ত প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার চৌরীচৌরা থানার অধিবাসীরা পুলিশের অত্যাচারে অতিষ্ঠ ও উত্তেজিত হয়ে থানা আক্রমণ করে থানা জ্বালিয়ে দেয়। এ ঘটনায় ২১ জন কনস্টেবলসহ থানার দারোগা অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।
মোঃ ওয়ালী উল্লাহ, আমাদের মুক্তি সংগ্রাম, ঢাকা- ১৯৭৮, পৃ. ২৫।

www.pathagar.com

গান্ধী বিচলিত হয়ে ১১ ফেব্রুয়ারি অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করে দেন।[১৯১] এর কয়েক মাসের মধ্যেই খিলাফত আন্দোলনও নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

খিলাফত আন্দোলন মাওলানা আকরম খাঁ'র জীবনে নবচেতনার উন্মেষ ঘটায়। তিনি এ আন্দোলনকে জোরদার করার উদ্দেশ্যে সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেন এবং তাঁর সহকর্মী আলি ভ্রাতৃদ্বয়কে সাথে নিয়ে সমগ্র ভারত সফর করেন। এ সময় তিনি বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটি, নিখিল ভারত খিলাফত কমিটি, নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের নেতৃস্থানীয় কর্মীরূপে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯১১-১৯১৩ সালে ত্রিপলী ও বলকান যুদ্ধের সময় তিনি মোহাম্মদী পত্রিকায় তুরস্কের স্বার্থে লেখনী ধারণ করেন। এর মাধ্যমে তাঁর মধ্যে প্যান ইসলামি[১৯২] ধারণা জন্মে। এই প্যান-ইসলামি মনোভাবের দ্বারাই পরবর্তী সময়ে খিলাফত আন্দোলনে তিনি এর সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন। এর মুখপত্র আল-এসলাম' পত্রিকা ১৯১৫ সালে মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামবাদীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। আকরম খাঁ এর প্রকাশক ও যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। খিলাফত আন্দোলনে আঞ্জুমানের মুখপত্র আল-এসলাম'-এর নির্ভীক ভূমিকা প্রশংসনীয়। খিলাফত রক্ষার আন্দোলনই যে তখন একমাত্র প্রয়োজন তা ব্যক্ত করে আল-এসলামে বলা হয় :

> খেলাফতের ব্যাপারে আঞ্জুমানের সমস্ত শক্তি ব্যয়িত হইতেছে বলিয়া আঞ্জুমানের পূর্বালম্বিত প্রচারাদি কার্য এক প্রকার চাপা পড়িয়া রহিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ধর্ম রক্ষাই যখন প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য তখন ধর্মের ভিত্তিস্বরূপ খেলাফত রক্ষা করাই বর্তমান প্রচারের প্রধান অংশ হওয়া বাঞ্ছনীয়।[১৯৩]

ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধকালীন ওয়াদা ভঙ্গ করার জন্য বিশ্বাসঘাতক আখ্যায়িত করে আল-এসলাম'-এর 'খিলাফত' শীর্ষক প্রবন্ধে বলা হয় :

> ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দের ৫ জানুয়ারি তারিখে ব্রিটিশ রাজ্যের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ ঘোষণা করিয়াছেন, এশিয়া মাইনরের শস্য শ্যামল ভূ-ভাগ, থ্রেস ও কনস্টান্টিনোপল তুর্কিদের নিকট হইতে কিছুতেই ছিনাইয়া লওয়া *হইবে না*। মোছলমানগণ স্বীয় রাজা এবং রাজ মন্ত্রীগণের ঈদৃশ ঘোষণা তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বাস করিয়া এই যুদ্ধে এছলাম জগতের খলিফা তুরস্ক সুলতানের রাজ্য ও তাঁহার ক্ষমতা প্রতিপত্তি বিশেষত পবিত্র স্থানসমূহের কোনো

---

১৯১. গান্ধীজী দেশবাসীকে যে অহিংস অসহযোগ মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন তার সাথে এই হিংস্র ব্যাপারটা সুসামঞ্জস্য নয়, আন্দোলন চালিয়ে নেয়ার পক্ষে এটাই ছিল কৈফিয়ৎ।
অতীত দিনের স্মৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০।

১৯২. অর্থাৎ, ইসলামি আন্তর্জাতিকতাবাদ। এ মতবাদের জন্মদাতা সৈয়দ জামাল উদ্দীন আফগানি (১৮৩৯-১৮৯৭)। তাঁর বিশ্বাস ছিলো, সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে এক খলিফার নেতৃত্বে আনা গেলে ইউরোপীয় জাতিগুলোর প্রভাব চিরতরে বিলুপ্ত হবে। এ বিশ্বাসে তিনি মক্কায় উম্মুল-কুরা' নামে প্রথমে একটি প্যান-ইসলামিক সমিতি গঠন করেন। বর্তমানে পাকিস্তান সরকারের চেষ্টায় যে মুতামারে আলমে ইসলামি বা নিখিল মুসলিম জাহান সম্মেলন গড়ে উঠেছে, এর বীজমন্ত্র আফগানীরই শিক্ষা। এর প্রথম অধিবেশন আফগানীর ওফাতের এক বছর পর ১৮৯৮ সালে অনুষ্ঠিত হয়।
মুসলিম মনীষা, পৃ. ১৭৮-১৮১।
বাংলা বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২২।

১৯৩. আল-এসলাম, পৌষ, ১৯২৭, পৃ. ৫১০।

www.pathagar.com

> প্রকার ক্ষতি হইবে না। এই বিশ্বাসের বশীভূত হইয়া ইংরেজদিগকে ধনেজনে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করে- রাশি রাশি অর্থ চাঁদা ও দান স্বরূপ রাজহস্তে দান করে মোছলমান সামন্তরাজগণ কোটি কোটি টাকা ও হাজার হাজার সৈন্য যোগাইতে কুণ্ঠিত হন নাই।...... তুরস্ক রাজ্য ধ্বংস করা, তুরস্কের বিশাল সাম্রাজ্য বেমালুম হজম করিয়া বসা খলীফার রাজধানী, রাজধানীর সংলগ্ন ভূ-ভাগ, রাজধানী রক্ষার অবলম্বন প্রণালী ও সমুদ্রপথসমূহ দখল করিয়া নেওয়া, জাজিরাতুল আরবের পবিত্র স্থানসমূহ মিত্রশক্তির দখলে লইয়া যাওয়া, ইহা ব্রিটিশ তথা মিত্রশক্তিগণের আদৌ অভিপ্রেত নহে।..... আমরা এখন দেখিতেছি বিশাল মিছর ও সুদান রাজ্য ইংরেজগণ সম্পূর্ণরূপে দখল করিয়া বসিয়াছেন। কায়রো রাজধানী মোছলমানগণের অতীত পবিত্র স্থান তাহা ইংরেজদের কাছে আয়ত্তাধীন।...... পবিত্র স্থানসমূহ এবং আরব রাজ্য খলিফার হাতছাড়া হইলে খলিফার পদমর্যাদা থাকে না। খলিফার পদমর্যাদা না থাকিলে তিনি খলিফারূপে থাকিতে পারেন না। খলিফা না থাকিলে, এমাম নির্দিষ্ট না থাকিলে মোছলমানের মোছলমানী থাকে না। এছলাম কায়েম থাকে না, জুমআ জামআৎ, ঈদ ও হজ্ব ইত্যাদি খলিফা বা তাহার প্রতিনিধির উপস্থিতি বা অনুমতির প্রয়োজন। তদ্ব্যতীত সে সকল ধর্ম-কর্ম কিছুই থাকিতে পারে না। অতএব এছলাম রক্ষা করিতে হইলে, মোছলমান নামে অভিহিত হইতে হইলে, শেষ প্রেরিত মহাপুরুষ হযরত মোহাম্মদের উম্মতের মধ্যে গণ্য হইয়া থাকিতে হইলে খলিফাকে রক্ষা করা, খলিফার রাজ্য, তাহার ক্ষমতা ও পদমর্যাদা রক্ষা করা প্রত্যেক মুছলমানের ফরজ।[১৯৪]

শুধু মুসলমানই নয়, হিন্দু জনসাধারণ ও সর্বভারতীয় খিলাফত কমিটি এবং কংগ্রেসকে যৌথভাবে সরকারের সাথে অসহযোগিতার আহবান জানালে খিলাফত ও অসহযোগিতা আন্দোলন বেগবান হয়। শেখ আবদুল গফুর জালালী এ প্রসঙ্গে বলেন:

> আজ খেলাফতের বেদনায় মোছলমানের হৃদয় দীর্ণ ব্যথিত, সে ব্যথার ভাগ যে আমাদের হিন্দু ভাইরাও না লইয়াছে এমন বলিতে পারি না, স্বদেশবাসী মোছলমান ভাইদের ব্যথায় ব্যথিত হইয়া যাহারা পুরুষানুক্রমিক জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করিতে পারে তাহাদিগকে কেমন করিয়া বলিব যে, মোছলমানের ব্যথার ভাগ তাহারা লয় নাই।[১৯৫]

খিলাফতের অন্যতম নেতা মাওলানা মনিরুজ্জমান ব্রিটিশ সরকারের সাথে অসহযোগিতা সম্পর্কে বলেন :

> ইংরেজ বিদেশী গবর্নমেন্ট তাহারা মুষ্টিমেয় লোক তাহাদিগকে এই দেশীয় লোকের সাহায্যেই রাজ্য শাসন করিতে হয়। এদেশের লোকেরা যদি কোনো প্রকার গবর্নমেন্টের সাহায্য ও সহযোগিতা না করে, অফিস আদালতে কেহ কাজকর্ম না করে, পুলিশ বা ফৌজ বিভাগের লোকেরা যদি পদত্যাগ করে, খানসামা আর্দালীরা যদি সাহেবদের আহার বিহারে সহায়তা না করে, কুলী, মজুর ও গাড়ী মটর এবং ট্যাকসির চালকগণ যদি তাহাদের কাজ করিতে অস্বীকার করে,

---

১৯৪. এছলামাবাদী, 'খেলাফত', প্রাগুক্ত, বৈশাখ ১৩২৭, পৃ. ৩৫-৩৬।
১৯৫. খেলাফত ও ভারতবাসী, আল-এসলাম, মাঘ, ১৩২৭ সন, পৃ. ২৭১-৭৩।

www.pathagar.com

ভারতবাসী যদি বিদেশী পণ্য ও বিলাতি মাল ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেয়, প্রজাসাধারণ যদি কর দেওয়া বন্ধ করে, তাহা হইলে কি বিদেশী গবর্নমেন্টের পক্ষে এই দূরদেশে অবস্থান ও শাসনদণ্ড পরিচালন সম্ভব হইতে পারে? যদি না হয় তাহা হইলে ভারতবাসী খেলাফৎ ও স্বরাজ সম্বন্ধে যাহা চাহিবে তা তাহারা অবাধে পাইতে পারিবে।[১৯৬]

আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা ব্রিটিশ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন ও তার সাহায্যপুষ্ট শিক্ষায়তনসমূহ এবং সরকারি আদালত ফৌজদারি ইত্যাদি বর্জনের সাথে সাথে বিকল্প হিসেবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, সালিশি আদালত, জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উপর জোর দেয়। এ সময় আঞ্জুমানের নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ও মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর নেতৃত্বে চট্টগ্রামে প্রস্তাবিত জাতীয় আরবি বিশ্ববিদ্যালয়'[১৯৭] বাস্তবায়নে এগিয়ে আসেন।

আঞ্জুমানের সেক্রেটারি মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ও সহ-সেক্রেটারি ইসলামাবাদী খিলাফত আন্দোলন জোরদার করার জন্য ঢাকা, চট্টগ্রামে বহু সভা-সমিতি করেছেন। তাঁদের আহবানেই বঙ্গদেশে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন আন্দোলন সৃষ্টি হয়। আকরম খাঁ'র বলিষ্ঠ নেতৃত্বদানের ফলেই খিলাফত-কংগ্রেস কমিটির সহযোগিতায় খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন বাংলার সকল সম্প্রদায়কে বিশেষ করে মুসলিম জনসাধারণকে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে অন্যতম ভূমিকা পালন করেছিল।

১৯২৩ সালের জানুয়ারিতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ স্বরাজ দল গঠন করেন। ড. আনসারী, হাকীম আজমল খাঁ, বিঠল ভাই প্যাটেল, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, মাওলানা মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখের সাথে মাওলানা আকরম খাঁ দেশবন্ধুকে সমর্থন করেন।[১৯৮] ১৯২৩ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, আকরম খাঁসহ ঐতিহাসিক 'বেঙ্গল প্যাক্ট' (হিন্দু মুসলিম) চুক্তিনামা রচনা করেন।[১৯৯] এই প্যাক্টে ব্যবস্থা করা হয় যে, সরকারি চাকরিতে মুসলমানরা জনসংখ্যানুপাতে চাকরি পাবে এবং যতদিন ঐ সংখ্যানুপাতে (তৎকালে ৫৪%) না পৌঁছবে ততদিন নতুন নিয়োগের শতকরা ৮০টি মুসলমানদের দেওয়া হবে। চুক্তি অনেকটা কাগজে-কলমেই থেকে

---

১৯৬. এছলামাবাদী, 'অসহযোগিতা ও আমাদের কর্তব্য; আল-এসলাম, মাঘ, ১৩২৭, পৃ. ৫১৩-৫১৬।

১৯৭. ১৯১৫ সালে আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা'র নেতৃবৃন্দ আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯২০ সালে চট্টগ্রামে পটিয়া থানার অন্তর্গত সমুদ্র তীরবর্তী দেয়াং পাহাড়ে ৬ শত বিঘা জমি সংগ্রহ করেন। সেখানে আরবি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা নেন। প্রাথমিকভাবে ১০ লক্ষ টাকার তহবিল গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ১৯৩৫ সালে এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। অবশ্য তখন এর নামকরণ 'মাওলানা শওকত আলী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়' করা হয়। মিশরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক এর কর্মকাণ্ডে শরিক হন, তবে পরবর্তী সময়ে এই পরিকল্পনাটি আর স্থায়ী হয় নি এবং বাস্তবতার মুখ দেখে নি।
ড. সুনীল কান্তি দে, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬।

১৯৮. আবুল মনসুর আহমদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ১৯৯৫ সাল, পৃ. ৩৩।

১৯৯. এই চুক্তিনামায় আরও ছিলেন-স্যার আবদুর রহীম, মৌলভী আবদুল করিম, মৌলভী মুজিবুর রহমান, মাওলানা মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী এবং হিন্দু নেতৃবৃন্দের মধ্যে মিঃ জি, এম, সেন গুপ্ত, মি. শরৎচন্দ্র বসু, মি. জে. এম. দাস গুপ্ত ও ডা. বিধান চন্দ্র রায়।
প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।

www.pathagar.com

যায়। এখানে ১৭৬৩-১৯৪০ সাল পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমানের চাকরির আনুপাতিক হারের একটি সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হলো :

ঢাকা নিয়াবত-১৭৬৩[২০০]

জমিদার	সংখ্যা	হার
মুসলমান	৪৬	৪০%
হিন্দু	৬৮	৬০%

১৭৭৪ সালে চট্টগ্রামের (২৫ জন) জমিদার (ধর্মভিত্তিক)[২০১]

সম্প্রদায়	জমিদারির সংখ্যা
হিন্দু	১৭
মুসলমান	৭
ইউরোপীয়	১
মোট	২৫

হিন্দু জমিদারদের উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রে মুর্শিদ কুলী খানের অবদান ছিল। তিনি হিন্দুদের মধ্য থেকেই বেশিরভাগ নতুন জমিদার, ইজারাদার নিযুক্ত করতেন।

মুর্শিদকুলীর শাসনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল প্রশাসনিক উচ্চপদে অধিক হারে হিন্দুদের নিয়োগ। কয়েকটি উচ্চপদ ছাড়া রাজস্ব বিভাগের সমুদয় পদ হিন্দুদেরই দখলে ছিল।

যদুনাথ সরকার এ সম্পর্কে বলেন :

> "Murshid Quli Khan employed none but Bengali Hindus in the collection of revenues because they were most easily compelled by punishment to discover their malpractices and nothing was to be apprehanded from their pusimillanimity."[২০২]

ড. আবদুল করিমের অভিমত, যদিও উচ্চপদসমূহে মুর্শিদ কুলী খানের আত্মীয়স্বজনরা নিযুক্ত ছিলেন, তবুও রাজস্ব বিভাগে প্রচুর সংখ্যক হিন্দু অফিসার চাকুরিরত ছিলেন। লাহোরীমল, মৃত্যুঞ্জয়, রঘুনাথ প্রমুখ রাজস্ব বিভাগে উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। কানুনগোরা সবাই ছিলেন হিন্দু। সুতরাং ইংরেজ কর্তৃক বাংলার শাসনক্ষমতা গ্রহণের পূর্বে জমিদারি ও রাজস্ব বিভাগের চাকরিতে পুরাপুরিভাবে হিন্দু প্রাধান্য ছিল। তবে সামরিক বিভাগের চাকরি ও বেসামরিক উচ্চপদে মুসলমানদের প্রাধান্য ছিল। বেসামরিক শাসনব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বিচার বিভাগের চাকরিতে মুসলমানদের একাধিপত্য ছিল লক্ষণীয়। কিন্তু রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ফলে মুসলমানদের অবস্থার অবনতি ঘটে।

২০০. ইমরান হোসেন, বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবী, চিন্তা ও কর্ম, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ. ২২।
২০১. এইচ. জে. এস. কটন, রেভিনিউ হিস্ট্রি অব চিটাগাং, ১৮৮০, পৃ. ২৩।
২০২. Jadu Nath Sarkar, History of Bengal, Vol. 12, Dacca, 1972, p. 409.

www.pathagar.com

'বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবী : চিন্তা ও কর্ম' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে :

> The position of the Muslims suddenly and rapidly deteriorated. Amils disappeared as administrator, the Muslim Soldiery faced unemployment when sepoys replaced them. The code of Islam actually ceased to be criminal law of the country.[২০৩]

সামরিক বাহিনীতে মুসলমানদের বিপর্যয় শুরু হয় পলাশীর পর থেকেই। মীরজাফর যে ৮০০০ সৈন্য বরখাস্ত করেছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই মুসলিম। ১৭২৪ সালে মুর্শিদাবাদ কোর্টে সভাসদ ও আমলাদের মধ্যেও মুসলিম একাধিপত্য দেখা যায়।

১৭২৪ সালে মুর্শিদাবাদ কোর্টে সভাসদ ও আমলা[২০৪]

মুসলমান	২১ জন
হিন্দু	৩ জন
মোট	২৪ জন

কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকে অবস্থা পাল্টাতে থাকে। যেমন-
১৭৭৩ সালে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা[২০৫]

ইংরেজ	১৭ জন
হিন্দু	২৬ জন
মুসলিম	২৪ জন
মোট	৬৭ জন

১৮৭৬ সালে ৭৩৪ জন উচ্চপদস্থ ও নিম্নপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৪৪ জন বা ৫.৯%। আঠার শতকে উকিলদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন মুসলিম, কিন্তু কর্নওয়ালিসের সংস্কারের ফলে তাদের সংখ্যা ২৫ শতাংশে নেমে আসে। ১৮৫৮ সালে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার বিচার বিভাগের চাকরিতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের অবস্থা ছিল নিম্নরূপ[২০৬] :

	হিন্দু	মুসলমান	অন্যান্য
প্রিন্সিপল সদর আমিন	৯৩	১২	৮
সদর আমিন	১৫	৯	২
মুনসিফ	১১২	৮২	৭৭
মোট	১৪০	১০৩	১৭

২০৩. ইমরান হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।
২০৪. প্রাগুক্ত।
২০৫. প্রাগুক্ত।
২০৬. থেকার্স নিউ ক্যালকাটা ডাইরেক্টরি, ১৮৫৮।

www.pathagar.com

১৮৮৭ সালে বিচার বিভাগের নিম্নপদে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৩.১৮ শতাংশ। নিজামত আমলে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের মধ্যে আবার স্থানীয় মুসলমানদের উপস্থিতি ছিল নগণ্য। এর কারণ দেশজ মুসলমানদের অধিকাংশ ছিল নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের থেকে ধর্মান্তরিত, যাঁদের উচ্চ পদে নিযুক্তি পাবার যোগ্যতা ছিল না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার দেখা যায়, মুসলমানরাও মুসলমানদের চেয়ে চাকরিতে হিন্দুদের বেশি পছন্দ করতেন। উদাহরণস্বরূপ, ১৯১১ সালের সেন্সাসে দেখা যায়, পূর্ব বাংলায় ছোট-বড় ৫৪০০০ মুসলমান ভূস্বামী ছিলেন অথচ তাঁদের অধীনে মাত্র ৭৫০০ মুসলমান কর্মচারী কর্মরত ছিলেন। ১৮৬৩-৬৪ সালে জমিদারের নায়েবদের মধ্যে মাত্র ১০ শতাংশ ছিলেন মুসলমান। তখনকার দিনে বেসামরিক চাকরির সিংহভাগ ছিল রাজস্ব বিভাগের চাকরি এবং এতে মুসলমানদের অবস্থা ছিল হতাশাজনক। ব্রিটিশ আমলে চাকরির ক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রতিকূল অবস্থার জন্য ১৮৩৭ সালে সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজি ও স্থানীয় ভাষা প্রবর্তন অনেকাংশে দায়ী ছিল। এর পর থেকে সরকার অনুসৃত বিভিন্ন নীতি ও গৃহীত পদক্ষেপ মুসলমানদের সরকারি চাকরি লাভে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

নিম্নের উদ্ধৃতির মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট হবে :

> In 1837 the government of Bengal decided to conduct its business either in English or in local vernacular. In 1844 the Council of Education began examining candidates for official employment. From 1859 a quarter of the posts of deputy magistrate and deputy collector in the lower provinces were reserved for those who know English. In 1863 it was ruled that half of the posts as munsifs, darogas and pleaders would be reserved for those who had passed University entrance or higher examinations. In 1864 the highcourt ruled that all law examinations would henceforth be in English, in 1866 it was laid down that only Bachelors of law would be eligible to become munsifs.[২০৭]

উনিশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত সরকারি চাকরিতে মুসলিম সমাজের দুরবস্থার কথা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। আধুনিক শিক্ষায় এগিয়ে থাকার ফলে হিন্দু সমাজ এই ক্ষেত্রে মুসলমানদের তুলনায় অত্যন্ত সুবিধাজনক অবস্থায় ছিলেন। চাকরি ছাড়াও প্রায় প্রতিটি পেশায় মুসলমানদের অবস্থা ছিল নৈরাশ্যজনক। মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষা বিস্তার শুরু হবার ফলে মুসলমানদের মধ্য থেকে কিছু কিছু লোক উনিশ শতকের শেষ দিকে চাকরিতে প্রবেশ করেন। তাঁরা চাকরি অর্জনের ক্ষেত্রে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণির কাছ থেকে প্রবল প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হন। মুসলমানদের জন্য এটা ছিল অসম প্রতিযোগিতা। এ জন্যই তাঁরা 'বিশেষ' সুবিধা ও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার প্রত্যাশী ছিলেন। সরকারি চাকরিতে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির সরকারি নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও আমলাদের অসহযোগিতা ও সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থতার ফলে তা বাস্তবায়িত হয় নি।

---

২০৭. ইমরান হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।

www.pathagar.com

সরকারি চাকরিতে ১৯০১ সালে বাংলায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অবস্থা[২০৮]

মোট পদ	মুসলিম	বৈদ্য	কায়স্থ	ব্রাহ্মণ	খ্রিষ্টান
২০৫১	১৪১	১৭২	৫০১	৪৩১	৮০৬

দেখা যায় যে, ১৯০১ সালে সরকারি উচ্চপদসমূহে মুসলমানদের সংখ্যা হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যান্য শ্রেণির চেয়েও কম। এই সময়ে হাই কোর্টের ১৬ জন জজের ১ জন, ডেপুটি ও সাব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদের ৯৩ জনের মধ্যে ৬৭ জন, সাব-জজ ও মুন্সেফ ৩৮৭ জনের মধ্যে ২০ জন, ৬৩ পুলিশ ইন্সপেক্টরের মধ্যে ৪ জন, ৯৯ জন ডিস্ট্রিক্ট ও সহকারি পুলিশ সুপারের মধ্যে ২ জন, ৩৭০ জন পূর্ত ও মেডিক্যাল অফিসারের মধ্যে শূন্য জন। বঙ্গভঙ্গ পরবর্তীকালে সরকারি চাকরিতে মুসলমানদের কিছুটা অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। পূর্ববঙ্গের কমিশনার অফিসের ২৯৮২টি পদের মধ্যে ১৯০৭ সালে ৪৩৭টি (১৪.৭%) পদ মুসলমানদের দখলে ছিল। ১৯১০ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৩১৩৫টি পদের মধ্যে ৫৫৮টি (১৭.৮%)। জনসংখ্যার অনুপাতে মুসলমান চাকরিজীবীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে না বাড়লেও এই সময় মোটামুটিভাবে উন্নতি লক্ষ্য করা যায়।[২০৯]

১৯১৩ সালে প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগের চাকরিতে বিভিন্ন প্রদেশে হিন্দু ও মুসলমানদের অবস্থা[২১০]

	হিন্দু		মুসলিম	
প্রদেশ	মোট জনসংখ্যার (%)	প্রাপ্ত পদের (%) সব পদের মধ্যে	মোট জনসংখ্যার (%)	প্রাপ্ত পদের (%) সব পদেও মধ্যে
বাংলা	৪৪.৮০	৮৪.৭	৫২.৭৪	১০.৬
বিহার ও উড়িষ্যা	৮২.২৪	৬০.২	১০.৬৩	২২.৭
ইউ পি, আগ্রা ও অযোধ্যা	৮৫.৩২	৬০.১	১৪.১১	৩৪.৭

উপরের সারণিতে দেখা যায় যে, বাংলায় জনসংখ্যার তুলনায় মুসলমানদের চাকরির হার কম। অন্যদিকে, বাকি দুই প্রদেশে সরকারি চাকরিতে মুসলমানদের অবস্থা জনসংখ্যার তুলনায় কিছুটা ভাল। বাঙালি মুসলমানরা যে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমানদের চেয়ে পশ্চাৎপদ ছিল, এই তথ্যে তারই প্রমাণ পাওয়া যায়। অবশ্য, উচ্চশিক্ষায় বাঙালি মুসলমানদের পশ্চাদপদতাকে চাকরির ক্ষেত্রে তাদের এই প্রতিকূল অবস্থার জন্য অনেকটা দায়ী করা যায়।

কলেজ শিক্ষকদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা : ১৯১৭[২১১]

২০৮. Census of India, Vol. VI, p. 506.
২০৯. ইমরান হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।
২১০. Royal Commission on the Public Service of India, Vol. I, 1913, p. 191.

www.pathagar.com

	হিন্দুদের মূল ভাষা : সম্প্রদায় সংস্কৃত, পালি ও বাংলা	মুসলমানদের মূল ভাষা : আরবি, ফারসি	অন্যান্য বিষয়
হিন্দু	১৩৭	-	৯১২
মুসলিম	-	৩৩	৩৭
খ্রিষ্টান	-	-	১১৬
সর্বমোট	১৩৭	৩৩	১০৬৫

ঃপরের সারণীতে দেখা যায় যে, মুসলমানরা তখনো চাকরিতে হিন্দুদের তুলনায় পিছিয়ে ছিলেন। তবে এটাও ঠিক যে, ১৯১১-১২ সালে পূর্ববঙ্গে যেখানে মাত্র ১৫ জন াত্র বি. এ. ও বি. এসসি. পাস করেছিলেন, সে স্থলে মাত্র পাঁচ বছরের ব্যবধানে লেজ শিক্ষকতায় ৭০ জনের নিয়োগ নিঃসন্দেহে শিক্ষা ও চাকরিতে মুসলিম সমাজের কছুটা উন্নতির ইতিবাচকতার সূচক। শুধু তা-ই নয়, ১৯২২ সাল থেকে ১৯৪৬-৪৭ াল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকগণের মধ্যে ৫০% ছিলেন সেলমান। বিশ শতকের বিশের দশকে সরকারি চাকরিতেও মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি রিলক্ষিত হয়।

প্রাদেশিক একজিকিউটিভ ও জুডিশিয়াল সার্ভিসে মুসলমানদের সংখ্যা : ১৯১৩-২৪ (শতকরা হারে)[১২]

সন	১৯১৩		১৯২৪	
(%)	হিন্দু (%)	মুসলিম (%)	হিন্দু (%)	মুসলিম
একজিকিউটিভ	৭২.৯	১৮.১	৭৫	২৫
জুডিশিয়াল	৯৫.৫	২.৫	৯৪	৬

বিভিন্ন নিম্নপদস্থ সরকারি কর্মচারির মধ্যে মুসলিম সংখ্যা[১৩]

বিভাগ	শতকরা হিন্দু সংখ্যা	শতকরা মুসলিম সংখ্যা
আবগারি	৬৩	৩৭
শিক্ষা	৭০	৩০
পশুচিকিৎসা	৮৯	১১
কৃষি	৯৪	৬
চিকিৎসা	৯৭.৫	২.৫
পূর্ত	৯৮.৫	১.৫
বন	১০০	০০

১১. Calcutta University Commission, Chapter VI, p. 165.
১২. রয়েল কমিশন অন পাবলিক সার্ভিস ইন ইন্ডিয়া, পৃ. ৫২৪।
ইসলাম দর্শন, আশ্বিন, ১৩৩১, পৃ. ৮৮।
১৩. ইসলাম দর্শন, আশ্বিন, ১৩৩১।

www.pathagar.com

১৯৩৬-৩৯-৪১ সালে বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের অফিসারদের পদমর্যাদা তালিকা। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংখ্যা নিম্নরূপ[২১৪] :

১৯৩৬			১৯৩৯			১৯৪১		
মোট	মুসলমান	হিন্দু	মোট	মুসলমান	হিন্দু	মোট	হিন্দু	মুসলমান
১৭১	৮	৫৬	১৭৯	৭৩	১৮	১৮২	৭০	২১

বিবিধ চাকরি[২১৫]

১৯৩৬			১৯৩৯			১৯৪১		
মোট	মুসলমান	হিন্দু	মোট	মুসলমান	হিন্দু	মোট	হিন্দু	মুসলমান
৪৭	১৮	২	৫৩	২৫	৪	২৯	-	৮

উল্লেখ্য ১৯৩৮ সালে সরকারি চাকরিতে হিন্দু-মুসলমান সমতা বিধানের জন্য বঙ্গীয় আইন সভায় এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। এতে সরকারি পদের ৬০% মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত করার প্রস্তাব করা হয়।[২১৬] বিশ শতকের চল্লিশের দশকে এসে হিন্দু সম্প্রদায় অভিযোগ উত্থাপন করেন যে, সরকারি চাকরিতে নিযুক্তির ক্ষেত্রে সরকার মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করছে। এই সময় থেকে মুসলমানরা সরকারি চাকরিতে কিছুটা অধিক হারে নিযুক্ত হতে থাকেন। যদিও তখন পর্যন্ত হিন্দু-প্রাধান্য বহাল ছিল।

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে পি. এস. সি. দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্তদের সংখ্যা[২১৭]

	১৯৩৭-৩৮			১৯৩৮-৩৯		
পদ	হিন্দু	মুসলিম	অন্যান্য	হিন্দু	মুসলিম	অন্যান্য
ক্লার্কশিপ পরীক্ষা	৬৭	৩৬	-	৩৩	২৪	-
বিশেষ ক্লার্ক শিপ স্টেনোগ্রাফার্স্ পরীক্ষা বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা, ১৯৩৭	২২	১৯	১	-	-	-
ঐ, ১৯৩৮	-	-	-	৪০	৩৫	১
ঐ ১৯৩৯	(তখন পর্যন্ত নিয়োগপত্র প্রদান করা হয় নি)					
মোট	৮৯	৫৫	১	৭৩	৫৯	১

১৯৩৭-১৯৩৮ থেকে ১৯৩৮-৩৯ সালে নিয়োগপ্রাপ্ত বিভিন্ন বিভাগের মোট ৬৬ জন কর্মকর্তার মধ্যে ৩৩ জন হিন্দু, ২৮ জন মুসলিম ও ৫ জন অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক

২১৪. Combined Civil List for India and Burma, 1936, 1939, 1941, pp. 96-115.
২১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৭-৮, ৬৬১।
২১৬. Bengal Ministry and The Hindus of Bengal, Part-1, Calcutta, Feb. 1940, p,2.
২১৭. বেঙ্গল মিনিস্ট্রি এন্ড দি হিন্দুস অব বেঙ্গল, পৃ. ৩, তালিকা 'এ'।

www.pathagar.com

হলেন। এখানে দেখা যায় যে, মুসলমানরা অনেকটা হিন্দুদের কাছাকাছি চলে াসেছেন।

১৯৪০ সালে বিচার, প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তাদের বিভাগভিত্তিক ালিকা[২১৮]

বিভাগ	হিন্দু	মুসলিম	অন্যান্য
প্রেসিডেন্সি	৩১৮	১৮৩	১৬
বর্ধমান	৩৫১	১৪০	১৫
চট্টগ্রাম	১২৮	১২০	১৩
ঢাকা	৩২৬	২৩৩	২৬
রাজশাহী	২৯৬	২১৬	১৭
মোট	১৪১৯(৬৯.১৪%)	৮৯২(৩৭.২২)%	৮৭

সক্রেটারি ও বিভাগীয় প্রধানদের তালিকা : সম্প্রদায়ভিত্তিক[২১৯]

পদের নাম	হিন্দু	মুসলিম	অন্যান্য
সেক্রেটারি	২	১	৮
এডিশনাল সেক্রেটারি	-	-	১
জয়েন্ট সেক্রেটারি	-	১	২
ডেপুটি সেক্রেটারি	৪	-	২
আন্ডার সেক্রেটারি	-	১	২
অ্যাসিসটেন্ট সেক্রেটারি	৯	৮	-
স্পেশাল অফিসার	৩	২	১
অন্যান্য কর্মকর্তা	৩	৫	-
মোট	২১	১৮	১৬
বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধান	৮	৪	১৫
সর্বমোট	২৯	২২	৩১

। সময় শিক্ষা বিভাগের চাকরিতেও মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। বেঙ্গল সিনিয়র ।ডুকেশন সার্ভিস, জুনিয়র এডুকেশন সার্ভিস ও সাব-অর্ডিনেট এডুকেশন সার্ভিসের মাট ৪৩৬টি পদের মধ্যে ১৬৫ জন (৩৮%) মুসলমান ছিলেন।

বিভিন্ন জেলায় হিন্দু-মুসলিম চাকুরির হার : ১৯৪০[২২০]

জেলা	মুসলিম	হিন্দু
নোয়াখালী	৫৭.৬২	৪০.৬৭

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-১১।
১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।
২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪, তালিকা 'এফ'।

www.pathagar.com

চট্টগ্রাম	৩৮.৩৮	৫২.৬৩
পাবনা	৪৬.০৬	৫৩.৯৪
যশোর	৪৩.৪৮	৫৬.৫২
ঢাকা	৪৪.৮৭	৪৮.৭১
ফরিদপুর	৪৪.১২	৫৩.৯২
বর্ধমান	২৫.৮৪	৬৯.৬৬

নন গেজেটেড ও অন্যান্য পদে পুলিশ বিভাগে মুসলিম সংখ্যা বৃদ্ধির নমুনা। নিম্নে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সংখ্যা ও মোট সংখ্যায় তাদের শতকরা অংশ দেখানো হলো[২২১] :

	১৯৩৮			১৯৪৬		
পদের নাম	মোট পদ	হিন্দু	মুসলিম	মোট পদ	হিন্দু	মুসলিম
ইন্সপেক্টর	২৭৮	১৮১	৬৬	২৮৫	১৮৭	৬
	%	৬৫.১০	২৩.৮	%	৬৫.৬১	২৩.২
সাব-ইন্সপেক্টর	১৪৬৯	৮৪৬	৬০৫	১৪২৩	৭৮৬	৬০৫
	%	৫৮.৮১	৪১.২	%	৫৫.২৩	৪২.৫
অ্যাসিসটেন্ট সাব-ইন্সপেক্টর	১৫৯৮	১০০৪	৪৭৪	১৫৭০	১০৬৮	৪৭৮
	%	৬৪.৮১	৩০.৬	%	৬৮.০২	৩০.৫
কনস্টেবল	২০২১৮	১৩৫৬৬	৫৭২১	২০২৯৭	১২৫১৫	৬৩১৬
	%	৬৭.০৯	২৮.২১	%	৬১.৬৫	৩১.১

দেখা যাচ্ছে যে, উপরোক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে বিশ শতকের মধ্যেই মুসলিম সমাজে একটি পেশাজীবী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে ওঠে, বুদ্ধিজীবী শ্রেণি ছিল তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে এঁরাই ছিলেন প্রথম কাতারের রাজনৈতিক নেতা, সমাজসংস্কারক ও সমাজসেবী। মুসলিম মানসকে জড়তামুক্ত করে যুগোপযোগী করেছিলেন এঁরাই। মুসলিম সমাজে জাতীয়তাবোধ ও স্বাধীনতার স্পৃহা জাগানোর ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান ছিল অপরিসীম।

অতঃপর স্বরাজ দল এবং প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে *বেঙ্গল প্যাক্ট* পাস হওয়ায় রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ কোলকাতা শহরের অলিগলিতে প্যাক্টের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা করে। তারা প্রচারণা চালান, চিত্তরঞ্জন দাশ মুসলমানদের কাছে বাংলাদেশ বিক্রি করে দিয়েছেন। অবশ্য, তাদের এ সমস্ত অপপ্রচারের পরও ১৯২৪ সালে কোলকাতা

২২১. Report on the Police Administration of Bengal. 1938, p. 5 and 1941, p.4.।

www.pathagar.com

কর্পোরেশনের নির্বাচনে স্বরাজ দল অধিকাংশ আসনে বিজয়ী হয়। চিত্তরঞ্জন দাশ নিজে মেয়র, শহীদ সোহরাওয়ার্দী ডেপুটি মেয়র এবং মাওলানা আকরম খাঁ কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান (Alderman) নির্বাচিত হন।[২২২]

প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনে যেন বেঙ্গল প্যাক্ট পাস না হতে পারে, সে জন্য সাম্প্রদায়িক হিন্দুগণ সচেষ্ট হন। ১৯২৪ সালের জুন মাসে সিরাজগঞ্জে প্রাদেশিক কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা আকরম খাঁ এ সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হন। প্রায় পনের হাজার ডেলিগেট এবং অগণিত দর্শকের মধ্যে আকরম খাঁ'র সুলিখিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণ ও অন্যান্য বক্তাদের বক্তৃতায় হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের বাণী সজীবতা লাভ করে, যার ফলে সর্বসম্মতিক্রমে বেঙ্গল প্যাক্ট উক্ত অনুষ্ঠানে গৃহীত হয়।[২২৩]

প্রজা সমিতি

১৯২৯ সালে মাওলানা আকরম খাঁ'র নেতৃত্বে কংগ্রেস বর্জনকৃত নেতৃবৃন্দ 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি' গঠন করেন। স্যার আবদুর রহীম এই সমিতির সভাপতি ও মাওলানা আকরম খাঁ সেক্রেটারি মনোনীত হন। মৌ. মুজিবুর রহমান, মৌ. ফজলুল হক, ডাঃ আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী, খান বাহাদুর আবদুল মোমিন সি. আই. ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং মৌঃ শামসুদ্দীন আহমদ ও মৌ. তমিজ উদ্দীন খাঁ জয়েন্ট সেক্রেটারি নির্বাচিত হন। বাংলার সমস্ত হিন্দু নেতা জমিদারের পক্ষে কংগ্রেসে জমায়েত হন। মুসলিম নেতৃবৃন্দ প্রজা সমিতিতেও যোগ দেন। এ জন্য জে এন সেনগুপ্ত আফসোস করে বলেছিলেন:

> আজ হইতে কংগ্রেস শুধু মুসলিম বাংলার আস্থাই হারাইল না প্রজাসাধারণের আস্থাও হারাইল।[২২৪]

পরবর্তী পর্যায়ে মাওলানা আকরম খাঁ ও শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের সাথে মতানৈক্য ঘটলে প্রজা সমিতি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়।[২২৫] শেরে বাংলার নেতৃত্বাধীন অংশের নামকরণ করা হয়, নিখিল বঙ্গ কৃষক প্রজা পার্টি। মাওলানা আকরম খাঁ নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি রূপেই সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনার চেষ্টা অব্যাহত রাখেন।[২২৬] মুসলমানদের স্বার্থেই মাওলানা প্রজা সমিতি গঠন করেন। তিনি মনে করতেন, মুসলমানদের নিয়ে প্রজা আর প্রজাদের নিয়েই মুসলমান। মুসলমানদের শতকরা ৮০ জনই ছিলেন প্রজা, বাকি বিশ জন জমিদার, মহাজন সকলেই হিন্দু ছিলেন। তাই,

---

২২২. K. McPherson, The Muslim Microcosm, Calcutta. 1918,1935, P.-81.
উদ্ধৃতি, Bazlur Rahman Khan, Politics in Bangal, 1927,1936, Dhaka (1987) P.-17.

২২৩. আবুল মনসুর আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

২২৪. আবুল মনসুর আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ.-৪৫-৪৬।

২২৫. কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের নির্বাচনে প্রজা সমিতির প্রেসিডেন্ট স্যার আবদুর রহীম নির্বাচিত হলে প্রজা সমিতির সভাপতির পদ খালি হয়ে যায় আকরম খাঁ-সহ প্রবীণ নেতারা আবদুল মোমিন সি. আই. ইকে সমিতির প্রেসিডেন্ট করতে চাইলেন, কিন্তু আবুল মনসুর আহমদসহ তরুণ নেতারা ফজলুল হককে প্রেসিডেন্ট করার ইচ্ছা পোষণ করেন। এ অবস্থায় স্যার আবদুর রহিমের উপর সালিসের ভার দেয়া হয়। তিনি মোমিনের পক্ষে রায় দিলে তরুণ নেতারা মানলেন না। আবুল মনসুরের ভাষায়, "আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করলাম"।
আবুল মনসুর আহমদ ঃ প্রাগুক্ত, পৃ.-৭১-৭২।

২২৬. দৈনিক আজাদ, কোলকাতা, ৪ঠা মে, ১৯৩৭।

www.pathagar.com

প্রজার স্বার্থে রাজনীতি করা ছিল প্রকৃতপক্ষে মুসলিম স্বার্থের রাজনীতি। এর মাধ্যমে তিনি বাংলার রাজনীতিতে মুসলিম প্রাধান্য রক্ষায় বিশেষভাবে সচেষ্ট ছিলেন।

১৯৩৭ সালের আগস্ট মাসে বাজেট অধিবেশনের সময় মাওলানা আকরম খাঁ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাংলার কৃষক-প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশা উল্লেখ করে তাদের প্রয়োজনে বাজেট ব্যয় বরাদ্দ নির্ধারণের সুপারিশ করেন। ৯ আগস্ট বাজেট অধিবেশনে বক্তৃতাকালে তিনি বলেন:

> পিচঢালা পাকা রাস্তা বড় বড় এমারত প্রভৃতি জিনিসগুলি দরকারী, তার চাইতে খুব বেশি দরকারী মূর্খ ও মরণমুখী বাঙ্গালী সমাজের স্বাস্থ্য রক্ষা ও শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা। ... আমি এই বিষয়টির প্রতি মাননীয় অর্থ সচিব মহাশয়ের করুণ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।[২২৭]

১৯৩৬ সালের মাঝামাঝি ১৯৩৭ সালের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ নিখিল ভারত মুসলিম লীগ পুনর্গঠনে তৎপর হন। ১৯৩৭ সালের ২২ আগস্ট বঙ্গীয় মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে মাওলানা আকরম খাঁ-কে সভাপতি এবং সৈয়দ বদরোদ্দাজাকে[২২৮] সেক্রেটারি করে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হয়।[২২৯]

১৯৩৭ সালের ১৫ অক্টোবর লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে বাংলার প্রধানমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক আনুষ্ঠানিকভাবে মুসলিম লীগে যোগদান করেন। যোগদানের পর তাঁকে সভাপতি করে কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়। লক্ষণীয় যে, ইতোপূর্বে আকরম খাঁ ও ফজলুল হকের মধ্যে কিছুটা মতবিরোধ থাকলেও মুসলিম লীগে যোগদানের পর ফজলুল হককে আকরম খাঁ জোর সমর্থন করেন। প্রজা-লীগ কোয়ালিশন সরকারের অন্যতম শরীক দল হওয়া সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হকের যুব লীগে যোগদানের পূর্ব পর্যন্ত মাওলানা আকরম খাঁ হক মন্ত্রীসভার কার্যাবলীর মুসলমানদের স্বার্থে কঠোর সমালোচনা করতেন।

১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে কিছু দলত্যাগী মুসলমান সদস্য এবং কংগ্রেসের সহযোগিতায় ফজলুল হক মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগে বাধ্য করে কংগ্রেস মনোভাবাপন্ন মন্ত্রীসভা গঠনের চেষ্টা চালায়। এ জটিল অবস্থায় মাওলানা আকরম খাঁ মুসলমানদের বৃহত্তর স্বার্থে হক মন্ত্রীসভাকে মিলিয়ে রাখার জন্য *দৈনিক আজাদ* পত্রিকার মাধ্যমে জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঘোষণা করেন :

> বাংলার তিন কোটি মুসলমান বাঁচাইতে হইবে, কংগ্রেস রাজের অভিশাপ হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে–ইহাই আমাদের সংকল্প, ইহাই আমাদের সাধনা এবং বর্তমানে ইহাই আমাদের সংগ্রাম।[২৩০]

১৯৩৮ সালের ২৭ মার্চ নানা উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে হক মন্ত্রীত্ব দিবস পালিত হয়। মাওলানা আকরম খাঁ'র সভাপতিত্বে সেদিন কোলকাতায় মোহাম্মদ আলি পার্কে মুসলিম

---

২২৭. Bengal Legislative Council Debates V. 11 29th July, 16th August-1937, pp 181-82।
২২৮. ১৯৩৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর নবগঠিত অর্গানাইজিং কমিটিরও তিনি অন্যতম সদস্য ছিলেন। দৈনিক আজাদ, কোলকাতা, ২ জানুয়ারি, ১৯৩৮, পৃ. ৫।
২২৯. দৈনিক আজাদ, ২৪ আগস্ট, ১৯৩৭, পৃ. ৫।
২৩০. দৈনিক আজাদ, কোলকাতা, ২২ মার্চ, ১৯৩৮, পৃ. ৪।

www.pathagar.com

লীগ ও খিলাফত কমিটির উদ্যোগে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির ভাষণে তিনি কঠোর ভাষায় দলত্যাগীদের বিরুদ্ধে বক্তব্য পেশ করেন। অতঃপর ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসে বাজেট অধিবেশনে হক মন্ত্রীসভার অনাস্থা প্রস্তাবকে ব্যর্থ করে দেওয়া হয়। লক্ষণীয় যে, এক সময় প্রজা সমিতি নিয়ে আকরম খাঁ ও হক সাহেবের মধ্যে চরম মতবিরোধ ছিল। কিন্তু সে মতবিরোধ ব্যক্তিগত ছিল না; বরং তা ছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। মূলত তাঁর শত্রুতা ও বন্ধুত্ব সবই ছিল দেশ, জাতি ও মুসলিম সমাজকে কেন্দ্র করে। তিনি মুসলিম লীগকে মুসলিম জাতিসত্তার প্রাণস্বরূপ মনে করতেন। তিনি মুসলিম লীগকে একটি শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে দাঁড় করাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

১৯৩৯ সালে কোলকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের জেনারেল কমিটির প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে আকরম খাঁ ডেলিগেটদের উদ্দেশে ভাষণে বলেন :

> লীগের অর্থ যে যাহাই করুন, আমি মনে করি লীগের প্রকৃত অর্থ 'জমাত' এবং এই 'জমাত' জাতীয় জীবনের সকল দিক হইতে অপরিহার্য। জমাত ব্যতীত মুছলমান বাঁচে না, আর মুছলমান না বাঁচলে ইসলাম বাঁচে না। মুছলমানকে বাঁচাইতে হইলে জমাতকে বাঁচাইতে হইবে।[২৩১]

দৈনিক আজাদে *মোছলেম লীগের জয়যাত্রা* শীর্ষক নিবন্ধে মাওলানা বলেন:

> বাংলার মুসলমানকে আজ শুধু এইটুকু জানাইয়া রাখিতেছি যে, কাজের ও কার্য্য পদ্ধতির অভাবের বাহানা করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকা এখন আর সম্ভব হইবে না।[২৩২]

মাওলানা আকরম খাঁ'র সংগঠনের প্রতি এই ধরনের নিষ্ঠার কথা কায়েদে আজমও ভাল করে জানতেন। ১৯৩৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভাপতি মোহাম্মদ আলি জিন্নাহর উপস্থিতিতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের নবগঠিত কমিটির এক বিশেষ সভায় মাওলানা আকরম খাঁ-কে আহবায়ক নির্বাচিত করে *বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের* কার্য পরিচালনার জন্য একটি ওয়ার্কিং কমিটিও গঠন করা হয়। ওয়ার্কিং কমিটির আহবায়ক নির্বাচিত হওয়ার পর আকরম খাঁ বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির দিকে মনোযোগী হন। ১৯৪১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর কোলকাতায় পাকিস্তান সম্মেলনের তিনি সভাপতি ছিলেন। এ সম্মেলনে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের পাকিস্তান 'ক্রিড'[২৩৩] কে পূর্ণ সমর্থন ও মি. জিন্নাহর নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করে পাকিস্তানের আদর্শকে ধর্মবিশ্বাসের অঙ্গ বলে ঘোষণা করা হয়। এ সম্মেলনে 'পাকিস্তান পল্লী প্রচার কমিটি' গঠন করা হয়। এ কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হয় মাওলানা আকরম খাঁকে।[২৩৪] ১৯৪৩ ও ১৯৪৪ সালে পুনরায়

---

২৩১. সাপ্তাহিক মুহাম্মদি, কোলকাতা, ১৪ই এপ্রিল, ১৯৩৯, পৃ. ৭।
২৩২. দৈনিক আজাদ, কোলকাতা, ৪ঠা মে, ১৯৩৭।
২৩৩. ক্রীড, ধর্মমত বা ধর্মবিশ্বাস। Creed, আমি বিশ্বাস করি শব্দ থেকে ক্রীড কথাটির উৎপত্তি। মৌলিক বিশ্বাসসূচক মতবাদের সারমর্ম। সম্ভবত ২য় বা ৩য় শতকে শব্দটির উদ্ভব ঘটে। বর্তমান রূপ ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে উদ্ভূত হয়।
বাংলা বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১।
২৩৪. দৈনিক আজাদ, কোলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৪১, পৃ. ৩।

www.pathagar.com

আকরম খাঁ বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি অসুস্থতার কারণে মধুপুরস্থ নিবাসে বসবাস করতে থাকেন। কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে তিনি তখনও নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখেন নি। ১৯৪৫ সালের ১৪ জুলাই সিমলাতে[২৩৫] মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ পাকিস্তান দাবির প্রশ্নে যে সাংবাদিক সম্মেলন করেন,[২৩৬] মাওলানা আকরম খাঁ সংবাদপত্রের মাধ্যমে জিন্নাহর ভূমিকাকে অকুণ্ঠভাবে সমর্থন করেন এবং মুসলিম লীগকে মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন বলে স্বীকার না করার জন্য কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করেন।

ইতোমধ্যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট *প্রত্যক্ষ সংগ্রাম* দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। এ দিন আকরম খাঁ হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা-উত্তর পরিস্থিতিকে প্রশমন এবং মুসলমানদের মনোবল ফিরিয়ে আনার জন্য *ন্যাশনাল গার্ড*কে শক্তিশালী করার চেষ্টা করেন।[২৩৭] ঐ বছরই ২২ ডিসেম্বর বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ড অ্যাম্বুলেন্স ব্রিগেডের কেন্দ্রীয় শিক্ষা শিবিরের উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত সভায় তিনি সভাপতিত্ব করেন। সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুসলিম লীগের পতাকা উত্তোলন প্রসঙ্গে আকরম খাঁ বলেন:

> আল্লাহর নামে এই পতাকা উত্তোলন করিতেছি। ভারতের দশকোটি মুছলমানের ইজ্জত ইহার সহিত জড়িত, শির গেলেও যেন ইজ্জত না যায়, ইহাই আমাদের সংকল্প।[২৩৮]

আকরম খাঁ'র আবেগময় বক্তব্য বাংলার মুসলমানদের পাকিস্তানের *আজাদী* লাভে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করে। ১৯৪৬ সালের ৮ নভেম্বর শারীরিক অসুস্থতার কারণে আকরম খাঁ বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগ সংগঠনের সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেন।[২৩৯] কিন্তু ১৯৪৭ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলের অধিবেশনে নতুন সভাপতি নির্বাচিত করতে ব্যর্থ হওয়ায় কাউন্সিলের পক্ষ থেকে আকরম খাঁ'র পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের অনুরোধ জানানো হয়।[২৪০] এ অবস্থায় মাওলানা আকরম খাঁ ১২ ফেব্রুয়ারি তাঁর পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করেন।[২৪১]

মাওলানা আকরম খাঁ পুনরায় সভাপতির পদ গ্রহণ করায় ভারতের রাজনীতির গতি-প্রকৃতি আকস্মিকভাবে পরিবর্তিত হয়। ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ব্রিটিশ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা দিলেও ভারতে শেষ ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন ১৯৪৭ সালের ৩ জুন আনুষ্ঠানিকভাবে ভারত বিভাগের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন।

---

২৩৫. সিমলা (Simla) ভারতের হিমাচল প্রদেশের রাজধানী ও বিখ্যাত শৈল শহর। ১৯৭২-এর মধ্যভাগে (জুন ২৯-জুলাই ৩) ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও খণ্ডিত পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর মধ্যে ১৯৭০ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পর এটাই প্রথম শীর্ষ বৈঠক। জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী উভয় দেশ চলার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করে। জম্মু ও কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ রেখা (১৯৭১-এর ১৭ ডিসেম্বর) উভয় দেশ মেনে চলার অঙ্গীকার করে। বাংলা বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১০।

২৩৬. দৈনিক আজাদ, কোলকাতা, ১৫ জুলাই, ১৯৪৫, পৃ.-৩।

২৩৭. দৈনিক আজাদ, কোলকাতা, ২২ ডিসেম্বর, ১৯৪৬।

২৩৮. দৈনিক আজাদ, কোলকাতা ২৩ ডিসেম্বর, ১৯৪৬, পৃ.-৩।

২৩৯. দৈনিক আজাদ, কোলকাতা, ৯ নভেম্বর, ১৯৪৬, পৃ.-১।

২৪০. দৈনিক আজাদ, কোলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭।

২৪১. দৈনিক আজাদ, কোলকাতা ১২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭, ।

www.pathagar.com

উল্লেখ্য, মি. জিন্নাহ আকরম খাঁ'র ন্যায় প্রথমদিকে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতায় অখণ্ড বাংলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার মত ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনার কারণে মি. জিন্নাহ্‌রও মত পরিবর্তন হয়। আকরম খাঁও মি. জিন্নাহর মত গ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালের ২০ জুন বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের মাধ্যমে বঙ্গবঙ্গের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এভাবে খণ্ডিত হলেও মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলার পূর্বাংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টিহয়।

সিলেটকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে গণভোট কমিটির চেয়ারম্যান আকরম খাঁ

মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনা অনুযায়ী আসামের মুসলিম অধ্যুষিত সিলেটকে গণভোটের সমর্থন সাপেক্ষে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করার বিধান রাখা হয়।[২৪২] এটাকে সুযোগ মনে করে আকরম খাঁ ১৯৪৭ সালের ১৯ জুন বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগের সভাপতি হিসেবে সিলেটের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে এক যুক্ত আবেদন সিলেটবাসীদের গণভোটে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তির সমর্থনে ভোট প্রদানের আহ্বান জানান। ২১ জুন তাঁর সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের নির্বাহী কমিটির অধিবেশনে সিলেট গণভোট কমিটি গঠন করা হয়। আকরম খাঁ নিজেই এই কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সিলেটকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা শুরু করেন। তাঁর *আজাদ* পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়:

> গণভোটে সিলেটবাসীর কর্তব্য পাকিস্তানের *আজাদী*, না হিন্দুস্থানের গোলামী? জিন্দাপীর শাহজালালের মাজার শরীফকে কোথায় রাখিবেন? পাকিস্তানের দারুল ইসলামে, না হিন্দুস্থানের দারুল হরবে?[২৪৩]

অসংখ্য লীগ কর্মীও বাংলা থেকে সিলেট গিয়ে পাকিস্তানের অনুকূলে গণভোটের প্রচারে অংশ নেয়। ফলে জুলাই মাসের ভোটে সিলেটবাসী মুসলমানগণ তাঁদের ঐতিহাসিক রায় প্রদান করেন। অতঃপর প্রায় এক মাসের মাথায় ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারতবর্ষের বিভক্তির মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তান নামক নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হলে পূর্ব বাংলা ও সিলেট পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। এভাবেই পৃথিবীর মানচিত্রে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র *পাকিস্তান*-এর আত্মপ্রকাশ ঘটে।

স্বাধীন দেশের মাটিতে আকরম খাঁ

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা লাভের পর স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে পরের বছরই তিনি ঢাকায় চলে আসেন। যে দেশের *আজাদী*র জন্য জীবনের একটি বিরাট অংশ তিনি ব্যয় করেছেন, সেই স্বাধীন আবাসস্থল পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকায় তিনি স্থায়িভাবে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নেন। উল্লেখ্য যে, পাকিস্তানের স্বাধীনতার জন্য যে-সব কেন্দ্রীয় নেতা আন্দোলন করেছেন, তাঁদের অনেকেই স্বাধীনতার পরও ভারতে ছিলেন। কিন্তু মাওলানা আকরম খাঁ একদিনের জন্যও ভারতে থাকা পছন্দ করেন নি বিধায় ঢাকায় চলে এলেন। ঢাকায় আসার পরই তিনি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫১ সালে এই পদ থেকে তিনি অব্যাহতি নেন। এছাড়া তিনি নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের সহ-

---

২৪২. দৈনিক আজাদ, কোলকাতা, ১১ জুন, ১৯৪৭, পৃ. ৩।
২৪৩. প্রাগুক্ত, ২ জুলাই, ১৯৪৮, পৃ. ৬।

www.pathagar.com

সভাপতি ও পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্যও নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই গণপরিষদ ১৯৫৪ সালে ভেঙ্গে যায়। ১৯৫৮ সালে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করেন। সামরিক শাসন প্রত্যাহারের পর ১৯৬২ সালে মুসলিম লীগকে পুনরুজ্জীবিত করতে চাইলে আকরম খাঁ আর যোগ দেন নি। মূলত তিনি ১৯৫৪ সালে গণপরিষদ ভেঙ্গে যাওয়ার পর রাজনীতি থেকে ক্রমশ সরে দাঁড়ান। অবশ্য, রাজনীতি থেকে সরে থাকলেও সাংবাদিকতা থেকে তিনি বিদায় নেন নি। ১৯৬৩ সালে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্সের প্রতিবাদে ৯ সেপ্টেম্বর সারাদেশে সাংবাদিকদের মিছিল বের হয়। ঢাকার রাজপথে সাংবাদিকদের মিছিলের পুরোভাগে হুডখোলা একটি জিপে চড়ে বয়োবৃদ্ধ আকরম খাঁ নেতৃত্ব দেন। ঐতিহাসিক এই মিছিলের ভাষণে তিনি বলেছিলেন :

> সংবাদপত্র পুনরুদ্ধারের জন্য এই বৃদ্ধ বয়সেও কারাবরণ করতে দ্বিধাবোধ করবো না।[২৪৪]

স্বতন্ত্র জাতীয়তা ও দ্বিজাতিতত্ত্ববোধ

এক সময় কংগ্রেস ও স্বদেশী আন্দোলনের সমর্থন দিয়েছিলেন মাওলানা আকরম খাঁ এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত *আজাদ* পত্রিকা। কিন্তু কংগ্রেসের কার্যকলাপে স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে, মুসলমানদের স্বার্থে চরম আঘাত আসছে। তাই তিনি ও তাঁর *আজাদ* পত্রিকা মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবি নিয়ে স্বতন্ত্র জাতীয় সত্তার ভিত্তি দ্বি-জাতিতত্ত্বকে মুসলিম সমাজের মুক্তির পথ হিসেবে মনে করেন। মুসলিম লীগও এ দাবীর পক্ষে জোরালো প্রচার চালায় যে, ভারতে হিন্দু মুসলিম কখনও এক জাতি হতে পারে না।[২৪৫] ১৯৩৭ সালে অনুষ্ঠিত হিন্দু মহাসভার সভাপতি বিনয়ক সভারকার এ সত্যকে অস্বীকার করতে পারেন নি। তিনি বলেন :

> ভারতকে কখনও একটি একক এবং সুসংবদ্ধ জাতি হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। বরং তার বিপরীতে এখানে প্রধানত দু'টি জাতি বিদ্যমান, একটি হিন্দু অপরটি মুসলমান।[২৪৬]

অবশ্য সভারকারের বক্তব্যের উদ্দেশ্য এ নয় যে, হিন্দু ও মুসলিম এলাকাভিত্তিক ভারতকে বিভক্ত করা, বরং সংখ্যাগুরু জাতি হিসেবে হিন্দুদেরকে ভারতের প্রধান জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। এটাই ছিল তাঁর বক্তব্যের মূল বিষয়বস্তু। মুসলমানদের কোনো স্বার্থ রক্ষা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না।

১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব দিয়েছিলেন- তাদের শাসনতান্ত্রিক সুবিধার জন্য।[২৪৭] কিন্তু বঙ্গবিভাগ হলো মুসলিম অধ্যুষিত পূর্বাঞ্চলের অবহেলিত

---

২৪৪. জীবনী গ্রন্থমালা, (১) বাংলা একাডেমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭-২৮।

২৪৫. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন, ১৯৯৫, পৃ.-২১৩।

২৪৬. প্রাগুক্ত।

২৪৭. মুসলিম লীগ বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে কিন্তু খাজা নাজিমুদ্দিন, মাওলানা আকরম খাঁ'র নেতৃত্বাধীন অংশ চাইল অখণ্ড বঙ্গ পাকিস্তান রাষ্ট্রে যোগ দিবে। অখণ্ড স্বাধীন বঙ্গের বিরুদ্ধে তাঁরা মত গড়ে তুললেন। মাওলানা ১৯৪৭ সালের ১৫ মে আজাদে লিখলেন, "বাংলার ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্পর্কে মিঃ শরৎবসুর নয় দফা সম্বলিত ফর্মুলাটি বাংলার মুসলমানের মুক্তি সংগ্রামকে চিরতরে সমাধিস্থ করিবার জন্যই রচিত হইয়াছে"। মাওলানা আরও বললেন- "এই ফর্মুলা গৃহীত

www.pathagar.com

মানুষের শিক্ষা দীক্ষা বৈষয়িক দ্বার উন্মুক্ত হলো। তখন এ বিভাগের তীব্র বিরোধিতা শুরু করে গোটা হিন্দু সমাজ। এর দ্বারা প্রমাণিত হলো হিন্দু-মুসলমান দু'টি স্বতন্ত্র জাতি, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ধর্ম-কর্ম, জীবনের দৃষ্টিভিঙ্গি, সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনীতির গতিধারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও পৃথক। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের এক সময় বক্তব্য ছিল এক জাতীয়তাবাদের। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য সমগ্র হিন্দুজাতির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন তাদের এক জাতীয়তাবাদের মুখোশ উন্মোচন করে দেয়।[২৪৮] এ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯০৬ সালে একটি শক্তিশালী মুসলিম প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে পৃথক নির্বাচনের দাবি সরকার সমীপে পেশ করা হয়। জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের জন্য রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য অপরিহার্য বিধায় ১৯০৬ সালে *মুসলিম লীগ*-এর প্রতিষ্ঠা হয়।

দূরদর্শী রাজনীতিবিদ

মাওলানা আকরম খাঁ'র জন্মের প্রায় ১১২ বৎসর পূর্বে ১৭৫৭ সালের ঐতিহাসিক যুগ-সন্ধিক্ষণে বিশ্বাসঘাতকদের কর্মতৎপরতায় পলাশীর আম্রকাননে সে দিন বঙ্গ-বিহার ও উড়িষ্যার স্বাধীনতার সূর্য অস্ত গিয়েছিল। সদ্য রাজ্যহারা মুসলমানরা বুঝতে পারে নি, তাদের জীবনে বড় দুর্দশার জোয়ার এসেছে। সিরাজউদ্দৌলার পরিবর্তে মীর জাফরকে পেয়ে মুসলমানরা মনে করেছে, এক নওয়াবের পরিবর্তে অপর নওয়াব পেয়েছি। আমাদের সিংহাসন তো অটুটই রয়েছে। এমনকি, মীর জাফরকে সরিয়ে নিয়ে মীর মদনকে সিংহাসনে বসানোর পরও মুসলমানরা বুঝতে পারে নি, তাদের জীবনে কত বড় বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। ১৭৬৩ সালে দিল্লীর নামমাত্র বাদশাহ্ শাহ আলমের কাছ থেকে কোম্পানির নিয়োগকৃত ক্লাইভ কর্তৃক দেওয়ানী লাভের পরও মুসলিম সমাজ তাদের অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা ধারণা করতে পারেনি। দেওয়ানী লাভের ফলে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর[২৪৯] দেখা দিলে দেশের সর্বসাধারণ মানুষের সঙ্গে মুসলমানরাও বুঝতে পারে- সত্যিই তারা পরাধীন। কোম্পানির লোকেরা দেশের সম্পদ বিদেশে চালান দিয়ে এই দেশে কৃষ্টিত্রম দুর্ভিক্ষের সৃষ্টিকরছে। ১৭৯৩ সালে মুসলিম জনসাধারণ দেখতে পায়, এদেশকে কতকগুলো হিন্দু জমিদারের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়েছে। পুরাতন মুসলিম জমিদাররা জীর্ণশীর্ণ অবস্থায় দিনাতিপাত করছে। ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার পর মুসলমানরা দেখতে পায়, তাদের স্বাভাবিক

হইলে পাকিস্তানের উপর মৃত্যুশেল পতিত হইবে এবং বাংলার সাড়ে তিন কোটি মুসলমান ব্রিটিশের হাত হইতে বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়ের ক্রমবর্দ্ধমান আন্দোলনের শ্বাসরুদ্ধ হইয়া যাইবে এবং তাহাদের দাসত্ব-শৃংখল চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে।"

বশির আল-হেলাল, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ২৭-২৮।

২৪৮. আব্বাস আলী খান, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৪, পৃ. ৩৪৪।

২৪৯. ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, ১৭৭০, বঙ্গদেশের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। ১১৭৬ সনে এ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় বলে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' অভিহিত করা হয়। দেশে একযোগে নওয়াব ও ইংরেজদের দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে বাঙ্গলার জনগণের অবস্থা চরমে উঠেছিল। দুর্ভিক্ষ এবং এর থেকে উদ্ভূত মহামারিতে প্রদেশের এক-তৃতীয়াংশ লোক প্রাণ হারায়।
বাংলা বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৭।

ভাষাকে বর্জন করে বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত ভাষায় রূপ দেয়া হচ্ছে। ১৮৩৭ সালে ফার্সির স্থলে ইংরেজিকে রাজভাষা রূপে চালু করা হয়েছে। সর্বশেষ আঘাত তাদের জীবনে দেখা যায় ১৮৪৭ সালের Resumption Act- এর প্রবর্তনের ফলে তাদের আয়মা জায়গির প্রভৃতির অকস্মাৎ বিলোপ সাধনে।

এভাবে একের পর এক আঘাত হানার ফলে মুসলিম মানস সজাগ হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে তাদের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করার মানসে মুজাহিদ আন্দোলন[২৫০] গড়ে তোলে। এর কেন্দ্র যুক্ত প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে থাকলেও আন্দোলনে সারা ভারতের মুসলিম জনসাধারণ সাড়া দিয়েছিল। এ মুজাহিদ আন্দোলনেরই অপর এক শাখা আমাদের *পূর্বাঞ্চলে মোহাম্মদী আন্দোলন*[২৫১] নামে দেশের বুকে রাজনৈতিক জোয়ার ডেকে আনে। সৈয়দ নিসার আলি ওরফে তিতুমীর[২৫২] এ আন্দোলনকে সফল করার উদ্দেশ্যে নারিকেলবাড়িয়ায় 'বাঁশের কেল্লা' গড়ে তোলেন। একই উদ্দেশ্যে ফারায়েজি আন্দোলনের প্রবর্তন করেন।

এ ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক প্রবীণ শিক্ষাবিদ ড. মঈনুদ্দীন আহমদ খানের নিম্নের কথাগুলো প্রণিধানযোগ্য :

> ইসলামে ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র পরস্পর সম্পৃক্ত এবং একই সূত্রে গ্রথিত। এগুলোর যে কোনো এক স্তরের অবক্ষয় অন্যান্যগুলিকেও জরাগ্রস্ত করে তোলে। যতোদিন বাংলায় ইসলামি সমাজ ব্যবস্থার সার্বিক অগ্রগতি অব্যাহত ছিল, ততোদিন মুসলিম সমাজে প্রতিবেশী ধর্মসম্প্রদায়সমূহের অনৈসলামিক রীতি-নীতি ও আচার-আচরণের অনুপ্রবেশ তেমন নজরে পড়েনি। কিন্তু পলাশী-উত্তর যুগে যখন বাংলায় ইসলামের অগ্রগতি দারুণভাবে ব্যাহত হয় এবং মুসলমানরা চারদিক থেকে কোণঠাসা হয়ে পড়লো, তখন তারা এ দুরবস্থা উত্তরণের লক্ষ্যে নিজেদের সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করলো এবং এ সমাজে ধর্মীয় সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভাব করলো।[২৫৩]

১৮৩১ সালে সিত্তানা বালাকোট বা নারিকেলবাড়িয়ায় মুসলমানদের আশা চূর্ণ হয়ে গেলেও তাঁরা একেবারেই নিরাশ হয় নি। হৃতগৌরব ফিরে পাওয়ার জন্য তাঁরা সর্বশেষ চেষ্টা চালায় ১৮৫৭ সালে।[২৫৪] পলাশীর মত এ ক্ষেত্রেও বিশ্বাসঘাতকদের কারসাজির

---

২৫০. ১৮৩৯ সালে রণজিৎ সিংয়ের মৃত্যুর পর পাঞ্জাবে বেশ আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়।
মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।
মঈনুদ্দীন আহমদ খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭।

২৫১. এ আন্দোলনে ভারতের বিভিন্ন অংশের উচ্চ-নিচ, ধনী-দরিদ্র মুসলিম অংশগ্রহণ করেছেন।
প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।
মঈনুদ্দীন আহমদ খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮।

২৫২. তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩১) বাংলায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের নেতা। বিস্তারিত ১ম অধ্যায়ের ৬নং টিকা দ্রঃ।

২৫৩. মঈনুদ্দীন আহমদ খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭।

২৫৪. হিন্দু বানিয়া সম্প্রদায় বিশ্বাসঘাতক আমীর-উমারা মুজাহিদ বাহিনীর শত্রুদের ষড়যন্ত্রের ফলে ইংরেজ নাসারা বাহিনী শহরের তোরণ ধ্বংস করে দিল্লীর পতন ঘটায়।
মুহিউদ্দীন খান, আযাদী আন্দোলন, ১৮৫৭, মদীনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা-১৯৯৪, পৃ. ২৭।

www.pathagar.com

ফলে সব বানচাল হয়ে যায়।[২৫৫] ১৮৫৭ সালের আন্দোলনের পটভূমি সম্পর্কে মুজাহিদ মাওলানা ফযলে হক খয়রাবাদী[২৫৬] লিখেছেন :

> হিংসুক বিধর্মী নাসারাগণ এই দেশের শহর, মাঠ-ময়দান সবকিছু দখল করার পরও এই দেশবাসীর প্রতি সীমাহীন বিদ্বেষে ফেটে পড়ে। এই দেশের প্রভাবশালী ও ক্ষমতাবান লোকদিগকে এক এক করিয়া এমন দুর্দশার মধ্যে পতিত করে, যাতে তাদের কুশাসন ও শোষণের বিরূদ্ধে প্রতিবাদ করার মত কেউ না থকে। তারা চেয়েছিল, এদেশের লোকদেরকে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করে তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ চিরস্থায়ী করার হীন পরিকল্পনা গ্রহণ করা ....। শাসকশ্রেণী সর্বপ্রকার ধর্মীয় চেতনার বিলুপ্তি সাধন করার নানা প্রকার জঘন্য কার্যকলাপে লিপ্ত হয়।[২৫৭]

শাসকশ্রেণী সর্বপ্রথম সৈন্যবাহিনীর মধ্যে কাজ শুরু করে ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলিম সৈনিকদেরকে স্বকীয় আচার-আচরণ, ধর্ম-কর্ম এবং ধর্মীয় বিশ্বাস হতে দূরে সরাতে নানা পন্থা অবলম্বন করে। কর্তৃপক্ষের ধারণা ছিল এই দেশেল সৈন্য বাহিনীকে যদি নানা প্রকার কলা-কৌশলের মাধ্যমে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে সমর্থ[২৫৮] হয় তা হলে

---

২৫৫. আবু জাফর, প্রাগুক্ত, পৃ.-৮১।

২৫৬. আল্লামা ফযলে হক খয়রাবাদীকে প্রাচীন মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বশেষ প্রবক্তা ও ব্যাখ্যাতা বলে অভিহিত করা হয়। ১৭৯৭ খ্রি. তিনি অযোধ্যার অন্তর্গত খয়রাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাওলানা ফজলে ইমাম ছিলেন সমকালীন জ্ঞান সাধকের একজন। তিনি দিল্লীর 'সদরুস-সুদুর' বা সরকারের প্রধান আইন উপদেষ্টা ছিলেন। পিতার ন্যায় ফযলে হক খয়রাবাদীও অসাধারণ মেধা ও প্রজ্ঞা বলে চাকরি জীবনের শেষ পর্যন্ত সদরুস সুদুর পদে উন্নীত হয়েছিলেন। কিন্তু সরকারি চাকরি তাঁর জ্ঞানচর্চা বিরত রাখতে পারেনি। তিনি মানতিক, হিকমতসহ প্রায় বারটি জ্ঞানগর্ভ পুস্তক রচনা করেছেন- যা দেশ-বিদেশে অনেক ইসলামি প্রতিষ্ঠানে পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়েছে। সর্বশেষ গ্রন্থদ্বয় আসসাওরাতুল-হিন্দিয়া' ও 'কাসিদায়ে ফিতনাতুল হিন্দ' মাওলানার নির্বাসিত জীবনের দু'টি বিলাপ-লিপি।
মুহিউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ.-৬,৮।

২৫৭. আস-সাওরাতুল হিন্দিয়া ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব সম্পর্কিত মূল্যবান দলিল। বিপ্লবের পর ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের বিচার প্রহসনে ভারতবর্ষের হাজার হাজার দেশপ্রেমিক নেতৃবৃন্দকে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে নির্বাসিত করা হয়। আন্দামানের কারাবন্দী মুজাহিদ মাওলানা ফযলে হক খয়রাবাদীও সেই নির্যাতনের শিকার ছিলেন। আন্দামানের সেই কঠিন বন্দি জীবনে মাওলানা সাহেব আরবি ভাষায় কাফনের কাপড়ের মধ্যে কয়লা দ্বারা নির্যাতনের করুণ কাহিনী এবং তৎকালীন ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর দুঃশাসনের এক বিষাদময় চিত্র সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন। আস্‌সাওরাতুল হিন্দিয়া সম্পর্কে 'সিয়ারুল উলামা' গ্রন্থে বলা হয়েছে, ১৮৫৭ খ্রি. আজাদী সংগ্রামে মাওলানা ফযলে হক খয়রাবাদী প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ ওয়াজিব বলে ফতওয়াও প্রচার করেছিলেন। এই অপরাধে তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে ১৮৫৯ সালে আন্দামানে নির্বাসন দেওয়া হয়। ১৮৬১ সালে তিনি এই অভিশপ্ত দ্বীপেই ইন্তিকাল করেন। কারাগারের মুক্তিপ্রাপ্ত অপর এক বন্দি মুফতী এনায়েত আহমদ কাকুরীর মাধ্যমে খয়রাবাদীর কাফনে লেখা ইতিহাসখানা তাঁর সুযোগ্য পুত্র মাওলানা আব্দুল হক খয়রাবাদীর হাতে পৌঁছানো হয়। কাফনে লেখা ইতিহাস ও টুকরা কাগজে লেখা পত্রের সমষ্টিই হলো আস্‌সাওরাতুল হিন্দিয়া' ও 'কাসিদাতুল ফিতনাতিল হিন্দ' নামক দু'টি পুস্তিকা।
মুহিউদ্দীন খান, আযাদী আন্দোলন, ১৮৫৭, ঢাকা-১৯৯৪, পৃ. ৯-১০।

২৫৮. ইংরেজরা হিন্দু সৈন্যের খাদ্য তালিকায় গরুর চর্বি, মুসলিম সৈন্যের জন্য শূকরের চর্বি প্রচলন করে। এর ফলে সৈন্যদের মধ্যে বিক্ষোভের দানা বেঁধে উঠে।
মুহিউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃঃ-১৮।

www.pathagar.com

দেশের সাধারণ মানুষকে ধর্মান্তরিত করা সহজ হবে। কিন্তু, মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করা সহজ নয়। মুসলমানরা সব সময় আল্লাহর উপর ভরসা রেখে রাসুল (সা.) প্রদর্শিত পথেই চলে আসছে। বিধর্মীরা কিভাবে মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করবে?

ইসলাম ধর্মের মূলনীতি ও প্রধান আদর্শ হচ্ছে অনাবিল একেশ্বরবাদ। নরপূজা, প্রতীকীপূজা, অবতারবাদ এবং পৌত্তলিকতার অভিশাপগুলোকে আল্লাহর সৃষ্ট দুনিয়া হতে ধুয়ে-মুছে সেই সর্বশক্তিমান, সর্বমঙ্গলময় একমাত্র আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং তাঁর সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ-মানব সমাজকে তাঁরই নামে অবিচ্ছিন্ন ভ্রাতৃ সমাজে পরিণত করা। রাসুল (স.)-এর সময় এবং তাঁর ইন্তেকালের পর আরবের মুসলমানগণ নিজেদের আবাসভূমি হতে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে আদর্শের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বহির্দেশে বেরিয়ে পড়েছিলেন। ড. ঈশ্বরী প্রসাদ তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন :

> The earliest Muslim invaders of Hindustan were not the Turks but the Arabs, who issued out from their desert homes after the death of the great Prophet to spread their doctrin throughout the world, which was, according to them, "the key of heaven and hell". Wherever they went, their intrepidity and vigour roused to the highest pitch by their proud feeling of a common nationality and their zeal for the faith enabled the Arabs to make themselve masters of Syria, Palestine, Egypt and Persian within the short space of twenty years. The conquest of Persia made them think of their expansion eastward and when they learnt of the fabulous wealth and idolatry of India from the merchants who sailed from Shiraz and Hurmuz and landed on the India coast, they discounted the difficulties and obstacles which nature placed in their way, and determined to lead and expedition to India, which at once received the sanction of religious enthusiasm and political ambition. The first recorded expedition was sent from Uman to pillage the cost of India in the year 636-37 A.D. during Khilafat of Umar.[২৫৯]

অর্থাৎ, হিন্দুস্তানের প্রথম বিজেতাগণ তুর্কি ছিলেন না; বরং তাঁরা ছিলেন আরবের অধিবাসী। মহানবি (স.)-এর ইন্তেকালের পরেই এই আরবগণ ইসলামি মতবাদের প্রচার ও প্রসারকল্পে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েন। তাবলীগে দ্বীন ও ইসলাম প্রচারণার মধ্যেই আছে আখেরাতের ভাল ও মন্দ-এই ছিল তাঁদের বিশ্বাস। আরবগণ যেখানেই গিয়েছে, সেখানেই শঙ্কাহীন দুর্জয় সাহসের পরিচয় দিয়েছে। এই জাতীয়তাবাদের গৌরবময় প্রেরণাকে সম্বল করে এভাবেই সত্যানুসারী আরবগণ মাত্র কুড়ি বছরের মধ্যেই সিরিয়া, ফিলিস্তিন, মিসর ও পারস্যের অধিপতি হতে পেরেছিলেন। পারস্য দখলের পর আরবগণ তাদের এই বিজয়কে পূর্বদিকে আরো সম্প্রসারিত করতে সচেষ্ট হন। সিরাজ ও হরমুজের সওদাগরগণ তখন তেজারতী কার্যোপোলক্ষে ভারতের উপকূলবর্তী অঞ্চলে যাতায়াত করতেন। আরবগণ তাদের মুখেই ভারতের প্রাচুর্য ও অধিবাসীদের বুতপুরস্তির খবর পেয়েছিলেন। প্রাকৃতিক বাধা-বিপত্তিকে উপেক্ষা করেই

---

২৫৯. মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫-৫৬।

www.pathagar.com

তারা ভারতে এক অভিযান প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। বলাবাহুল্য, এই অভিযানের ব্যাপারে ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় উভয়বিধ সমর্থনই পাওয়া যায় এবং ৬৩৬-৩৭ খ্রিষ্টাব্দে হজরত ওমরের খিলাফত আমলে ওমান হতে ভারতের উপকূল ভাগে আরব মুসলমানদের প্রথম অভিযান পরিচালিত হয়েছিল বলে ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে।

উপরোক্ত বক্তব্যের সমর্থন রসুলুল্লাহ (স.)-এর হাদিসেও পাওয়া যায়। রাসুল (স.) তাঁর ছাহাবাগণকে পাক-ভারত অভিযান পারিচালনা করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেছেন :

> রসুলুল্লাহ (স.) আমাদেরকে হিন্দ অভিযানের নিশ্চিত ওয়াদা দিয়েছেন। অতএব আমি যদি সেই সময় উপস্থিত থাকি তবে আমি (আবু হুরায়রা রা.) তাতে আমার জান ও মাল ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হবো না। এতে যদি আমাকে কতল করা হয়, তবে আমি শ্রেষ্ঠ শহীদে পরিগণিত হবো। আর যদি আমি ছহী-সালামতে সুস্থভাবে ফিরে আসি, তবে আমি হবো দোযখমুক্ত।[২৬০]

উক্ত হাদিস পাক-ভারত অভিযানই শুধু নয়; বরং এই অভিযানের অপরিহার্যতা সম্পর্কেও স্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে। সমসাময়িক প্রেক্ষাপট তো বটেই, এছাড়া উপরোক্ত হাদিস মাওলানাকে ইসলামের প্রচার-প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করেছে বললে ভুল হবে না। তাঁর রাজনীতিও ছিল এ উদ্দেশ্যেই। আমৃত্যু তাঁর যাবতীয় কাজ ছিলো রসুলে আরাবীর প্রচারিত ইসলামের প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠা। তাঁর রাজনীতিও ছিলো ইসলামের প্রতিষ্ঠাই। তিনি জাগতিক কোনো লোভ বা মোহে রাজনীতি করেন নি। ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম মিল্লাতের কল্যাণই ছিলো তাঁর আরাধ্য মিশন। এ মিশনে তিনি সফলও হয়েছিলেন।

অসাম্প্রদায়িক আকরম খাঁ

মাওলানাকে অনেকেই কিছুটা সাম্প্রদায়িক মনে করেন। আসলে তিনি সাম্প্রদায়িক ছিলেন কি-না, কয়েকটি ঘটনাতেই তা প্রতীয়মান হবে। ভারতে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হলে তিনি মহাত্মাগান্ধী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু[২৬১] নেতৃবৃন্দের সাথে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে হিন্দু-মুসলিম মিলনের অগ্রদূত হিসেবে কাজ করেছেন। বেঙ্গল প্যাক্ট গঠনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে সাহায্য করেন। তিনি মহাত্মা গান্ধীর খুবই প্রিয়পাত্র ছিলেন। পণ্ডিত শ্যামাচরণ মুখার্জী, প্রফেসর জিএল ব্যানার্জি প্রমুখ নেতৃবৃন্দের তিনি ছিলেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। মাওলানা জেলে যাওয়ার সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত রাখার চিন্তা করেছিলেন। দুর্ভাগ্য, দু'জন একত্রেই কারাগারে যাওয়ায় তা আর বাস্তবায়িত হয় নি।

---

২৬০. عن ابى هريرة رضـ قال وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الهند فان ادركتها انفق فيها نفسى وما لى وان قتلت كنت افضل الشهداء وان رجعت فانا ابو هريرة المحرر.
নাসায়ী শরিফ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬২।

২৬১. সুভাষচন্দ্র বসু। জন্ম ১৮৯৭ সালের ২৩ আগস্ট। মৃত্যু ১৯৪৫ (?) সালে। তিনি সাধারণত নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু নামে পরিচিত। অবিভক্ত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা। তিনি অনেকগুলো গ্রন্থও রচনা করেন।
বাংলা বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৩৬।

www.pathagar.com

পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পরের একটি স্মরণীয় ঘটনা। মহারাজ ত্রৈলক্যনাথ চক্রবর্তী নামক এক ব্যক্তি আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে মাওলানার কয়েদী বন্ধু ছিলেন।[২৬২] দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কেটে গেছে অনেক বছর, তখনও মহারাজ তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে ছিলেন। পরে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। সেখানেই তাঁর শেষকৃত্য হয়। তিনি শেষ জীবনে *জীবন স্মৃতি* নামে একখানি বই লিখেছিলেন। বইটি ধারাবাহিকভাবে সাপ্তাহিক বসুমতী পত্রিকায় প্রবন্ধ আকারে বের হয়েছিল। প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি আকরম খাঁ সম্পর্কে লিখেছেন :

> ১৯৫০ সালের দাঙ্গার পর আমি ঢাকা গিয়া মওলানা আকরম খাঁ'র সহিত দেখা করি। ১৯২১ সালে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে মওলানা সাহেবের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল। তাহার পর আর মওলানা সাহেবের সহিত দেখা হয় নাই। তখন শহরের অবস্থা এমন যে, আমাকে রাস্তায় হত্যা করিয়া ফেলিয়া রাখিলে কিছুই হইত না। তখন *আজাদ* অফিস ও মওলানার বাড়ী এত বড় ছিল না। মওলানা সাহেব একতলা দালানে বাস করিতেন। গেটের দরজা খোলা ছিল। আমি মওলানা সাহেবকে কিছুক্ষণ ডাকিয়া উত্তর না পাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। তখন বেলা প্রায় তিনটা। মওলানা সাহেব বারান্দায় পাইচারী করিতেছিলেন। আমার পরনে ধুতি ছিল। একজন অপরিচিত হিন্দুকে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি রাগভরে বলিলেন : বাড়ীতে মেয়েছেলে আছে ভিতরে ঢুকিয়াছেন? আমি বলিলাম, আপনার বাড়ীর মধ্যে আমি ঢুকিতে পারি। বৃদ্ধের রাগ অনেক কমিয়া গেল। তিনি বলিলেন পরিচয়, আমি আলিপুর জেলের পরিচয় দিলাম। তিনি আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং পাশে চেয়ারে বসাইলেন। আমি বলিলাম, মওলানা সাহেব দেশ স্বাধীন হইয়াছে, এখন জাতির মধ্যে যদি সাম্প্রদায়িকতা, দুর্নীতি ও উচ্ছৃঙ্খলতা থাকে তবে জাতির ভবিষ্যৎ কি? মওলানা সাহেব বলিলেন, পূর্বে রাজা বাদশাহরা ছিল চরিত্রহীন, স্বার্থপর, জাতিকে গড়িয়া তুলিয়াছে সাধু-সন্ন্যাসী ফকিরেরা। আমি সব সময় ভাবি সব ছাড়িয়া গাছতলায় বসি। আমি ত সব ছাড়িতে পারিতেছি না। এ জন্য কাহাকেও কিছু বলিতে পারিতেছিনা, যাহা কিছু করিবেন আপনারাই করিবেন। তিনি ইহাও বলিলেন, ইসলামিক রাষ্ট্রে হিন্দুরা বাস করিতে পারিবে না, দুনিয়ার সম্মুখে এই কলঙ্ক হইতে দিব না। যখনই কোনো গণ্ডগোলের আভাস পাইবেন, আমাকে সংবাদ দিবেন। আমি গণ্ডগোল বন্ধ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। প্রয়োজন হইলে আমি নিজে সেখানে যাইব। স্বাধীনতার পর জাতি গঠনে বা জাতীয় চরিত্র গঠনে কোনো চেষ্টা হয় নি- আমাদের ছেলেরা শৈশব হইতে দেখিতে পায়, দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে না পারিলে জীবনযাত্রা নির্বাহ হয় না। ঘুষ না দিলে কোনো কাজ হয় না। দুর্নীতির আশ্রয় লইলে প্রচুর অর্থ উপার্জন হয়। যাহার প্রচুর অর্থ আছে তিনিই বড়লোক। তিনি দেশের মধ্যে গণ্যমান্য নেতা। তিনি সুখী, যাহারা সৎলোক তাহারা গরীব, তাহাকে কেহ মান্য করে না। বর্তমানে প্রয়োজন সমাজ সংস্কার। বর্তমান দুষিত আবহাওয়া পরিবর্তন করিয়া নূতন আবহাওয়া সৃষ্টিকরা। ইহার মূল হইবে দেশপ্রেম। দেশপ্রেম হইলেই প্রত্যেকেই মনে করিবে আমি জাতির সেবা

২৬২. দৈনিক আজাদ, ১২/৬/৮৩ ইং।

www.pathagar.com

> করিতেছি। তখনই প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্তব্য করিয়া যাইবে। যখন তখন সরকারী কর্মচারীরা ঘুষ লইতে সাহসী হইবে না। লজ্জাবোধ করিবে। তখন ব্যবসায়ীরা খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশ্রিত করিবে না, মনে করিবে আমার জাতি দুর্বল হইয়া পড়িবে। যাহারা সমাজ সংস্কার করিবেন, জাতি গড়িয়া তুলিবেন, তাহাদের প্রথমে আদর্শস্থানীয় হইতে হইবে। নতুবা কেহই তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিবেন না। অবশ্য, বর্তমান অবস্থায় কারা সংস্কার প্রয়োজন। তবে জেলে কয়েদীদের চরিত্র সংশোধনের পূর্বে জেল কর্মচারীদের ও দেশের নেতাদের চরিত্র সংশোধনের প্রয়োজন।[২৬৩]

উদারপন্থী মাওলানা আকরম খাঁ ১৯৫০ সালের হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা বন্ধ করার জন্যও আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন বিষয় ও ঘটনাবলি আলোচনা করলে দেখা যায়, তিনি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্যও যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেছেন।

নির্ভীক ও আদর্শ ব্যক্তিত্ব আকরম খাঁ

খিলাফত আন্দোলন আকরম খাঁ'র জীবনকে সর্বভারতীয় ভিত্তিভূমিতে উন্নীত করে। তাঁর খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের ফলে হিন্দু-মুসলমানগন মধ্যে *সাপ্তাহিক মোহাম্মদীর* প্রচার যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। ব্রিটিশ সরকারকে আক্রমণ করে তখন অত্যন্ত তেজোদ্দীপ্ত ভাষায় *মোহাম্মদী*তে লেখা ছাপা হতো। এই সময় বিরুদ্ধবাদীরা বিদ্বেষের স্বরে তাঁকে আক্রমণ' খাঁ বলেও অভিহিত করেন।[২৬৪] তবে এ কথাও সত্যি তিনি ছিলেন আপোষহীন সাহসী ও নির্ভীক ব্যক্তি। অন্যায় অত্যাচারের কাছে কখনও তিনি মাথা নত করেন নি। নিম্নের একটি ঘটনাই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সাহিত্যিক মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলি বর্ণনা করেছেন :

> তখন তুরস্কের প্রতি ব্রিটিশনীতি একেবারেই মারমুখো হইয়া উঠিয়াছে। তুরস্কের খলীফা সুলতানের প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা ও সহানুভূতিবশত নির্ভীক ও স্বাধীনচেতা মুসলিম লেখক ও সাংবাদিকগণ ব্রিটিশনীতির তীব্র সমালোচনা করিতেছে। মওলানা (আকরম খাঁ) সাহেবও মোহাম্মদীতে জোর কলম চালাইতেছেন। এই জন্য একদিন রাইটার্স বিল্ডিংয়ে বেঙ্গল গভর্নমেন্ট সেক্রেটারিয়েটে তাঁহার ডাক পড়িল। সেকালে ইংরেজ লাট সাহেবের নির্দেশ অনুসারে একটি এক্‌জিকিউটিভ্‌ কাউন্সিল বা শাসন পরিষদ দেশ শাসন করিত। এই পরিষদের অন্যতম সদস্য জনৈক নবাব উপাধি বাঙ্গালী মুসলিম। তিনি বাহ্যত মওলানা সাহেবকে মোহাম্মদী আহলে হাদিস সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়াই জানিতেন। আহলে হাদিসরা হানাফী, শাফিয়ী ইত্যাদি চারি মাজহাব মানিতেন না। এই কারণে এখনকার অনেকের মতো তখন প্রায় তাঁহাদের সুন্নাত জামাতের বহির্ভূত মনে করিতেন। তুরস্কের খলীফা সুলতান সুন্নাত জামাতের নেতা। আহলে হাদিসরা তাকে নাও মানিতে পারেন। প্রথমে এই কথার উল্লেখ করিয়া নবাব সাহেব তুরস্কের পক্ষে মওলানা সাহেবের লেখনীর অযৌক্তিকতা প্রকাশ করিলেন। তাতে ফল হইল না দেখিয়া

---

২৬৩. এম আব্দুর রহমান, ভারতীয় সাময়িক দৃষ্টিতে মাওলানা আকরম খাঁ, সাপ্তাহিক বসুমতি, ৭৩শ বর্ষ, ২৪শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৫ সন।

২৬৪. মনসুর উদ্দীন, অধ্যাপক, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, পৃ. ২৫৪।

www.pathagar.com

তিনি একটি লোভের ফাঁদ পাতিলেন। বলিলেন, আপনি যদি ব্রিটিশ পক্ষের অর্থাৎ তুরস্কের বিপক্ষে লেখনী ধারণ করেন, গভর্নমেন্ট আপনার মোহাম্মদী -কে দৈনিক পত্রে রূপান্তরিত করিতে প্রয়োজনীয় সমস্ত অর্থ সাহায্য স্বরূপ দান করিবেন। মওলানা সাহেব তখন কষ্টকর দারিদ্র্য ভোগ করিতেছেন। মাঝে মাঝে তাঁহার বাজার সওদা করিতেও আটকা পড়িত। এ অবস্থায় সরকারী সাহায্যপুষ্ট একখানি দৈনিক পত্রের পরিচালনা তাঁহার পক্ষে স্বস্তিকর হইতে পারিত। কিন্তু তিনি সেদিন যে জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন ব্রিটিশদ্রোহী বংশের রক্তে তার সমর্থন মিলিয়াছিল। তিনি নবাব সাহেবকে বলিলেন, 'দেখুন জনাব, খলিফা সুলতানের বিরুদ্ধে চিন্তা করার আগেই যেন আমার মস্তিষ্ক বিকল হইয়া যায়। তাঁহার বিপক্ষে লেখনী ধারণ করার পূর্বেই যেন আমার হাত অবশ হইয়া পড়ে। তাঁহার অনিষ্ট সাধনের চেষ্টার আগেই যেন আমার নশ্বর দেহের অবসান ঘটে। খোদার দরবারে এই আমার প্রার্থনা। নবাব সাহেব অতঃপর অন্য কৌশল অবলম্বন করিলেন। তিনি রোষ কষায়িত নেত্রে মওলানা সাহেবের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, আপনি জানেন, আপনি কাহার সহিত কথা বলিতেছেন? আমি বাংলা গভর্নমেন্টের একজন এক্জিকিউটিভ কাউন্সিলর। ইচ্ছা করিলেই আমি এখানেই আপনাকে বন্দুকের গুলিতে হত্যা করিবার আদেশ দিতে পারি।' মাওলানা সাহেব কিন্তু এতেও বিচলিত হইলেন না। ধীর গম্ভীর কণ্ঠে তিনি উত্তর করিলেন, 'দেখুন জনাব, আমি জীবনে বহুবার শিকার করিয়াছি। বন্দুকের গুলিতে অনেক পাখী মারিয়াছি, আমার প্রতি গুলি নিক্ষিপ্ত হইলে মারা যাইতে পারি–এ ভালভাবেই জানি। কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই জানিবেন, আমাকে বন্দুকের গুলিতে নিহত করা হইলে আমার দেহ হইতে যত বিন্দু রক্তপাত হইবে, বাংলার বুকে ঠিক ততজন আকরম খাঁ পুনর্বার জন্মিবে'।[২৬৫]

ভারতীয় মুসলমানরা একজাতি

সৈয়দ আমীর আলি[২৬৬] সর্বপ্রথম এই দাবি উত্থাপন করেন যে, ভারতীয় মুসলমানরা একই জাতি। তিনিই সর্বপ্রথম তাদেরকে Nationality Nation বলে আখ্যায়িত করেন। ১৮৭৭ সালে 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের আন্দোলন শুরু হয়। আমীর আলি সে সময় বলেছেন, ভারতের পাঁচ কোটি মুসলমান একটি জাতি। অবশ্য সৈয়দ আহমদ ভারতীয় মুসলমানদেরকে 'কওম' বলেছেন। 'কওম' শব্দটি তিনি সম্প্রদায় অর্থে ব্যবহার করেছেন। আমীর আলির ন্যায় রাজনৈতিক অর্থে একে ব্যবহার করেন নি।

---

২৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০-৫২।

২৬৬. ১৮৪৯ সালের ৮ এপ্রিল কোলকাতাস্থ হুগলীর কন্টকে আমীর আলী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সৈয়দ সাদৎ আলী কোলকাতায় আসেন এবং হুগলীতে বসবাস স্থাপন করেন। আমীর আলী প্রথম জীবনে মাদ্রাসা ও কলেজ শিক্ষা লাভের পর কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে এম.এ. ও বি.এল ডিগ্রি প্রাপ্ত হন এবং বিলেত থেকে ব্যারিস্টারি পাস করেন। এরপর কোলকাতা হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হন। পরে এল. এল. ডিএল ও ডি. লিট ডিগ্রি লাভ করে। ১৮৮৭ সালে সি. আই. ই উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯২৮ সালের ৯ আগস্ট তাঁর মৃত্যু হয়।
এম. এ রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, ১৯৭৬, ঢাকা, পৃ. ১৩১।

www.pathagar.com

আমীর আলি লর্ড মর্লির[২৬৭] নিকট দাবি করেছিলেন যে, ভারতীয় মুসলমানগণ একটি রাজনৈতিক জাতি এবং স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রবর্তনে এই দাবি স্বীকৃতি পেয়েছিল। আমীর আলির দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ইসলাম একটি মহান ধর্ম। তিনি পৃথিবীর সমস্ত দেশের মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তিনি শিয়া মতাবলম্বী ছিলেন। তবুও তুরস্কের খিলাফতকে শুধু সমর্থই করেন নি; বরং খিলাফতের সংহতি বজায় রাখার জন্য প্রচারকার্যও চালিয়েছিলেন। তিনি তৎকালীন তুরস্কের কামাল আতাতুর্কের নিকট খিলাফতের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য পত্র প্রেরণ করেন। আমীর আলি মুসলমানদের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে তাদের রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। বিংশ শতকের প্রথম ভাগে রাজনৈতিক জীবনে এর ফল সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। এর ভেতর দিয়ে তাঁর প্যান-ইসলামি মনোভাবেরও পরিচয় পাওয়া যায়।[২৬৮]

সমাজসেবক

সমাজসেবার ব্রত নিয়ে মাওলানা আকরম খাঁ'র কর্মজীবনের শুরু। তিনি কোনো সরকারি চাকরি গ্রহণ করেন নি। অবহেলিত মুসলিম সমাজের দুঃখ-দুর্দশা কিভাবে দূর করা যায়, সে-জন্যই তাঁর প্রকাশিত পত্র-পত্রিকায় তিনি নিরলসভাবে লেখা পরিচালনা করেছেন। মানুষের অসহায় অবস্থায় তিনি গভীর সমবেদনা জানাতেন। দুর্গত মানুষের সংকট নিরসনের জন্য এগিয়ে যেতেন তাদের পাশে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ত্রিপলি ও বলকান যুদ্ধের সময় ভারতের বিভিন্ন এলাকা থেকে এক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে যুদ্ধবিধ্বস্ত মুমূর্ষু পীড়িতদের সেবায় তিনি তুর্কি ফান্ডে এই অর্থ দান করেন। তুরস্কে মুসলমানদের বিপদের সময় তিনি তার পত্রিকা *মোহাম্মদীর* মাধ্যমে চল্লিশ হাজার রুপি সংগ্রহ করে তুরস্কে পাঠিয়েছিলেন। বিহারে ঈদুল আযহার দিনে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধে। তিনি নিজেই দাঙ্গা-বিক্ষুব্ধ এলাকায় গিয়ে দাঙ্গা নিবৃত্ত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের সাহায্যের জন্য প্রায় ত্রিশ হাজার টাকার কাপড় সংগ্রহ করে পাঠান।[২৬৯]

১৯৪৫ সালে চট্টগ্রামের কাহারপাড়া গ্রামে একটি লোমহর্ষক ঘটনা ঘটে। দক্ষিণ ভারতীয় অঞ্চলের কালা আদমি নামক সিপাহিরা একটি কসাই পরিবারের মহিলাকে অপদস্থ করতে উদ্যত হয়। তার চিৎকার শুনে গ্রামের লোকজন এসে তাকে রক্ষা করে। রাতের অন্ধকারে ঐ রেজিমেন্টের সিপাহিরা গ্রামটিকে ঘেরাও করে অগ্নিদগ্ধ করলে গ্রামের জনগণ একতাবদ্ধ হয়ে এ অশুভশক্তির মোকাবেলা করে। এ ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে সিপাহিরা গ্রামে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। এতে বেশ কিছু লোক লাঞ্ছিত, আহত, নিহত হয়।[২৭০] পুরো চট্টগ্রামে এ ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। হরতাল পালিত

---

২৬৭. লর্ড মর্লি। মর্লি-মিন্টো সংস্কার নীতির ভিত্তিতে ১৯০৯ সালে স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতি আইনে পরিণত হয়।
রাজনীতিতে বঙ্গীয় ওলামার ভূমিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

২৬৮. প্রাগুক্ত।

২৬৯. মোঃ কাসেদ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬।

২৭০. উক্ত ঘটনায় ১ জন নিহত, কিছু সংখ্যক আহত ও তিনজন মহিলাকে ধর্ষণ করা হয়।
মোঃ কাসেদ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬,
আবুল কালাম শামসুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭।

www.pathagar.com

হয়। অনেক প্রতিবাদ সভা আহবান করা হয়। চট্টগ্রাম মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে মুসলিম লীগ নেতা ফজলুল কাদের চৌধুরীর নেতৃত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাশেষে মাওলানা আকরম খাঁকে চেয়ারম্যান করে একটি রিলিফ ফান্ড কমিটি গঠন করা হয়। *আজাদ* কর্তৃপক্ষ রিলিফ ফান্ড খুলে সাহায্যের জন্য জনসাধারণের কাছে আবেদন জানান। এতে অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে। প্রায় একত্রিশ হাজার টাকার প্রাপ্তি স্বীকারও আজাদে প্রকাশিত হয়েছিল।[২৭১] এই রিলিফ ফান্ডের সংগৃহীত অর্থ দুস্থদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।[২৭২] খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের সময় রাউলাট বিধি[২৭৩] (Roulatt Act)-এর পরিণামে জালিয়ানওয়ালাবাগের[২৭৪] যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়, আকরম খাঁ স্বচক্ষে সে হৃদয়বিদারক ঘটনাও দেখতে গিয়েছিলেন।

ভাষা আন্দোলন

ভাষা আন্দোলন আমাদের ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। পৃথিবীর ইতিহাসে মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য এমন দুঃখবহ ঘটনা সম্ভবত আর নেই। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য এদেশের মানুষ রক্ত দিয়েছে। কিন্তু, এ ভাষা আন্দোলনের প্রকৃত ইতিহাস থেকে জাতি বঞ্চিত। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ১৯৫২ সাল থেকে শুরু হয় নি। এরও অর্ধশতাব্দী পূর্বে বাংলা ভাষা আন্দোলনের বীজ বপন করেছিলেন মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ। ১৮৯৬-৯৭ সালে কোলকাতায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার বীজ বপিত হয়। এরপর সাম্রাজ্যলিপ্সু ব্রিটিশদের

---

২৭১. আবুল কালাম শামসুদ্দীন, অতীত দিনের স্মৃতি, ঢাকা, ১৯৬৮ পৃ. ২৫৮।

২৭২. এ ফান্ড বিতরণকে কেন্দ্র করে কিছু দ্বিমতও দেখা যায়। Some people were of opinion that the fund was not utilised properly for which it was created.
মোঃ কাসেদ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬।

২৭৩. প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকার ইংল্যান্ডে "গ্রেট বৃটেনের প্রতিরক্ষা আইন" নামে একটি আইন পাস করে। একে কেন্দ্র করে কিছু দ্বিমতও দেখা যায়। Some people were of opinion that the fund was not utilised properly for which it was created.
মোঃ কাসেদ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ.-৭৬।
প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকার ইংল্যান্ডে "গ্রেট বৃটেনের প্রতিরক্ষা আইন" নামে একটি আইন পাস করে। এর পাশাপাশি ভারতের স্বাধীনতাকামী ও সংগ্রামী নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ করার জন্য ভারত প্রতিরক্ষা আইন (Defence of India Act) নামে একটি আইনও পাস করে। এ সব আইনের দ্বারা সরকার জরুরি অবস্থায় যে কোনো মামলা বিচারক ছাড়াই নিষ্পত্তি করতে পারবে। ভারতীয় জনগণ এটিকে নাগরিক অধিকারের মৃত্যুদণ্ড হিসাবে আখ্যায়িত করে। এর বিরুদ্ধে ভারতের হিন্দু মুসলমান বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ৩০ মে ১৯১৯ সালে গান্ধী হরতালের ডাক দেয়। এই হরতালে কয়েক হাজার লোক নিহত হয়। ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের পর হিন্দু মুসলমানের এইরূপ মিল আর দেখা যায় নি।
মোহাম্মদ ইনাম-উল-হক, ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১।

২৭৪. রাউলাট আইন ও নিহত ভারতীয়দের আত্মার মুক্তির জন্য এবং এই বর্বরোচিত হত্যার প্রতিবাদে ১৩ এপ্রিল ১৯১৯ সালে প্রায় দশ হাজার লোক অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে এক সভায় মিলিত হয়। উক্ত সভা চলাকালীন জেনারেল ডায়ারের নেতৃত্বেগুর্খা সৈন্যগণ গুলি চালিয়ে প্রায় চারশ' লোককে নিহত ও এক হাজারের অধিক লোককে আহত করে। বেসরকারি মতে, মৃত্যের সংখ্যা ছিল কয়েক হাজার। ইতিহাসে এটাই জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড নামে অভিহিত।
মোহাম্মদ ইনাম-উল-হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১-১৭২।
সরকারি হিসেব মতে, এই হত্যাকাণ্ডে ৩৭৯ জন নিহত এবং ১৫০০ জন আহত হয়েছিল।

www.pathagar.com

নাগপাশ থেকে আযাদি লাভ করে ভারতীয় মুসলমান। পরবর্তীকালে উর্দু ভাষা নিয়ে বিরোধ বাধে। বাংলাদেশের মানুষ বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। আজ বাংলা আমাদের রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। ভাষা আন্দোলনে মাওলানার কি অবদান ছিলো, তা জানা যাবে এ আলোচনার মাধ্যমে।

১৯৪৭ সালের ৫ ডিসেম্বর ঢাকায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সর্বশেষ বৈঠক বসে। ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, উর্দুকে পূর্ব বাংলার (তদানীন্তন) সরকারি ভাষা করা হবে না। প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের সরকারি বাসভবন বর্ধমান হাউসে বহুসংখ্যক ছাত্র-শিক্ষক উপস্থিত হয়ে অবিলম্বে পূর্ব বাংলার (তদানীন্তন) রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে বাংলাকে চালু করার দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভাপতি মাওলানা আকরম খাঁ তাঁদের দাবি পূরণের আশ্বাস দিলে তারা বর্ধমান হাউস ত্যাগ করেন।[২৭৫]

ঐ দিনই তমদ্দুন মজলিসের পক্ষ থেকে আবুল কাসেম এবং আবুল কালাম শামসুদ্দীন মাওলানা আকরম খাঁ'র সাথে ভাষার প্রশ্নে আলোচনা করেন। আলোচনার পর এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আবুল কাসেম বলেন :

> মওলানা আকরম খাঁ আলোচনা প্রসঙ্গে তাদের এ আশ্বাস দেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা রূপে বাংলা ছাড়া অন্য কোনো ভাষাকে চালানোর চেষ্টা করলে পূর্ব পাকিস্তান বিদ্রোহ ঘোষণা করবে এবং তিনি নিজে সেই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেবেন।[২৭৬]

এর পূর্বে ১৮ নভেম্বর আজাদে' আকরম খাঁ স্বাক্ষরিত নিম্নরূপ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়:

> ঢাকা, ১৭ নভেম্বর। বাংলা ভাষাকে পূর্ব্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বলিয়া ঘোষণা করার অনুরোধ জানাইয়া পূর্ব্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রীর নিকটে একখানি স্মারকপত্র দাখিল করা হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানের শত শত নাগরিক এই স্মারকপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং ইহাদের মধ্যে সাহিত্যিক, কবি, শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ, আইনজীবী, অধ্যাপক, ওলামা, ছাত্র, রাজনৈতিক নেতা, ডাক্তার, মহিলা সকলেই আছেন।[২৭৭]

উক্ত স্মারকপত্রে যাঁদের নাম রয়েছে তাঁরা হলেন :

> বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সভাপতি মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মওলানা আবদুল্লাহিল বাকি, এম. এল. এ. তমদ্দুন মজলিসের সেক্রেটারি অধ্যাপক আবুল কাশেম, মওলবী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, কবি জসিমুদ্দীন, মওলবী আবুল কালাম শামসুদ্দিন (সম্পাদক *আজাদ*), অধ্যাপিকা মিসেস শামসুন্নাহার মাহমুদ, এম. এ. এম. বি. ই. প্রিন্সিপ্যাল ইব্রাহিম খান, চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, শিল্পী জয়নুল আবেদীন, অধ্যাপক মনসুরুদ্দীন, মি. আবুল হাসানাত (ডি. আই. জি. পুলিশ), অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন, অধ্যাপক

---

২৭৫. ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ১৯১।
রেজোয়ান সিদ্দিকী, পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬, পৃ. ৫৩।

২৭৬. প্রাগুক্ত।

২৭৭. ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭-৮৮।

www.pathagar.com

ডাঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, ডি. পিএইচ. (প্রভোস্ট, সলিমুল্লাহ মোছলেম হল), প্রিন্সিপ্যাল শরফুদ্দীন আহমদ, প্রিন্সিপ্যাল জহুরুল এছলাম, মি. জাকের হোসেন (আই. জি. পুলিশ) ডা. ওসমান গনি, ডি. এস. সি. অধ্যাপক আবদুল লতিফ, বার, এট, ল, মওলানা মোস্তাফিজুর রহমান, অধ্যাপক অতুল সেন, আল্লামা ডাঃ মহিউদ্দীন, মওলবী আবুল মনসুর আহমদ, মিসেস লীলা রায়, এম, এ (সম্পাদিকা. জয়শ্রী). মিসেস আনওয়ারা চৌধুরী বি. এ. বি. টি. সেক্রেটারি, নিখিল বঙ্গ মোছলেম মহিলা সমিতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থ বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ এস. আর খাস্তগীর ডি. এস. সি. গায়ক আব্বাসউদ্দীন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক মি. গণেশ বসু, আজাদের' বার্তা সম্পাদক মওলবী মোহাম্মদ মোদাব্বের, নিখিল বঙ্গ মোছলেম ছাত্র লীগের সেক্রেটারি শাহ আজীজুর রহমান, সৈয়দ ওলিউল্লাহ, শওকৎ ওসমান, আবু রুশদ, আলি আহসান, সৈয়দ মান্নান বখশ, আহসান হাবীব, ডাঃ ফহিমুদ্দিন (প্রচার বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর), ডাঃ আবদুল মাজেদ (ডেপুটি সার্জ্জন জেনারেল), ডাঃ ওয়াহিদ ..... মাহমুদ, জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারি, মি. আবুল কাশেম, জিন্দিগী সম্পাদক কাজী আফসারউদ্দিন, আবু জাফর শামসুদ্দীন, জহুর হোসেন চৌধুরী প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[২৭৮]

স্মারকপত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোও উল্লেখ করা হয়েছে :

বাংলা ভাষা ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সম্পদশালী ভাষা এবং বিশ্বের প্রধান প্রধান ভাষাগুলির মধ্যে বাংলা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। ভারতের প্রায় ৮ কোটি লোক বাংলা ব্যবহার করিয়া থাকে এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই ইহার বিকাশ ও সমৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়া ইহাকে বর্তমান উন্নত স্তরে উন্নীত করিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব্ব পাকিস্তানের গভর্নমেন্টদ্বয় উভয়েই যদি বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে উহার ভবিষ্যত আরও উজ্জ্বলতর হইবে।

হিন্দুরা যেমন সংস্কৃত, হিন্দী অথবা অন্যান্য ভাষার চর্চা করিবে, পূর্ব্ব পাকিস্তানবাসীরাও তেমনি পশ্চিম পাকিস্তান ও অন্যান্য মোছলেম রাষ্ট্রের সহিত রাজনৈতিক অথবা সাংস্কৃতিক যোগাযোগ রক্ষার জন্য আরবি, ফার্সি ও উর্দু ভাষা শিক্ষা করিবে। সুতরাং পূর্ব্ব পাকিস্তান গভর্নমেন্টকে ঐকান্তিক আগ্রহের সহিত অনুরোধ করা যাইতেছে যে, বাংলা ভাষাকে পূর্ব্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ও শিক্ষার বাহন বলিয়া যেন অতিসত্বর ঘোষণা করা হয়।

পূর্ব্ব পাকিস্তান ও কেন্দ্রীয় পাকিস্তান গভর্নমেন্টের বাংলা ভাষাভাষী সদস্যগণও এই প্রস্তাবটি সমর্থন করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।[২৭৯]

১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলের সাহিত্য সভার পর তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগেই সর্ব রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ঢাকা

---

২৭৮. ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭-৮৮।
২৭৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮।

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন তৎকালীন কলা ভবনের গেটের পাশে একটি বাড়ী ছিল রশিদ বিল্ডিং নামে। ঐ বিল্ডিং-এর একটি কামরায় তমদ্দুন মজলিসের অফিস ছিল। সেখানে তমদ্দুন মজলিস ও শামসুল হকের নেতৃত্বে পরিচালিত মুসলিম ছাত্র লীগের অল্প কয়েকজন কর্মীর উপস্থিতিতে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। তমদ্দুন মজলিসের অন্যতম প্রধান কর্মী অধ্যাপক নূরুল হক ভূঁইয়া পরিষদের আহবায়ক নির্বাচিত হন।[২৮০]

মাওলানা আকরম খাঁ'র ৫ ডিসেম্বরের স্বাক্ষরিত নিম্নোক্ত বিবৃতি ৮ ডিসেম্বরের *দৈনিক আজাদে* প্রকাশিত হয় :

> পূর্ব্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষাকে উপলক্ষ করিয়া দেশে একটা অহেতুক উত্তেজনার সৃষ্টি করা হইতেছে দেখিয়া আমি বিশেষ দুঃখিত হইলাম। আমার মতে, এই উত্তেজনার কোনোই সঙ্গত কারণ নাই। পূর্ব্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষা বাংলা না হইয়া উর্দ্দু হইবে কোনো দলের কোনো মতের কোনো বাঙ্গালী মুসলমান আজ পর্যন্ত এরূপ অভিমত প্রকাশ করেন নাই। বরং সকলেই এক্ষেত্রে তারস্বরে বাংলার দাবী সমর্থন করিতেছেন। আমার জ্ঞানবিশ্বাস মতে, কেন্দ্র হইতেও পূর্ব্ব-পাকিস্তানের উপর কখনো কোনো প্রকার এরূপ নির্দ্দেশ দেওয়া হয় নাই। পক্ষান্তরে, রাষ্ট্রীয় ভাষা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের একমাত্র অধিকারী হইতেছেন, পাকিস্তানের Constituent Assembly বা বিধান রচনা পরিষদ। এই পরিষদ যে কোনো অবস্থায় মোছলেম বঙ্গের অভিমতকে অগ্রাহ্য করিতে চাহিবেন এবং চাহিলেও করিতে পারিবেন, এরূপ আশঙ্কা করার বিন্দুমাত্র কারণও আমি দেখিতে পাইতেছি না।[২৮১]
>
> কিন্তু, দুঃখের বিষয়, অহেতুক হইলেও উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। তাই পূর্ব্ব-পাকিস্তানের মুসলমান জনসাধারণের খেদমতে এই প্রশ্নগুলি সম্পর্কে নিজের ব্যক্তিগত মতামত সংক্ষেপে আরজ করিয়া দিতেছি।
>
> (১) রাষ্ট্রের জনগণের মাতৃভাষাই সেখানকার রাষ্ট্রীয় ভাষা হইবে, ইহাই সঙ্গত ও স্বাভাবিক কথা। যেহেতু পূর্ব্ব-পাকিস্তানের গণ-ভাষা অবিসম্বাদিতরূপে বাংলা, অতএব তাহার রাষ্ট্রীয় ভাষাও নিশ্চিতরূপে বাংলাই হওয়া চাই।
>
> (২) পূর্ব্ব-পাকিস্তানের মুসলমান অধিবাসীদিগের শিক্ষার মাধ্যম বাংলা হওয়াই সব হিসেবে সঙ্গত ও আবশ্যক। কিন্তু আরবি শিক্ষার অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই নীতি প্রযোজ্য হইতে পারিবে না।
>
> (৩) সাধারণ শিক্ষা ক্ষেত্রে উর্দ্দুকে পূর্ব্ব-পাকিস্তানের মুসলমান শিক্ষার্থীদিগের জন্য একমাত্র ও বাধ্যতামূলক দ্বিতীয় ভাষারূপে নির্দ্ধারিত করিতে হইবে। ধর্ম্ম, রাষ্ট্র ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উর্দ্দু ভাষার যে গুরুত্ব আছে, তাহা অস্বীকার করিলে পূর্ব্ব-পাকিস্তানের মুসলমানরাই সবদিক দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন।
>
> (৪) মধ্যস্তর পর্যন্ত আরবি শিক্ষার্থীদিগের জন্য বাংলা শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করিয়া দিতে হইবে।

---

২৮০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮.
২৮১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩.

www.pathagar.com

(৫) এছলাম ধর্ম্ম ও মোছলেম সংস্কৃতির প্রতিকূল না হয়, তাহার মধ্যবর্তিতায় স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের মুসলমান জাতি যাহাতে মুসলমান হিসেবে আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠা করার প্রেরণা সঞ্চয় করিতে পারে, মুসলমান শিক্ষার্থীদিগের পাঠ্যপুস্ত কগুলি সেইভাবে রচনা করিয়া নিতে হইবে।

(৬) বাঙ্গালী ছাত্রদিগের পক্ষে সুপাঠ্য ও সহজসাধ্য হইতে পারে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উর্দ্দু পাঠ্যপুস্তকগুলি রচনা করিতে হইবে। ইহা দুঃসাধ্য ব্যাপার নহে।

(৭) পুরাতন বা আধুনিক গোঁড়ামির প্ররোচনায় ইংরেজিকে এখন বয়কট করিতে যাওয়া মোছলেম জাতি ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের পক্ষে একেবারেই সঙ্গত হইবে না।[২৮২]

মাওলানা আকরম খাঁ ৭ ডিসেম্বরও সলিমুল্লাহ হলের এক সভায় বাংলার পক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে কঠোর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৪৭ তারিখে কোলকাতার *দৈনিক আজাদে* প্রকাশিত ঢাকা অফিস থেকে প্রেরিত এই-সংক্রান্ত প্রতিবেদনটি এইরূপ :

> ঢাকা, ৮ ডিসেম্বর (বিলম্বে প্রাপ্ত)। ৭ ডিসেম্বর তারিখে পূর্ব্ব পাকিস্তান সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে পূর্ব্ব পাকিস্তানের শিক্ষা সমস্যা আলোচনা করার জন্য ঢাকার শিক্ষাবিদ ও ছাত্রদের এক বিরাট সভার আয়োজন হয়। সভাপতিত্ব করেন জনাব মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ। বক্তৃতা প্রসঙ্গে মাওলানা আকরম খাঁ বলেন, উর্দ্দুর সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্ট করিতেছে উর্দ্দুর নাদান দোস্ত। বাঙ্গলাদেশে উর্দ্দু ও বাংলা লইয়া যে বিতণ্ডা চলিতেছে তাহার কোনোই অর্থ হয় না। বস্তুতঃ বাঙ্গলাদেশের শিক্ষার বাহন বা অফিস আদালতের ভাষা বাঙ্গলা ছাড়া অন্য কোনোও ভাষা হইতেই পারে না।[২৮৩]
>
> তিনি বলেন :
>
> শতকরা নিরানব্বই জন যে ভাষায় কথা বলে, সেই ভাষা ব্যতিরেকে অন্য ভাষা তাহাদের উপরে চাপাইয়া দিবার কোনোও প্রশ্ন ওঠে না। আম বৃক্ষের নিকট হইতে আখরোট ফল আশা করা যেমন সম্ভব নয়, বাঙ্গলাদেশেও বাঙ্গলা ছাড়া অন্য কোনোও ভাষা শিক্ষা বা সরকারী অফিস আদালতের মাধ্যম হিসেবে আশা করা সেরূপ অসম্ভব ব্যাপার।[২৮৪]

অতঃপর তিনি ঐদিনের *মর্নিং নিউজ* পত্রিকার সম্পাদকীয়ের স্থানবিশেষ হইতে পাঠ করিয়া বলেন : ইহাতে লেখা হইয়াছে যে,

> যাহারা অনতিবিলম্বে উর্দ্দু না শিখিবে তাহারা নিজেদের দেশেই শাসন ব্যাপারে পরবাসী হইয়া থাকিবে—এরূপ জবরদস্তি বাঙ্গলার মুসলমান সহ্য করিবে না—এরূপ কখনও আমরা হইতে দিব না।[২৮৫]

---

২৮২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩-৯৪।
২৮৩. দৈনিক আজাদ, ১৫, ১২, ১৯৪৭।
রেজোয়ান সিদ্দিকী, ড., প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২।
২৮৪. ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪।
২৮৫. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

উর্দু সম্বন্ধে তিনি বলেন :

> আমরা বাঙ্গলার পক্ষপাতী কিন্তু উর্দ্দুরও আমরা বিরোধী নহি। আমরা উপরের দিকের শ্রেণিতে উর্দ্দু বাধ্যতামূলক দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে অবশ্যই শিখিব ......। বাঙ্গলার পক্ষপাতিত্ব করা উর্দ্দুর বিরোধিতা করা বুঝায় না।[২৮৬]

ইংরেজি ভাষা সম্বন্ধে তিনি বলেন :

> ইংরেজী বিদ্বেষের সহিত যেন আমরা ইংরেজী ভাষাকেও এখনই বিসর্জ্জন না দেই। .... এই ব্যাপারে আধুনিক ও প্রাচীন এই উভয় প্রকার গোঁড়ামীকেই ত্যাগ করিতে হইবে।[২৮৭]

করাচী শিক্ষা সম্মেলন সম্বন্ধীয় পরস্পরবিরোধী সংবাদ নিয়ে যে বাক-বিতণ্ডার সৃষ্টিহয়েছে, মাওলানা সাহেব সে সম্পর্কে বলেন :

> একথা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না যে, করাচীতে বাংলাদেশের মতের বিরুদ্ধে কোনরূপ ভাষা চাপাইয়া দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইতে পারে। ঐ সভায় কে কি প্রস্তাব করিয়াছিল সম্পূর্ণ ব্যাপারের বিশদ বিবরণ তিনি লিখিতভাবে দাবী করেন।[২৮৮]

তাঁর পূর্বে অধ্যক্ষ জহুরুল ইসলাম, মি. আবু সুফিয়ান, জনাব হবিবুল্লাহ বাহার প্রমুখও বক্তৃতা করেন। হলে তিল ধারণের স্থান ছিল না।

লক্ষণীয়, মাওলানা আকরম খাঁ তখন পর্যন্ত তাঁর বক্তৃতায় 'বাঙ্গলাদেশ' কথাটিই ব্যবহার করতেন।

১৯ ডিসেম্বর আকরম খাঁ'র বিবৃতি এবং আজাদের সম্পাদকীয় মন্তব্যের কিছু অংশ উপস্থাপন করা যেতে পারে। মাওলানা আকরম খাঁ একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন, সেই বিবৃতি এবং সরকারের প্রেসনোটই মোটামুটি এই সম্পাদকীয়গুলির বক্তব্য নির্ধারণ করেছিল। সর্বশেষ সম্পাদকীয় থেকে কয়েকটি লাইন এখানে সংযুক্ত করা হলো :

> উর্দ্দু বনাম বাংলা বিতর্ক যেভাবে বিতণ্ডা ও সংঘর্ষে পরিণত হইয়াছিল, তাতে পূর্ব্ব পাকিস্তানের কল্যাণকামী ব্যক্তিমাত্রেই শঙ্কিত না হইয়া পারেন নাই। অত্যন্ত আনন্দের কথা যে, পরিস্থিতি শান্ত হইয়া গিয়াছে এবং উত্তেজনা প্রশমিত হইয়াছে। অনেকের নিকট আজ দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে যে, যে প্রশ্নের উপর এই গোলমাল পাকিয়া উঠিয়াছিল সে প্রশ্নটা তলাইয়া দেখিলে তাকে নিছক আহম্মকী ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। করাচীস্থিত 'ডন' পত্রে ঢাকার এই গোলমালকে 'নির্ব্বোধ বিতর্ক' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং এ ব্যাপার লইয়া যে এ ধরনের বিরোধ-বিতর্কের কোনো অবকাশ নাই, সে সম্বন্ধেও মন্তব্য করা হইয়াছে। আমরাও কয়েকটি প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে, পাকিস্তানের সাধারণ জবান যে উর্দ্দু হইবে, এ সম্পর্কে মতবিরোধের কোনো

---

২৮৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫।
২৮৭. প্রাগুক্ত।
২৮৮. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

অবকাশ নাই। উর্দুপন্থী ও বাঙ্গালাপন্থীদের প্রায় সকলেই এ-ব্যাপারে একমত। তাঁরা প্রায় সকলেই এ-মত পোষণ করেন যে, পূর্ব্ব বাংলার শিক্ষার মাধ্যম, অফিস আদালত ও কারবার দরবারের ভাষা বাংলা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। অবশ্য এ-কথা স্বীকার্য যে, এদেশের বিশিষ্ট চিন্তাশীল একটি দলের এ সম্পর্কেও ভিন্ন ধরনের মতও রহিয়াছে।[২৮৯]

১৯৪৮ সালের ৫ এপ্রিল ঢাকায় *দৈনিক আজাদ* অফিসে স্টার অব ইন্ডিয়া'র প্রতিনিধি আকরম খাঁ'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আলোচনা প্রসঙ্গে মাওলানা ভাষার প্রশ্নে সম্প্রতি যে-সব শোচনীয় ব্যাপার ঘটেছে তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বলেন :

> এগুলি অযৌক্তিক এবং এর পেছনে চক্রান্ত রয়েছে। তিনি ২৬ ফেব্রুয়ারির কোলকাতার একটি সংবাদপত্র থেকে অংশবিশেষ পাঠ করে দেখাবার চেষ্টা করেন যে, পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলনে পশ্চিম বঙ্গের চক্রান্তকারী মহল অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।[২৯০]

৬ এপ্রিল, ১৯৪৮ সালে অপরাহ্ণ তিনটায় পূর্ববঙ্গ বিধান-পরিষদের অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন বাংলাকে সরকারি ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করার জন্য একটি প্রস্তাব পেশ করেন। ৮ এপ্রিল প্রস্তাবটি নিম্নরূপ সামান্য সংশোধনের পর সর্বসম্মতক্রমে গৃহীত হয় :

(ক) পূর্ব বাংলা প্রদেশে ইংরেজির স্থলে বাংলাকে সরকারি ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হইবে; এবং যত শীঘ্র বাস্তব অসুবিধাগুলি দূর করা যায় তত শীঘ্র তাহা কার্যকর করা হইবে।

(খ) পূর্ব বাংলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার মাধ্যম হইবে 'যথাসম্ভব' বাংলা অথবা প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশ স্কলারদের ভাষা।[২৯১]

১৯৫৪ সালে পাকিস্তান সরকার আবদুর রব নিশতার, নূরুল আমিন ও পীরজাদা আবদুস সাত্তার, মাওলানা আকরম খাঁ, আবদুল্লাহ্ আল মাহমুদ ও সর্দার আসাদুল্লাহ জান-এর সমন্বয়ে একটি ভাষা কমিটি গঠন করেন। কেন্দ্রীয় লীগ পার্লামেন্টারি পার্টি আরো একটি সিদ্ধান্ত নেন যে, যদিও উর্দু ও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত করা হচ্ছে, তথাপি আগামী বিশ বছর ইংরেজিকেই সরকারি ভাষা-রূপে বলবৎ রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য ফল কিছুই হয় নি। পার্লামেন্টারি পার্টির উক্ত সভায় যে-সিদ্ধান্ত টি গৃহীত হয় তা উত্থাপন করেন পূর্ব-বাংলার গণপরিষদ-সদস্য আবদুল্লাহ আল মাহমুদ। প্রস্তাব গৃহীত হলে পাকিস্তানের অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়ে বিভিন্ন সদস্য আরো ছয়টি প্রস্তাব উত্থাপন করেন।[২৯২]

---

২৮৯. ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০-২০১।

২৯০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৬।

২৯১. প্রাগুক্ত, পৃ.-২৫৭।

২৯২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৭।

www.pathagar.com

জাতীয়তার প্রশ্নে আকরম খাঁ

এ-বিষয়ে মাওলানা আকরম খাঁ বলেন :

> জাতি শব্দের সংজ্ঞা সংস্কৃতে কি আছে না আছে জানি না। ব্যবহারেও যেরূপ নির্ণয়-নাস্তি-দশা, তাহাতে উহার একটা নির্দিষ্ট অর্থ ধরিয়া লওয়াও অসম্ভব। মোটের উপর, খুব ব্যাপক ও বর্তমান যুগের রাজনৈতিক অর্থে উহা ইংরেজি Nation-এর প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, এই নেশন বা জাতি সম্বন্ধে মুসলমানের আদর্শ স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্যই মোছলেম জাতীয়তার বিশেষত্ব এবং মোছলেম জাতির রক্ষাকবচ। এ-বিষয়ের আলোচনা করিবার সময় আমাদিগকে বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মুসলমানের জাতীয়তা বংশ, ব্যবসায় বা দেশগত নহে। মুসলমানের জাতীয়তা সম্পূর্ণ ধর্মগত। বিশ্বের সকল মুসলমান মিলিয়া এক অভিন্ন ও অভেদ্য জাতি।[২৯৩] একেই বলা হয় নিখিল-ইসলামিকতা বা ইসলামি ভ্রাতৃত্ব।[২৯৪]

২৯৩. ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৬।
২৯৪. প্রাগুক্ত, ৫৮৫-৮৬।

www.pathagar.com

পূর্ববঙ্গ শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠন কমিটি, ১৯৪৯-৫১
(East Bengal Educational System Reconstruction Committee, 1949-51)

সরকার ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ মার্চ শিক্ষাসমস্যাকে ব্যাপকভাবে পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদানের জন্য দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্ট সাংবাদিক মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর সভাপতিত্বে ১৭ সদস্যের একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করেন। কমিটির সভাপতির নামানুসারে এটি আকরম খাঁ শিক্ষা কমিটি' নামে পরিচিত।[২৯৫] উক্ত কমিটি ৪৪৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত একটি রিপোর্ট ১৯৫১ সালের ২৫ জুন সরকারের কাছে পেশ করেন।

ক্রমিক নং	কমিটির সদস্যবৃন্দের নাম	
১.	মাওলানা মো. আকরম খাঁ, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিক	সভাপতি
২.	ড. মোয়াজ্জাম হোসেন, ভাইস চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৩.	মৌলভী মো. ইব্রাহিম খান, প্রেসিডেন্ট, ইস্ট বেঙ্গল সেকেন্ডারি এডুকেশন বোর্ড	"
৪.	মাওলানা জাফর আহমদ ওসমানী, হেড মৌলভী, মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা	"
৫.	মাওলানা রোকন উদ্দিন, এম.এল.এ.	"
৬.	মৌলভী আবদুল হাকীম বিক্রমপুরী, এম.এল.এ.	"
৭.	খান বাহাদুর আবদুল হাকীম, সহকারি জনশিক্ষা পরিচালক প্রাথমিক শিক্ষা	"
৮.	জনাব এ.এফ.এম. আবদুল হক, সহকারি জনশিক্ষা পরিচালক, মুসলিম শিক্ষা	"
৯.	মৌলভী আলি নূর, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, ইস্ট বেঙ্গল সেকেন্ডারি এডুকেশন বোর্ড, ঢাকা	"
১০.	জনাব এস.এম.কিউ. জুলফিকার আলি, বিদ্যালয় পরিদর্শক, বাকেরগঞ্জ রেঞ্জ	"
১১.	জনাব মো. শামসুল হক, অধ্যক্ষ, প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ময়মনসিংহ	"
১২.	মিস রাবেয়া খাতুন, প্রধান শিক্ষিকা, সরকারি গার্লস স্কুল, সিলেট	"

---

২৯৫ East Bengal Educational System Reconstruction Committee. 1949-51. p-1.
(ক) Reports on Islamic Education and Madrasah Education in Bengal, Dr. Sekandar Ali Ibrahimi. P – 135, Vol. – 3.
(খ) যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ, মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, ১৯৯৯ পৃ. ২৬৭।

www.pathagar.com

১৩. মৌলভী মো. সোলায়মান চৌধুরী, প্রফেসর, এস.সি কলেজ, সিলেট "
১৪. জনাব এল. আসাদ, ডাইরেক্টর অব ইসলামিক রিকনস্ট্রাকশন, পশ্চিম পাঞ্জাব "
১৫. বাবু এস.সি. সেনগুপ্ত, অধ্যক্ষ, বি.এম. কলেজ, বরিশাল "
১৬. বাবু রাজকুমার দাস, বিশেষ কর্মকর্তা, সিডিউলড ক্লাস্ট এডুকেশন, গভর্ণমেন্ট অব ইস্ট বেঙ্গল "
১৭. রেভারেন্ড ব্রাদার জুড, প্রধান শিক্ষক, সেন্ট গ্রেগরীজ উঃ বিঃ, ঢাকা "

Mr. A.F.M. Abdul Hoq and Moulvi Ali Noor are appointed as secretaries to the committee in addition to their normal duties.

উপরোক্ত কমিটিকে সাহায্য করার জন্য সরকার নিম্নোক্ত ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি সাব-কমিটিও অনুমোদন করেন।

1. Miss L. A. Baker Inspectress of schools. East Bengal.
2. Miss Rabeya Khatun
3. Mrs. Shamun Nahar Mahmood
4. Begum Sufia Kamal
5. Mrs W.A. Shadani
6. Mrs Fazilatun nesa Zoha.
7. Miss Ansari
   Head mistress Ramna Preparatory school.
   Miss BAker will act as president of the sub-committee and Begum Shamsun Nahar Mahmood as secretary.

কমিটি নিম্নোক্ত বিষয়ে সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করবেন:

১. প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার কোর্স কারিকুলাম
২. মাদ্রাসা শিক্ষার সর্বোত্তম পদ্ধতি নিরূপণ করা যাতে 'পুরাতন স্কীম মাদ্রাসা', পুনর্গঠিত মাদ্রাসা' ও উচ্চবিদ্যালয়ের সামগ্রিক পাঠ্যসূচির সকল উপাদান সুসমন্বিত হয় এবং ইসলামি ভাবধারা ও মূল্যবোধ প্রতিফলিত হয়।
৩. মুসলমান ছাড়া অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য নিজ নিজ ধর্মীয় শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা।
৪. বর্তমানে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে এমন একটি নবতর পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করার ব্যবস্থা করতে হবে যার মাধ্যমে প্রকৃত লব্ধজ্ঞানের পরিমাণ মূল্যায়ন অধিকতর গুরুত্ব পায়।
৫. নারী শিক্ষার উন্নয়নের জন্য সর্বোত্তম পদ্ধতি নির্ণয় করা, যাতে তাদের জন্য শিক্ষাক্রমে, তাদের স্বার্থ পুরোপুরি সংরক্ষিত হয়।

কমিটির প্রথম সভা

১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ১১ এপ্রিলে ঢাকার রমনায় অবস্থিত শিক্ষা অধিদপ্তরে এ কমিটির উদ্বোধনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন কমিটির সভাপতি মাওলানা মোঃ আকরম খাঁ। উক্ত অধিবেশনের যে বিবরণী পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ:

www.pathagar.com

The Peesident welcomed the members and impressed upon them the importance of the work before the committee on whose deliberation's depended the future shape of Eastern Pakistan, He requested each member to give his best attention to the problems before the committee..

তিনি সম্মানিত সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আরও বলেন যে, কমিটি গঠনকালে সরকার কমিটির যে কর্মপরিধি নির্ধারণ করে দিয়েছেন তার আলোকে উক্ত কর্মপরিধির ওপর বিস্তারিত আলোচনা করে কমিটির কাজের কর্মপন্থা নির্ণয়পূর্বক ৭টি সাব-কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেন।

ক. খসড়া প্রশ্নমালা প্রণয়ন সাব-কমিটি:

১. খান বাহাদুর জনাব আবদুল হাকীম, এম.এ. (ক্যান্টাব)
সহকারী জনশিক্ষা পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, পূর্ববঙ্গ

২. জনাব মো. শামসুল হক, এম.এ.
অধ্যক্ষ, প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, ময়মনসিংহ

৩. মৌলভী এ.এস. মাহমুদ, এম.এ.বি.এল.
বিশেষ কর্মকর্তা, শিক্ষা অধিদপ্তর, পূর্ববঙ্গ

৪. জনাব আলি নূর, এম.এ, বি.টি.
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, পূর্ববঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

৫. জনাব এ.এফ.এম. আবদুল হক, এম.এ, ডিপ্লোমা-ইন-এডুকেশন আহ্বায়ক (লীডস্), সহকারী জনশিক্ষা পরিচালক, পূর্ববঙ্গ

খ. প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা সাব-কমিটি:

১. জনাব এ.এফ.এম. আবদুল হক

২. জনাব মো. শামসুল হক

৩. মিস রাবেয়া খাতুন, বি.এ., বি.টি.
প্রধান শিক্ষিকা, সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট

৪. মাওলানা মো. রুকুনুদ্দীন, এম.এল.এ.

৫. মৌলভী আবদুল হাকীম বিক্রমপুরী এম. এল. এ.
সরকার মিস এম.বি. আনসারী, প্রধান শিক্ষিকা, রমনা প্রিপারটরি স্কুল-কে এ সাব-কমিটির সদস্য এবং খান বাহাদুর আবদুল হাকীম কে কনভেনর নিয়োগ করেন

গ. মাধ্যমিক শিক্ষা সাব-কমিটি:

১. জনাব মোঃ ইব্রাহীম খান, এম.এ., বি.এল.
সভাপতি, পূর্ববাংলা মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

২. খান বাহাদুর জনাব আবদুল হাকীম

৩. জনাব অব্দুল রাজ্জাক, বি.এ., বি.টি., ডিপ্লোমা-ইন-এডুকেশন (এডিন)
অধ্যক্ষ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, ঢাকা

৪. মৌলভী আবদুল হাকীম বিক্রমপুরী, এম.এল.এ.

www.pathagar.com

৫. জনাব এস.এন.কিউ. জুলফিকার আলি, বি.এ., বি.টি.
স্কুল পরিদর্শক, বাকেরগঞ্জ রেঞ্জ
৬. জনাব এস.সি. সেনগুপ্ত, এম.এ., অধ্যক্ষ, বি.এম. কলেজ, বরিশাল
৭. খান বাহাদুর অবদুর রহমান খান, এম.এ., বি.টি.
প্রাক্তন জনশিক্ষা পরিচালক, বেঙ্গল ও অধ্যক্ষ, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা
৮. জনাব এম. ওসমান গণী, ডি.এস-সি. (লন্ডন), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৯. জনাব মতিউর রহমান, পরিচালক (ফিজিক্যাল), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১০. জনাব আলি নূর
১১. জনাব এ.এফ. এম. আবদুল হক — আহ্বায়ক

জনাব এম.এ. আযম, পরিচালক (শিল্প), পূর্ববাংলা সরকারকে কারিগরি ও শিল্প শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়। এ সাব-কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নারী শিক্ষা সাব-কমিটি নিম্নোক্ত দু'জনকে মনোনীত করেন।

১. মিস. এল. এ. বাকের, স্কুল পরিদর্শক, পূর্ববাংলা
২. মিসেস আনোয়ারা চৌধুরী, প্রধান শিক্ষিকা, কামরুন্নেসা গার্লস হাইস্কুল, ঢাকা।

আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালনে অপরাগতার কারণে জনাব এ.এফ.এম. আবদুল হকের স্থলাভিষিক্ত হন অধ্যাপক ওসমান গণী, এম.এ., বি.টি., ডিপ্লোমা-ইন-এডুকেশন (লীডস), শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, ঢাকা। আবার, তিনি করাচীতে বদলি হওয়ার কারণে ইস্তফা দিলে আহ্বায়ক হিসেবে মৌলভী এস.এস. মাহমুদ, সচিব, মূল কমিটি, দায়িত্ব পালন করেন।

ঘ. মাদ্‌রাসা শিক্ষা সাব-কমিটিঃ

১. মাওলানা মো. আকরম খাঁ
২. মাওলানা জাফর আহম্মদ উসমানী, হেডমৌলভী মাদ্‌রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা
৩. ড. এম.এ. হোসেন, এম.এ., ডি.ফিল, (অক্সন)
উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৪. ড. মো. সেরাজুল হক, এম.এ., পিএইচ.ডি. (লন্ডন)
প্রধান, আরবি ও ইসলামি শিক্ষা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
৫. মাওলানা মো. রুকুনুদ্দীন, এম.এ., বি.এল.
৬. মৌলভী এস. শরফুদ্দীন, এম.এ., বি.এল.
অধ্যক্ষ, ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, ঢাকা
৭. জনাব, এ.এফ.এম, আবদুল হক
৮. মৌলভী এ. এস. মাহমুদ — আহ্বায়ক

এই সাব-কমিটিতে উপদেষ্টা হিসেবে নিম্নোক্ত দু'জন দায়িত্বপালন করেন

১. শামস্-উল-উলামা মাওলানা আবু নসর মো: ওয়াহীদ, এম.এ. আই.ই.এস. (অবসরপ্রাপ্ত)
২. খান বাহাদুর মাওলানা এম. যিয়াউল হক, এম.এ.
অধ্যক্ষ, মাদ্‌রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা

www.pathagar.com

ঙ. সংখ্যালঘু শিক্ষা সাব-কমিটিঃ

১. জনাব এস.সি. সেনগুপ্ত
২. জনাব এম.বি. মল্লিক, এম.এ., বি.এল., এম.এল.এ, প্রাক্তন মন্ত্রী, বেঙ্গল
৩. জনাব ডি.পি. ঘোষ, এম.এ., অধ্যক্ষ, কারমাইকেল কলেজ, রংপুর
৪. জনাব আর.এ. গোমেজ, এম.এ., এম.এল.এ. প্রভাষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
৫. বাবু মনীন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য, এম.এ., প্রধান শিক্ষক, পোগোজ স্কুল, ঢাকা
৬. জনাব এ.এফ.এম. আবদুল হক
৭. বাবু রাজ কুমার দাস, বি.এ., বি.টি. আহ্বায়ক

এই সাব-কমিটিতে উপদেষ্টা হিসেবে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ দায়িত্ব পালন করেন।

১. ড. এস.এন. রায়, এম.এ., ডি.ফিল (অক্সন), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২. জনাব শশী মোহন চক্রবর্তী, এম.এ., প্রাক্তন অধ্যক্ষ, সরকারি মহিলা কলেজ, সিলেট
৩. জনাব ইন্দুভূষণ বড়ুয়া, এম.এ., বি.টি, কুমিল্লা জেলা স্কুল (বৌদ্ধ প্রতিনিধি)

চ. পরীক্ষা সাব-কমিটিঃ

১. মাওলানা আকরম খাঁ
২. জনাব মো. শামসুল হক
৩. অধ্যাপক এম.এম. সুফিয়ান, এম.এ., এম. এড (লীড্স), শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, ঢাকা
৪. অধ্যাপক এম, ওসমান গণী, এম,এ, বি.টি, ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন (লীডস্), শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, ঢাকা
৫. খান বাহাদুর অবদুর রহমান খান
৬. জনাব আলি নূর
৭. খান বাহাদুর জনাব আবদুল হাকীম-
আহ্বায়ক

ছ. নারী শিক্ষা সাব-কমিটিঃ

১. মিস এল.এ. বাকের, বিদ্যালয় পরিদর্শিকা, পূর্ববঙ্গ সভাপতি
২. মিস রাবেয়া খাতুন সদস্য
৩. বেগম সুফিয়া কামাল সদস্য
৪. মিসেস ডব্লিউ. এ. শাদানী সদস্য
৫. মিসেস ফজিলাতুন্নেসা জোহা সদস্য
৬. মিস আনসারী, প্রধান শিক্ষিকা, রমনা প্রিপারেটরি স্কুল, ঢাকা সদস্য
৭. মিসেস শামসুন্নাহার মাহমুদ সদস্য সচিব

কমিটির সদস্যবৃন্দের পরিবর্তন[২৯৬]

কমিটির কার্য মেয়াদকালে কতিপয় সদস্যের পরিবর্তন সাধিত হয়। ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ জুলাই তারিখের সরকারি নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে মৌলভী আবু সাইয়িদ মাহমুদ,

---

২৯৬. Report on Islamic Education and Madrasah Education in Bengal, Dr. Sekandar Ali Ibrahimi. P - 316-317, Vol. - 3

www.pathagar.com

এম.এ., বি.এল, বিশেষ অফিসার, শিক্ষা অধিদপ্তর, পূর্ববাংলা ১৯ জুলাই, ১৯৪৯ খ্রি. থেকে কমিটির সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

রিপোর্ট প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া

উক্ত কমিটি নিম্নবর্ণিত ডকুমেন্টগুলো প্রতিবেদন প্রণয়নে বিশেষ বিবেচনায় আনে যা এব্যাপারে সাহায্য করেছে–

১. ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে করাচিতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান শিক্ষা কনফারেন্সের সিদ্ধান্তসমূহ।
২. পাকিস্তান শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশনের সিদ্ধান্ত সমূহ।
৩. ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দের ভারতের শিক্ষা উন্নয়ন রিপোর্ট (সার্জেন্ট রিপোর্ট)।
৪. ১৯৪৯-৫১ খ্রিষ্টাব্দে বিভিন্ন শিক্ষা কনফারেন্সে গৃহীত সুপারিশমালা।
৫. সিন্ধু সরকার কর্তৃক সমবায় উচ্চ বিদ্যালয় স্কীম সংক্রান্ত প্রস্তুতকৃত সুপারিশমালা।
৬. পাকিস্তান সরকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টার কর্তৃক প্রণীত স্কীম।
৭. পাকিস্তান সরকারের বাণিজ্য শিক্ষা সংক্রান্ত স্কীম।
৮. ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের সিলেটে অনুষ্ঠিত সংখ্যালঘু সংক্রান্ত শিক্ষা কনফারেন্সের স্মারকলিপি।
৯. ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্ববঙ্গ ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের পক্ষে ঢাকার বিশপ কর্তৃক প্রেরিত স্মারকলিপি।
১০. পূর্ববঙ্গ লেজিসলেটিভ এসেম্বলী কর্তৃক প্রেরিত স্মারকলিপি।
১১. ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (স্যাডলার কমিশন) প্রতিবেদন।
১২. ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম শিক্ষা উপদেষ্টা মোমিন কমিটির প্রতিবেদন।
১৩. ১৯৪১ সালের মাদ্রাসা শিক্ষা কমিটি (মাওলা বখশ) কমিটি।
১৪. ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে মাদ্রাসা সিলেবাস কমিটি (মুয়ায্যামুদ্দীন) কমিটি প্রতিবেদন।
১৫. শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন রিপোর্ট ও প্রকাশনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন।
১৬. বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, সাময়িকীতে প্রকাশিত শিক্ষা সংক্রান্ত প্রবন্ধ।[২৯৭]

উপরোক্ত শিক্ষা সংক্রান্ত দলিল, প্রতিবেদন, সুপারিশমালা স্মারকলিপি ও মতামত সম্বলিত প্রবন্ধগুলো প্রতিটি সাব-কমিটি রিপোর্ট প্রণয়ন কালে সুবিবেচনায় এনেছেন যার মাধ্যমে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন সমস্যাবলী চিহ্নিত হচ্ছে। এ চিহ্নিত সমস্যাদি দূরীকরণে এর যথার্থ সমাধান খুঁজে বের করার জন্য কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ নিবেদিত হয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করে তৎসম্বলিত সুপারিশমালা প্রণয়ন করেছেন। তাছাড়া প্রতিটি সাব-কমিটি কর্তৃক পেশকৃত সুপারিশমালা কমিটি সুবিবেচনায় এনে এ প্রদেশের শিক্ষা সংক্রান্ত জটিল সমস্যাদির সমাধানকল্পে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। রিপোর্ট প্রণয়নকালে কমিটি আশা পোষণ করেন যে, এ প্রদেশে সার্বিক শিক্ষা বিশেষত প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার ও পুনর্গঠনে এক গঠনমূলক ভূমিকা ও অবদান রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

---

২৯৭. East Bengal Education System Reconstruction Committee 1949-51.

www.pathagar.com

রিপোর্ট প্রণয়ন ও জমা দানঃ

কমিটির ওপর দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পাদন করার লক্ষ্যে গঠিত সাব-কমিটি রিপোর্ট প্রাপ্তির পর সেগুলো পর্যালোচনাপূর্বক সরকারের বিবেচনার জন্য চূড়ান্ত সুপারিশমালা প্রণয়ন করতঃ তা সরকারের নিকট ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে জমা দেয়া হয়। কমিটির এ রিপোর্ট চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে ওল্ড স্কীম ও নিউ স্কীম বা পুনর্গঠিত মাদ্‌রাসাগুলোর ওপর বিস্তারিত জরিপ পরিচালনা করে এবং মাদ্‌রাসার শিক্ষা সম্পর্কিত নানান অসুবিধার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় এও স্থান পায় যে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উপরোল্লিখিত উভয় ধরনের মাদ্‌রাসায় বা উভয়ের যে কোনো একটি, উভয় মিশ্রণে একটি বা উভয়কে বিলোপ করে এক ধারার শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা যায় কিনা তা খতিয়ে দেখা হয়।

এ সম্পর্কে মাওলানা আকরম খাঁর ব্যক্তিগত মতামত নিম্নরূপ :

Note by Maulana Akram Khan[২৯৭ক]

I am in general agreement with the recommendation of the committee but I do not agree with it on one point namely the stage up to which the old scheme Madrasah system should be intergrated with that of the general secondary education.

The committe has recommended that the old scheme madrasah system should be integrated with the general secondery education up to the junior (or middle) school stage, while the madrasah education sub committee appointed by the committee has proposed that such integration should be only up to the primary stage

I agree with the latter view on the ground that integration of old scheme Madrasah with the secondary schools up to the junior (or middle) school stage, as proposed by the cmmittee, will definitely impair the standard of Islamic education in the madrasah.

সুপারিশমালা

ক. প্রাথমিক শিক্ষা

১. প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস, পরিকল্পনার কৃতকার্যতা প্রধানত নির্ভর করে শিক্ষকদের ওপর। প্রাথমিক শিক্ষকদের শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় বুনিয়াদি শিক্ষা ছাড়াও উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়।

২. শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের গুণগত ও সংখ্যাগত বর্তমান অব্যবস্থা অতিসত্বর দূর করতে হবে।

৩. প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকদের নিম্নতম শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রশিক্ষণসহ মাধ্যমিক পাস হতে হবে।

৪. প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিক পাস হতে হবে।

২৯৭ক. Report of the East-Bengal Educational system recomstruchtion committee, 1949-51, p-44।

www.pathagar.com

৫. প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার প্রয়োজন মেটাতে বর্তমানের অল্প সংখ্যক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যথেষ্ট নয়, এ সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করতে হবে।

৬. সনাতন পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার পূর্ণ পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে উন্নত সরঞ্জাম ও উন্নত ধরনের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করতে হবে।

৭. প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে পুঁথিগত জ্ঞানার্জনের ওপর বেশি গুরুত্ব না দিয়ে ব্যবহারিককরণের সমন্বয়ে একে কার্যকরী করতে হবে, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে যে কোনো বিশেষ বিষয়ে (যেমন সমাজ বিজ্ঞান, অর্থনীতি, লোকপ্রশাসন, সাহিত্য) অধ্যয়নের সুযোগ থাকবে। শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে শিশুর মন-মানসিকতা যাচাই করার একটি বিশেষ স্থান থাকবে।

৮. শিক্ষক প্রশিক্ষণের সময়কাল দুই বছরের নিম্নে হতে পারবে না।

৯. শিক্ষকদের একটা উন্নতমানের সমতুল্য ও পদমর্যাদাসম্পন্ন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থায় 'বি.এ-ইন-এডুকেশন' নামে একটা স্নাতক শিক্ষাক্রম প্রচলন করতে হবে এবং পরবর্তী বৎসর ডিপ্লোমার পর উচ্চতর ডিপ্লোমার জন্য এম.এ.ইন-এডুকেশন কোর্সের প্রবর্তন করা যেতে পারে।

১০. যেহেতু প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের মহিলা হওয়া বাঞ্ছনীয়, সেহেতু মহিলাদের সবরকমের সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। এ উদ্দেশ্যে আলাদা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

১১. এদেশের জন্য একটি 'মহিলা প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়' এবং প্রতি জেলায় একটি করে মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র অতি সত্বর প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন

প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ক্ষেত্রে আকরম খাঁ কমিটি নিম্নরূপ সুপারিশ পেশ করে:

১. প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ক্ষেত্রে 'মহকুমা শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ' একজন নিয়োগকৃত চেয়ারম্যানসহ বর্তমানের স্কুল বোর্ডের স্থান গ্রহণ করবে।

২. শিক্ষা প্রশাসন ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের অংশগ্রহণ থাকতে হবে। বিদ্যালয় ভবন, শিক্ষকদের বাসস্থান নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের নিয়মিত স্কুলে উপস্থিতি ইত্যাদি কাজে প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ্য রাখার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ দায়িত্বশীলভাবে সম্পৃক্ত থাকবে এবং বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদে প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার লাভ করবে।

৩. প্রস্তাবিত মহকুমা শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ যাতে করে তাদের দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করতে পারে তজ্জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ যোগান দিতে হবে।

৪. শিক্ষা করের হার বাড়িয়ে দেয়া যেতে পারে এবং তা থেকে লব্ধ অর্থ দেশের সাধারণ আয়করে জমা করতে হবে। পরবর্তিতে মহকুমা শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদের চাহিদা অনুসারে অনুদান দিতে হবে।

৫. প্রত্যেক থানায় একজন করে পরিদর্শক নিয়োগের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিদর্শন প্রক্রিয়াকে আরও জোরদার করতে হবে।

৬. প্রাথমিক শিক্ষার পরিদর্শন পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন। এ পরিদর্শন একটা বিশেষ পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবমুখী পরিচালনা হিসেবে কাজ করবে এবং যা শুধুমাত্র শিক্ষকদের দৈনন্দিন কাজে সহযোগিতা ও দেখাশুনার চেয়ে পৃথক হবে।

www.pathagar.com

পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবমুখী পরিচালনার জন্য উচ্চ কারিগরি জ্ঞান, বিশেষ প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের প্রয়োজন।

৭. এ উদ্দেশ্যে একটা নতুন পদ সৃষ্টির ব্যবস্থা থাকা দরকার, যার নাম দেয়া যেতে পারে এটেন্ডেন্স অফিসার।

৮. থানা পর্যায়ে সহকারী পরিদর্শকের পদটি বিলুপ্ত করে এর স্থলে এডুকেশন অফিসার হিসেবে এ পদের নামকরণ করতে হবে।

৯. যেহেতু মহকুমা হবে প্রশাসনের প্রাথমিক স্তর, সেহেতু প্রত্যেক মহকুমায় একজন মহকুমা শিক্ষা অফিসার থাকবেন। তিনি 'মহকুমা শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদে'র সম্পাদক হিসেবেও কাজ করে যাবেন এবং একই সঙ্গে প্রস্তাবিত আঞ্চলিক শিক্ষা অফিসারের কাজ তদারক করবেন ও সমন্বয়কারী হিসেবে ভূমিকা পালন করবেন।

১০. আঞ্চলিক শিক্ষা অফিসারের সংখ্যা এমনভাবে নির্ধারিত করতে হবে, যাতে করে তার দায়িত্বে ন্যস্ত অঞ্চলটি একটি স্বাভাবিক আকারে থানার চেয়ে বড় না হয়।

১১. শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য পরিদর্শকের একটি পদ সৃষ্টি করতে হবে।

১২. শিক্ষা পরিদপ্তরে সংখ্যালঘুদের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য একটি অফিসারের পদ সৃষ্টি করতে হবে।

খ. মাধ্যমিক শিক্ষা

১. পাঁচ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষাকাল আরও ৬ বৎসরের হতে হবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভর্তির স্বাভাবিক বয়স ১১ বছর হতে হবে।

২. উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষা দুই ভাবে বিভক্ত হতে হবে- ৬ষ্ঠ শ্রেণি হতে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে অন্তর্ভুক্ত হবে এবং ৯ম থেকে একাদশ পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত হবে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে।

৩. বর্তমানে মহাবিদ্যালয়ের প্রচলিত উচ্চ মাধ্যমিক স্তরটি বিলুপ্ত করে এর একটি শ্রেণিকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত করতে হবে এবং অপরটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ডিগ্রির কোর্সের সাথে যুক্ত করতে হবে।

৪. উচ্চ বিদ্যালয়ে বিভিন্ন পাঠ্য শাখায় ভর্তি মেধা ও দক্ষতার ভিত্তিতে হতে হবে।

৫. শিক্ষার্থীদের নিম্ন মাধ্যমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত করার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং পরবর্তী পর্যায়ে তাদের শিক্ষাক্রমে ঐচ্ছিক বিষয় গ্রহণ করার সুযোগ দিতে হবে।

৬. মাতৃভাষাই শিক্ষার মাধ্যম হতে হবে।

৭. যে সকল শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত অথবা উচ্চ কারিগরি অথবা বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করতে ইচ্ছুক তাদের অবশ্যই ইংরেজি ঐচ্ছিক ভাষা হিসেবে পড়তে হবে।

৮. নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। রাষ্ট্র ভাষার একটা সিদ্ধান্তে না পৌঁছা পর্যন্ত উর্দু অথবা আরবি শিক্ষা দেয়া যেতে পারে।

www.pathagar.com

৯. ধর্মকে মুসলমান শিক্ষার্থীর জন্য বাধ্যতামূলক বিষয় করতে হবে। অমুসলমানদের ক্ষেত্রে ন্যায় ও নৈতিক শাস্ত্রকে সাধারণ বিষয় হিসেবে দেয়া যেতে পারে যদি তারা স্বীয় ধর্মে অধ্যয়ন করতে না চায়।

১০. শারীরিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য কার্যক্রম প্রবর্তন করতে হবে। কিছু কিছু নির্দিষ্ট বিদ্যালয়ে সামরিক প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করতে হবে।

১১. মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যেতে পারে। যেমন– ক. পৃথক নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, খ. পৃথক উচ্চ বিদ্যালয়, গ. সংযুক্ত নিম্ন ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাথে প্রাথমিক বিদ্যালয় যেখানে প্রয়োজন রয়েছে সেখানে তা রাখা যেতে পারে।

১২. সরকারকে উপযুক্ত স্থানে কারিগরি বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করে কম্প্রিহেনসিভ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১৩. সরকারকে প্রত্যেক মহকুমায় আধুনিক ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে অন্ততপক্ষে একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের উন্নয়নসাধন করতে হবে এবং বিদ্যালয়সমূহের স্থানীয় অবস্থার ওপর নির্ভর করে যতগুলো বিভাগ বা বিষয় প্রয়োজন মনে হয়, তা প্রবর্তন করতে হবে। সরকারের সরাসরি অনুদান কোনো স্থানে অবস্থার ওপর নির্ভর করে বাড়ানো বা কমানো যেতে পারে। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ও ছাত্রের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে আবাসিক ব্যবস্থাও করতে পারে।

১৪. শিক্ষার্থীর চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার লক্ষ্যে নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ প্রদেশের সর্বত্র সমানভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যাতে এ বিদ্যালয়সমূহ প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণে পরবর্তী পর্যায়ে ব্যবহার করা যায়।

১৫. নিম্নবর্ণিত ফল লাভের লক্ষ্যে বর্তমানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে একটি কার্যকরী জরিপ চালনা করতে হবে। ক. অযোগ্য ও নিষ্প্রয়োজনীয় বিদ্যালয়সমূহকে অপসারিত, পুনঃবণ্টিত বা সংযুক্ত করা। খ. বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা।

১৬. বেসরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের বেতন স্কেল যতদূর সম্ভব সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমপরিমাণ হতে হবে এবং প্রভিডেন্ট ফান্ড ও চাকরির নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

১৭. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য ১৮০০০ শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য দশ বছর মেয়াদ একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

১৮. পর্যায়ক্রমে দেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার ফলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধিক ছাত্র ভর্তির জন্য পর্যায়ক্রমে চাপ পড়বে তা মোকাবেলা করার জন্য মাধ্যমিক স্কুলের সুযোগ সুবিধার লক্ষ্যে দশ বছর মেয়াদী একটা পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। সেখানে মেয়েদের জন্য যথেষ্টাপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা ভবিষ্যতের জন্য নিশ্চিত করা দরকার।

১৯. বিষয় (যথা বিজ্ঞান, কারিগরি ও বাণিজ্য) পরিদর্শন, শিক্ষা পরিকল্পনা ও গবেষণা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাজ করার জন্য সুপারিশ করা হয়।

www.pathagar.com

২০. ছয়টি রেঞ্জ ইনস্‌পেক্‌টরের পদ বিলুপ্ত করে তদস্থলে ১৫টি জেলা পরিদর্শকের পদায়ন করে মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালনা ও পরিদর্শনের দায়িত্ব দেয়া হবে এবং তাদের পদবি হবে জেলা অফিসার।

২১. প্রতিটি মহকুমা সদরে একজন করে 'মহকুমা শিক্ষা অফিসার' নিয়োগ দান করতঃ নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় ও প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।

২২. প্রাদেশিক সদরে শিক্ষা দফতরে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য একজন সহকারী পরিচালকের পদ থাকবে।

২৩. প্রতিটি বিদ্যালয়ের ছাত্র বেতন দ্বিগুণ করতে হবে। তবে দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে বিশেষ কনসেশন থাকবে।

২৪. সকল মহকুমা বিদ্যালয়ের অন্তত ৫০% খরচ সরকারকে বহন করতে হবে।

গ. মাদ্‌রাসা শিক্ষা

১. বিশেষ বিশেষ ইসলামিক বিষয়সমূহের সমন্বয়ে একটি স্বতন্ত্র বিভাগের ব্যবস্থা রেখে প্রচলিত সাধারণ শিক্ষার সকল গ্রুপের জন্য একান্ত আবশ্যিক বিষয়সমূহ পুনর্গঠিত মাদ্‌রাসা শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সুপারিশ করা হয়।

২. পুরাতন স্কীমের মাদ্‌রাসার স্বীকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমন্বিত প্রচলিত ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রেখে সাধারণ শিক্ষার প্রয়োজনীয় বিষয়াদি মাদ্‌রাসা পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়।

৩. মাদ্‌রাসার ইবতেদায়ি ও দাখিল কোর্সের বিষয়বস্তুকে সাধারণ শিক্ষার সমস্তরে সমন্বিত করতে হবে, যাতে নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা মাদ্‌রাসার আলিম কোর্সে ভর্তি হতে পারে।

৪. মাদ্‌রাসার শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের কোর্সের সময়কাল হবে নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	কোর্সের নাম	মেয়াদ কাল
১	দাখিল	৪ বছর মেয়াদ
২	আলিম	৪ বছর মেয়াদ
৩	ফাযিল	২ বছর মেয়াদ
৪	কামিল	২ বছর মেয়াদ

৫. মাদ্‌রাসার শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার মাধ্যম ও পরীক্ষাদানের ভাষা হবে নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	শিক্ষার স্তর ও পরীক্ষার নাম	শিক্ষার মাধ্যম ও পরীক্ষার ভাষা	কোর্সের মেয়াদ
১	দাখিল	মাতৃভাষা	জুনিয়র স্কুলের মত
২	আলিম	উর্দু	শেষ দুই বছর
৩	ফাযিল	উর্দু	পূর্ণ কোর্স
৪	কামিল	আরবি	পূর্ণ কোর্স

www.pathagar.com

৬. মাদ্‌রাসা কামিল স্তরে ৬টি গ্রুপে/ বিষয়ে পাঠদান করা হবে এবং পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে গ্রুপভিত্তিক। গ্রুপভুক্ত বিষয়গুলোর যথাযথ পাঠদানের জন্য উপযুক্ত সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। বিষয়গুলো হবে নিম্নরূপ :

ক. হাদিস ও তাফসির, খ. ফিকহ্ ও উসুল, গ. আদাব (আরবি সাহিত্য), ঘ. ইসলামি দর্শন ও সুফীবাদ, ঙ. তাবলীগ (কমপ্যারাটিভ রিলিজিয়ন), ও চ. ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি।

৭. কামিল পরীক্ষায় পৃথক ১০০ নম্বরের গবেষণামূলক দীর্ঘ নিবন্ধ সম্পর্কিত একটি বিষয় থাকবে, যাতে শিক্ষার্থীদের পঠিত বিষয়ে জ্ঞানের গভীরতা ও মূল চিন্তাশক্তির পরিমাপসহ তাদের নিজস্ব প্রকাশভঙ্গির যোগ্যতা নিরূপণ করা যায়।

৮. মাদ্‌রাসার আলিম ও ফাযিল পর্যায়ে শিক্ষাক্রমে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে তিনটি ভোকেশনাল বিষয় যথা- ক্যালিওগ্যাফী, কমপোজিটরশীপ ও সাংবাদিকতা অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে তবে সমাপনী পরীক্ষায় সেগুলো অন্তর্ভুক্ত হবে না।

৯. মাদ্‌রাসায় বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে উৎসাহদানের জন্য সরকার বিশেষ অনুদানের ব্যবস্থা করবেন, যাতে করে এ শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ নিশ্চিত করা যায়। উপযুক্ত প্রশিক্ষণার্থীদের বিশেষ বৃত্তিদানের ওপরও জোর দেয়া হয়।

সুপারিশের বাস্তবায়ন

মাওলানা আকরম খাঁর 'পূর্ববঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠন কমিটির' সুপারিশের আলোকেই ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দ হতে প্রচলিত ও লালিত নিউ-স্কিম মাদ্‌রাসাগুলো ক্রমান্বয়ে সাধারণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। তবে অতীব দুর্ভাগ্যের বিষয় এ যে, আকরম খাঁ কমিশনের সুপারিশের মাত্র কিছু কিছু সুপারিশ সরকার বাস্তবায়ন করেন। সুপারিশের সংস্কার প্রস্তাবগুলোর অধিকাংশই বাস্তবায়িত হয় নি।

মূলত প্রদেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা, মহিলা এবং সংখ্যালঘুদের শিক্ষাব্যবাস্থা পুনর্গঠন করা সম্পর্কে পরামর্শ দান করার জন্যই এই কমিটি গঠন করা হয়েছিল।

১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এ কমিটি প্রাদেশিক সরকারের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে সুপারিশ পেশ করেছিলেন। শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কীয় অন্যান্য বিষয়ে চূড়ান্ত সুপারিশও ১৯৫১ সালের জুন মাসে প্রাদেশিক সরকারের নিকট পেশ করা হয়।

OFFICE OF THE EAST BANGAL EDUCATIONAL SYSTEM RECONSTRUCTION COMMITTEE

From: Maulana Muhammad Akram Khan.
President East Bengal Educational system Reconstruction Committee.

To
The Secretary to the Government of East Bengal, Education Department (Through the Director of Public Instruction, East Bangal) Dacca, the 29th June 1951

Sir

I have a honour to invite a reference to Government Resolution No. 659- Ed n, dated the 16th March 1949, and connected correspondence appointing a high-powered committee by the name of East Bengal Educational system Reconstruction committee to advise Government- on the reconstruction of the Present ill balanced system if Education of the province, so as to make it more fitted to meet the new demands of this new state, I now submit herewith two copies of the report of the said committee for consideration of Government.

It will be recalled that an interim report of the committee embodying its recommendations with regard to the reorganization of pre-primary and primary Education was separately submitted to Government under this office letter No. 211. Dated the 17th February 1950.

A Set of questionnaire was drawn up and copies were circulated to more than 1,000 people of different categories, the ripples received to the question naira have been summarized, a copy of which is appended to the report. The committee also took into consideration the replies to a questionnaire on madrasah education issued by the director of Public Instruction East Bengal, in 1948. The replies to this questionnaire were also summarized and are appended to the report.

The delay it the completion and submission of this report is very much regretted. But the committee was greatly hampered in its work, at the beginning, by successive and rapid changes of its secretary, Besides, it-will be realized that the problems that the committee was called upon to tickly were of such a nature that they required deep thinking and deliberation It was no easy task to indicate the lines along which is to be reconstructed the system of education comprising the pre-primary, primary secondary, Madrasah (both old and new), The women's and Minorities Education as well as the system of examination and the school Health Service, The time taken cannot, therefore be said to be inordinate, considering the magnitude of the problems involved in the reconstruction of the entire educational system of the province up to the University stage.

I must however, gratefully acknowledge the great assistance We got in preparation of the report from khan Bahadur Mr. Abdul Hakim and Maulivi Abu Sayed Mahmud, The first named gentle man placed his valuable services ungrudgingly at our disposal and has drafted the chapters on pre-primary and primary Education and the Examination, To Maulvi A. S. Mohmud We owe the draft of the chapters on secondary Education and Madrasah Education, The Director of public Health also deserves our grateful thanks for helping us with the scheme of school Health service.

www.pathagar.com

I must thank all the members and advisers of the committee and its various sub-committees, for their valuable help and co-operation.

In conclusion I should like to place on record the committee's high appreciation of the very sincere and efficient work done by its secretary, Moulvi A. S. Mahmud.

I have the honour to be sir

Your most obedient servant.

President

East Bengal Educational system

Reconstruction Committee Published: East Bengal Government Press, Dacca- 1952।[২৯৮]

দুর্ভাগ্যবশত কি জন্য জানি না, এ সুপারিশ সরকার জনসাধারণের খেদমতে প্রকাশ করেনি। কি জন্য এই সুপারিশ প্রকাশ করা হয় নি তা সরকারই ভালোভাবে জানেন।

ভাষা কমিটির সভাপতি মাওলানা আকরম খাঁ

পূর্ব-বাংলা সরকার ১৯৪৯ সালের ৯ মার্চ যে ভাষা কমিটি গঠন করেছিলেন, তাঁরা ১৯৫০ সালের ১৯ আগস্ট একটি উর্দু লিপি উপ-কমিটি গঠন করেন, মূল কমিটির সভাপতি মাওলানা আকরম খাঁ, আহবায়ক সদস্য ছিলেন এ. এস. মাহমুদ। এস. শরফুদ্দীন, আবুল কাসেম মোহাম্মদ আদমুদ্দীন ও জুলফিকার আলি। উপ-কমিটির কাজ বেঁধে দেয়া হয়েছিল: এস. আবুল হাসানাত মো. ইসমাইল (আবুল হাসনাত নামে পরিচিত) ও এস. শরফুদ্দীন দু'টি বাংলা অনুচ্ছেদ নির্বাচন করে দেবেন, উপ-কমিটি উর্দু লিপিতে তার প্রতিবর্ণীকরণ করবেন এবং উর্দুতে প্রতিবর্ণীকরণের মূল নিয়মাবলীর সুপারিশ করবেন, যাতে ব্যাপকভাবে বাংলা ভাষার সকল ধ্বনির সংস্থান থাকবে।[২৯৯]

বাংলা লিপির পক্ষে বিপক্ষে ভোটদান : ভাষা কমিটির সভাপতি মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ-সহ আটজন সদস্য বাংলা লিপির পক্ষে এবং শেখ শরফুদ্দীন ও জুলফিকার আলি উর্দু লিপির পক্ষে ভোট দেন। শেখ শরফুদ্দীন তাঁর ভিন্নমতও লিপিবদ্ধ করান।

মূল রিপোর্টে ভাষা কমিটি এ-সংক্রান্ত সুপারিশটিও করেছিলেন এভাবে :

যেহেতু শিক্ষা, লিখন, মুদ্রণ, টাইপিং ইত্যাদি সকল আধুনিক ব্যবস্থার উপযোগী করে বাংলা লিপির যথেষ্ট সংস্কার সাধন করা হয়েছে, তাই অন্তত ২০ বৎসরের জন্য বাংলা লিপির স্থলে অন্য কোনো লিপি, রোমান বা উর্দু প্রবর্তিত হবে না। অবশ্য ঐ ২০ বৎসর সময় পার হলে, যখন এই প্রদেশে শিক্ষাবিস্তারের যথেষ্ট অগ্রগতি হবে বলে আশা করা যায়, তখন লিপি-পরিবর্তনের বিষয়টি আবার পরীক্ষা করে দেখা যায়।

---

২৯৮. East Bengal-Educational system Reconstruclion committee 1949-51 ।
২৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২৮।

www.pathagar.com

১৯৪৮ সালের ৯ মার্চ মাওলানা আকরম খাঁ'কে চেয়ারম্যান করে ভাষা কমিটি গঠিত হয়। ভাষা-আন্দোলনের অন্যতম নেতা আবুল কাসেম এ সম্পর্কে বলছেন :

> বাস্তব অসুবিধা দূর করিয়া আমাদের সরকার অফিসে ও আদালতের অফিসিয়াল ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সনের ৯ মার্চ এক সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাওলানা আকরম খাঁ'কে চেয়ারম্যান এবং ড. শহীদুল্লাহ, প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ, ড. এনামুল হক প্রমুখসহ ১৪ জনের একটি উচ্চ পর্যায়ের ভাষা-কমিটি গঠিত হয়।[৩০০]

পূর্ব পাকিস্তানের (তদানীন্তন) শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাও প্রাদেশিক সরকার উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ফলে সরকারি উদ্যোগে দু'টি সংস্কার-কমিটিও গঠিত হয় (১) শিক্ষা-সংস্কার-কমিটি এবং (২) ভাষা-সংস্কার-কমিটি। উভয় কমিটিতে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সভাপতি ছিলেন। মাওলানা আকরম খাঁ'র সভাপতিত্বে ১৬ সদস্যের শিক্ষা-সংস্কার কমিটি পূর্ব-বাংলা সরকার গঠন করেন ১১ মার্চ, ১৯৪৯।[৩০১]

পূর্ব-বাংলা সরকার পূর্ব-বাংলা ভাষা কমিটি (ইস্টবেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ কমিটি) গঠন করেন ১৯৪৯ সালের ৯ মার্চ। কমিটির এরূপ বিচার্য বিষয় নির্ধারণ করা হয় :

(১) পূরভাষিক শব্দ ও অন্যান্য শব্দের প্রতিশব্দ বাংলায় নেই, যতদূর সম্ভব, সে-সবের অনুবাদের প্রস্তাব করা।

(২) বাংলাভাষাকে নির্দিষ্টভাবে পূর্ব-বাংলা এবং সাধারণভাবে পাকিস্তানের মানুষের প্রতিভা ও কৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় বিবেচনা করতে পারেন-এমন অন্যান্য সুপারিশ কমিটি করতে পারেন।[৩০২]

মাওলানা আকরম খাঁ কমিটির সভাপতি ও কবি গোলাম মোস্তফা (প্রধান শিক্ষক) সম্পাদক নিযুক্ত হন। সদস্য ছিলেন : হবিবুল্লাহ (বাহার) চৌধুরী (প্রাদেশিক মন্ত্রী); ডাক্তার এ. এম. মালিক (ঐ); ড. মোয়াজ্জেম হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলর; মওলানা আবদুল্লাহ আল-বাকী, দিনাজপুরের বিধান-পরিষদ সদস্য; ড. মু. শহীদুল্লাহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান; আবুল কালাম শামসুদ্দীন, পরিষদ সদস্য ও ঢাকার দৈনিক আজাদের সম্পাদক সৈয়দ আবুল হাসানাত মোহাম্মদ ইসমাইল, পূর্ব-বাংলা সরকারের পুলিশের ডেপুটি আই. জি. মিজানুর রহমান, পূর্ব-বাংলা সরকারের শিক্ষা বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারি, মজদুদ্দিন আহমদ, সিলেটের এম. সি. কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ; শাইখ শরফুদ্দীন, ঢাকার ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যক্ষ, আবুল কাসেম মোহাম্মদ আদমুদ্দীন, নওগাঁর ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যাপক, জুলফিকার আলি, চট্টগ্রামের আলাভিয়া প্রেসের মালিক, গণেশচন্দ্র বসু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক, মোহিনী মোহন দাস, ঢাকা। এ-ছাড়া কমিটির কাজে বিভিন্ন সময়ে সাহায্য করার জন্য নিম্নলিখিত ভাষাতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞদের কমিটিতে সংযোজন করা হয় : ড. মু এনামুল হক, রাজশাহী

---

৩০০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬১।
৩০১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬৭।
৩০২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬৮।

www.pathagar.com

কলেজের বাংলা বিভাগের প্রফেসর ও প্রধান, আবদুল মজিদ, পূর্ব-বাংলা সরকারের বাংলা অনুবাদক; অজিতকুমার গুহ, ঢাকার জগন্নাথ কলেজের প্রফেসর।

কমিটির প্রথম বৈঠকের দ্বিতীয় দিনে, ২৩ জুন, ১৯৪৯ সালে, জনৈক সদস্য জানতে চান, ভাষার প্রশ্নে সংখ্যালঘুর স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে কমিটির কিছু করার আছে কিনা, নির্ধারিত বিচার্য বিষয়গুলোর মধ্যে এর উল্লেখ নেই। সভাপতি বলেন, 'পূর্ব-বাংলার মানুষ' বলতে সংখ্যালঘুদেরও বোঝায়। তাই কমিটির পবিত্র দায়িত্ব হবে উপযুক্তভাবে তাঁদের প্রয়োজনীয় স্বার্থ রক্ষা করা। তবু দেখা যাচ্ছে, গণেশচন্দ্র বসু ও পরে হরনাথ পাল কমিটির কার্যাবলীর সঙ্গে নিজেদের যুক্ত রাখা যুক্তিযুক্ত নয় বলে মনে করেছেন।[৩০৩]

ভাষা কমিটির উদ্দেশ্য ও করণীয় সম্পর্কে ১৯৪৯ সালের ১০ মার্চ, *দৈনিক আজাদ* -এর 'ভাষা সংস্কার' শীর্ষক সম্পাদকীয় লক্ষণীয়। সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

> '.... অনেক দিন হইতেই এরূপ একটি কমিটি গঠনের জল্পনা-কল্পনা চলিতেছিল। কিন্তু কি কারণে ইহা গঠনে এত দেরী হইল, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। .... কমিটিতে অনেক যোগ্য ব্যক্তি রহিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু কমিটির গঠন ও মনোনয়নের ব্যাপারে আরো একটু সতর্কতা এবং বিবেচনার পরিচয় দিলেই ভাল হইত। সরকারী ছাপমারা ব্যক্তিদের প্রতি আরো একটু কম নজর দিলেই সুন্দর হইত। এসব দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও আমরা কমিটির নিকট সত্যিকারের কাজ আশা করি। জাতি গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁদের উপর যে গুরুদায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে, আশা করি তাহা তৎপরতা, বিচক্ষণতা এবং সাফল্যের সাথেই পালন করিবেন। সুতরাং কমিটির দায়িত্ব আজ অসীম এবং দায়িত্ব যদি তাঁরা সুষ্ঠুভাবে ও সুন্দরভাবে পালন করিতে পারেন, তবে পূর্ব্ব পাকিস্তানের ভাষা ও সাহিত্যে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হইবে।[৩০৪]

আবুল কালাম শামসুদ্দীন লিখেছেন :

> মাওলানা মোঃ আকরম খাঁ সাহেবের বাড়ীর বৈঠকখানা ঘরেই সাধারণতঃ ভাষা-সংস্কার কমিটির বৈঠক বসত। দীর্ঘ কয়েক মাস কয়েকটি বৈঠকে ভাষা-সংস্কার সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। পাকিস্তানী ভাবধারার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাঙলা ভাষাকে নবরূপ দেয়ার জন্য এর কোনো্ কোনো্ বিষয়ে সংস্কার অপরিহার্য হয়ে পড়েছে, তা নিয়ে কমিটির সভায় তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হত। আমি ছিলাম এর বহুল সংস্কারের পক্ষপাতী। বর্ণমালা থেকে শুরু করে ব্যাকরণ পর্যন্ত এর আদ্যন্ত সংস্কার দরকার, কমিটির অধিকাংশ সদস্যেরও অভিমত ছিল এই ধরনের। আমাদের মতে, বাঙলা ব্যাকরণ নামে যা প্রচলিত রয়েছে, তা সংস্কৃত ব্যাকরণ ছাড়া আর কিছু নয়। বাঙলা ভাষাকে যেহেতু সংস্কৃতের দুহিতা, কিংবা দৌহিত্রী বলে আমরা স্বীকার করি না, তাই সংস্কৃত ব্যাকরণকে আমরা বাঙলা ব্যাকরণ বলে মানতে পারি না। আমাদের এই ধরনের অভিমত শুনে গণেশবাবু অবশ্য একটুখানি আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন এই বলে যে, ব্যাকরণ সম্পর্কে

৩০৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬৯।
৩০৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭১।

www.pathagar.com

> আমরা যেনো কোনো অভিমত প্রকাশ না করি, কারণ সে সম্পর্কে অধিকারী মাত্র তাঁদের মতো সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তিরাই। আমরা এর উত্তরে গণেশবাবুকে জানিয়েছিলাম : দেখুন গণেশবাবু, বাঙলা ভাষাকে সংস্কৃতের আওতা থেকে মুক্ত করে আমরা যেভাবে এর সংস্কার করতে চাইছি, তাতে আপনার মতো সংস্কৃত পণ্ডিত কোনো কথা না বললেই সম্ভবতঃ শোভন হয়। এরপর গণেশবাবু আর বিশেষ কোনো উচ্চবাচ্য করেন নাই এবং তাঁকে ভাষা-সংস্কার-কমিটির পরবর্তী কোনো বৈঠকে আর দেখাও যায় নাই।[৩০৫]

মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ঢাকার সলিমুল্লাহ হলে পূর্ব পাকিস্তান সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে 'পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা সমস্যা' সম্পর্কিত এক সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন। সে ভাষণেও তিনি অফিস আদালতের ভাষা বাঙ্গলাই হবে বলে জোর দিয়েছেন যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।[৩০৬]

ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারির পর প্রকাশ্য আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়লেও রাষ্ট্রভাষা বিষয়ে বিশেষ করে *দৈনিক আজাদ* পত্রিকায় লেখালেখি অব্যাহত থাকে।

আজাদের ২১ ফেব্রুয়ারি সংখ্যা বাজেয়াপ্ত:

বাংলা ভাষার আন্দোলন ও স্বার্থকে ১৯৫২ সালেও পূর্ব বাংলার সব পত্র-পত্রিকা সমর্থন করেনি। বিশেষ করে, ঢাকার নাজিমুদ্দিন সাহেবদের দৈনিক 'মর্নিং নিউজ' ও নূরুল আমিন সাহেবের 'দৈনিক সংবাদ' বিরোধিতা করেছিল বলে বহুলভাবে উল্লেখিত আছে। এম, আর আখতার মুকুল তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন :

> একুশে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় মাওলানা আকরম খাঁ'র *আজাদ* পত্রিকা'র বিশেষ সংখ্যা বেরুলে হেডিং ছিলো, 'ছাত্রদের তাজা খুনে ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত'। ২১ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় এ দিনের ঘটনাবলীর সংবাদসহ দৈনিক আজাদের বিশেষ সংখ্যা বের হয় এবং সরকার এ সংখ্যাটি বাজেয়াপ্ত করেন। আবুল কালাম শামসুদ্দিন লিখেছেন : গুলী বর্ষণের নিন্দা করে সে-সংখ্যায় অগ্নিবর্ষী ভাষার যে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে ঢাকার নাগরিক মহলে বিশেষ করে ঢাকার যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল বলে শুনেছি।[৩০৭]

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, কাউকে অধিকার বঞ্চিত করা অন্যায়। ধনবল, জনবল দিয়ে কারো অধিকার চিরদিন দাবিয়ে রাখা যায় না। ইতিহাসের ধর্মও হচ্ছে, যার যা পাওনা তা ফিরিয়ে দেয়া। এ ধারাবাহিকতায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের *আজাদী* ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে, ইংরেজির যাঁতাকল থেকে এদেশের মানুষ অনেকটা মুক্ত হয়েছে, একই ধারাবাহিকতায় উর্দুকেও এদেশের মানুষ বর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। মাতৃভাষা বাংলা এখন আমাদের গর্ব। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস সেদিনই সম্পূর্ণ হবে, যেদিন আন্দোলনের পুরোভাগের অগ্রজদের যথার্থ মর্যাদা ফিরিয়ে দেয়া হবে। রচনা করা হবে সঠিক ও সত্য ইতিহাস।

---

৩০৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭১।
৩০৬. দৈনিক আজাদ, ১৫-১২-১৯৪৭।
রেজোয়ান সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২।
৩০৭. ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬০।

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠায় মাওলানা আকরম খাঁ ও *আজাদ*-এর ভূমিকা:

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রথম 'বাংলা একাডেমী' কথাটি ব্যবহার করেন। কিন্তু প্রস্তাবাকারে জনসম্মুখে পত্রিকার মাধ্যমে সর্বপ্রথম *দৈনিক আজাদ* -ই 'বাংলা একাডেমী' প্রতিষ্ঠার দাবি উত্থাপন করে। এ সম্পর্কে মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্ লিখেছেন :

> *দৈনিক আজাদ* ১৯৫৪ সালের অনেক আগে, বায়ান্নোর ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের সময়কালেই একটি 'বাংলা একাডেমী' প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং এ ব্যাপারে *আজাদ* সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।[৩০৮]

১৯৫২ সালের ২৯ এপ্রিল *আজাদ আমাদের অতীত* শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এটাকে এক ঐতিহাসিক দলিল বলা যায়। কারণ, এতেই আমরা প্রথম স্পষ্টত বাংলা একাডেমী নামধেয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের দাবি জানাতে দেখি।[৩০৯] আজাদের সম্পাদকীয়তে আরও বলা হয় :

> পূর্ব্ব পাকিস্তানের বাংলাভাষী মুসলমানের তমদ্দুনিক জীবন এক সংকটজনক পর্যায়ে উপস্থিত হইয়াছে। ঐতিহ্যবিহীন বা ঐতিহ্যভোলা মানব সমাজ পরিণামে দাসত্ববরণ করিতে বাধ্য হয়। কেবল রাজনৈতিক অধিকার দ্বারা সে গোলামী রোধ করা যায় না। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, বাঙালি মুসলমানদের একটা বিরাট অতীত ইতিহাসের অস্তিত্ব সত্ত্বেও তাহা আজ আমাদের নিকট অজ্ঞাত ও অপরিচিত। সেই সামাজিক ও জাতীয় ইতিহাস উদ্ধার, গঠন ও রচনাই আজ দেশের সুধীবৃন্দের প্রধানতম কর্তব্য। আমরা বিশ্বাস করি, সরকার, মোছলেম লীগ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ কার্য্য সাধনের পথ সহজ ও সুগম হইতে পারে।
>
> ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে আমরা সত্বর একটি 'বাংলা একাডেমী' প্রতিষ্ঠা করিতে অনুরোধ জানাই। আমরা আশা করি, বিশ্ববিদ্যালয় এ ক্ষেত্রে সরকার ও মোছলেম লীগের সহযোগিতা হইতে বঞ্চিত হইবেন না। দেশের জনসাধারণও এ বিষয়ে সহযোগিতা করিতে অগ্রণী হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।[৩১০]

বশীর আল হেলাল বলেন:

> *আজাদ* পত্রিকাকেই আমরা নির্দিষ্টভাবে 'বাংলা একাডেমী' নামটি প্রথম প্রস্তাবিত হতে দেখলাম। *আজাদ* পরে সম্পাদকীয় উপ-সম্পাদকীয়তে বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠার দাবী জোরালোভাবে তুলে ধরেছিলো।[৩১১]

দৈনিক আজাদ কার্যালয়ে বাংলা একাডেমী স্থাপন সম্পর্কে কথাবার্তা হতো। লেখক-সাংবাদিকরা এই নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন। *দৈনিক আজাদ* -এর কর্মরত কাণ্ডারী সাহিত্য মজলিসের সম্পাদক দেওয়ান আবদুল হামিদ এক প্রবন্ধে লিখেছেন :

> স্মৃতিপটে যতটুকু ভেসে ওঠে তা থেকে বলতে পারি, *দৈনিক আজাদ* পত্রিকাই বাঙলা একডেমী প্রতিষ্ঠার দাবী নিয়ে সর্বপ্রথম অগ্রসর হয়। এর পেছনে ছিলেন, *আজাদ* সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন, জনাব মুজিবর রহমান খান, সৈয়দ

---

৩০৮. বাংলা একাডেমীর ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৬, পৃ. ১০-১৫।
৩০৯. প্রাগুক্ত।
৩১০. প্রাগুক্ত।
৩১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

www.pathagar.com

শাহাদাত হোসেন, বিখ্যাত নাট্যকার জনাব আকবর উদ্দীন প্রমুখ। সকলের পরামর্শদাতা ছিলেন পত্রিকার মালিক ও পরিচালক মুসলিম সাংবাদিকতার জনক মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ।[৩১২]

১৯৫৩ সালের ৩০ আগস্ট রোববার অপরাহ্ণ আড়াইটায় রমনাস্থ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাইস চান্সেলরের গৃহে বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় *বাংলা একাডেমী* সংক্রান্ত একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত বিবেচিত হয়। একজিকিউটিভ কাউন্সিল কোর্টের বাংলা একাডেমী চালু করার প্রস্তাব নীতিগতভাবে গ্রহণ করেন এবং কমিটি গঠন করে একটি স্কীম প্রণয়নের জন্য বিষয়টি তার কাছে প্রেরণ করেন। উল্লেখযোগ্য সদস্য নিয়ে উক্ত কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ।[৩১৩]

অনেক চড়াই-উৎরাইয়ের পর ১৯৫৫ সালের ২৬ নভেম্বর পূর্ব-বাংলা সরকার বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। [৩১৪] ১৯৬০ সালে মাওলানা আকরম খাঁ 'বাংলা একাডেমী'র ফেলো নির্বাচিত হন।[৩১৫]

বাংলা একাডেমীর প্রথম সভাপতি : মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ:

১৯৬১ সালের ৩ আগস্ট একটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সরকার মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ'কে সভাপতি মনোনীত করেন। অবশ্য, এর পূর্বে ১৯৫৭ সালের বাংলা একাডেমী আইনের ৪(১)(বি) ধারার বিধান ছিল পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী পদবলে বাংলা একাডেমীর সভাপতি হবেন। সেই অনুযায়ী ঐ বছরের ১০ আগস্ট থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীগণ পদাধিকারবলে বাংলা একাডেমীর সভাপতি ছিলেন। ১৯৬০ সালে আইনের সংশোধন হলে বিধান হয়, পূর্ব-পাকিস্তানের গবর্নর একাডেমীর সভাপতি মনোনীত করেন। সেই অনুযায়ী উক্ত সনের ৩ আগস্ট এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে গবর্নর অনুগ্রহ করে ১৯৬১ সালের জন্য মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ'কে একাডেমীর প্রথম সভাপতি মনোনীত করেন।[৩১৬]

নিম্নে বাংলা একাডেমীর সভাপতিমণ্ডলীর তালিকা দেওয়া হলো :

<u>বাংলা একাডেমীর সভাপতিমণ্ডলী, ১৯৮৪ পর্যন্ত</u>[৩১৭]

মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ- ১৯৬১

মুহাম্মদ বরকত উল্লাহ - ১৯৬২-৬৩

ড. মুহাম্মদ কুদরত-ই-খুদা - ১৯৬৪-৬৫

সৈয়দ মুর্তজা আলি - ১৯৬৯-১৯৭১

৩১২. বাংলা একাডেমীর ইতিহাস, প্রাগুক্ত।

৩১৩. উক্ত কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হলেন, (১) ভাইস চ্যান্সেলর,(২) সকল অনুষদের ডীনগণ, (৩) ড. এনামুল হক, (৪) খান বাহাদুর আবদুর রহমান খান, (৫) টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ, (৬) প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ, (৭) ড. কুদরত-ই-খুদা, (৮) ড. এম,এ গনি, (৯) কাজী মোতাহার হোসেন, (১০) সম্পাদক, আজাদ, (১১) সম্পাদক, 'সংবাদ'।

৩১৪. বাংলা একাডেমীর ইতিহাস, প্রাগুক্ত , পৃ. ৩৫।

৩১৫. বাংলা একাডেমীর ইতিহাস, প্রাগুক্ত , পৃ. ১২৮।

৩১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮, ২১২।

৩১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩০ (পরিশিষ্ট ৫)

www.pathagar.com

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন - ১৯৭২-১৯৭৪
সৈয়দ মুর্তজা আলি - ৮ মার্চ ১৯৭৫ থেকে ৭ মার্চ ১৯৭৭
সৈয়দ আলি আহসান - ১০ অক্টোবর ১৯৭৭ থেকে ৯ অক্টোবর ১৯৭৯
আ, ফ, ম আবদুল হক - ১৪ জুলাই ১৯৮০ থেকে ১৩ জুলাই, ১৯৮২
আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ- ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৮২ থেকে ৩ জুন ১৯৮৪ (আমৃত্যু)

উল্লেখ্য, পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষা-মন্ত্রীগণ (পদাধিকারবলে) ১০ আগস্ট, ১৯৫৭ থেকে ২৫ জুলাই ১৯৬০, সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

ঘ. সাহিত্য সাধনা ও রচনাবলী

সাহিত্য সাধনা করে যাঁরা সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন, মাওলানাকে সে মানদণ্ডে বিচার করা যায় না। তিনি নিজেকে সাহিত্যিক বলে কখনো দাবি করেন নি। নিরেট সাহিত্য সাধনা তাঁর জীবনের ব্রতও ছিল না। তিনি মূলত ধর্ম, রাজনীতি, সাংবাদিকতা ও সমাজ সংস্কারমূলক কাজেই তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করেন। তিনি এই মিশন নিয়ে কর্মজীবনের প্রারম্ভেই সাংবাদিকতা করেছেন, পত্র-পত্রিকায় অসংখ্য লেখা লিখেছেন। এসবের মাধ্যমে উপমহাদেশের উদাসীন মুসলমানদের জাগ্রত করেছিলেন। তাঁর রচনার মূল প্রতিপাদ্য মুসলিম সমাজের উন্নতি-অগ্রগতি ও সমাজ সংস্কার। সমাজে যে-সব বিজাতীয় অপসংস্কৃতি জমাট বেঁধেছিল, তিনি সেগুলোর বিরুদ্ধেও লিখেছেন। বিশেষ করে, উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শক্তিকে এ দেশ থেকে বিতাড়িত করার জন্য তাঁর তেজোদ্দীপ্ত লেখনী অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। তিনি একই সময় সাপ্তাহিক, মাসিক, পাক্ষিক ও দৈনিকসহ বেশ কয়েকটি পত্রিকার সম্পাদনাও করেছেন। এটা বিরল দৃষ্টান্ত। উপমহাদেশের মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ সংগঠন *মুসলিম লীগ* ও স্বাধীনতা আন্দোলনকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য *দৈনিক আজাদ* যুগান্তকারী ও বিপ্লবী ভূমিকা পালন করে। এই পত্রিকার মাধ্যমে আত্মবিস্তৃত মুসলিম জাতি তার প্রকৃত ঠিকানার সন্ধান পায়। মাওলানা আকরম খাঁ তাঁর শাণিত লেখা ধারণ করে বাংলার মুসলিম সমাজকে *আজাদী*র জন্য উজ্জীবিত করে তোলেন।

১৯১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় মহা-সম্মেলন।[৩১৮] উক্ত সম্মেলনের সাহিত্য শাখার সভাপতি মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ তাঁর ভাষণে আমাদের সাহিত্যের প্রকৃতি কেমন হবে', তার সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরে বলেন :

> বঙ্গ মোছলেম ইতিহাসের সূচনা হইতে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষাই তাহাদের লেখা ও কথা মাতৃভাষা রূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও মাতৃভাষা রূপে ব্যবহৃত হইবে। এদেশে মুসলমানের প্রাদুর্ভাব আর বঙ্গভাষার উৎকর্ষ-ইতিহাসের

৩১৮. জাতীয় জাগরণের মহান উদ্দেশ্য নিয়ে চট্টগ্রামের চিন্তাশীল, জ্ঞানী-গুণী, ধর্ম, শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ ও ছাত্র আন্দোলনের যৌথ উদ্যোগে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম- (ক) মাওলানা আজাদ সোবহানী, (খ) মৌলবী মোহাম্মদ আকরম খাঁ, (গ) বঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষা সমিতির সভাপতি মিঃ আমিনুর রহমান, (ঘ) শিক্ষা সমিতির সেক্রেটারি মৌলবী ওয়াহেদ হোসেন, (ঙ) ছাত্র সম্মেলনের সভাপতি মৌলবী মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও (চ) সওগাত সম্পাদক নাসির উদ্দীন প্রমুখ।
মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ, ১৯৮৫, পৃ. ৪৬।

www.pathagar.com

একই পৃষ্ঠায় লিখিত আছে। মুসলমান বঙ্গভাষাকে নিজের মাতৃভাষা রূপে গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, বরং তাহারাই যে বঙ্গভাষার প্রথম পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহদাতা ছিলেন, এ কথার সাক্ষ্য দিতেছে। দীর্ঘ ছয়টি শতাব্দী অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। যখন বঙ্গভাষা দীনহীন বেশে তখনকার বিদ্বৎ সমাজের এবং হিন্দু নরপতিগণেরও নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া হতাশ হইয়াছিল, যখন 'ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরের' ন্যায় পদ আওড়াইতে না পারিলে কেহ লোকের নিকট শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত হইতে পারিতেন না, যখন বঙ্গভাষায় শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদকদের জন্য তখনকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা গোঘ্ন, ভ্রূণহা, ব্রাহ্মণঘাতী ইত্যাদি মহাপাতকীদিগের, নির্ধারিত 'রৌরব' নামক ভীষণ নরকের ব্যবস্থা করিতেছিলেন,বঙ্গভাষার সেই অতি কঠিন বিপদের সময় মুসলমানগণ তাহাকে লইয়া পঞ্চগৌড়েশ্বরের মণিমুক্তা-বিখচিত রাজসিংহাসনে বসাইয়া রাজরাজেশ্বরী করিয়া দিয়াছিল। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণই বঙ্গভাষার গৌরব-সৌধের ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

ভক্তগণের আন্তরিক সেবা ব্যতীত কোনো ভাষাই সাহিত্যে পরিণত হইতে পারে না। আবার যে জাতির নিজস্ব সাহিত্য নাই, জগতে জাতি হিসেবে তাহার কোনো অস্তিত্ব নাই। কাল-চক্রের আবর্ত্তন-বিবর্ত্তনে পড়িয়া মানব সমাজকে এক এক সময় অতি মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়। এই সময় একমাত্র তাদের জাতীয় সাহিত্যই তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে। শরীর রক্ষার জন্য যেমন বিভিন্ন খাদ্য হইতে বিভিন্ন রস গ্রহণ করিতে হয়, ঠিক সেইরূপ মাতৃভাষার মধ্যবর্তিতায় বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন ভাষার অফুরন্ত জ্ঞানভাণ্ডার হইতে রস সঞ্চয় করিয়া সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিতে হয়।

আরবি, ফার্সি শব্দের প্রচলন যখন বন্ধ করা যাইবে না, তখন ঐ সকল শব্দ বাঙ্গলা ভাষায় যাহাতে শুদ্ধ করিয়া লিখিতে পারা যায়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। এ জন্য আমাদের বিশেষজ্ঞ লোকদিগকে বিশেষ আলোচনা ও গবেষণা করিয়া লিখন প্রণালীর একটা Standard ঠিক করিয়া দিতে হইবে। এবং মুসলমান লেখকগণের সকল পুস্তকে এবং মুসলমান পরিচালিত সমস্ত সংবাদ ও সাময়িকপত্রে তাহা চালাইয়া দিতে সকলের চেষ্টা করিতে হইবে, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে এই লিপি বিভ্রাটের প্রতিকার হইয়া যাইবে।[৩১৯]

মূল সভাপতির ভাষণে মাওলানা বলেন:

আমাদের বহু কিছুরই অভাব রহিয়াছে, এই কারণে আমাদের অভিযোগও রহিয়াছে, এইরূপ অভিযোগ শুনা যায়। গত ১১ বৎসর পূর্বে পূর্ব বাংলার সাহিত্যিকগণ সমাজকে কিছুই দিতে পারেন নাই। কিন্তু আমি বলিতে চাই যে,

---

৩১৯. 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য মাহফিলের' উদ্যোগে ১৯৫৮ সালের ২,৩ ও ৪ মে চট্টগ্রামে 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মোলনের' আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্বের অন্যান্য সভাপতি ছিলেন- অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ, আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, অধ্যাক্ষ জয়নুল আবেদীন। দৈনিক আজাদ, ২৪-৪-১৯৫৮ ইং।
রেজোয়ান সিদ্দিকী, ড. পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬, পৃ. ২৪৮।

www.pathagar.com

> আমাদের কবি সাহিত্যিকগণ অতিমানব নন, তাঁহারা স্বাভাবিক ও সাধারণ মানুষ। তাঁহাদিগেরও অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে হয় এবং পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের চিন্তা করিতে হয়। আমার মনে হয়, যতদিন পর্যন্ত এই সমস্যার যুক্তিসঙ্গত সমাধান না হয়, ততদিন পর্যন্ত আমরা অভিযোগ করিতে পারিব না। আমাদের অভিধান, ইতিহাস, পাকিস্তানী বাংলা ভাষায় নতুন ব্যাকরণ, নাটক, উপন্যাস এবং অন্যান্য বহু জিনিসের প্রয়োজন। এই প্রয়োজন যদি প্রকৃত ও বাস্তব হয়, তাহা হইলে আমরা ঐক্যবদ্ধ হইয়া যথেষ্টাপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারি।[৩২০]

উপরোক্ত সম্মেলন শেষে *মাসিক মোহাম্মদী* সম্মেলনের সকল নিবন্ধ নিয়ে একটি 'সাহিত্য সম্মেলন সংখ্যা' প্রকাশ করে। সম্পাদকীয়তে সম্মেলনের প্রশংসা করে দু'বঙ্গের সাহিত্যের ভিন্নতা ও অভিন্নতা সম্পর্কিত সাহিত্যিক বিতর্কের পর্যালোচনায় বলা হয় :

> পাক-বাংলার সাহিত্যিক স্বকীয়ত্বের ঘোষণা গোলামীর প্রতিবাদ। ষড়যন্ত্রের মৃত্যু কামনা ও সুস্থতার জয়যাত্রার স্বাক্ষর। সুন্দরের রাজ্যে বাধা-নিষেধের প্রাচীর নাই সত্য, কিন্তু কঠিন বাস্তবের মাটিতে পা রাখিয়াই সুন্দরের স্বপ্নালোকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হয়। সুতরাং পাকিস্তানের সাহিত্য পাকিস্তানবাদের পশ্চাতভূমিতে দাঁড়াইয়াই মুক্ত আকাশতলের আলোক ও বৃদ্ধিধারায় নাহিয়া ফুলে-ফলে মঞ্জুরিত ও বিকশিত হইবে। এছলাম পাকিস্তানবাদের মূল ধারায় আবেহায়াতের যে অমৃতত্ব যুক্ত করিয়া দিয়াছে, তাহা হইতে আমাদের বিচ্যুতি চলে না। সে বিচ্যুতির অর্থ আত্মহত্যার সামিল। চাটগাঁ সম্মেলনের বিভিন্ন ভাষণে, বিভিন্ন প্রবন্ধ ও আলোচনায় বৈচিত্র্য আছে যথেষ্ট। নানাভাবে ও নানা দিক হইতে সাহিত্যিক ও সুধীরা আমাদের সাহিত্যিক ও সমস্যাকে দেখিয়াছেন এবং আমাদের ঐতিহ্য ও দেশের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের সমাধান খুঁজিয়াছেন। কিন্তু তাঁদের সকল বৈচিত্র্যে বিভিন্নতাকে ছাপাইয়া যে সুরটি বার বার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে, তাহা হইল পাক-বাংলার বৈশিষ্ট্যের কথা, তার স্বাতন্ত্র্যের কথা ও তার সিরাতুম মোস্তাকিমের কথা। এই ঘোষণার আজ প্রয়োজন ছিল। কারণ এতে বহু ভুল বুঝাবুঝির অবসান হইল এবং আমাদের যাত্রাপথের সম্মুখবর্তী অধ্যায় আলোকদীপ্ত হইয়া উঠিল।[৩২১]

মাওলানা আকরম খাঁ সম্পাদিত *দৈনিক আজাদ* পত্রিকায় রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ১৩৬৮ সনের (১৯৬১ খ্রিঃ) ১ বৈশাখ প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথ ও মাওলানা *আজাদ*' শীর্ষক এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে উভয়ের সমালোচনা করে বলা হয় :

> রবীন্দ্রনাথের দোহাই পাড়িয়া অখণ্ড বাংলার আড়ালে আমাদের তামদ্দুনিক জীবনে বিভেদ ডাকিয়া আনার সুযোগ দেওয়া চলিবে না। একদল লোক পশ্চিম বাংলার সাহিত্যের অন্ধ অনুসারী ও ভক্ত। তাদের রবীন্দ্র-ভক্তি বিপদের কারণ হতে পারে

---

৩২০. রেজোয়ান সিদ্দিকী, ড., পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬, পৃ. ২৫১।
মাসিক মুহাম্মদি, সাহিত্য সম্মোলন সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৬৫ বাং,পৃ. ৮৫৫।

৩২১. দৈনিক আজাদ, ১৭-০৫-১৯৫৮।

www.pathagar.com

এবং বাইরের যারা পাকিস্তানকে দ্বিধাহীন মনে গ্রহণ করেন নাই, তারা এই সুযোগ তামদ্দুনিক অনুপ্রবেশের খেলায় নামিতে পারে।[৩২২]

পাকিস্তান ইসলামি আদর্শ বাস্তবায়নের সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি নিয়ে দুনিয়ার বুকে জন্ম লাভ করেছে। পাকিস্তানীরা তাই স্বকীয় তাহযীব তমদ্দুনের পরিপন্থী কোনো প্রচেষ্টাকেই বরদাস্ত করতে পারেন না। তারা বলেন, রবীন্দ্রনাথের বহু সঙ্গীত মুসলিম তমদ্দুনকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে হিন্দু সংস্কৃতি ও যৌন ভোগলালসার জয়গান গেয়েছে।[৩২৩]

পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের মাপকাঠিতে মাওলানা আকরম খাঁ'র প্রকৃত সাহিত্য প্রতিভার মূল্যায়ন করা কষ্টসাধ্য। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল সাহিত্য সৃষ্টিনয়, ধর্ম ও সমাজচিন্তা। এ ক্ষেত্রে তিনি জাত-গবেষক এবং গভীর চিন্তা উদ্দীপক। দীর্ঘকাল সাধনা করে তিনি বিভিন্ন ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। জীবনে তিনি যে ক'টি গ্রন্থ লিখে গেছেন, নিঃসন্দেহে তা আমাদের সাহিত্য জগতের অমর কীর্তি। তাঁর গ্রন্থগুলোর সাহিত্যিক মূল্যমান যা-ই হোক না কেন, অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিকোণ থেকে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, তাঁর বেশির ভাগ গ্রন্থই গবেষণামূলক। তিনি আরবি, ফার্সিসহ বিভিন্ন ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তাই তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় বই-পুস্তক থেকে জ্ঞান আহরণ করে ধর্ম, ইতিহাস ও সমাজ চিন্তামূলক মৌলিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁর প্রত্যেকটি গ্রন্থই মনে হয় অনেকগুলো গ্রন্থের সারসংক্ষেপ। এমনকি, তাঁর গ্রন্থসমূহের বিষয়াবলি দেখলে বোঝা যায়, প্রত্যেকটি বিষয়ই একটি বিরাট গ্রন্থের সূচিপত্র মাত্র।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বুদ্ধিজীবী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল বারী বর্তমান গ্রন্থের লেখকের সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন :

মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ'র রচনাবলীর উপর একটি নয়, কয়েকটি গবেষণামূলক গ্রন্থ হতে পারে।[৩২৪]

মুসলিম চিন্তা-চেতনায় উদ্দীপ্ত লেখক বাংলা সাহিত্যে লেখা শুরু করলে তাদের হাতে বাংলা সাহিত্য স্বাভাবিকভাবেই মুসলমানি রূপ পেতে শুরু করে। এতেই শুরু হয় গণ্ডগোল। হিন্দু সাহিত্যিকরা একে চিরন্তনের পরিপন্থী বলে হুঙ্কার দিতে থাকেন। সাহিত্যের নতুন বৈচিত্র্য বলে অভিনন্দন জানাবেন কী, তাঁরা এতে বাংলা সাহিত্যের জাত নাশের কাল্পনিক বিভীষিকায় আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তাঁদের ধারণা, তাঁরা যে রূপ-সজ্জায় বাংলা সাহিত্যকে সাজিয়েছেন, তা-ই একমাত্র রূপ। বাঙালি মুসলমানরা চলবেন তাঁদের দেয়া বাংলা সাহিত্যের সেই রূপকে অনুসরণ করে। এ ধারণা সত্যি হতে পারে না। উভয়ের ধর্মই পৃথক। মানুষের জীবনযাত্রার প্রণালীর উপর ধর্মের প্রভাব অনেকখানি। সুতরাং বাঙালি মুসলমানরা কিন্তু একই পারিপার্শ্বিকতার বাসিন্দা হলেও ধর্মের প্রভাবের জন্য উভয়েরই জীবন প্রণালী পৃথক। এ কারণে তাদের সৃষ্ট সাহিত্যের প্রকাশভঙ্গি অনেকটা পৃথক হবে- এটাই স্বাভাবিক। এ পরিস্থিতিতে মুসলমানদের সৃষ্ট

---

৩২২. রেজোয়ান সিদ্দিকী, ড., পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬, পৃ. ৩৪৯।

৩২৩. রেজোয়ান সিদ্দিকী, ড., প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬০।

৩২৪. সাক্ষাতকার, প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল বারী, উপাচার্য ভবন, ধানমন্ডি, তারিখ ঃ ১০/০২/৯৬, সময়, সকাল ১০ টা।

www.pathagar.com

সাহিত্যে মুসলমানি প্রকাশভঙ্গি দেখে হিন্দুদের আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ ছিল না। তারপরও তারা ছিলেন আতঙ্কগ্রস্ত। এর বিরুদ্ধে মাওলানাসহ আরো অনেকেই নিরাপোষভাবে কলম ধারণ করেন। বস্তুত সাহিত্যের একটা বৈচিত্র্য মাত্র মাওলানার সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্যবোধের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। আকরম খাঁ ছিলেন মূলত গভীর চিন্তার অধিকারী, গবেষক, সাহিত্যিক ও সুপণ্ডিত। ভাষার উপর অপরিসীম দখল থাকায় তাঁর জ্ঞানগর্ভ রচনাবলী বিশেষত রাসুল (স.)-এর জীবনীসম্বলিত গ্রন্থ *মোস্তফা চরিত, মোসলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, তাফসিরুল কুরআন* ইত্যাদি সবার নিকট বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হিসেবে পরিগণিত। এ-সব কারণে, বিশেষভাবে সাহিত্য ক্ষেত্রে অবদানের জন্য আকরম খাঁ'কে পাকিস্তান সরকার প্রাইড অব পারফরমেন্স পদকেও ভূষিত করেন।[৩২৫]

বলা দরকার যে, সাহিত্যসেবার মনোভাব নিয়ে তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রে আগমন করেন নি। তাঁর সাহিত্য ক্ষেত্রে বিচরণ ছিল অনেকটা প্রয়োজনের তাগিদে। নিজস্ব প্রয়োজন নয়, জাতীয় প্রয়োজনে। তিনি ধর্ম এবং সামাজিক বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যার উপর আলোচনা করেছেন। সভা-সমিতি ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন, প্রবন্ধ রচনা করেছেন–সব কিছুতেই সে যুগের এবং সময়ের দাবী অনুযায়ী মানুষের কল্যাণেই করেছেন। তিনি আমাদের সাহিত্য ভাণ্ডার করেছেন সমৃদ্ধশালী। তাঁর রচনাবলীতে অনাগত ভবিষ্যৎ বংশধর জ্ঞান পিপাসু ও গবেষকদের জন্য রয়েছে তথ্য সমৃদ্ধ উপাদান ও উপকরণ। এগুলো যুগ যুগ ধরে জাতীয় ইতিহাস সৃষ্টিতেও সহায়ক হবে।

বাঁধাধরা নিয়মানুযায়ী মাওলানা আকরম খাঁ'কে তথাকথিত গবেষক হিসেবে চিহ্নিত করা এবং তাঁর রচিত গ্রন্থাবলি চিত্রিত করা অবিচার হবে। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকাসমূহের মাধ্যমে তিনি অগণিত সাহিত্যিক তৈরি করেছেন। এই বিচারে তিনি Father of the literature। ভবিষ্যতেও তাঁর রচনাবলি সাহিত্যসেবীদের জ্ঞানের রাজ্যে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করার জন্য যথেষ্ট সহায়ক বলেই গবেষকদের ধারণা। ভাষা ও সাহিত্যের সেবায় আকরম খাঁ একনিষ্ঠতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন। তদানীন্তন অন্য কোনো আরবি শিক্ষাবিদের পক্ষে তা সম্ভব হয় নি। ইংরেজি প্রভৃতি বিদেশী ভাষায় পূর্ণ দখল না থাকায় তাঁর দৃষ্টিভিঙ্গিতে অনেক স্থলে কিছুটা ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ পেলে তাঁর জ্ঞানের ও দৃষ্টিভঙ্গির আরো প্রসার হতো বলেই বিশ্বাস।

যা-ই হোক, আকরম খাঁ'র বাংলা অত্যন্ত সংস্কৃত সমৃদ্ধ, নীরস- মাঝে মাঝে ব্যঞ্জনাশূন্য। এছাড়া তিনি প্রচলিত বাংলার বিরুদ্ধে তেমন একটা কলম ধারণ করেন নি। হিন্দু পণ্ডিতরা যেভাবে বাংলা লিখতেন, তিনিও সেভাবেই লিখতেন। সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং সমাজ চিন্তায় তিনি বিভিন্ন ধর্মের কাল্পনিক বিষয়াবলীর বিরুদ্ধে যেভাবে নির্ভীকচিত্তে কলম ধারণ করেছেন, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি প্রভাবিত হিন্দু প্রচলিত বিভিন্ন বানান-পদ্ধতির বিরুদ্ধে ইসলামি রীতিনীতির প্রচলন করলে আজ বাংলা ভাষার রূপ অন্যরকম থাকতো বলেই অনেকে মত প্রকাশ করেন। সম্ভবত তিনি তাঁর মিশন নিয়ে চলার জন্য খুব বেশি সাথী পান নি। সেহেতু তাঁর এতোগুলো বিষয়-আনজাম দেয়া সম্ভব হয় নি। তাঁর প্রথম বয়সের লেখা এবং পরিণত বয়সের লেখা এর প্রকৃষ্ট

৩২৫. বাংলা বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮।

www.pathagar.com

প্রমাণ। তিনি ছিলেন আজন্ম সাংবাদিক। সাংবাদিকতার সাহিত্যমান সর্বদেশে সাধারণত অতি উচ্চ মানের হয় না।

সাংবাদিকরা গবেষণাধর্মী সাহিত্য সৃষ্টিতে মনোযোগ দিতে পারেন না। এছাড়া সাহিত্য সৃষ্টিতাঁদের দায়িত্ব নয়। রিপোর্ট এবং প্রতিবেদন তৈরি করাই সাংবাদিক সমাজের মূল দায়িত্ব।

জনৈক ইংরেজ মনীষীর ভাষায় : Genius is one person inspiration and ninety nine percent perspiration"[৩২৬]

অর্থাৎ, প্রতিভার এক শতাংশ প্রেরণাজাত এবং নিরানব্বই শতাংশ পরিশ্রমের ফল।

মাওলানার সাহিত্য সম্পর্কে একথা পুরোপুরি মিলে যায়। তাঁর সাহিত্যিক অবদান আয়াসলব্ধ, গবেষণাধর্মী ও গুরুগম্ভীর।

মাওলানা আকরম খাঁ'র সাহিত্য-সাধনা ছিল ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। তাঁকে ঘিরে তখন এতদঞ্চলে চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীদের উজ্জ্বল পরিমণ্ডল সৃষ্টিহয়েছিল। এতে মুসলিম বাংলার নবদিগন্তের উন্মোচন ত্বরান্বিত হয়েছিল। তাঁর প্রকাশিত ও পরিচালিত পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে বাঙালি মুসলিম সমাজ নিজেকে চিনতে ও বুঝতে পেরেছিল। প্রকাশ করতে পেরেছিল নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে। সেই ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে আধুনিক মুসলিম বাংলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে মেধাবী জনগণের বলিষ্ঠ পদচারণা জাতির অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে সহায়তা করে। তাঁরা রাজনীতিক, অর্থনীতিবিদ, সমাজ সংস্কারক, পল্লী কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও চিন্তাবিদ যা-ই হোন না কেন, প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষভাবে মাওলানা সাহেবের এই 'চোখ মেলার' ও 'দ্বার খোলার' সাধনার সাথে জড়িত ছিলেন।

অধুনাকালেও স্বাতন্ত্র্যবাদী কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, চিন্তাবিদ, রাজনীতিক, সমাজকর্মী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মাওলানা সাহেবের চিন্তা ও ভাবধারা থেকেই প্রাণরস আহরণ করছেন। সেদিন যাঁরা চিন্তায় ও ভাবধারায় মাওলানা সাহেবের বিরোধী ছিলেন, এখনো যাঁরা তাঁর বিরোধী বলে দাবি করেন, তাঁদের সবাইকে স্বীকার করতে হবে, তাঁর আবির্ভাবই এই বিরোধিতার অবকাশ সৃষ্টিকরেছে। তাঁদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি, প্রেরণা ও উদ্দীপনা জুগিয়েছে। এখনো অনুরূপ প্রেরণাই জুগিয়ে যাচেছ।

জার্মান কবি গ্যেটে সম্পর্কে জনৈক সমালোচক বলেন :

> পাশ্চাত্যের কোনো লেখক বা সাহিত্যিক স্বীকার করুক বা না করুক; তারা প্রত্যেকেই গ্যেটের শিষ্য।[৩২৭]

এর প্রতিধ্বনি করে মাওলানা সম্পর্কে নির্দ্বিধায় বলা যায়, আধুনিক বাঙালি বা বাংলাদেশী মুসলিম সমাজের সকলেই, বিশেষত যাঁরা সমাজ ও স্বজাতি সম্পর্কে চিন্ত াভাবনা করেন, তাঁদের মত ও পথ যা-ই হোক না কেন, তাঁদের কেউ স্বীকার করুক আর না-ই করুক, প্রত্যেকেই মাওলানা আকরম খাঁ'র শিষ্য, প্রশিষ্য বা ভাবশিষ্য। মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ'র জীবনসাধনার সাফল্য ও সার্থকতা এটাই। তাঁর

---

৩২৬. আবু জাফর, এক অনন্য সাধারণ প্রতিভা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫-১৬।
৩২৭. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

সাধনার আর একটি সুফল, ধর্ম ও আধুনিকতার সমন্বয় প্রচেষ্টা। এ প্রচেষ্টা যে সফল ও সার্থক হয়েছিল, পরবর্তীকালে মুসলিম বাংলার নবজাগরণ থেকে তা সহজেই বোঝা যায়।

আকরম খাঁ'র জীবনে আর একটি সফলতা হচ্ছে তাঁর কারাবরণ। মুসলিম সাহিত্যিকদের মধ্যে রাজনৈতিক সংগ্রামের দায়ে ১৯১০ সালে সর্বপ্রথম কারাবরণ করেন ইসমাইল হোসেন সিরাজী।[৩২৮] তাঁর পর ১৯২১ সালে কারাভোগ করেন মাওলানা আকরম খাঁ। এ দু'জন সংগ্রামী সাহিত্যিকের পর ১৯২৩ সালে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। এঁরা হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়ে গেছেন যে, সাহিত্য কেবল মানসিক বিলাসের নাম নয়– এর চরম ও পরম লক্ষ্য জীবন সংগ্রামে বিজয় অর্জন করা।

সাহিত্য রচনা

মাওলানা আকরম খাঁ জাত সাহিত্যিক না হলেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সেবা ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক অবদান রেখে গেছেন। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই তিনি বাংলা সাময়িকী পত্রিকা প্রকাশ করেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন। তিনি লেখার মাধ্যমে বাংলা ভাষার উন্নয়নে বিরাট অবদান রেখেছেন। তিনি বলতেন :

> পৃথিবীতে একটি বিষয় আমার কাছে আশ্চর্যজনক বলে মনে হয়। যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে, বাংলার মুসলমানদের মাতৃভাষা কোনটি? উর্দূ না বাংলা, এটা একটা আশ্চর্যজনক প্রশ্ন। নারকেল গাছে নারকেল ধরবে, এটাই তো স্বাভাবিক। কেউ যদি এই প্রশ্ন লইয়া আমাদের সহিত তর্ক করতে আসেন তাহা হইলে, আমরা তাহার সঙ্গে বিতর্কে প্রবৃত্ত হইবার পরিবর্তে বন্ধুদিগের নিকট হইতে টাকা সংগ্রহ করিয়া তাহাকে বহরমপুরের টিকিট কিনিয়া দিতে চেষ্টা করিব। বাংলায় মোসলেম ইতিহাসের সূচনা হইতে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষাই আমাদের লেখা ও কথা মাতৃভাষারূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে এবং ভবিষ্যতেও মাতৃভাষা রূপে ব্যবহৃত হইবে।[৩২৯]

বাংলা হলো বাংলার মুসলমানদের মাতৃভাষা, ভবিষ্যতেও এটা বাংলার মুসলমানদের মাতৃভাষা হিসেবেই থাকবে। তিনি আরও বলেছেন :

> নিজের মাতৃভাষার পরিপুষ্টি সাধন করা প্রত্যেকেরই অবশ্যকর্তব্য। দেহ ভাল রাখার জন্য যেমন ভাল খাদ্যের প্রয়োজন। ভাষার সমৃদ্ধির ও বৈচিত্র্যের জন্য প্রয়োজন সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাষার শব্দ যোজনার মাধ্যমে নিজস্ব ভাষাকে সমৃদ্ধশালীকরণ। প্রয়োজনে বাংলার রূপ আরও বৃদ্ধির জন্য এর সাথে অন্যান্য ভাষার শব্দালঙ্কার সংযোজন করা যেতে পারে।[৩৩০]

তিনি প্রয়োজনবোধে বাংলার সাথে আরবি ও ফার্সি শব্দ ব্যবহারের পক্ষে ছিলেন। বাংলা ভাষায় অনাবশ্যক ভিনদেশী শব্দের ব্যবহারের তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি একবার বাংলা ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে ঘোষণা করেছিলেন :

---

৩২৮. রায়নন্দিনী কাব্যের রচয়িতা । তিনি বলকান যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন।
হোসেন মাহমুদ (সম্পাদিত), ইসমাইল হোসেন সিরাজী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬, সম্পাদকের কথা দ্রঃ।

৩২৯. আবু জাফর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫।

৩৩০. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

দেশের সাধারণ মানুষকে সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে শিক্ষার মাধ্যম হবে দেশের স্থায়ী ও সাধারণ ভাষা :[৩৩১]

মাওলানা বাংলা ভাষায় তাঁর জ্ঞান সম্পর্কে বলেছেন :

বাংলা ভাষার জ্ঞানকে আমি আমার ইলমে লাদুন্নীর[৩৩২] জ্ঞান মনে করি। জিহাদের জন্য আমি বাংলা ভাষাকে গ্রহণ করেছি। সে জন্য আমি বাংলা লেখা শুরু করি। জিহাদের অস্ত্র হিসেবে আমি বাংলা ভাষাকে গ্রহণ করেছি। প্রয়োজনীয়তা যখন তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে, আমার অস্ত্রও তেমনি আরও শাণিত হয়েছে। আমি মৌলভীর সন্তান, জিহাদ আমার পরিবারের আদর্শ। আমার পূর্বপুরুষগণ জিহাদে অংশগ্রহণ করেছে। শিশুকাল থেকেই আমি জিহাদে শরিক হওয়ার আশা পোষণ করছি। যে কেউ শুনে আশ্চর্য হবেন যে, ছাত্রজীবন থেকেই আমি তীর নিক্ষেপ আর লাঠি চালনা অভ্যাস করেছি।[৩৩৩] তবে আল্লাহ আমাকে তলোয়ারের লড়াইয়ের বদলে কলমের লড়াইয়ে নিযুক্ত করেছেন। আমি কোনো চেষ্টা ছাড়াই বাংলা শিখেছি। জিহাদের জন্য বাংলাভাষাকে আমি বেছে নিয়েছি। আল্লাহ আমার জন্য বাংলা ভাষাকে একটি দান হিসেবে প্রদান করেছেন।[৩৩৪]

জাতীয় অধ্যাপক আবুল ফজল মাওলানার সাহিত্য সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন এভাবে :

সময়ের পরিবর্তন ঘটেছে, জীবনের প্রতিটি স্তরেই আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু মাওলানার সাহিত্য মানের কখনো পরিবর্তন হয় নি। রাজনৈতিক ও সাহিত্য ক্ষেত্রে মওলানার সাথে আমার মতদ্বৈততা থাকতে পারে, কিন্তু বাংলা ভাষায় বিভিন্ন ভাষার ব্যবহার আমাকে এমনভাবে মুগ্ধ করেছে যে, আমি মওলানার ভীষণ ভক্ত হয়ে গিয়েছি।[৩৩৫]

তিনি আরও বলেন :

আমার বিশ্বাস, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে পাকিস্তান কায়েম হওয়ার আগ পর্যন্ত যে যুদ্ধ গেছে তা মুসলমানদের ইতিহাসে নানা কারণে স্মরণীয়। এটি আমাদের স্বতন্ত্র আত্মপ্রতিষ্ঠা আর জাতীয় সচেতনতার যুগ। এই সচেতনতা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস এবং জাতীয় মানের বিচিত্র আকুলি-বিকুলির পরিচয় সর্বাপেক্ষা লক্ষ্যগোচর হয় শিক্ষা, রাজনীতি আর সাহিত্য ক্ষেত্রে। ইতিহাস বহু বিচিত্র ও বিস্ময়কর। এ ইতিহাস রচনার যোগ্যতা আমার নেই। আমার বিশ্বাস, এ

---

৩৩১. প্রাগুক্ত।
৩৩২. ইলমে লাদুন্নী হচ্ছে খোদা প্রদত্ত শিক্ষা।
৩৩৩. অধ্যাপক মুনসুর উদ্দীন, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫।
৩৩৪. ১৯২৯ সালে জেলে থাকার সময় তিনি জনৈক নগেন্দ্র কুমার গুহ রায়ের কাছে বলেন, এডুকেশন আমার নাই-ই। ১৯০০ সালে কোলকাতা মাদ্রাসা হতে ফাইনাল আরবি পরীক্ষা পাস করি। ইংরেজি বিদ্যা তখন ফাস্ট বুক-এর I met a lame man in the lane পর্যন্ত। বাংলা যুক্তাক্ষর লিখিতেও অক্ষম ছিলাম। উর্দু কাগজ বের করার আগে কখনো উর্দু লিখি নাই। অকস্মাৎ যিনি সম্পাদকীয় লেখার ছিলেন তিনি অস্বীকার করায় আমাকেই সম্পাদকীয় লিখতে হয়। মুহাম্মদিরও ঠিক একই অবস্থা। জনৈক মৌলভী আবদুল্লাহ লিখবেন কথা দিয়েছিলেন, সময়কালে তিনি অস্বীকার করায় অগত্যা আমাকেই বাংলাও লিখতে হয়। দয়াময়ের ইচ্ছায় জীবনটা কেটে যাচ্ছে। আবু জাফর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪।
৩৩৫. আবু জাফর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪।

www.pathagar.com

> ইতিহাস রচনার যোগ্যতম ব্যক্তি মওলানা আকরম খাঁ। এ ইতিহাস আগাগোড়া তাঁর অধিগত, এর সর্বক্ষেত্রে তিনি বিচরণ করেছেন এবং এ যুগের বহু সংগ্রামে তিনি একাধারে সৈনিক ও সেনাপতির ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর সঙ্গে রাজনৈতিক ব্যাপারে আমাদের যতই মতবিরোধ থাকুক, তাঁর সাহিত্যিক মনীষা সম্বন্ধে কারো দ্বিমত থাকার কথা নয়। ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক কারণে যদি আজ আমরা তাঁর সাহিত্যিক অবদান ও প্রতিভাকে অস্বীকার করি তা হলে বুঝতে হবে, সাহিত্যের মান ও মূল্য নির্দ্ধারণ আর তাঁর গুণগ্রাহিতার শক্তি এখনো আমাদের মধ্যে বিকাশ লাভ করেনি, এ এক রকমের দুর্বলতা আর মানসিক অস্বাস্থ্যেরই লক্ষণ। ক্লাসিক রচনার স্পর্শে আকরম খাঁর ভাষা সু-সমৃদ্ধ। স্বীয় অধ্যবসায় ও ধীশক্তির বলে বাংলা সাহিত্যের একজন শক্তিশালী গদ্য লেখক হিসেবে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।[৩৩৬]

বস্তুত, আমাদের সাহিত্যের প্রকৃতি কেমন হবে তাঁর স্বরূপ সম্পর্কে ১৯৫২ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ইসলামি সাংস্কৃতিক সম্মেলনে প্রসিদ্ধ লেখক আবদুর রশীদ খান[৩৩৭] বলেন :

> পশ্চিম বঙ্গের বাংলা সাহিত্যকে আমাদের সাহিত্য বলতে পারিনে, যেমন পারেনি আইরিশগণ ইংরাজী সাহিত্যকে নিজেদের সাহিত্য বলে স্বীকার করতে। আদর্শের ও জীবনের প্রতি দৃষ্টিভিঙ্গিরই যে পার্থক্য। ..... পূর্ব পাকিস্তানী সাহিত্যের ধারা হবে পশ্চিম বঙ্গ বা যুক্ত বঙ্গের ধারা হতে স্বতন্ত্র। এই সাহিত্যের রূপক উপমায় থাকবে না কোনো পৌত্তলিকতার ছাপ, যা আমাদের আদর্শের পরিপন্থী। আমাদের মহান ঐতিহ্য থেকে, পুঁথি ও লোকসাহিত্য থেকে সংকলিত হবে আমাদের রূপক ও উপমা। উভয় বাংলার ভাষা বাংলা হলেও তার মধ্যে (বিশেষত পূর্ব পাকিস্তানী বাংলা ভাষার মধ্যে) আসবে পরিবর্তন। আমাদের জীবন দর্শন, আমাদের বিশিষ্ট জীবন পদ্ধতি ও ঐতিহ্য এই ভাষাকে করে দেবে স্বতন্ত্র, যেমন আইরিশ ও ইংরাজী সাহিত্য ইংরাজী ভাষার মাধ্যম হয়েও স্বতন্ত্র। যেমন আমেরিকার ইংরাজী ও ইংল্যান্ডের ইংরাজীর মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ।[৩৩৮]

সাহিত্য চর্চা

১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে সিভিলিয়ানদের স্বদেশীয় ভাষা ও আইন-কানুন শিক্ষা দেওয়ার জন্য পাঠ্য পুস্তকের প্রয়োজন হয়।[৩৩৯] বাংলা রচনার জন্য হিন্দু পণ্ডিত এবং উর্দু-ফার্সি রচনার জন্য মুসলমান ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। ১৮১৭-১৮২১ সাল পর্যন্ত কোলকাতা স্কুল বুক সোসাইটির প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা দাঁড়ায় (প্রচারপত্র-সহ) লক্ষাধিক।[৩৪০] তৎকালীন সময়ে বেশির ভাগ সাহিত্য সাধনা আরম্ভ হয় ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক। তাই, ব্যক্তিগতভাবেও অনেকে এসব বিষয়ের উপর সাহিত্য

---

৩৩৬. আবু জাফর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪-১৩৬।
৩৩৭. ১৯৫২ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'ইসলামিক সাংস্কৃতিক সম্মেলনে' তিনি 'পূর্ব-পাকিস্তানের আধুনিক কাব্য-সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।
ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১ ও ২০৩।
৩৩৮. ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫।
৩৩৯. ড. ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ঢাকা-১৯৮৩, পৃঃ ২৪৩।
৩৪০. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড।

www.pathagar.com

রচনা করেন। বেশির ভাগ বাংলা সাহিত্য ও ভাষা চর্চার বিকাশ ঘটে শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় গ্রন্থাবলি ও সভা-সমিতির মাধ্যমে। প্রকৃতপক্ষে, বাঙালি মুসলমান কর্তৃক আধুনিক বাংলা সাহিত্য রচনার সূত্রপাত ১৮৬৯ সালে মীর মশাররফ হোসেনের[৩৪১] প্রথম গদ্য পুস্তক *রত্নাবতী* প্রকাশনার মাধ্যমে।

১৮০০ সাল থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুসলমান লেখকের সংখ্যা ছিল না বললেই চলে। মুসলমানদের বাংলা সাহিত্যচর্চার যে গতিধারা ছিল তার প্রধান স্রোত ধর্মকে আশ্রয় করে প্রবাহিত হয়, আর এ ধর্মচেতনাকেন্দ্রিক মরমিবাদ অবলম্বনে আবর্তিত হয়। কবিদের অনেকেই ব্যক্তিজীবনে পীরভক্ত ছিলেন। এঁদের অনেকেই গুরুর নির্দেশেই কাব্য রচনায় রত হন। মুসলমান রচিত বাংলা সাহিত্যের একটা বড় অংশ অধ্যাত্মবাদকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে।[৩৪২]

উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে নব্য শিক্ষিত মুসলমানরা বাংলা সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। তাঁরা তৈরি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পেলেন, হিন্দু লেখকদের মত তাঁদের একেবারে প্রাথমিক অবস্থা থেকে শুরু করতে হয় নি। তবুও মুসলমান লেখকরা এতবড় সুযোগকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারেন নি। অপরপক্ষে আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্য হিন্দুদের হাতে গড়ে উঠায় হিন্দুয়ানী সংস্কৃতির প্রভাব পড়ে।[৩৪৩] মুসলমান সমাজপতিদের কাছে তা গ্রহণযোগ্য ছিল না; বরং সংস্কৃতবহুল বাংলার পরিবর্তে তারা সর্বত্র আরবি ফার্সি ও উর্দু শব্দ মিশ্রিত বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিল। ইংরেজি শিক্ষা প্রচলিত হওয়ার পর বাংলা ভাষার প্রতি বিরূপ মনোভাব কেবলমাত্র যে মুসলমানরাই পোষণ করে তা-ই নয়, বরং হিন্দু সমাজের মধ্যেও এরূপ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রখ্যাত সাহিত্যিক ড. ওয়াকিল আহমদ তাঁর গবেষণা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন :

> বাংলা ভাষার প্রতি বিরূপ মনোভাব হিন্দু সমাজের একটি শ্রেণির মধ্যেও দেখা দেয়, যার জন্য বাংলা ভাষা শিক্ষা ও প্রচলনের জন্য আন্দোলন করতে হয়।

---

৩৪১. মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৮-১৯১১)। খ্যাতনামা মুসলিম সাহিত্যিক। কুষ্টিয়ার লাহিনী পাড়ায় তাঁর জন্ম। বিষাদ সিন্ধুসহ অনেকগুলো গ্রন্থের তিনি রচয়িতা।
বাংলা বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩।

৩৪২. ড. ওয়াকিল আহমদ, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৬।

৩৪৩. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে যে বাংলা গদ্য চর্চা শুরু হয় তা ঐতিহাসিক কারণে খ্রিষ্টান পাদরী ও হিন্দু পণ্ডিতদের দ্বারা গড়ে উঠে। তারা বাংলাকে সংস্কৃতের দুহিতা জ্ঞান করে ব্যাকরণনীতি ও শব্দমালার দিক থেকে সংস্কৃতের ওপর বেশী নির্ভর করেন। পণ্ডিতদের হাতে ভাষা কিরূপ মূর্তি লাভ করেছিল, বঙ্কিম চন্দ্র বলছেন, "আমি নিজে বাল্যকালে ভট্টাচার্য অধ্যাপকদিগকে যে ভাষায় তাঁহার কদাচ খয়ের বলিতেন না, খদির বলিতেন, কদাচ চিনি বলিতেন না, শর্করা বলিতেন। ঘি বলিলে তাহাদের রসনা অশুদ্ধ হইত, আজাই বলিতেন কদাচিৎ কেহ ঘৃতে নামিতেন, চুল বলা হইবে না, কেশ বলিতে হইবে। কলা বলা হইবে না, বথফনা বলিতে হইবে। পণ্ডিতদের কথোপকথনের ভাষাই এখানে এইরূপ ছিল, তবে তাহাদের লিখিত বাংলা ভাষা, আরও কি ভয়ংকর ছিল তাহা বলা বাহুল্য।"
বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ, পৃ. ১৭৬।
ড. ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, টীকা ২৪৭।

www.pathagar.com

তাঁদের প্রধান অভিযোগ ছিল, বাংলা ভাষা উচ্চভাব প্রকাশের উপযোগী ছিল না।[৩৪৪]

মূলত সে-সময় সামাজিক পরিবেশটাই এমন ছিল। মুসলমান-হিন্দু সবাই বাংলা ভাষাকে অভিজাত শ্রেণির ভাষা নয়- এটাই মনে করতো। মুসলমানদের ছিল উর্দুপ্রীতি, হিন্দুদের ছিল ব্রিটিশ তোষণনীতি ও ইংরেজিপ্রীতি। হিন্দুদের এই তোষণনীতির কারণে এবং মুসলমানদের বাংলার প্রতি অনীহার জন্য সম্ভবত উইলিয়াম কেরী কোনো বাঙালি মুসলমানকে বাংলা পুস্তক রচনায় নিযুক্ত করেন নি।[৩৪৫] বাংলার মুসলিম সাহিত্যের এ দুর্গতির কারণ ঐতিহাসিক। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন হয় বাংলার মুসলমান শক্তির সাথে সাক্ষাৎ সংঘর্ষের পর। রাষ্ট্রভাষা ফার্সির পর এল ইংরেজি। জাতিগত ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মুসলমান-হিন্দুর বিরোধের অতীত উত্তরাধিকার সমান্ত রালভাবে বাংলার হিন্দু মুসলমানের এই ভাঙ্গাগড়ার যুগ-সন্ধিক্ষণে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো। হিন্দুরা পাশ্চাত্য শিক্ষাকে গ্রহণ করে এবং মুসলমানরা তা বর্জন করে। আর এ জন্য মুসলমানদেরকে শাস্তিও পেতে হয়। হিন্দুদের প্রতি সরকারি শুভেচ্ছার প্রসন্ন দৃষ্টি পড়ে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা যে সংস্কৃত সাহিত্যের নতুন সংস্করণ তা আজ সবারই জানা কথা।

একদিন যে সাহিত্যে অনেক ভাল ভাল জিনিস রচিত হত, তা আর হল না। হিন্দু কবিদের ধারার উপর নবিন হিন্দু সাহিত্যের বুনিয়াদ গড়ে ওঠে। কৃত্তিবাস, কালিদাস ও বৈব কবিরা নতুনভাবে রূপান্তরিত হয়ে আধুনিক হিন্দু বাংলা সাহিত্যে গতিশীল হলেন। আধুনিক মুসলমান কবি-সাহিত্যকগ্না হিন্দু সাহিত্যের অন্ধ অনুসারী না হলে এবং পুঁথি সাহিত্যিকদের রচনায় যদি পড়ত নয়া জামানার আলো, তবে আমাদের এত বড় ট্র্যাজেডি দেখা দিত না।

একদল মুসলমান সাহিত্যিক এই হিন্দু সাহিত্যের ঝলকানিতে মুগ্ধ হলেন। তাঁরা প্রবল উৎসাহে এই সাহিত্যের অনুসরণ শুরু করেছিলেন। মুসলমান জাতীয় ধারা হতে তারা বিচ্যুত হলেন। মুসলমান অতি আধুনিক কবিরা, হিন্দু অতি আধুনিক কবিদের অনুকরণপ্রিয় হয়ে যায়। মুসলমানদের দুরবস্থা যে সীমাহীন তা এভাবে চিন্তা করলেই বুঝা যাবে। হিন্দু সাহিত্যিকরা করলেন ইংরেজি সাহিত্যের অনুসরণ। মুসলমানরা করলেন কিছুটা হিন্দুদের অনুসরণ। তবে, হিন্দুরা তাদের রচনার পশ্চাদ্‌ভূমিতে রেখে ছিলেন নিজস্ব সংস্কৃতিকে। তাদের রচনায় ছিল মনীষার ছাপ এবং প্রতিভার দীপ্তি।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলো প্রণিধানযোগ্য :

মুসলমানদেরকে ভারতে ইতিহাসের জন্মদাতা বললে অত্যুক্তি হয় না। আজ সেই মুসলমান বাংলাদেশে ইতিহাসের চর্চা ছাড়িয়া দিয়াছে। জাতীয় প্রাচীন ইতিহাস যেরূপ লোকদিগকে উদ্বুদ্ধ করে, যেরূপ তাহাদের মনে আত্মসম্মান জাগাইয়া দেয়। যেরূপ তাহাদের প্রাণে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা আনিয়া দেয়। এ রূপ আর কোনো সাহিত্য দ্বারা হইতে পারে না। ভারতের মুসলমান ইতিহাস প্রায়শ মুসলমানের বিকৃত চরিত্রের চিত্র মাত্র। আমাদের সন্তানগণকে ভবিষ্যৎ ভারতের জন্য উপযোগী করিতে হইলে এখন হইতে আমাদিগকে জাতীয় ইতিহাসের আলোচনা করিতে

---

৩৪৪. ড. ওয়াকিল আহমদ, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত,পৃ. ২৪৮।
৩৪৫. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৮।

www.pathagar.com

> হইবে। এবং তজ্জন্য উপযুক্ত পুস্তকাদি প্রণয়ন করিতে হইবে। বিদেশীগণ বা বিধর্মীগণ মুসলমান রাজকন্যা বা রাজকুমারী ও রাজমহিষীগণ সম্বন্ধে যে সমস্ত স্বকল্পিত কুৎসিত আখ্যায়িকার সৃষ্টিকরিয়াছেন, অকাট্য ঐতিহাসিক প্রমাণ মূলে তাহার খণ্ডন করা মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য, 'রাজসিংহের' চন্দ্রশেখরের লেখককে খালি গালি দিলে চলিবে না। ঐতিহাসিক Search Light দ্বারা তাহার অসত্যতা বা অৰ্দ্ধসত্যতা জগতের সামনে প্রকাশ করিয়া দিতে হইবে। বাঙ্গালী মুসলমান, তাহা করিয়াছে কি? দেখ অধ্যাপক যদুনাথ সরকার ও বাবু অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় তোমার কার্য্য করিয়া দিতেছেন। বাঙালি মুসলমান তোমার মুখের চুনকালি মুছিতেছেন হিন্দু, তুমি কি এত অক্ষম? আমাদিগকে বাংলার মুসলমানের জাতীয় ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে।[৩৪৬]

মুসলিম সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্যের কথা উল্লেখ করে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী বলেন :

> হাঁ কাহারও অবিদিত নহে যে, হিন্দু-শোষিত বাঙ্গালা সাহিত্য হিন্দু সভ্যতাকে ভিত্তি করিয়াই দণ্ডায়মান, পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ, পুনর্জন্মবাদ, অবতারবাদ প্রভৃতি হিন্দু সভ্যতার বৈশিষ্ট্যগুলি তাহার রক্তমাংসে, অস্থিমজ্জায় বিজড়িত রহিয়াছে। মুসলমানকে নিজের সঙ্গী, সহচর দোসররূপে পাইবার আশায় হিন্দু কখনও বাঙলা সাহিত্যের অঙ্গ হইতে তাঁহার নিজস্ব সভ্যতার এই ছাপগুলি তুলিয়া লইতে রাজি হইবেন না। পক্ষান্তরে মুসলমান নিজের সার্বজনীন বৈশিষ্ট্যগুলি বিসর্জন দিয়া হিন্দু-সেবিত বাঙলা সাহিত্যকে নিজস্ব বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবেন না কিংবা হিন্দুর অন্ধ অনুকরণ দ্বারা নিজের সর্বনাশের পথ পরিষ্কার করিতে সম্মত হইবেন না। .... বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ হইতে এ পর্যন্ত তাহাদের যে তীব্র তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইয়াছে, তাহার ফলে তাঁহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছেন যে, পৌত্তলিক হিন্দুর এবং ইসলামের সহিত সম্পূর্ণ বিরুদ্ধভাবাপন্ন সভ্যতার উত্তরাধিকারী হিন্দুর অঙ্গে অঙ্গ মিলাইয়া, কণ্ঠে কণ্ঠ মিশাইয়া সাহিত্য সেবা করিতে গেলেই তাঁহাকে বাগদেবী বীনাপাণির রাতুল চরণে ভক্তি কুসুমাঞ্জলী উপহার দিতে হইবে। .... ইহার আওতায় গেলে মুসলমানের স্বরূপ লুপ্ত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এই কারণে মুসলমানেরা স্বতন্ত্র থাকিয়া বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের বুকে তাঁহাদের নিজস্ব সভ্যতার জন্য স্থায়ী আসন রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।[৩৪৭]

লেখক মুসলমান হলেই ইসলামি সাহিত্য হয় না। অনেক হিন্দু সাহিত্যিকের মধ্যেও মুসলিম সাহিত্যিকের উপকরণ পাওয়া যায়।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ভাষায় :

> আমাদের সাহিত্য অনুপ্রেরণা পাবে কুরআন, হাদিস, মুসলিম ইতিহাস ও মুসলিম জীবনী থেকে। আমরা অনেকবার বলেছি মুসলিম সাহিত্য কি গোঁড়ামী! সাহিত্যেও আবার জাত বিচার।
>
> তাই একটু খোলাসা করে বলা দরকার–মুসলিম সাহিত্য বলতে কি বুঝি। আমাদের ঘর ও পর, আমাদের সুখ ও দুঃখ, আমাদের আশা ও ভরসা, আমাদের

---

৩৪৬. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আমাদের সাহিত্যিক দরিদ্রতা, আল এছলাম, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৯২৩।

৩৪৭. ওয়াজেদ আলী, মোহাম্মদ, সাহিত্যে স্বতন্ত্র্য কেন, সওগাত, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা. অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫।

www.pathagar.com

লক্ষ্য ও আদর্শ নিয়ে যে সাহিত্য, তা-ই আমাদের সাহিত্য। কেবল মুসলমান হলেই মুসলমান সাহিত্য হয় না। হিন্দুর সাহিত্য অনুপ্রেরণা পাচ্ছে বেদান্ত ও গীতা, হিন্দু ইতিহাস ও হিন্দু জীবনী থেকে। আমাদের সাহিত্য অনুপ্রেরণা পাবে কুরআন ও হাদিস, মুসলিম ইতিহাস ও মুসলিম জীবনী থেকে। হিন্দুর সাহিত্য রস সংগ্রহ করে হিন্দু সমাজ থেকে, আমাদের সাহিত্য করবে মুসলিম সমাজ থেকে। ... হিন্দু সাহিত্য ও মুসলিম সাহিত্য হিন্দুর মন্দির ও মুসলমানের মসজিদের মত এক সম্প্রদায়ের একচেটে জিনিস নয়। সুহৃদয় সত্যেন্দ্র দত্ত, ভক্তিভাজন গিরীশ চন্দ্র সেন, শ্রদ্ধেয় জলধর সেন, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রভৃতি হিন্দু লেখকও অনেক মুসলমান সাহিত্য রচনা করেছেন। বাস্তবিক বাঙলা সাহিত্য হিন্দু মুসলমানে অক্ষয় মিলন মন্দির হবে। হিন্দু সাহিত্যেও মুসলিম সাহিত্য হবে তার দুই কুঠরী। সর্বত্রই সকলের অবাধ প্রবেশাধিকার। যে পর্যন্ত মুসলিম সাহিত্য না গড়ে ওঠেছে, সে পর্যন্ত মিলন মন্দির পূর্ণাঙ্গ হচ্ছে না।[৩৪৮]

বঙ্গীয় মুসলমানদের সাহিত্যক্ষেত্রে অধঃপতনের কথা উল্লেখ করে তৎকালীন বঙ্গীয়-মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকায় বলা হয়েছে :

বর্তমান বঙ্গীয় মুসলমানদের কোনোও স্বতন্ত্র সাহিত্য আছে বলা যায় না। তবে বর্তমানে যে কয়জন মুষ্টিমেয় মুসলমান সাহিত্যচর্চায় ব্রতী হইয়াছেন তাহাদের রচিত সাহিত্যের প্রতি আমরা লক্ষ্য করিতেছি। এ পর্যন্ত মুসলমানদের যে কয়খানি বাঙ্গলা উপন্যাস বাহির হইয়াছে সেগুলিকে মোটামুটি নিম্নলিখিত কয়েকটি ধাপে বিন্যস্ত করা যাইতে পারে- ১. বালক বালিকা বা যুবক যুবতীর প্রথম সন্দর্শন ও প্রণয় সম্ভার, ২. ইহাদের একের জল-নিমজ্জন ও অন্য কর্তৃক উদ্ধার-তদ্বারা প্রেমের প্রগাঢ়তা সাধন, ৩. একটি প্রতিবন্ধকের আবির্ভাব-প্রায়ই হয় পিতা-মাতার মতাভাব, অথবা অন্য প্রণয়ীর দুরভিলাষ; ৪. পূর্ব্বপ্রণয়ী প্রণয়িনীর কিছুকাল বিড়ম্বনা ভোগ; ৫. পরিণয় বা অন্য প্রকারে মিলন, ইহার মাঝে মাঝে মিলনের উল্লাস এবং বিরহের হা-হুতাশ যথানিয়মে সজ্জিত আছে।...

মুসলমান লিখিত অনেকগুলি উপন্যাসেই হিন্দু নায়িকার সহিত মুসলমান নায়কের প্রণয় প্রদর্শন করা হয়েছে। প্রেমের রাজ্যে জাতি বিচার নাই, এবং সাহিত্যের দিক দিয়া ইহা একটি বৈচিত্র্যও বটে। কিন্তু সাহিত্য সৃষ্টিএক কথা আর প্রতিহিংসা সাধন আর এক কথা। প্রতিহিংসার বশবর্তী হইয়া কেহ যেন এই বৈচিত্র্যের অবতারণা না করেন।[৩৪৯]

তদানীন্তন প্রেক্ষাপটে হাতেগোনা যে ক'জন মুসলমান সাহিত্যিক হিন্দু সাম্প্রদায়িক সাহিত্যিকদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সাহিত্যের যুক্তিনির্ভর উত্তরে আত্মনিয়োগ করেন, মাওলানা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। মাওলানা ছিলেন খাঁটি গবেষক এবং যুক্তিনির্ভর সাংবাদিক। সেই নিরিখে তিনি বিরুদ্ধবাদীদের দাঁতভাঙ্গা জবাবে সিদ্ধহস্ত। উপরের আলোচনায় বিষয়টি প্রতিভাত হয়েছে।

---

৩৪৮. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, অভিভাষণ, এম-এ, বি-এল, ডি-লিট, সওগাত, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৩৬।

৩৪৯. এম, আনসারী, সাহিত্যে বৈচিত্র্য, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, কার্তিক, ১৩২৮।

www.pathagar.com

মাওলানার গ্রন্থাবলি

মাওলানা ছিলেন শতাব্দী আয়ুর মহীরুহ। এক শতাব্দীর জীবন একেবারে কম সময় নয়। একটি শতাব্দীকে তিনি বেহুদা ব্যয় করেন নি। লেখাপড়া শিখেছেন, সমাজকল্যাণ ও সংস্কার আন্দোলন করেছেন, গবেষণা করেছেন, সাংবাদিকতার ন্যায় কন্টকময় জীবনেও বিচরণ করেছেন। সময়ের দাবিতে তিনি লিখেছেন অবিরামভাবে। সভা-সমিতিতে বক্তৃতা-বিবৃতিও তিনি দিয়েছেন। তিরিশের অধিক গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। এগুলোর প্রায় বেশির ভাগই গবেষণালব্ধ। নিম্নে তাঁর রচনাবলীর ওপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো :

মোস্তফা চরিতের বৈশিষ্ট্য

১৯৩২ সালে মাওলানা মোস্তফা চরিতের বৈশিষ্ট্য পুস্তিকাটি রচনা করেন। এর আগে তিনি *মোস্তফা চরিত* নামে বিরাট সীরাত গ্রন্থ রচনা করেন। এই সীরাত গ্রন্থ রচনার পর মাওলানা *মোস্তফা চরিতের বৈশিষ্ট্য* লেখার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন :

> নিজের সামান্য শক্তি অনুসারে মোস্তফা চরিত সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু ইহার প্রথম খণ্ড মোস্তফা জীবনের ইতিহাস ভাগের আলোচনাতে সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার পবিত্র জীবনের অনুপম বৈশিষ্ট্যগুলির অবতারণা তাহাতে সম্ভব হয় নাই। ইচ্ছা ছিল দ্বিতীয় খণ্ডে সেই বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব। তাহার উপকরণগুলি সংগ্রহ করার কতকটা চেষ্টাও সঙ্গে সঙ্গে করেছিলাম। কিন্তু নানা প্রতিকূল অবস্থার অত্যাচারে আমার সে আকাজ্ক্ষা আজও পূর্ণ হইতে পারে নাই। এখন আশংকা হইতেছে এই আকাজ্ক্ষা ও উপকরণগুলি হয়ত আমার মস্তিষ্ক ও হৃৎপিন্ডের সঙ্গে সঙ্গে কবরের মাটিতে লুপ্ত হইয়া যাইবে। তাই বিন্দু দিয়া সিন্ধুর পরিচয় দেওয়ার মত এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানার সংকলন। ইহা মোস্তফা চরিত দ্বিতীয় খণ্ডের সঙ্কলিত অর্ধশত অধ্যায়ের মধ্যকার চারিটি অধ্যায় মাত্র।[৩৫০]

মাওলানার উপরোক্ত বক্তব্যে এ কথা পরিষ্কার যে, তাঁর রচিত মোস্তফা চরিতের বৈশিষ্ট্য ২য় খণ্ড বিরাট গ্রন্থ, যার অধ্যায় কমপক্ষে অর্ধশত হতো। তিনি তাঁর পরিকল্পনাধীন এ গ্রন্থের মাত্র চারটি অধ্যায় দিয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন। পরবর্তী পর্যায়ে কেন তিনি বাকি অধ্যায়গুলো দিয়ে মোস্তফা চরিতের ২য় খণ্ড প্রকাশ করেন নি তা জানা যায়নি। অথচ ১৯৩২ সালে মোস্তফা চরিতের বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হবার পরও তিনি প্রায় ৩৬ বছর জীবিত ছিলেন। তিনি মোস্তফা চরিতের বৈশিষ্ট্যের ভূমিকায় লিখেছিলেন :

> সর্বশক্তিমানের হুজুরে দোয়া করুন। এ অধম দাস যেন কোরআনের তফসির ও মোস্তফা চরিতের ২য় খণ্ড সমাপ্ত করিয়া মরিতে পারে।[৩৫১]

অথচ এত বছর জীবিত থাকা সত্ত্বেও তিনি কেন তাঁর আরাধ্য কাজটি সম্পন্ন করেন নি-তা বোধগম্য নয়। অবশ্য, তাফসিরের কাজটি তিনি সমাপ্ত করে গেছেন।

এই গ্রন্থে মাওলানা মোস্তফা চরিতের চারটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। বিষয়গুলো ছিলো :

---

৩৫০. আবু জাফর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪।

৩৫১. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোস্তফা চরিতের বৈশিষ্ট্য, প্রাগুক্ত, লেখকের নিবেদন দ্রঃ।

www.pathagar.com

প্রথম বৈশিষ্ট্য - তাওহীদ;
দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য - সর্ব্ব ধর্ম সমন্বয়;
তৃতীয় বৈশিষ্ট্য - মানবতার জয় ঘোষণা;
চতুর্থ বৈশিষ্ট্য - সাম্যের প্রতিষ্ঠা।

তাওহীদ : রাসুল (স.)-এর আবির্ভাবের প্রধান কারণ হলো তাওহীদের প্রতিষ্ঠা। এই তাওহীদ সম্পর্কে উক্ত অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। রাসুল (স.)-এর প্রচারিত তাওহীদ এবং খ্রিষ্টধর্মের ত্রিত্ববাদের আকিদা, দেবতার পূজা, হিন্দু ধর্মে কল্পিত ভূত-প্রেত ও দেব-দেবীদিগকে ইষ্টনিষ্টের কর্তা এ সবের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে অধ্যায়ের সর্বশেষে মাওলানা বলেন :

> মোহাম্মদ মোস্তফা আবির্ভাবের সময় তাওহীদ বিশেষ করিয়া সত্যকার তাওহীদ দুনিয়া হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল এবং নানাবিধ জাতগত শের্ক, ছেফাতগত শের্ক ও অতি নিকৃষ্ট শ্রেণির পৌত্তলিকতা তাহার স্থানকে শোচনীয়ভাবে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, সেই ঘোর ঘনঘটায় আচ্ছন্ন অন্ধকার বিশ্বকে স্বর্গের নূরে উদ্ভাসিত করিয়া ছিলেন হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা। তাঁহার প্রচারিত এই তাওহীদই সত্যকার তাওহীদ। পূর্ণ আল্লাহর পূর্ণস্বরূপে পূর্ণ বিকাশ একমাত্র তাহারই শিক্ষায় ঘটিয়াছিল। আহাদরূপে বিদ্যমান, ছামাদরূপে বিদ্যমান। আল্লাহর সত্য স্বরূপকে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠা করিয়া রাখিয়াছেন একমাত্র তিনি। আমার মতে, এটাই হইতেছে তাঁহার নবি জীবনের শ্রেষ্ঠতম বৈশিষ্ট্য।[৩৫২]

সর্ব্বধর্ম সমন্বয় : এ অধ্যায়ে মাওলানা প্রমাণ করেছেন যে, হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে পৃথিবীতে যত ধর্ম প্রচারক এসেছেন, তাঁদের ক্ষেত্র ছিল বিশেষ গোত্র, বিশেষ স্থান, বিশেষ এলাকা। তাঁদের লক্ষ্য ছিল না বিশ্ব মানব। অর্থাৎ, বিশ্বমানবের কল্যাণ কোনোদিনই ছিল না। যীশুখ্রিষ্ট এসেছিলেন এহুদার হারানো মেষপালগুলোকে খুঁজে বের করতে। হজরত মূসার আবির্ভাব বনি ইসরাঈলকে দাসত্বমুক্ত করতে। ভারতবর্ষে নয় নয়র্জন অবতার কেবল ভারতবাসীর জন্যই চিন্তা-ভাবনা করেছেন।[৩৫৩] এমনি বিস্তারিত বিশ্লেষণ দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন, আসলে বিশ্বমানবতার মুক্তির পথনির্দেশক হিসেবে কেউ ছিলেন না। সর্বশেষে মাওলানা সাহেব বলেন :

> প্রত্যেক ন্যায়নিষ্ঠ স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, ধর্ম সংক্রান্ত সকল বিকারের বিচার করিয়া যুগগত, জাতিগত, দেশগত ধর্মের সকল সংকীর্ণ গণ্ডিকে চিরকালের তরে তুলিয়া দিয়া বিশ্বমানবের সব বিচ্ছেদ, সব ব্যবধানের সীমান্তরেখাগুলিকে স্থায়ীভাবে মুছিয়া ফেলিয়া হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা দুনিয়ার সকল ধর্ম-সংঘর্ষের ও সকল ধর্মসমস্যার যে সমন্বয় ও সমাধান আনয়ন করিয়াছেন বস্তুতই মানবের ইতিহাসে তাহা এক অনুপম ও অভিনব ব্যাপার। দুনিয়া জোড়া সংঘর্ষ-সংঘাতের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া হযরত মোহাম্মদ মোস্তফাই এই সমন্বয়ের সর্বপ্রথমে বিশ্ববাসীর সম্মুখে ঘোষণা করিয়াছেন এবং একমাত্র তিনিই সেই সমন্বয় ও

---

৩৫২. মোহাম্মদ আকরম খাঁ মাওলানা, মোস্তফা চরিতের বৈশিষ্ট্য, পৃ. ২৮।
৩৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।

www.pathagar.com

সমাধানকে বিশ্বের বুকে বাস্তবরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছেন। আমার মতে ইহাই হইতেছে সেই রহমতরূপী মহামানবের নবি জীবনের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য।[৩৫৪]

মানবতার জয় ঘোষণা : এ অধ্যায়ে বিশ্ব মানবতার বিজয় ঘোষণা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, জগতে যত মহাগুরু বলেছেন, যত মধুর বক্তব্যই উপস্থাপন করেছেন, মূলত শিক্ষার আদর্শের হিসেবে তা মানব মনে স্থায়ী প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে নি। তাঁদের অবস্থান ছিল স্বর্গের দেবলোক। তিনি উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করেন, পারস্যের মিথ্রার কথা, ব্যাবেলনিয়ানদের বা আলের কথা। সিরিয়ার আউদনীর কথা, গ্রীসের Beachus ও মিশরের হোবসেনের কথা। এঁরা সবাই দেবতা, অবতার, অতিমানব।[৩৫৫]

এ অবস্থার মধ্যে হযরত মোহাম্মদ (স.) মানবতার বিজয় বাণী নিয়ে এলেন। তারা বললো, আমাদের মত পিতার ঔরসে মাতার গর্ভে যার জন্ম, আমাদেরই মত যিনি সুখ-দুঃখে পরিবেষ্টিত-তিনি আমাদের শিক্ষক কিভাবে হতে পারেন।[৩৫৬] তারা আরও বললো-মোহাম্মদ কেমন রাসুল, তিনি অন্ন ভক্ষণ করেন এবং (সংসারের কাজকর্ম) হাটে-বাজারেও ঘুরে বেড়ান। রাসুলই যদি হবেন তবে স্বর্গলোক হতে কোনো একজন দেবদূত অবতীর্ণ হলো না কেন?[৩৫৭]

রাসুল (স.) এর উত্তরে কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন :

> হে মোহাম্মদ! তোমার পূর্বে আমরা মানুষ ব্যতীত অন্য কাউকেও রাসুলরূপে প্রেরণ করি নি। অতএব জ্ঞানীজনকে জিজ্ঞাসা করে দেখ, তোমরা যদি অবগত না থাক।[৩৫৮]

অর্থাৎ, মানুষের মুক্তির জন্য সুখ-দুঃখের সমভাগী মানুষকে রসূল করাই সঙ্গত ও সার্থক হতে পারে। অবতারের বা স্বর্গীয় দেবতার কোনো সার্থকতাই এখানে নেই। অতঃপর মাওলানা সাহেব এয়াকুব আলি চৌধুরীর[৩৫৯] মানব মুকুট গ্রন্থের একটি উদ্ধৃতি পেশ করে বলেন :

> হযরত মোহাম্মদ মানবতার সুমহান গৌরব। তিনি ঈশ্বরের পুত্র বা অবতার নহেন, তিনি মানুষ, ইহাতেই তাহার সার্থকতা ও ইহাতে তাঁহার অহঙ্কার। তিনি মানুষের মহিমা ও গৌরবের যে ডঙ্কা বাজাইয়াছেন মানুষের পক্ষে তাহা অতিবড় গৌরবের বিষয়।[৩৬০]

এ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি টেনে মাওলানা আকরম খাঁ বিভিন্ন ধর্ম প্রচারকের শিক্ষা ও রাসুল (স.)-এর শিক্ষার তুলনামূলক আলোচনায় বলেন :

---

৩৫৪. মোস্তফা চরিতের বৈশিষ্ট্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।
৩৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।
৩৫৬. মোস্তফা চরিতের বৈশিষ্ট্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১।
৩৫৭. ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى الاسواق الاية
প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।
৩৫৮. وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحى اليهم فسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون
সুরা আম্বিয়া, আয়াত ৯।
৩৫৯. এয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৭-১৯৩৮)। ফরিদপুর জেলার পাংশা থানার অন্তর্গত মাগুরা ডাঙ্গী গ্রামে তাঁর জন্ম। তিনি ছিলেন বাংলা প্রাবন্ধিক।
বাংলা বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৬।
৩৬০. মোস্তফা চরিতের বৈশিষ্ট্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।

www.pathagar.com

খ্রি. বুদ্ধ ও চৈতন্য অহিংস ও প্রেমের মন্ত্র প্রচার করিয়া মানুষকে উৎকৃষ্ট নীতি শিক্ষা দিয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহারা মানুষের উপাস্য সম্বন্ধে নীরব থাকিয়া মহাপুরুষকে ঈশ্বরের আসনে বসাইতে গিয়া মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনকে শোচনীয়রূপে পঙ্গু করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। হজরত মোহাম্মদও মানুষকে প্রেম ও ক্ষমার উপদেশ দিয়াছেন। আত্মজীবনে তাহার জ্বলন্ত আদর্শ দেখাইয়াছেন। কিন্তু তিনি মহাপুরুষের কল্পিত দেব সিংহাসনে পদাঘাত করিয়া মানবতার অতল সমতলে দাঁড়াইয়া উর্দ্ধে অঙ্গুলি তুলিয়া বলিয়াছেন, ঐ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া হে মানুষ আর কেহ বড় নহে।[৩৬১]

বস্তুত মানবতার এ বিজয় ঘোষণা দুনিয়ার ধর্ম ইতিহাসে অভিনব ব্যাপার। একেই মাওলানা সাহেব রাসুল (স.)-এর নবিজীবনের তৃতীয় বৈশিষ্ট্যরূপে আখ্যায়িত করেছেন।

সাম্যের প্রতিষ্ঠা : এ অধ্যায়ে মাওলানা ইসলামের সাম্যবাদ ও প্রচলিত সাম্যবাদের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। তিনি ধর্মশাস্ত্রবিশারদদের সাম্যবাদের নমুনা এবং রাসুল (স.)-এর সাম্যবাদের নমুনা উল্লেখ করে বলেন :

এই নিরক্ষর মহামানবের আবির্ভাবকালে জগতে ধর্মের, ধর্মশাস্ত্রের, ধর্মদর্শনের এবং ধর্ম সমাজের একটুও অভাব ছিল না। কিন্তু এই সকল ধর্মশাস্ত্র নিজেদের অনুসারী মানব সাধারণের মধ্যে যে শিক্ষা ও সংস্কারের প্রচলন করিয়াছিল এবং তখনকার ধর্ম সমাজগুলি সদা প্রভুর ও শ্রী ভগবানের নামে যে সকল নির্মম বিধি-ব্যবস্থাকে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছিল। তাহা ঘোর অধর্ম, ঘোর মহাপাতক এবং মানবতার অতি শোচনীয় অপচয় ব্যতীত আর কিছুই নহে। হিন্দু, এহুদী, পার্সিক ও খ্রিষ্টানদিগের শাস্ত্রীয় আদেশ, নিষেধ ও সামাজিক ব্যবস্থার ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিলে সহজে জানা যাবে যে, অসাম্যের অভিশাপ হইতে বিশ্ব মানবকে মুক্ত করার জন্য কোনো প্রচেষ্টার সামান্য অস্তিত্বের একটা ক্ষীণদপি ক্ষীণ চিহ্নও সেখানে বিদ্যমান নাই। বরং সত্যের অনুরোধে সকলকে স্বীকার করিতে হইবে যে, এই সকল শাস্ত্র ও শাস্ত্রকারদিগের মধ্যে কেহ বা নীরবে বিনা প্রতিবাদে এইসব নির্মম অত্যাচারের সমর্থন করিয়াছেন। আবার কেহ বা নিজেদের পাণ্ডিত্যের সম্পূর্ণ অপব্যবহার করিয়া এই নির্মমতার চিত্রকে নির্মমতর করিয়া দিয়াছেন। এইসব মুনি, ঋষি ও মহাপুরুষদেরই কল্যাণে মানব জাতির অন্ততঃ তিন-চতুর্থাংশ নারী শূদ্ররূপে, দাস ও হিদেন রূপে শৃগাল কুকুরের ঘৃণিত অবস্থায় উপনীত হইতে বাধ্য হইয়াছিল।[৩৬২]

মাওলানা খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ এবং তাদের বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে বলেন :

বাইবেলের আদি পুস্তকের পানে অঙ্গুলী সঙ্কেত করিয়া একদল ধর্মযাজক পুরোহিত দুনিয়ার সমগ্র নারী জাতিকে চিরকালের স্তরে ত্রস্ত করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করেন। কারণ, নারী প্রথম পাপের প্রবর্তন করিয়াছে। ইভ বা হাওয়ার মহাপাতকের জন্যই সমস্ত মানব প্রকৃতিগতভাবে পাপের ভাগী হইয়াছে এবং সদা প্রভুর একজাত

---

৩৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১।
৩৬২. মোস্তফা চরিতের বৈশিষ্ট্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪-৫৫।

www.pathagar.com

পুত্রকে সেই পাপের জন্য ক্রুশবিদ্ধ প্রাণ ত্যাগ করিতে হইয়াছে। তাই সাধু তার্তুলীয়ান নারীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন :

Do you know, that are each Eve? The sentence of God on this sex of yours lives in this age; the guilt, of necessity, must live too, you are the devil's lateway; you are the unsealer of that tree; you are the first deserter of the devine law; you destroyed as easily God's image.[৩৬৩]

অন্যদিকে, বিশ্ব মানবের আদি সৃষ্টিকর্তা স্বয়ম্ভু ভগবান মনু দ্বিজসপ্তমগণকে সম্বোধন করে নারীদের সম্বন্ধে বলছেন-

নৈতা রূপং পরীক্ষন্তে নাসাং বয়সি সংস্থিতিঃ।
সুরূপদস্বা বিরূপসৃ পুমানিতোর ভূঞ্জতে।[৩৬৪]

অতঃপর উক্ত গ্রন্থে মাওলানা সাহেব যিশু খ্রিষ্টের আবির্ভাবের যুগ হতে সুসভ্য খ্রিষ্টান জগতের সুদীর্ঘ দুই সহস্র বছরের ইতিহাসের চিত্র সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন। ইটালি, ফরাসি, জার্মানি, ইংরেজ জাতি দাসদের সাথে কি ধরনের আচরণ করেছে, তার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা বর্ণনা করেছেন। সাম্যের নামে কী জঘন্য ধরনের অমানবিক সাম্য তারা জগতের ইতিহাসে রেখে গেছেন, তারও চিত্র তুলে ধরেছেন। সাথে সাথে ইসলামের নবি দাসদের সাথে কি ধরনের আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন-তারও একটি প্রামাণ্য আলোচনা করে তিনি প্রমাণ করেছেন, ইসলাম কি ধরনের সাম্য পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করেছে। সর্বশেষ আলোচনায় বলা হয়েছে- প্রেম ও সাম্যের এই সব স্বর্গীয় আদর্শকে দুনিয়ার কার্যক্ষেত্রে বাস্তবরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা দুনিয়াকে সত্যিকারভাবে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করিয়া দিয়াছিলেন। এটাই তাঁর চতুর্থ বৈশিষ্ট্য।[৩৬৫]

'মোস্তফা চরিতের বৈশিষ্ট্য' ও 'বিশ্বনবির বৈশিষ্ট্য'র মধ্যে পার্থক্য : কবি গোলাম মোস্তফা 'মোস্তফা চরিতের' প্রতিবাদস্বরূপ 'বিশ্ব নবি' রচনা করেছেন, তেমনি তিনি সম্ভবত মোস্তফা চরিতের বৈশিষ্ট্যের প্রতিবাদস্বরূপ বিশ্বনবির বৈশিষ্ট্য লিখেছেন। বিশ্বনবির বৈশিষ্ট্যের আলোচ্য বিষয়গুলো হলো-

ক. ইসলাম কী?
খ. আদর্শ প্রতিষ্ঠায় হযরত মুহাম্মদ;
গ. কয়েকটি প্রশ্ন ও তাহার জবাব;
ঘ. হযরত মুহাম্মদ একক রাসূল ছিলেন কী না।[৩৬৬]

---

৩৬৩. অর্থাৎ "তোমরা কি জান যে, তোমরা প্রত্যেক্যেই এক একজন ইভ? সেদিন ঈশ্বর আমাদের স্ত্রী জাতির উপর যে অভিসম্পাত বর্ষণ করেছিলেন তাহা এ যুগেও বলবৎ রহিয়াছে, এবং অভিসম্পাত যখন আছে তখন তোমাদের সাধ্য পাপও নিশ্চয় আজও রহিয়া গিয়াছে। তোমরা শয়তানের প্রবেশ পথ। নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল তোমরাই প্রথম আস্বাদ করিয়াছ-তোমরাই প্রথম ঈশ্বরের নির্দেশকে লঙ্ঘন করিয়াছ এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিকেও অনায়াসে চূর্ণ করিয়াছ।"
প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬।

৩৬৪. অর্থাৎ, নারীরা সৌন্দর্য্য অন্বেষণ করে না, যুবা বা বৃদ্ধ তাহাও দেখে না, সুরূপ বা কুরূপ হউক তাহারা পুরুষ পাইলেই তাহার সহিত সম্ভোগ করে।
প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭।

৩৬৫. মোস্তফা চরিতের বৈশিষ্ট্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭।

৩৬৬. গোলাম মোস্তফা, বিশ্ব নবির বৈশিষ্ট্য, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৩, ভূমিকা দ্রঃ।

www.pathagar.com

লক্ষণীয় যে, আকরম খাঁ'র মোস্তফা চরিতের বৈশিষ্ট্যও ৪টি বিষয় নিয়ে বইটির সমাপ্তি টানা হয়েছে, ঠিক তেমনি গোলাম মোস্তফা সাহেবও তাঁর বিশ্বনবির বৈশিষ্ট্যে ৪টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে গ্রন্থটির আলোচনা শেষ করেছেন। তাই মনে হয়, মোস্তফা চরিতের বৈশিষ্ট্যের জওয়াবেই রচিত হয় বিশ্বনবির বৈশিষ্ট্য গ্রন্থ। অবশ্য, এ গ্রন্থের এক জায়গায় তিনি মোস্তফা চরিতের একটি উদাহরণও পেশ করেছেন।[৩৬৭]

'মোস্তফা চরিতের বৈশিষ্ট্য'র প্রকাশক : মুহম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ, ৯১, আপার সার্কুলার রোড, কোলকাতা। মুদ্রক : মুহম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ, মোহাম্মদী প্রেস, ৯১, আপার সার্কুলার রোড, কোলকাতা। প্রথম সংস্করণ : ২৬শে জুলাই, ১৯৩২, পৃঃ ২+৯৭। মূল্য-দশ আনা।[৩৬৮]

সমস্যা ও সমাধান

সমস্যা ও সমাধান মাওলানার একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। যুগের আলোকে কতকগুলো ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে দীর্ঘদিন থেকে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টিহয়েছিল। যেমন : গান জায়েয কী-না, চিত্রকলা নিষিদ্ধ কী-না? ব্যাংকের সুদ গ্রহণীয় কী-না? ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার কি ধরনের, ইসলাম নারীকে অন্যান্য ধর্মাপেক্ষা অধিকতর অধিকার দান করেছে। মিশরে বিবাহ আইন সংশোধন করা হয়েছে। ভারতেও তদ্রূপ আইন করা প্রয়োজন ইত্যাদি বিষয়ে মাওলানা আকরম খাঁ যুগের চাহিদা অনুযায়ী কুরআন-হাদিসের তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ করে অশেষ পাণ্ডিত্যের মাধ্যমে এ ধরনের কয়েকটি সমস্যার সামাধানে গ্রন্থটি রচনা করেছেন। এর ভেতর দিয়ে তাঁর যুক্তিবাদী এবং সংস্কারকামী মনের নির্ভুল পরিচয় পাওয়া যায়।

মাওলানার এই গ্রন্থটি আধুনিক যুগ-জিজ্ঞাসার আলোকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইসলামের কিছু অনুশাসন নিয়ে আলিম সমাজে দীর্ঘদিন থেকে বিতর্ক চলে আসছে। এগুলো রক্ষণশীল ও প্রগতিবাদীদের মধ্যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টিকরেছিল। মাওলানা গ্রন্থটি লিখে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে প্রচলিত ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে তাঁর মতামত পেশ করে রক্ষণশীল ও আধুনিকপন্থীদের বিরোধ মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করেন। এ সব বিষয় কখন, কোনো্ অবস্থায়, কোনো্ প্রেক্ষিতে বৈধ বা অবৈধ-ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বিশদ আলোচনা করেন।

চিত্রকলা সম্পর্কে তিনি বলেন : জীবজন্তুর চিত্রের সকল প্রকার ব্যবহার সকল অবস্থায় এবং সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু পৌত্তলিকতার প্রতীক জীবজন্তুর সকল প্রকার ব্যবহার সকল অবস্থায়ই সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ।[৩৬৯]

---

৩৬৭. মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেব আলাক' শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "আলাক-অভিধানে ইহার অর্থ শোণিত বা তাহার কোনো পরিবর্তিত অবস্থা, প্রেম আসক্তি বা প্রেম সহকারে আকর্ষণ, জোঁক জাতীয় ক্ষুদ্র কীট প্রভৃতি (কামুছ, মাজমাউল বাহার)। এখানে উহার বর্ণিত সমস্ত অর্থ সমাভাবে প্রযোজ্য। এই জন্যই আমি উহার বাংলা প্রতিশব্দ দিতে পারি নাই। কেবল জমাট রক্ত বলিয়া উহার অর্থ করিলে যারপরনাই অন্যায় করা হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।"
প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।

৩৬৮. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১৯৩২ খ্রি. ৩য় ত্রৈমাসিক খতিয়ান, ক্রমিক সংখ্যা ৬৭১, পৃ. ৫৮।

৩৬৯. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, সমস্যা ও সমাধান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১-২।

www.pathagar.com

নারীর মর্যাদা প্রসঙ্গে বলেছেন : যুগে যুগে নির্মমভাবে উপেক্ষিত এবং আবহমানকালের উৎপীড়িতা এই নারীকে মাটি হইতে তুলিয়া তাহাকে সম্মান ও গৌরবের মছনদে বসাইয়া দিয়াছিল এছলাম।[৩৭০]

সঙ্গীত সম্পর্কে বলা হয়েছে : এছলাম প্রাকৃতিক ধর্ম, কোরানের এই দাবী নিশ্চয়ই সত্য। সকল সঙ্গীতকে ইসলাম সকল অবস্থায় কখনই হারাম বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে পারে না।[৩৭১]

সুদ সম্পর্কে বলা হয়েছে : এছলামের আদেশ-নিষেধগুলিকে এক সঙ্গে গ্রহণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারিলে সুদখোর মহাজন দিগের দ্বারস্থ হওয়ার কোনো দরকারই মুছলমানের থাকিবে না। সুদ সমস্যা মুসলমানদের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিতেছে এছলামকে অতিক্রম করিয়া, তাহাকে অবলম্বন করিয়া নহে। এছলাম এ সমস্ত সমাধানের সম্যক ব্যবস্থা করিয়াই সুদের নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছে।[৩৭২]

এসব বিতর্কমূলক বিষয় দীর্ঘদিন যাবত চলে আসছে। জনমতের বিরুদ্ধে লেখনীর ময়দানে নির্ভীক ও সাহসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে কোনো আলিমই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন নি। আকরম খাঁ-ই সর্বপ্রথম এ ধরনের সাহসিকতা নিয়ে গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। বাংলা ভাষায় এ ধরনের গ্রন্থ সম্ভবত এটাই প্রথম। *সমস্যা ও সমাধান* গ্রন্থটি বিভিন্ন প্রবন্ধ আকারে *মাসিক মোহাম্মদী*তে প্রকাশিত হয়। পরে একত্রিত করে *সমস্যা ও সমাধান* নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। গ্রন্থটি প্রকাশের পর অবশ্য তিনি সমালোচনার পাত্র হন। এসব বিতর্কমূলক বিষয় নিয়ে মুসলিম দুনিয়ায় সম্ভবত প্রথম লেখনী ধারণ করেন মিশরের মুফতি মুহাম্মদ আবদুহু এবং তাঁর শিষ্য আল্লামা রশীদ রেযা।[৩৭৩] মাওলানা আকরম খাঁ তাঁদের পথ অনুসরণ করে এ পথে লেখা পরিচালনা করেন। অবশ্য, এসব বিতর্কের এখনও অবসান ঘটেনি। একদল আলিম তাঁর মতের বিরোধিতা করেই চলছেন। তবুও, সত্যের খাতিরে বলতে হয় তিনি সৎসাহস নিয়ে এ সঙ্কটাপন্ন ময়দানে ঝাঁপ দিয়েছেন। এটাই তাঁর কৃতিত্ব। তিনি ধর্মের সাথে আধুনিকতার সেতু বন্ধনের চেষ্টা করেছেন। মুক্ত মন নিয়ে বিশ্লেষণের মাধ্যমে অনুধাবনের চেষ্টা করলে আমাদের সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনের অনেক সমস্যা সমাধান হবে, এতে সন্দেহ নেই। আমাদের দেশের খ্যাতনামা ইসলামি চিন্তাবিদগণ সংস্কার মন নিয়ে এই পথে অগ্রসর হলে চিন্তা-চেতনার দিগন্ত উন্মোচিত হবে, মুসলিম সমাজ পাবে সঠিক পথ-নির্দেশনা।

গ্রন্থটির প্রকাশক: মুহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ, ৯১, আপার সার্কুলার রোড, কোলকাতা। মুদ্রক: মুহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ, মোহাম্মদী প্রেস, ৯১ আপার সার্কুলার রোড, কোলকাতা। প্রথম সংস্করণ: ১৮ই মার্চ, ১৯৩১ খ্রিঃ, পৃঃ ১৫৬। মূল্য- পাঁচ সিকা।[৩৭৪]

---

৩৭০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২।

৩৭১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪।

৩৭২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯-৬০।

৩৭৩. রশীদ রেযা, সৈয়দ, আল্লামা। তিনি আল-মানার' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 'তাফসিরুল মানার'-এর অংশবিশেষ তাঁরই লেখা।
মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১, ৩৩৫।

৩৭৪. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১৯৩১ খ্রি., প্রথম ত্রৈমাসিক খতিয়ান, ক্রমিক সংখ্যা ১০৩৪, পৃ. ৮৪।

www.pathagar.com

মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস

মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস মাওলানা আকরম খাঁ'র অক্ষয়কীর্তি। আলোচনা করলে দেখা যায়, উক্ত গ্রন্থে মাওলানা সাহেব যে পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন তা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। তিনি এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে সম-উচ্চারিত আরবি, ফার্সি ও যুক্ত শব্দের একটি তালিকা দিয়েছেন। শব্দগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে বাংলা ভাষায় তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থটিতে তিনি বাংলার মুসলমানের সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর সাধনা ও গবেষণার প্রশংসাই করতে হয়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিভিন্ন ইতিহাস, হিন্দু পৌরাণিক ব্যাখ্যা, উপকথার অবতারণা করে, অতঃপর আলিম সমাজের কার্যকলাপ আলোচনা-সমালোচনা করে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের প্রয়াস পেয়েছেন। এ গ্রন্থে তাঁর দেশপ্রেম ও ইসলামপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলার মুসলমান সমাজ যে তাঁদের সবকিছু হারিয়ে ঐতিহ্যহীন হয়ে পড়েছিল তাই তিনি ধারাবাহিকভাবে উক্ত গ্রন্থে আলোকপাত করেছেন। এই গ্রন্থে তাঁর সমাজপ্রীতি ও সমাজের অবনতির জন্য বেদনার কথা স্পষ্টতই বুঝা যায়।

মাওলানা গ্রন্থটি ২৬টি অধ্যায়ে শেষ করেছেন। গ্রন্থখানিতে আলোচিত বিষয়গুলোর কয়েকটি নিম্নরূপ : জাতীয় ইতিহাসের শুভ সূচনা, বাংলার সমসাময়িক অবস্থা, মোছলেম বাংলার পতন, অধঃপতনের বাস্তব উদাহরণ, হিন্দুদের পঞ্চতত্ত্ব রহস্য : মুসলমান সমাজে উহার প্রভাব, মোছলেম ভারতের বিপর্যয়কাল, ইসলামের মৌলিক আদর্শ, মোছলেম বাংলার অনৈসলামিক ভাবধারা অনুপ্রবেশের প্রকৃত কারণ ইত্যাদি।

মাওলানার লিখিত এ গ্রন্থটি মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস নাম দেওয়া হয়েছে। এটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নয়, বরং গ্রন্থটিকে সূচীপত্র বা ইঙ্গিত বলা চলে। মাওলানার ভাষায় :

> মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস নামক একখানা কপি বুক আর কতকগুলি এলোমেলো গোছের 'ফস কাগজ' এবং তাহাতে কতকগুলি অস্পষ্ট 'নোট ও ইঙ্গিত'।[৩৭৫]

মূলত মাওলানা মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসটি পূর্ণাঙ্গভাবে রচনা করার সুযোগ পেলে এটি একটি বিরাট গ্রন্থে পরিণত হতো। কিন্তু বার্ধক্য তাঁকে সে সুযোগ দেয়নি। গ্রন্থটি রচনার সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। এই দুরূহ ও কষ্টসাধ্যের কাজ তাঁর পক্ষে তখন করা কঠিন ছিল। মাওলানা নিজেই তাঁর অপারগতার কথা গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের শেষ ভাগে বলেছেন এভাবে :

> মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস সম্বন্ধে বিচার আলোচনা করা যে সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। অভিজ্ঞ পাঠকবর্গকে তাহা বলিয়া দিতে হইবে না। ভারতের সহিত বিশেষত বঙ্গদেশের সহিত আরবদিগের ও ইছলাম ধর্মের সংশ্রবের ফল। তাহার সময়, বঙ্গদেশের পুরাতন ইতিহাস ও বিদেশী আর্য্যদিগের প্রতি তাহাদের তৎকালীন মনোভাব, বৌদ্ধ, জৈন এবং বৈষ্ণব ও খ্রিষ্টান ধর্মের প্রভাব ও প্রসার, বাংলা ভাষার উৎপত্তি এবং তাহার ক্রমবিকাশ বা বিকার এই দীর্ঘ সময় ধরিয়া তাহাদের আত্মরক্ষার সাধনা ও সংগ্রাম প্রভৃতি অনেক বিষয়ের সন্ধান আমাদিগকে

---

৩৭৫. মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১-২।

www.pathagar.com

> লইতে হইবে। এমন অনেক প্রশ্নও আছে। বর্তমানে তাহা আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে বাহ্যতঃ অবান্তর বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু পরে দেখা যাইবে সেইগুলিই বস্তুত অধিক দরকারী ও মৌলিক তথ্য।[৩৭৬]

উপরোক্ত অধ্যায়ের শেষে এই গ্রন্থ সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন :

> এই প্রবন্ধটা সম্পূর্ণ অবিন্যস্ত। ইহার বিষয়বস্তুগুলি কতকগুলি বিক্ষিপ্ত তথ্যের সমষ্টি মাত্র।[৩৭৭]

গ্রন্থটি মাওলানার জীবনের শেষ গ্রন্থ এবং তাঁর জীবদ্দশাতেই প্রকাশিত হয়েছে।

গ্রন্থের ৮৩ পৃষ্ঠায় মুসলিম বাংলার পতনের কথা উল্লেখ করে মাওলানা বলেন :

> মুছলিম বাংলার পতন যুগের ইতিহাস পাঠ করলে কালা ও গঙ্গার স্তোত্র এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা বিষয়ক গীত রচনা করিয়াছেন, এরূপ বহু সৈয়দ, মীরজা ও পাঠান কবির সাক্ষাৎ আমরা পাইব, আকবর কর্তৃক উত্তর-পশ্চিম ভারত হইতে স্থানান্তরিত একদল ধর্মদ্রোহী পীর ও ফকিরের আগমনের ফলে এই সময় অবস্থা আরো শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। মুসলমান জনসাধারণ কিরূপ সরাসরিভাবে হিন্দুদের দেব-দেবীদিগকে গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা দেখাইবার জন্য ড. দীনেশ চন্দ্র সেন বলিতেছেন: গাজী ও দক্ষিণারায়ণের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ বিষয়ে রচিত 'কালু গাজীর ও চম্পাবতী' নামক পুঁথি এবং অনুরূপ অন্যান্য পুঁথি কাজে ব্যাঘ্র সম্পর্কিত গীতি কবিতা বা বাঘের পাঁচালীতে আমরা দেখিতে পাই যে, হিন্দু দেবী গঙ্গাকে গাজীর মাসীরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। জেবুল মূলক শামারুখ কাব্যে দেখা যায় যে, মুসলিম কবি হিন্দু দেব-দেবীগণকে মুসলমানের পীররূপে অঙ্কিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।[৩৭৮]

একটি বন্দনা গীতের নমুনা নিম্নে তুলে ধরা হলো :

> হজরত রসুল বন্দি প্রভু নিজ সখা।
> হিন্দু কুলে অবতারি চৈতন্য রূপে দেখা।[৩৭৯]

মাওলানা আকরম খাঁ উক্ত বন্দনা গীতের উদাহরণ উল্লেখ করে অত্যন্ত দুঃখ করে বলেন :

> মুছলিম বাংলা অধঃপতনের কোনো অতল গহবরে নামিয়া গিয়াছিল এবং মুছলিম ধর্ম বিশ্লেষণে কিরূপ গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় এই বন্দনা গীতিতে। এই বন্দনা গীতিতে মুছলমানের আল্লাহ ও হিন্দুর ঈশ্বর, হিন্দুর কালী ও মুছলমানের হাওয়া, হিন্দুর দ্বাদশ রাখাল ও রসুলে করিমের আছহাব এবং হিন্দু পুরাণ ও মুছলমানের কোরআনকে অভিন্ন অথবা সমতুল্য বস্তুরূপে দেখান হইয়াছে। হিন্দু দেবতাদিগকে মুছলমানের নবি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যকে হজরত মোহাম্মদ (স.)-এর অবতার বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে এবং সকল হিন্দু দেব-দেবীর প্রতি পূজা নিবেদন করা হইয়াছে।

---

৩৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২।
৩৭৭. প্রাগুক্ত।
৩৭৮. মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ.ঃ ৮৩।
৩৭৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫।

www.pathagar.com

> কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা বর্তমান সময়ের দুইজন অতি উচ্চ শিক্ষিত মুসলমান এই বন্দনা গীতিটাকে উপভোগ্য বলিয়া ইহার প্রশংসা-কীর্তন করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই। মুসলিম বঙ্গের ধর্মীয় ও তামদ্দুনিক অধঃপতনের ইহা অপেক্ষা চূড়ান্ত নজীর আর কি দেওয়া যাইতে পারে।[৩৮০]

মাওলানা গ্রন্থের আর এক জায়গায় মুসলিম বঙ্গের বিপর্যয়ের একটি উদাহরণ দিয়ে বলেন, আমাদের মতে হজরত উসমানের শোকাবহ মৃত্যু বা শাহাদাত মুসলমান জাতির প্রথম ও বৃহত্তম দুর্ঘটনা।[৩৮১] আমার মতে, এই শাহাদাত ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। তিনি দুঃখ করে আরবি একটি শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন :

> মা-কানা হালাকো কায়ছেন লাহালাকুন ওয়াহেদুন
> অলাকেন্নাহু বুনয়ানো কওমেন্ তাহদ্দামা।[৩৮২]

অর্থাৎ, কায়েসের ধ্বংস একটি একক ধ্বংসমাত্র ছিল না। এই একটিমাত্র ধ্বংসের ফলে একটি জাতির বুনিয়াদ চুরমার হইয়া গিয়াছিল।

এ ঘটনার পশ্চাদভূমিতে মুসলিম জাতিকে ধ্বংস করে দেওয়ার যে সমস্ত পাপ ও দুর্বলতা জমে উঠছিল তা-ই ছিল পরবর্তীকালের কারবালার হৃদয়বিদারক হত্যাকাণ্ডের মূল কারণ। এর পর তাতার জাতির অভ্যুত্থান এবং স্পেন হতে মুসলমানদের অপ্রত্যাশিতভাবে বিতাড়ন এই দুটি ঘটনাকে আমরা মুসলমানদের জাতীয় বিপর্যয়ের অন্যতম প্রধান কারণরূপে উল্লেখ করতে পারি। এ সম্পর্কে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, অতীত ইতিহাসের এই অভিজ্ঞতা অত্যন্ত তিক্ত ও পীড়াদায়ক। কিন্তু জাতির ভবিষ্যৎ অগ্রগতির জন্য এই অভিজ্ঞতার প্রয়োজন ছিল অপরিহার্য। একটি জাতির ইতিহাস আলোচনার মূল্য এখানেই। আকরম খাঁ গ্রন্থটির নাম মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস দিলেও মূলত এতে গোটা উপমহাদেশের সামাজিক ইতিহাসের কিছুটা ইঙ্গিত রয়েছে। মোগল আমলের রাজা-বাদশাহদের সুকীর্তি সবই এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। মুসলিম সমাজে কিভাবে ইসলামবিরোধী আচার-আচরণের অনুপ্রবেশ ঘটলো তা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হয়েছে। মোগল আমলের শাসকবর্গ সম্পর্কে তিনি বলেন :

> মোছলেম বাংলার দীর্ঘ ইতিহাসে এছলামী ভাবধারা ও আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং মোছলেম তাহযিব ও তমদ্দুনে বিশ্বাসী এরূপ একজন চরিত্রবান শাসনকর্তা সরকারী কর্মচারী ও রাজনৈতিক নেতার সাক্ষ্য আমরা পাই না, যিনি বাংলার মুসলমানদিগকে তাহাদের ব্যক্তিগত অথবা সমাজ জীবনে শক্তি ও সাহস অর্জনে প্রেরণা যোগাইতে সক্ষম ছিলেন। এটাই ছিল মুছলিম সমাজের মানসিক খাদ্যের দুর্ভিক্ষ, যা উহাকে ভেতর হইতে ধ্বংস ও অধঃপতিত করিয়া চলিয়াছিল।[৩৮৩]
>
> বাংলার তথাকথিত উদার মহানুভব ও বিদ্যোৎসাহী মুসলমান নবাব ও সুলতানগণ তাদের নিজস্ব ধর্মগ্রন্থসমূহ ও সাহিত্য চর্চার প্রতি নজর দেওয়া অথবা এ কাজে কোনো মুসলমানকে উৎসাহ দান ও পৃষ্ঠপোষকতা করার কোনো প্রয়োজন অনুভব

---

৩৮০. মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫।
৩৮১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭।
ما كان هلك قيس لهلك واحد + ولا كنه بنيان قوم تحدما.
৩৮২. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭।
৩৮৩. মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।

www.pathagar.com

> করেন নাই। সমসাময়িক সাহিত্য খুঁজিয়া বাংলার এই সমস্ত নবাব ও সুলতানগণের দরবারে কোনোদিন কোরআন অধ্যয়ন অথবা হজরত মোহাম্মদ (স.)-এর জীবনচরিত ও শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনার অনুষ্ঠান হইয়াছে- এই ধরনের কোনো আভাস আমরা পাই না। শত শত প্রাচীন পুস্তক ও পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায় যে, তাঁহাদের অনেকেরই দরবারে রামায়ণ ও মহাভারত পাঠের নিয়মিত সাহিত্যিক আসরের অনুষ্ঠান হইতেছে।[৩৮৪]

মাওলানা এই গ্রন্থের অন্যান্য স্থানে উপরোক্ত বক্তব্যের প্রমাণস্বরূপ বলেন :

> প্রায় সহস্র বৎসর যাবত যে সমস্ত বিরুদ্ধশক্তি প্রকাশ্যে অথবা গোপনে এছলাম ও মুসলমানদের সমাজ জীবনের ধ্বংস সাধনে লিপ্ত ছিল সম্রাট আকবরের নিকট তাহা সমর্থন ও উৎসাহ পাইল। তিনি এই সমস্ত বিরুদ্ধবাদের ব্যাখ্যাদাতাদের প্রচুর সম্মান ও সমাদরের সহিত তাঁহার দরবারে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ইহাতেও তিনি সন্তুষ্ট হইলেন না। মুসলমানদের তামদ্দুনিক ও রাজনৈতিক জীবনের সকল সম্পদ ও শক্তি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিয়া দেওয়ার জন্য ভারতে যে হিন্দু মানসিকতা নীরবে অথচ অব্যাহতভাবে শক্তি সঞ্চয় করিয়া চলিয়াছিল ইতিহাসের লিখিত ও সর্বসম্মত রায় অনুসারে সেই হিন্দু মানসিকতাকে জীবন ধারায় প্রাধান্য দেওয়ার জন্য কোনোরূপ চেষ্টারই তিনি ত্রুটি করেন নাই।.... এছলাম মুসলমানকে বহু দেব-বাদী, প্রকৃতি পূজাকে ও পৌত্তলিকদের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে।... আকবরই ইসলামের এই নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করেন। নিজের বিবাহিত মুসলিম পত্নীর প্রতি নিষ্ঠুর উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া জয়পুরের রাজা বিহারী মলের কন্যাকে তিনি মহিষীরূপে গ্রহণ করেন।... তিনি জনৈক খ্রিষ্টান রমণীকেও বিবাহ করিয়াছিলেন।[৩৮৫]

মুসলমানদের মধ্যে কীভাবে কুসংস্কার এবং ইসলামবিরোধী ভাবধারার অনুপ্রবেশ ঘটেছে, মাওলানা এই গ্রন্থে তার অনেকগুলো কারণ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, বাংলার মুসলমান সমাজে ইসলামবিরোধী ভাবধারা প্রবেশ করেছে প্রধানত ফারসি সাহিত্যের মাধ্যমে। দীর্ঘকাল পরে ঐ শ্রেণির বিকৃত মতবাদগুলি উর্দু সাহিত্যে বিপুল পরিমাণে প্রবেশ করেছে। যে সময়ের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, তখন ফার্সি ভাষাই ছিল বাঙালি মুসলমানের দরবারি বা সরকারি ভাষা। বাংলার মুসলমান সমাজ ঐ ভাষাকে নিজেদের সামাজিক ভাষারূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং মধ্যবিত্ত ও উচ্চস্তরের মুসলিম সমাজ এটাকে নিজেদের শিক্ষা-সংস্কৃতির বাহনরূপে গ্রহণ করেছিলেন। ফারসি সাহিত্য থেকে উর্দু সাহিত্যে এবং বাংলা সাহিত্যে এ জাতীয় ধ্যান-ধারণার অনুপ্রবেশ ঘটে। বাংলা সাহিত্য মোগল বাদশাহদের হাতে বিশেষ উন্নতি লাভ করে। এর ফলে বাংলা সাহিত্যে বিদ্যমান অনেক ইসলামবিরোধী চিন্তাধারা ও আচার-অনুষ্ঠান মুসলিম সমাজ জীবনে বিস্তারলাভ করে। ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বিশেষ করে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের লোকদের সম্পর্কে তিনি বলেন :

---

৩৮৪. প্রাগুক্ত।
৩৮৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯।

www.pathagar.com

এ সমস্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা এছলাম ধর্মে দীক্ষিত হলেও নিজেদের যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত আচার-অনুষ্ঠান ও সংস্কৃতিকে সাথে করে নিয়ে আসে। যার কারণে বিভিন্ন ধর্মের রীতিনীতি মুসলমান সমাজে অনুপ্রবেশ ঘটে।[৩৮৬]

মাওলানা ইসলামবিরোধী সাহিত্য-সংস্কৃতি ভাবধারা, রীতি-নীতি মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশের সূত্র খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। কুসংস্কারকে প্রতিহত করার জন্য যাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করেন, তাঁদের মধ্যে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার নাম উল্লেখযোগ্য। মাওলানা তাঁকে মুসলিম বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক বলে আখ্যায়িত করেন। সাথে সাথে মুজাদ্দিদে আলফে সানী (শেখ আহমদ সের হিন্দী), শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ এবং শহীদ সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর সংস্কারমূলক কার্যাবলীরও ভূয়সী প্রশংসা করেন। এটি মুসলিম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে অনন্য গ্রন্থ।[৩৮৭]

গ্রন্থটির প্রকাশক : মুহাম্মদ আকরম খাঁ, *আজাদ* অফিস, ঢাকেশ্বরী রোড, ঢাকা-১; মুদ্রক : কামরুল আনাম খাঁ, *আজাদ* এন্ড পাবলিকেশনস লিঃ, ঢাকেশ্বরী রোড, ঢাকা। প্রথম সংস্করণ : অগ্রহায়ণ-১৩৭২, নভেম্বর-১৯৬৫, পৃঃ ৪+২০৬, মূল্য-সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সা।[৩৮৮]

বাইবেলের নির্দেশ ও প্রচলিত খ্রিষ্টান ধর্ম

মাওলানা আকরম খাঁ ১৯৬২ সালে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। খ্রিষ্টান মিশনারীদের অপপ্রচার থেকে মুসলিম সমাজকে রক্ষা করার জন্যই বইটি রচিত হয়। দেশ বিভাগের পূর্বে পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) ও পশ্চিম পাকিস্তানে খ্রিষ্টান মিশনারীদের খ্রিষ্ট ধর্ম প্রচারের তৎপরতা বেড়ে যায়। তারা পবিত্র কুরআন-হাদিসের ও নবি (স.)-এর চরিত্রের উপর নানা ধরনের অপবাদ দিতে থাকে। মাওলানা এ অপবাদের প্রতিবাদ স্বরূপ এবং তাদের দেয়া মিথ্যাচারকে যুক্তির মাধ্যমে খণ্ডন করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে এ গ্রন্থ রচনা করেন। অবশ্য এ ধরনের একটি গ্রন্থ ৫৬ বছর আগে ১৯০৬ সালে *খ্রিষ্ট্রিয়ানিটি ফ্রম দি ইসলামিক স্ট্যান্ড পয়েন্ট* নামে সৈয়দ আমীর আলি রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থে খ্রিষ্টান ধর্ম ও ইসলামের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে।[৩৮৯] খ্রিষ্টান ধর্ম যে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে, মাওলানা প্রথমেই তাদের সে মৌলিক বিষয়সমূহের উপর আঘাত করেছেন। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি তাঁর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে পুস্তকের পুরো আলোচনাকে নিম্নের তিনটি বিষয়ে বিভক্ত করেন :

এক. খ্রিষ্টান বা ইসলাম ধর্মে কোরআন মজিদের ও রাছুলে করিমের বিরুদ্ধে যে-সব অপবাদ রচনা করে আসছেন অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে সে সমস্তের সুসঙ্গত প্রতিবাদ করা;

দুই. হযরত ঈছার নামকরণে মিশনারীরা যে ধর্মের প্রচার করছেন তাওরাত, ইঞ্জিল বলে যে সব পুথি পুস্তক দুনিয়াময় প্রচার করে আসছেন, বস্তুত তা কোরআনে বর্ণিত আল্লাহর নাজেল করা তাওরাত ইঞ্জিল নয়। সেগুলির

---

৩৮৬. প্রাগুক্ত।

৩৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬-৪৭।

৩৮৮. আলী আহমদ সংকলিত, বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জি, বাংলা একাডেমী, পৃ. ১৮।

৩৮৯. আব্দুর রহীম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, ১৭৪৭-৫৭, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ. ১৪২।

www.pathagar.com

অস্তিত্ব দুনিয়া হতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে বহু শত বছর পূর্বের ঐতিহাসিক ও দার্শনিক যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা তা প্রতিপন্ন করা;

তিন. যিশুর ক্রুশে আরোহণ, তার রক্তে বিশ্বাসী গোনাহগারদিগের নাজাতের ব্যবস্থা, তাকে অতি মানবিক গুণের অধিকারী ঈশ্বরের অংশ বা পুত্র বলে গ্রহণ করা প্রভৃতি পাদ্রীদের ধর্মীয় সংস্কারগুলির অসারতা প্রতিপন্ন করা।[৩৯০]

মাওলানা উক্ত গ্রন্থে ইঞ্জিল কিতাব সম্পর্কে বলেন :

> আজ আমরা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি মথি বা Mathew নামক কোনো একজন মানুষের লিখিত ইঞ্জিলের-আল্লাহর প্রেরিত ইঞ্জিলের নহে। 'কোন একজন মানুষের' বলিলাম, কারণ বাইবেলের অনুবাদক ও প্রকাশক স্বীকার করিতেছেন যে, মথির ব্যক্তিগত জীবনের বিশেষ কোনো পরিচয় পাওয়া যায় নাই। মথি কোনো ভাষায় এই প্রথম 'ইঞ্জিল' বা সুসমাচারখানা রচনা করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। অনেকের মতে এই সুসমাচারখানা মথি কর্তৃক লিখিত হইয়াছিল। এবরানী ভাষায় খ্রিষ্টানদের হাতে আসিয়াছিল। তাহার একখানা গ্রীক অনুবাদ আমাদের কাছে পৌঁছিয়াছে। এই গ্রীক অনুবাদের ইংরাজি ও আরবি অনুবাদ, আর সেই অনুবাদের বাংলা, উর্দু প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদও বাইবেলের Authorised version- এর সংশোধিত ভার্সনের অনুবাদ। এইরূপে সাত নকলে আসল খাস্তা মথি নামক জনৈক অজ্ঞাত পরিচয় মানুষের লিখিত ইঞ্জিলের বা সুসমাচারের একটা অনুবাদ আল্লাহ কর্তৃক হজরত ঈসার প্রতি নাজেল করা ইঞ্জিল নহে।[৩৯১]

খ্রিষ্টান পাদরিরা প্রচার করেন যে, আদি পিতা আদম (আ.) গমের রুটি খেয়ে অপরাধী হন। আর সে জন্য তাঁর এ পাপ রক্তকণিকার মধ্যদিয়ে সমস্ত বর্জ্য আদমের দেহে সংক্রমিত হয়। তাই সদা প্রভু প্রেমবশত নিজেরই ঔরসজাত যিশু খ্রিষ্টকে কুরবানী করে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন।

স্যার সৈয়দ আহমদ তাঁর *তাবঈনুল কালাম* গ্রন্থে প্রচলিত তাওরাত ও ইঞ্জিলের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে মত প্রকাশ করে বলেন, তাওরাত ও ইঞ্জিলে একাধিক পরিবর্তন ঘটলেও তাতে আল্লাহর মৌলিক বাণীর বিকৃতি ঘটে নি। এ ব্যাপারে মাওলানা আকরম খাঁ'র মত ছিল সম্পূর্ণ আলাদা:

> খ্রিষ্টানদের বর্তমান বাইবেল কোরআনে বর্ণিত ইঞ্জিল নহে বরং এখন তাহা দাঁড়াইয়াছে হযরত ঈছার জীবন কাহিনী সম্বন্ধে কতগুলি উদ্ভট ও অনৈতিহাসিক। পুরাণিক কেচ্ছা কাহিনীর সমষ্টি মাত্র।[৩৯২]

এছাড়া মাওলানা উক্ত গ্রন্থে খ্রিষ্টানদের ত্রিত্ববাদ ও পৌত্তলিকতার মতকেও দলিল-প্রমাণ দিয়ে খণ্ডন করেন। প্রখ্যাত গবেষক ও লেখক ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ এ গ্রন্থ সম্পর্কে বলেন :

---

৩৯০. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, বাইবেলের নির্দেশ ও প্রচলিত খ্রিষ্টান ধর্ম, ১৯৬২, ভূমিকা দ্রঃ।
৩৯১. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, বাইবেলের নির্দেশ ও প্রচলিত খ্রিষ্টান ধর্ম, ১৯৬২, পৃ. ১৮।
৩৯২. মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২২।

www.pathagar.com

এ পুস্তকটির ইংরেজি অনুবাদ করে ইউরোপে ছড়াতে পারলে ইসলামের সার্থক তাবলীগ সাধিত হবে আশা করা যায়।[৩৯৩]

গ্রন্থটির প্রকাশক : মুহাম্মদ বদরুল আনাম খাঁ, প্রাচ্য প্রকাশনী, ২৭-বি ঢাকেশ্বরী রোড, ঢাকা-২। প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর, ১৯৬২ খ্রিঃ, পৃঃ ৯+১১২। মূল্য-২.২৫ পয়সা।[৩৯৪]

কোরআন শরীফ আমপারার অনুবাদ

উনিশশ' একুশ সালে জেলখানাতে বসেই মাওলানা আমপারার বঙ্গানুবাদ করেন। গ্রন্থটির নামকরণ করেন 'কারাগারের সওগাত'। গ্রন্থের প্রারম্ভেই তিনি বলেন :

> এই কারাগারের সওগাত শিক্ষিত মুসলমান যুবকগণকে উপহার দিলাম।' এই অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর দেশের সুধী সমাজ ভূয়সী প্রশংসা করেন। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এর অনুবাদ পাঠে বলেন, ইহা যে 'কারাগারের সওগাত' গ্রন্থটি পড়ে Ichn Banyan-এর Pilgrim's Progress-এর কথা মনে পড়ে। তিনিও কারাগারে এক অপূর্ব গ্রন্থ রচনা করেন।[৩৯৫]

এই পবিত্র গ্রন্থের টীকা ও অনুবাদের ভাষা যেমন সরল, তেমনি মনোরম। সুধী প্রবর অধ্যাপক জীতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন :

> কুরআনের দুরুদ পদাবলী যে এরূপ মনোহর ও গভীর ভাবপূর্ণ অনুবাদ বাংলা ভাষায় সম্ভব, পূর্বে কেহই কল্পনাতেও আনিতে পারিতেন না। কিন্তু অসাধারণ প্রতিভা বলে মাওলানা সাহেব অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছেন।[৩৯৬]

গ্রন্থে যের-যবরসহ মূল আয়াত, বিশুদ্ধ বাংলায় মূল অনুবাদ, বাংলা অনুবাদের ভাবার্থ বিশুদ্ধ প্রাঞ্জল বাংলায় বিভিন্ন তাফসিরকারের মতামতের আলোচনা ও স্বাধীন গবেষণামূলক টীকা রয়েছে। ধর্মগ্রন্থের ভাব ও ভাষা উভয়দিকে সমান দৃষ্টি রেখে তিনি চমৎকার অনুবাদ করেন। কারাগারে কুরআনের অনুবাদে যখন তিনি লিপ্ত, সে সময় ইংরেজ সরকার 'মোহাম্মদীকে' বিলুপ্ত করার জন্য পত্রিকার জামানত বাজেয়াপ্ত করেন। উক্ত আমপারা প্রকাশের কোনো তারিখ নেই। শুধু কভার পৃষ্ঠায় সেন্ট্রাল জেল, আলিপুর, ১৯২২ সাল মুদ্রিত আছে। বইটি প্রকাশের পর সাপ্তাহিক ছোলতান পত্রিকায় একটি সমালোচনা বের হয়।[৩৯৭] সুরা ফাতিহা সুরা বাকারার প্রথমে অর্থাৎ কুরআনের প্রথম সুরা আমপারার সাথে সুরা ফাতিহার স্থান দেয়া সম্পর্কে মাওলানা বলেন :

> ফাতেহা কোরআনের প্রথম পারার প্রথম সুরা, সুরা বাকারার পূর্ব্বেই ইহার স্থান, এই জন্য আমি প্রথমে আমপারার সহিত ইহার অনুবাদ করি নাই। শেষে কয়েকজন বন্ধুর অনুরোধে ইহার অনুবাদ ও ভাবার্থ মাত্র দেওয়া হইল। এ সুরা সম্বন্ধে জানিবার ও বলিবার এত কথা আছে যে, এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তাহার স্থান সঙ্কুলান হওয়াও অসম্ভব। এই সকল কারণে এখানে উহার টীকা ও তাফছির

---

৩৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২২-২৩।
৩৯৪. আলী আহমদ সংকলিত, বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।
৩৯৫. আবু জা'ফর (সম্পাদিত), মাওলানা আকরম খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯।
৩৯৬. প্রাগুক্ত।
৩৯৭. ড. মোফাখ্‌খারুল ইসলাম, অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি।

www.pathagar.com

দেওয়া হইল না। আল্লাহ শক্তি দিলে যথাস্থানে সেগুলি পাঠকগণের গোচরীভূত করার চেষ্টা করিব।[৩৯৮]

গ্রন্থটির প্রকাশক : মুহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ, ২৯, আপার সার্কুলার রোড, কোলকাতা। মুদ্রক : মুহম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ, মোহাম্মদী প্রেস, ২৯, আপার সার্কুলার রোড, কোলকাতা। প্রথম সংস্করণ : ১২ এপ্রিল, ১৯২৪, পৃঃ ১৭১। মূল্য- এক টাকা বার আনা।[৩৯৯]

উম্মুল কেতাব

'উম্মুল কেতাব' সুরা ফাতিহার অনুবাদ। এই বিশদ তাফসিরে সুরা ফাতিহার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য অতি উজ্জ্বল, অতি প্রাঞ্জল এবং অতি মানোরমভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। ইমামের পশ্চাতে সুরা ফাতিহা পাঠ, জোরে আমিন বলা ইত্যাদি বিরোধের নিরপেক্ষ সমাধান, খ্রিষ্টান লেখকদের অসাধু মন্তব্যের অকাট্য উত্তর প্রভৃতি বহু মূল্যবান বিষয় এই তাফসিরে বিদ্যমান। আনন্দবাজার পত্রিকা এ তাফসিরের প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> গ্রন্থকার মাওলানা সাহেব সবিশেষ পাণ্ডিত্য সহকারে সুরা ফাতেহার ভাষ্য করিয়াছেন এবং ঐ সুরার অন্তর্নিহিত সুগভীর আধ্যাত্মিকতা এবং দার্শনিক তথ্যসমূহকে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। তাহার ভাষ্য পাঠে ধর্মপিপাসু ব্যক্তি মাত্রই শান্তি এবং প্রীতি লাভ করিবেন।[৪০০]

সুরা ফাতিহার বঙ্গানুবাদকালে এক স্থানে মাওলানা দুঃখ করে বলেছেন :

> দুঃখের কথা, এই মতবাদের বিষয় আমাদের দেশের বহু লোকের অজ্ঞাত।[৪০১]

উল্লেখ্য, আমপারা' অনুবাদের সাত বছর পর ১৯২৯ সালে 'উম্মুল কেতাব' বা সুরা ফাতিহার তাফসির প্রকাশিত হয়।[৪০২]

গ্রন্থের প্রকাশক : মুহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ, ২৯, আপার সার্কুলার রোড, কোলকাতা। মুদ্রক: মুহম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ, মোহাম্মদী প্রেস, ২৯, আপার সার্কুলার রোড, কোলকাতা। প্রথম সংস্করণ : ১৯৩৬ সাল, ৬ই জুন, ১৯২৯ খ্রিঃ, পৃঃ ১+২৩। মূল্য- ছয় আনা।[৪০৩]

Basic Principles of Islamic Constitution

এ গ্রন্থটি মাওলানা আকরম খাঁ'র সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। প্রকাশের তারিখ উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। বহু খোঁজাখুঁজির পর এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে একমাত্র কপিটি পাওয়া যায়। দুর্ভাগ্যবশত, প্রকাশনার স্থানটি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তারিখ সংগ্রহ করা যায়নি। তবে, এ পুস্তকটির প্রথমে বাংলা সংস্করণ প্রবন্ধ আকারে 'মাসিক মোহাম্মদী'তে প্রকাশিত হয়। এর শেষাংশ ১৩৫৮ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে 'মাসিক মোহাম্মদী'তে প্রকাশিত হয়। এই হিসেবে ধরে নেয়া যায়, ১৩৫৮ সালের পরেই বইটি ইংরেজিতে ছাপা হয়।

---

৩৯৮. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, কারাগারের সওগাত, ১৯২২ সাল, সুরা ফাতেহা দ্রঃ।
৩৯৯. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১৯২৪ খ্রি., ২য় ত্রৈমাসিক খতিয়ান, ক্রমিক সংখ্যা ৬৫৬, পৃ. ৫০।
৪০০. কারাগারের সওগাত, সুরা ফাতেহা দ্রঃ ১৯৩৬ সাল, ২২ আষাঢ়, বুধবার।
৪০১. আবু জাফর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০।
৪০২. ড. মোফাখ্খারুল ইসলাম, প্রাগুক্ত।
৪০৩. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১৯২৯ খ্রি. ৩য় ত্রৈমাসিক খতিয়ান, ক্রমিক সংখ্যা ৬০৪, পৃ. ৫১।

www.pathagar.com

গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার A. Chakrabarty, বইটির প্রথমেই পাঠকদের উদ্দেশে আকরম খাঁ বলেন :

> "With the aim of elucidating the basic principles of an Islamic constitution, sometimes back I started to write a book in Bengali and it appeared in the form of a series of articles in the monthly "Mohammadi" I was requested by my friends to publish its English versions, so that it might reach wider circle of readers....
>
> I shall deem my labour amply rewarded if it be helpful, at least to some extent, in framing an Islamic constitution for Pakistan.[৪০৪]

উক্ত গ্রন্থে মাওলানা ইসলামি রাষ্ট্রে খলিফা ও খিলাফত, বুনিয়াদী উসূল বা Basic principle অর্থাৎ, ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে রাষ্ট্রীয় বিধান, কোন কোন বুনিয়াদ উসূলের উপর নির্ভর করে রচিত হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে একটি রূপরেখা বর্ণনা করেছেন। তিনি এ গ্রন্থে ইসলামি রাষ্ট্রের ২১টি মূলনীতির কথা ঘোষণা করেছেন। সর্বশেষ দফায় বলা হয়েছে :

> The specific aim of the Islamic state is the salvation of all human beings of the world and the world bringing of the whole of remanity within the fold of one brotherhood, where there shall be no distinction of colour and race no discrimination for geographical reasons or linguistic nationalsim and where there shall be no lord to be obeyed save the Almighty and the All Merciful Allah.[৪০৫]

গ্রন্থের এক স্থানে ওমর (রা.) ও ওসমান (রা.)-এর খেলাফত নির্বাচন সম্পর্কেও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রয়েছে। গ্রন্থটির গুরুত্ব অনুভব করেই মাওলানা আকরম খাঁ এর ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশেরও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে করা হয়।

এ গ্রন্থের প্রকাশক: মোহাম্মদ ছদরুল আনাম খাঁ, মোহাম্মদী বুক এজেন্সী, পোস্ট: রমনা, ঢাকা, মুদ্রক: শামসুল ইসলাম, আল হেলাল প্রেস, ৩/১, জংশন রোড, ঢাকা, মূল্য ৪ রূপী।[৪০৬]

মুক্তি ও ইসলাম

১৯৩০ সালে মাওলানা সুরমাভেলী মোসলেম কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করেন। অধিবেশনে তিনি দেশবাসীকে অত্যন্ত মূল্যবান বাণী উপহার দিয়েছিলেন, এ জন্য সমাজ ও দেশ তাঁর কাছে চিরঋণী। তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ পরে *মুক্তি ও ইসলাম* শিরোনামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। পুস্তিকায় তিনি 'মুক্তি ও ইসলাম' সম্বন্ধে যা বলেছেন, তার অংশবিশেষ নিম্নরূপ :

---

৪০৪. Basic prienciple of Islamic constitution to my readers, মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মুহাম্মদি বুক এজেন্সী, সাল অনুঃ, পৃ. লেখকের বক্তব্য দ্রঃ।

৪০৫. অর্থাৎ, এছলামী রাষ্ট্রের বিশেষ লক্ষ্য হইতেছে পৃথিবীর সমগ্র মানব সমাজের মুক্তি সাধন করে তাদের সকলকে এমন এক ভ্রাতৃ সমাজের অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া, যেখানে ভৌগোলিক বা ভাষাগত জাতীয়তাবাদ কোনো পার্থক্যের সৃষ্টি করিতে পারিবে না এবং যেখানে একমাত্র সর্বশক্তিমান ও সর্ব মঙ্গলময় আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারো প্রভুত্ব স্বীকৃত হইবে না।
প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।

৪০৬. এ তথ্য উক্ত গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

www.pathagar.com

> ইসলাম মুক্তিরই প্রতীক, গোলামীর পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে তাঁহার স্থিতি এবং পুষ্টিএক প্রকার অসম্ভব। মুসলমান একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করিবে এবং আল্লাহ ব্যতীত দুনিয়ার আর কোনো ভাবের, বস্তুর, ব্যক্তির বা শক্তির দাসত্ব সে কখনো কোনো মতে স্বীকার করিবে না- ইহাই তাহার কালেমায়ে তাওহীদের একমাত্র শিক্ষণ, এবং ইহাই হইতেছে তাহার তাওহীদের মূলমন্ত্র। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে সহজে জানা যাইবে যে, পরাধীন জীবনে তাওহীদের পূর্ণভাব কখনই বিকাশ লাভ করিতে পারে না।[৪০৭]

তিনি আরও বলেন :

> যাহাই সত্য তাহাই কহিতে হইবে এবং যাহা ন্যায্য তাহাই করিতে হইবে ইহাই হইতেছে আল্লাহর হুকুম। কিন্তু পরাধীন জীবনে আমরা সত্য পালন করিতে ও নায্য হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য হই। অনেক সময় রাজদণ্ডের ভয়ে এমন কথা বলি ও এমন কাজ করি যাহা আমার জ্ঞান ও বিবেক অনুসারে অসত্য ও অন্যায়। .... ফলত: পরাধীন জীবনে মোসলমানের ঈমান যেমন সুস্থভাবে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। শরিয়ত-ও তদ্রূপ অক্ষত দেহে তিষ্ঠিতে পারে না।[৪০৮]

মুসলমানদের রাজনৈতিক দিক-নির্দেশনায় তিনি বলেন :

> মুসলমানদিগকে কংগ্রেসের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিতে ও হিন্দু রাজনৈতিক চিন্তাবিদদের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে অনুরোধ করি।[৪০৯]

পুস্তিকাটির প্রকাশক: মুহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ, ৯১, আপার সার্কুলার রোড, কোলকাতা। মুদ্রক: প্রাগুক্ত, মোহাম্মদী প্রেস, ৯১, আপার সার্কুলার রোড, কোলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৩০, পৃঃ ২৩।[৪১০]

তাফসীরুল কুরআন

তাফসীরুল কোরআন মাওলানার অমর ও অক্ষয় অবদান। মাওলানা তাফসির লেখার পটভূমি সম্পর্কে প্রখ্যাত কলামিস্ট আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর সাথে কথা প্রসঙ্গে বলেন:

> একদিন লাইব্রেরীতে ইজি চেয়ারে শুয়ে আছি। হঠাৎ তন্দ্রা এলো, তন্দ্রার মধ্যে মনে হলো, আমার মরহুম ওয়ালেদ সাহেব এসে বসেছেন ঠিক আমার সামনের চেয়ারটায়। মুখে রাগের চিহ্ন। বললেন, তোমার কাছ থেকে কি আমি এসব কাজই আশা করেছিলাম, তোমার কাজ যে এখনো বাকী রয়ে গেছে। তন্দ্রা ছুটে গেল, এর কিছুদিন পরেই আমি কুরআনের তাফসীরের কাজে হাত দেই।[৪১১]

'তাফসীরুল কুরআন' 'মোস্তফা চরিতে'র ন্যায়ই অমর সাহিত্য সৃষ্টি। পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত মাওলানার সকল রচনার মধ্যে এটি সর্বশ্রেষ্ঠ ও মধ্যমণি এবং বৃহৎ গ্রন্থ। মহাগ্রন্থ আল্ কুরআন শুধুমাত্র একটি কিতাব বা নীতিবাক্যের সংগ্রহমাত্রই নয়, কুরআন তাঁর জীবন।

---

৪০৭. আজাদ, ১০ই আগস্ট, ১৯৮০ সাল।

৪০৮. প্রাগুক্ত।

৪০৯. প্রাগুক্ত।

৪১০. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১৯৩০ সাল, ৩য় ত্রৈমাসিক খতিয়ান, ক্রমিক সংখ্যা ২৯৫, পৃ. ২৯।

৪১১. আবু জাফর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪।

www.pathagar.com

কর্মজীবনের প্রারম্ভেই তিনি ধর্ম প্রচার করেছেন, সমাজ সেবা করেছেন, এরপর পুস্তক লিখেছেন, সংবাপত্র ও সাময়িকী সম্পাদনা করেছেন। অতঃপর রাজনৈতিক নেতারূপে দেশ ও জাতির নেতৃত্ব দিয়েছেন। আসলে সব কিছুতেই তিনি কুরআন ও হাদিসকে সর্বক্ষণ তাঁর জীবন পথের পাথেয় হিসেবে অতন্দ্র মনের নিকট জীবন্ত রেখে মিশন পরিচালনা করেছেন। তাঁর মিশনের আসল উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম প্রচার, সমাজ সেবা, সমাজ সংস্কার, সাংবাদিকতা ও রাজনীতি। এ সবের মাধ্যমেই মহাগ্রন্থ আল্ কুরআনের আদর্শের প্রতিধ্বনি। তাঁর দারুল ইসলাম ভাবধারার প্রতি আনুগত্যের কথা সর্বজনবিদিত। তিনি প্যান ইসলামি চিন্তাধারার সমর্থক ছিলেন। তাঁর আহলে হাদিস, খিলাফত ও মুসলিম লীগ আন্দোলনের ভূমিকা এবং 'ইসলামি শাসনতন্ত্রের মূলনীতি' সম্পাদিত রচনা, মোস্তফা চরিত এবং সমস্যা ও সমাধানসহ রচিত অন্যান্য রচনাবলী প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তুর মধ্যদিয়ে প্রমাণিত হয়, কুরআনের আদর্শকেই জীবন ও কাজের সর্বত্র রূপায়িত করে তুলতে হবে। উল্লেখ্য, তাফসীরুল কুরআনের বিভিন্ন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিয়ে আলিমদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা যায়।

অনুবাদের তিনটি রীতি রয়েছে :

১. বিশ্বস্ত অনুবাদ
২. স্বচ্ছন্দ অনুবাদ এবং
৩. সৃষ্টিধর্মী অনুবাদ।

মহৎ কোনো গ্রন্থ অনুবাদ করতে গেলে উপরোক্ত রীতির কোনো একটি গ্রহণ করলে সেই গ্রন্থের মূল বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখা সম্ভব নয়। তাই এই ছক বাঁধা রীতিকে পরিহার করে মাওলানা যথেষ্ট বিশ্বস্ততার সাথে কুরআনের মূল শব্দের সঠিক অর্থকে যেমন রক্ষা করেছেন, তেমনি বাংলা ভাষার সাহিত্যরীতির সাথেও সামঞ্জস্য রেখেছেন। তিনি কুরআনের তর্জমা ও তাফসিরের এসব বিষয়ের উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, কুরআনে উল্লিখিত রাসুল ও নবিদের সম্পর্কে পরবর্তীকালে অনেক অলৌকিক, অর্থহীন কিচ্ছা-কাহিনী প্রচলিত হয়েছে, যেমন আদম (আ.), মুসা (আ.), ঈসা (আ.) সম্পর্কে নানা ধরনের অতিরঞ্জিত ও বিস্ময়কর উপাখ্যান তাফসিরকারদের অজ্ঞতার দরুন পরবর্তীকালে যুক্ত হয়েছে। আকরম খাঁ এই অযৌক্তিক উপকথাসমূহকে পাণ্ডিত্যপূর্ণ যুক্তিতর্ক এবং নির্ভরযোগ্য প্রমাণাদির সাহায্যে অমূলক প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। বহু কুসংস্কার, অজ্ঞতা ও ক্ষতিকর ভ্রান্ত ধারণার মূলোৎপাটন করেছেন বলে এযাবৎকালের গবেষকরা মতামত ব্যক্ত করেন।

মাওলানার তাফসিরের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো কুরআনের জটিল শব্দসমূহের সুন্দর টীকা তিনি রচনা করে প্রশংসা অর্জন যেমন করেছেন, তেমনি তাঁর এ তাফসিরের সমালোচনাও অনেকে করেছেন।[৪১২] তাঁর তাফসির ও টীকার ভাষা প্রাঞ্জল

---

৪১২. মাওলানা রুহুল আমীনসহ অনেকেই মাওলানা আকরম খাঁ'র তাফসিরের সমালোচনা করেছেন। মাওঃ রুহুল আমিন (১৮৮২-১৯৪৫) তাঁর সম্পাদিত 'ছুন্নত-আল জামায়াত' পত্রিকায় 'খাঁ সাহেবের তাফছিরের প্রতিবাদ' শীর্ষক ধারাবাহিক সমালোচনামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। পরে লেখাগুলোর সমন্বয়ে বই প্রকাশিত হয়। ১৯১৭ সালে প্রকাশিত তার তরজমা ও তাফছিরের উদ্দেশ্য ছিল খাঁ সাহেবের প্রতিবাদ ও সমালোচনা।
মাসিক শরী'য়ত, ১৩৩২, বৈশাখ, ২য় বর্ষ, বিজ্ঞাপন, পৃ. ২।
মাসিক সওগাত, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ।

www.pathagar.com

এবং সুন্দর। বস্তুত টীকা ও তাফসির রচনায় তিনি যে পন্থা গ্রহণ করেছেন, তা বিদগ্ধ পাঠক সমাজের নিকট সমাদৃত হয়েছে।

অপরদিকে, কুরআনের প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ ভাষাতাত্ত্বিকের বিশ্বস্ত পন্থায় উদঘাটন করার চেষ্টা করেছেন। প্রথমে তিনি এক একটি শব্দের অর্থ বের করার জন্য কুরআনের ভেতরেই তার অন্যত্র ব্যবহারের তাৎপর্য গ্রহণের জন্য অনুসন্ধান করেছেন। যেখানে তাঁর সুযোগ পাওয়া যায়নি, সেখানে সেসব শব্দের অর্থ বের করার জন্য সহীহ হাদীসের শরণাপন্ন হয়েছেন। এরপর তিনি সমসাময়িক আরবি সাহিত্য ও অভিধানে সেসব শব্দের অর্থের প্রয়োগবিধিও লক্ষ্য করেছেন। এখানেই তাঁর অনুসন্ধিৎসু বিচারধর্মী এবং যুক্তিবাদী মনের নিবিড় পরিচয় দিয়েছেন। তিনি আপোষহীন যুক্তি ও অকাট্য ঐতিহাসিক তথ্যের মাধ্যমে টীকা ও ব্যাখ্যা নির্ভুল করে তুলেছেন।

অনুবাদ সাহিত্যে সব সময়ই একটি অসুবিধা রয়েছে। কারণ, যে ভাষা থেকে অনুবাদ করা হয় সে ভাষার রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠানের সাথে সাথে অন্য ভাষার সাধারণত দখল থাকে, কেবলমাত্র তখনই তাঁর রচনাশৈলীর ধারা এই অসুবিধাকে তিনি অতিক্রম করতে পারেন। বাংলা ভাষায় অসাধারণ দখল থাকার কারণে মাওলানা অনুবাদের এই বাধা অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। সাথে সাথে তিনি অনুবাদের সরলতা এবং সাবলীলতাও রক্ষা করেছেন। অবশ্য তাঁর পূর্ববর্তী রচনায় কিছুটা ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। কারণ সে সময়টা এমন ছিল যে, আমাদের এক শ্রেণির নেতৃস্থানীয় লেখক ও লেখিকা কঠিন অপরিচিত গুরুগম্ভীর ও আভিধানিক সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারে আগ্রহ দেখাতেন। ঐতিহাসিক পারিপার্শ্বিক কারণে মুসলমান সাহিত্যিকগণও একদিন সংস্কৃতাভিলাষী বাংলাভাষাকে গ্রহণ করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। আকরম খাঁও তখন ছিলেন তাঁদেরই একজন। অবশ্য, তাফসিরুল কুরআনে যদিও দু'চারটি কঠিন ও আভিধানিক সংস্কৃত শব্দ রয়েছে, এগুলো ব্যতিক্রম মাত্র। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ ধরনের সংস্কৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত। তাফসিরুল কুরআনের ভাষা সহজ, অকৃত্রিম ও বেগবান। কোথাও আড়ষ্টতা নেই। এর আর একটি দিক হলো তাফসিরের ভিতর আধুনিক বহু সমস্যার প্রেক্ষিতেও বহু কথার মনোজ্ঞ আলোচনা এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত এই তাফসিরখানা বাংলা সাহিত্যের অতুলনীয় সম্পদ।

এ তাফসির আকরম খাঁ'র দীর্ঘ বার বছরের[৪১৩] সফল সৃষ্টি। স্যার সৈয়দ রচিত *তাফসিরুল কুরআন* এবং মুফতী মোহাম্মদ আবদুহু ও তাঁর শিষ্য আল্লামা রশীদ রেযা প্রণীত 'তাফসিরুল মানার'-এর অনুসরণেই মাওলানা সাহেব তাঁর 'তাফসির' রচনা করেন। এতে তিনি বিজ্ঞান ও যুক্তির মাধ্যমে আধুনিক যুগ-জিজ্ঞাসার আলোকে ব্যাখ্যা দেন। বাংলা ভাষায় এটাই এ ধরনের সর্বপ্রথম তাফসির। তাঁর তাফসির প্রচলিত তাফসিরসমূহ থেকে অনেকটা ভিন্ন ধরনের। তাঁর ধারণা মতে, পূর্ববর্তী তাফসিরসমূহে যে সমস্ত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে তা অনেকক্ষেত্রে অসার ও ভিত্তিহীন। তিনি বলেন :

> পূর্ববর্তী অনেক তাফসিরকারক অসতর্কভাবে অনুমানের উপর নির্ভর করে অনেক ভিত্তিহীন বক্তব্য নিজ তাফসীরে যুক্ত করতেন। এ ছাড়া ইহুদী খ্রিষ্টানদের অনেক ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কার কিংবদন্তী আমাদের ধর্মে অনুপ্রবেশ করেছে। আমাদের পূর্ববর্তী গ্রন্থকারকগণ সত্যাসত্য বিচার না করেই সে সব নকল করে তাঁদের

---

৪১৩. মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১।

www.pathagar.com

> তাফসিরসমূহ বোঝাই করে ফেলেন। ক্রমাগত সেগুলো ইসলামি আকাইদভুক্ত হয়ে দাঁড়ায়। এখন কেবল 'রেওয়াইত হায়' একথাটুকু ছাপার অক্ষরে দেখলেই অতিভক্ত ও অন্ধভক্ত কোনো কোনো মুসলমান তা স্বীকার করে নিতে কুণ্ঠাবোধ করে না।[৪১৪]

মাওলানা সাহেব তাঁর রচিত মোস্তফা চরিতেও এ সম্পর্কে বলেন :

> আমরা এরূপ অনেক লোক দেখিয়াছি যাহাদিগের জ্ঞানের সহিত তাহাদের বিশ্বাসের সামঞ্জস্য নাই, তাহাদের জ্ঞান বলিতেছে ঐগুলো মিথ্যা। কিন্তু অন্ধবিশ্বাসের ভূত এমনভাবে তাহাদের ঘাড়ে চাপিয়া আছে যে, তাহার ফলে তাহারা নিজেদের জ্ঞান ফলকে মস্তকের এক কোণে ধামাচাপা দিয়া আত্মবঞ্চনাপূর্বক স্বস্তি লাভ করিয়া থাকে।[৪১৫]

শুধু বিজ্ঞানের যুক্তিকেই যারা নির্মম সত্য বলে মনে করেন, সে সম্পর্কে মাওলানা বলেন :

> প্রগতিশীল বিজ্ঞানের নিজ পরিবর্তনশীল মতবাদগুলো স্থিরীকৃত সত্য বলে গৃহীত হতে পারে না। তাই বৈজ্ঞানিকের থিওরী মাত্রকে অবলম্বন করে তার আলোকে ধর্মশাস্ত্রের বিচার করা সমীচীন হবে না।[৪১৬]

তিনি আরও বলেন :

> এক শ্রেণির পণ্ডিত কোরআনকে আধুনিকতার সহিত খাপ খাওয়াইবার জন্য অতি নির্মমভাবে যথেচ্ছাচারের পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, ইহাও সংস্কারের দাসত্ব, ইহাও হুজুগের গড্ড লিকা প্রবাহে আত্মসমর্পণ।[৪১৭]

এ কথা সত্য, তাঁর 'তাফসির' রচনার ফলে বাংলা তাফসির রচনার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। তাঁর সব মতবাদ কারও কারও নিকট গ্রহণযোগ্য না হলেও সত্য ও প্রকৃত তথ্য উদঘাটনের যে প্রণালী ও নীতি তিনি উদ্ভাবন করেছেন তা প্রশংসার দাবি রাখে।

পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত মাওলানার কুরআনের তরজমা ও তাফসির প্রকাশিত হলে তাঁর এক ভক্ত সমালোচনায় বলেন :

> মাওলানা যথাসাধ্য বিশ্বস্ততার সাথে মূলেও যেমন রক্ষা করেছেন, তেমনি বাংলা ভাষার সহিত রীতির সাথেও সঙ্গতি রেখে অগ্রসর হয়েছেন। তিনি যুক্তি ও অকাট্য ঐতিহাসিক তথ্যের মাধ্যমে তাঁর টীকা ও ব্যাখ্যাকে সর্বক্ষেত্রেই নির্ভুল করে তুলেছেন।[৪১৮]

মরহুম কবি আবদুল কাদিরের[৪১৯] ভাষায় :

---

৪১৪. মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৮।
৪১৫. মোস্তফা চরিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২।
৪১৬. মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৯।
৪১৭. মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৯।
৪১৮. অধ্যাপক মুজিবর রহমান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাবেক শিক্ষক, বর্তমানে আমেরিকায় বসবাস করছেন।
৪১৯. মোফাখ্খারুল ইসলাম, ড. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

এ অনুবাদে বর্জনীয় বাহুল্য নেই; ভাষা বলিষ্ঠ ও ব্যঞ্জনাময়, ফলে ভাবে আবেদন হইয়াছে অন্তরস্পর্শী।[৪২০]

আকরম খাঁ তাঁর তরজমা ও তাফসিরে বিশুদ্ধ প্রমাণাদিসহ দলিল ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিভিঙ্গি গ্রহণ করেন। কারো অন্ধ অনুকরণ না করাই ছিল তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যে পৌঁছতে তাঁকে অনেক প্রচলিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করতে হয়েছে। যা-ই সঠিক মনে করেছেন, তা-ই ব্যক্ত করেছেন। ফলে, কেউ কেউ তাফসিরের বিরোধিতা করেন। সর্বপ্রথম বিরোধিতা করেন মাওলানা রুহুল আমিন। 'খাঁ সাহেবের তাফছিরের প্রতিবাদ' নামে তিনি তাঁর 'ছুন্নত আল-জামায়াত' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রতিবাদ প্রকাশ করেন।[৪২১] অতঃপর মাওলানা আব্দুস সাত্তার 'তাফসীরের নামে সত্যের অপলাপ' নামক পুস্তক এবং মাওলানা আযীযুল হক 'পবিত্র কোরআনের অপব্যাখ্যা' নামক পুস্তকে আকরম খাঁ'র তাফসিরের কঠোর সমালোচনা করেন।[৪২২] সম্ভবত এ জন্যেই এ তাফসিরখানা পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও বিশ্বস্ত হওয়ার পরও তেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। তবে সুধী মহলে এবং গবেষকদের নিকট এ তাফসীরের যথার্থ গুরুত্ব রয়েছে।

তাফসিরুল কুরআন সম্পর্কে ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন বলেন:

> মাওলানা সাহেবের আরবি জ্ঞানের গভীরতা সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করা হবে আমার পক্ষে চরম বেয়াদবী। তাঁর তাফসীরের মধ্যে যুক্তিবাদী আদর্শ সুস্পষ্ট। এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, বাংলা ভাষায় আর কোনো তাফসির নেই যা একাধারে সুপাঠ্য এবং আধুনিক চিন্তাশীল মনের ক্ষুধা মিটাতে সক্ষম। বাংলায় যারা কুরআনের তরজমা বা তাফসির করেছেন। তাঁরা আরবির হুবহু অনুসরণ করে গদ্য লিখেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধারণ পাঠকের পক্ষে তা দুর্বোধ্য। যিনি আরবি জানেন, তাঁর পক্ষে হয়তো এই অনুবাদের মর্ম উদ্ধার করা সম্ভব। কিন্তু আরবি জানা না থাকলে এর অর্থ অনুধাবন করা কিছুতেই সম্ভব হয়ে ওঠে না। এর ব্যতিক্রম দেখতে পাই মাওলানা আকরম খাঁ'র তাফসির। তাই তাঁর তফসির ও অনুবাদ শুধু গ্রন্থ হিসেবে নয়, উৎকৃষ্ট বাংলা গদ্যের নমুনা হিসেবেও টিকে থাকবে। যে কুসংস্কারবশত সাধারণ অনুবাদকগণ বাংলা গদ্যে আরবি শব্দ বিন্যাসের অনুসরণ করা ধর্মীয় কর্তব্য বলে বিবেচনা করেন, মাওলানা সাহেব তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, কুরআনের বাণী কোনো ভাষায় অনুবাদ করতে হলে অনুবাদককে যথাসম্ভব চেষ্টা করতে হবে মূলের অর্থ সুললিত ভাষায় বিবৃত করতে। যে ভাষা গদ্য হিসেবে সুন্দর বা সুললিত নয়, কুরআনের অর্থ বহন করবার ক্ষমতা থাকতে পারে না। তাই সারা জীবন সাধনা

---

৪২০. কবি আবদুল কাদির। জন্ম ১৯০৬ সাল। নজরুল গবেষক। ১৯৪৭ সালে তাঁর 'কাব্য কুরআন' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। 'পাকিস্তান লেখক সংঘে'র অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে ১৯৬৮ সালে গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক সমাজের স্বাপ্নিক বলে মূল্যায়ন করেন।
সাঈদ-উর-রহমান, পূর্ব বাংলার রাজনীতি, সংস্কৃতি ও কবিতা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩, পৃ. ৪১, ৭৮, ১১২।

৪২১. ছুন্নত আল জমায়াত, ৭ বর্ষ, ৫ম খণ্ড।

৪২২. অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬, পৃ. ১২০-২১।

www.pathagar.com

করে মাওলানা সাহেব কুরআনের তাফসির লিখে গেছেন এবং অত্যন্ত আনন্দের কথা যে, গ্রন্থটি তিনি নিজে প্রকাশ করে যেতে পেরেছেন।[৪২৩]

বিশিষ্ট গবেষক ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ বলেন : তিনি (আকরম খাঁ–) তাঁর 'তাফসিরুল কোরআনে' যেভাবে স্যার সৈয়দের 'তাফছীরুল কুরআনে' প্রযুক্ত বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যাখ্যার অনুসরণ করেছেন, তাতে তাঁকে 'বাংলার স্যার সৈয়দ' বলে আখ্যায়িত করা হলে তেমন কিছু অযৌক্তিক বলে মনে হয় না।[৪২৪]

মাওলানার তাফসির প্রকাশের তথ্যাবলী নিম্নরূপ :

মাওলানা পাঁচ খণ্ডে সম্পন্ন এ তাফসিরুল কুরআনের নামকরণ করেছেন : সহজ বাংলা অনুবাদ ও বিস্তারিত তাফছীরসহ কোরআন শরীফ।

প্রথম খণ্ড : সুরা ফাতিহা থেকে সুরা নিসার ৬ষ্ঠ রুকু শেষ।। প্রকাশক : মোহাম্মদ বদরুল আনাম খাঁ ও মোহাম্মদ কামরুল আনাম খাঁ, ২৭-বি, ঢাকেশ্বরী রোড, ঢাকা। মুদ্রক: তৈয়েবুর রহমান এম, এ, তমদ্দুন প্রেস, ৫০, লালবাগ রোড, ঢাকা। প্রথম সংস্করণ: রমজান, ১৩৭৮ হি. (মার্চ, ১৯৫৯ খ্রি. চৈত্র ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ) পৃঃ ৩+৭০০+৩। মূল্য- সাড়ে সতর টাকা।

দ্বিতীয় খণ্ড: সুরা নিসার ৭ম রুকু থেকে সুরা কাওসার শেষ পর্যন্ত।। প্রকাশক: প্রথম খণ্ডের অনুরূপ। মুদ্রক : প্রথম খণ্ডের অনুরূপ। প্রথম সংস্করণ: জিলহজ্জ, ১৩৭৮ হিঃ (জুন ১৯৫৯, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ) পৃ. ৩+৮০০। মূল্য- সাড়ে সতর টাকা।

তৃতীয় খণ্ড: সুরা ইউনুসের প্রথম থেকে সুরা আম্বিয়ার শেষ পর্যন্ত।। প্রকাশক: প্রথম খণ্ডের অনুরূপ। মুদ্রক : প্রথম খণ্ডের অনুরূপ। প্রথম সংস্করণ: সফর, ১৩৭৯ হিঃ (আগস্ট, ১৯৫৯ খ্রি. ভাদ্র ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ) পৃ. ৩+৭৬৬। মূল্য- সাড়ে সতর টাকা।

চতুর্থ খণ্ড: সুরা হজ্জ থেকে সুরা ছাদের শেষ পর্যন্ত।। প্রকাশক: প্রথম খণ্ডের অনুরূপ। মুদ্রক: সৈয়দ জাফর আলি, *আজাদ* প্রেস, রমনা, ঢাকা। প্রথম সংস্করণ: জমাদিউল আখের ১৩৭৯ হিঃ (ডিসেম্বর, ১৯৫৯ খ্রিঃ, পৌষ ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ), পৃঃ ৭২৭+৫, মূল্য- সাড়ে সতর টাকা।

পঞ্চম খণ্ড: সুরা জুমার থেকে এবং পরিশি ৪টি।। প্রকাশক : প্রথম খণ্ডের অনুরূপ। মুদ্রক: চতুর্থ খণ্ডের অনুরূপ। প্রথম সংস্করণ : শাবান, ১৩৭৯ হিঃ (ফেব্রুয়ারী, ১৯৬০ খ্রিঃ, মাঘ ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ)। পৃঃ ৪+৮৩৮+৪+৪। মূল্য- সাড়ে সতর টাকা।[৪২৫]

মোস্তফা চরিত

মোস্তফা চরিত, উপক্রম ও ইতিহাস ভাগ বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ও নতুন সংযোজন। সিরাত গ্রন্থ হিসেবে এটি অনন্য মৌলিক গ্রন্থ। এই গ্রন্থে মাওলানা আকরম খাঁ সহিহ হাদিসের পরিচয় দিতে গভীর অধ্যয়ন এবং বিনয়ের পরিচয়

---

৪২৩. আবু জাফর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০।

৪২৪. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ,, স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ'র ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৯৮।

৪২৫. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, তাফসিরুল কোরআন, ১-৫ খণ্ড।
বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী, বাংলা একাডেমী, পৃ. ১৭-১৮।
উল্লেখ্য, তাফসিরের প্রতি খণ্ড ২৫০০ কপি করে মুদ্রিত হয়।
মোফাখখারুল ইসলাম, ড. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

দিয়েছেন। যুক্তির কষ্টিপাথরে সহিহ হাদিস সন্ধান করে পাঠকের নিকট গ্রহণীয় গ্রন্থ হিসেবে তুলে ধরেছেন।

মোস্তফা চরিত বিরাট সিরাত গ্রন্থ। এ ধরনের তথ্যসমৃদ্ধ সিরাত গ্রন্থ বাংলা ভাষায় তেমন নেই। গ্রন্থটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মাওলানা তাঁর ভাষার আভিজাত্য রক্ষা করেছেন। একথাও সত্য, ভাষার গুরুগম্ভীর এবং সংস্কৃত শব্দের প্রতি তাঁর প্রবণতা লক্ষণীয়। এ গ্রন্থে তার পুরোপুরি ছাপ রয়েছে। এই গ্রন্থে ইসলাম, কুরআন হাদিস ও মহানবির বিরুদ্ধে খ্রিষ্টান মিশনারি এবং ইউরোপীয় লেখকদের আনীত বিভিন্ন অভিযোগের উত্তর দিতে মাওলানা সাহেব যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। কাল্পনিক, অযৌক্তিক ও দুর্বল হাদিস দ্বারা প্রমাণিত অতিরঞ্জিত ঘটনাসমূহকে তিনি যুক্তির মানদণ্ডে বিচার করে যা সত্য মনে করেছেন, তা-ই এ গ্রন্থে তিনি স্থান দিয়েছেন।

বিরুদ্ধবাদীদের অপবাদ হচ্ছে, মাওলানা খ্রিষ্টান মিশনারীদের এবং একই গোষ্ঠীর বিদ্বেষপরায়ণ ইউরোপীয় লেখকদের মতবাদকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছেন, অথচ এর কোনো প্রয়োজন ছিল না। অপরদিকে, তিনি ইসলাম ও মহানবির শ্রেষ্ঠত্বকে প্রমাণিত করতে অনেক ইউরোপীয় মনীষীর উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যা ছিল নিষ্প্রয়োজন। তাঁদের ভাষায়, ইসলাম ও মহানবির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ইউরোপীয় লেখকদের সার্টিফিকেট গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই, এটা অর্থহীন। ইসলাম তার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের জোরেই প্রতিষ্ঠিত। এ প্রসঙ্গে মাওলানা আকরম খাঁ নিজেই স্বীকার করে বলেছেন, অভিযোগটা সত্য। তবে, বিদেশী ও ইউরোপীয় লেখকদের প্রচার ও মতামতকে এক শ্রেণির লেখক তাঁদের রচনায় ব্যবহার করে থাকেন। তার জবাবে আমার এ লেখা। সাথে সাথে তিনি আরও বলেন :

> এ যোগ্য নূতন জীবনীকার যখন মোস্তফা চরিতের জীবনালেখ্য পুনরায় লিখবেন, তখন তিনি এইগুলোকে বর্জন করে চললেই ভাল হবে। আমি যোগ্য হই আর অযোগ্য হই। বাংলা ভাষায় এ ব্যাপারে অগ্রগামী দলের একজন। সুতরাং আমার রচনার অপ্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু তথ্যাদি যথাসময়ে পরিত্যক্ত হলে আমি খুশি হবো।[৪২৬]

মাওলানার এই বক্তব্য বিখ্যাত ফরাসী মনীষী রোমা রোঁলার উক্তিকে স্মরণ করিয়ে দেয়:

> "Yet young man, young man of today, come and tremolo as be happier and greater than me."[৪২৭]

মাওলানা সব সময়ই তাঁর 'মোস্তফা চরিত' ও অন্যান্য রচনার ব্যাপারে গঠনমূলক সমালোচনা ও সাহায্য প্রার্থনা করেন। খবরের কাগজেও বহুবার আবেদন জানিয়েছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি যে গঠনমূলক সমালোচনা গ্রহণ করেছেন- তার নজিরও রয়েছে।

মোস্তফা চরিত রাসুল (সা.)-এর গতানুগতিক জীবনকাহিনী হিসেবে মাওলানা লেখেন নি। শুধু ঐতিহাসিক দৃষ্টিভিঙ্গিকেও অনুসরণ করেন নি। মহাগ্রন্থ আলকুরআন

---

৪২৬. মোস্তফা চরিত, প্রাগুক্ত, ভূমিকা দ্রঃ।
৪২৭. আবু জাফর (সম্পাদিত), মোহাম্মদ আকরম খাঁ, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ১১৮।

www.pathagar.com

ও হাদিস এবং ফিকহ ও অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থাবলির মাপকাঠিতে পূর্ববর্তী লেখকদের মতামতের সত্যতা যাচাই-বাছাই করে যেটাকে সত্য মনে করেছেন তা-ই গ্রহণ করেছেন। আবেগপরায়ণ হয়ে জীবনী আলোচনা করেন নি। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বিচার-বিবেচনা করে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ঘটনাপ্রবাহকে বিশ্লেষণ করে তবেই নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাই এ গ্রন্থকে বলা যায়, বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যুক্তিমূলক ও সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রচিত নবি চরিত। এটা কিছুটা স্যার সৈয়দ আহমদের *খুতবাতে আহমদিয়ার*[৪২৮] অনুরূপ অথচ তত্ত্ব ও তথ্যের দিক দিয়ে এটি তার চাইতে সমৃদ্ধ। এটি মাওলানা সাহেবের দীর্ঘ চৌদ্দ বছরের সফল সাধনার ফসল। গ্রন্থটির 'উপক্রম' ভাগে তিনি সহিহ্, গায়রে সহিহ্ (বিশুদ্ধ ও মেকী) হাদিস নিরূপণের মূলনীতিসমূহ তুলে ধরেছেন। এতে নবি চরিত সম্পর্কে প্রচলিত অনেক তথ্য ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়েছে। যেমন- হযরতের দুধ মা বিবি হালিমার নিকট অবস্থানকালে ফিরিশতাগণ কর্তৃক হযরতের বক্ষ বিদীর্ণ হয়– এ মতবাদ সম্পর্কে জমহুর আলিমগণের রায় তিনি সমর্থন করেন নি। মি'রাজ সম্পর্কে তিনি বলেন : অসতর্ক রাবীদের কল্যাণে মি'রাজ সম্পর্কিত 'স্বপ্নের' বিবরণটি উপকথার মাধ্যমে বর্তমান আকার ধারণ করেছে, সত্যের মাপকাঠিতে নয়। তবে এর অর্থ এই নয় যে, মাওলানা মু'জিযাকে অস্বীকার করেছেন। তিনি মু'জিযাকে কখনও অস্বীকার করেন নি। তবে, বিশুদ্ধ দলিল ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ, যুক্তির মাপকাঠিতে কোনোটি মু'জিযা আর কোনোটি মু'জিযা নয় তা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করেছেন এবং তার ভিত্তিতে মতামত ব্যক্ত করেছেন।

যেমন রাসুল (স.)-এর দৈহিক মি'রাজকে তিনি সমর্থন করেন নি। অথচ এর সম্ভাবনাকেও তিনি উড়িয়ে দেন নি। দৈহিক মি'রাজ সমর্থন না করার কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন :

> শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক যুক্তি-প্রমাণই আমাদিগের এই অসমর্থের কারণ। নচেৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানের হিসেবে আমরা শেষোক্ত (দৈহিক মি'রাজ) মতের মূল বিবরণগুলিকে অসম্ভব বলিয়া মনে করি না।[৪২৯]

পূর্ববর্তী সিরাতকারদের (নবি জীবনীকার) ন্যায় মাওলানা আকরম খাঁ রাসুল (সাঃ)-কে অতি মানবরূপে চিত্রিত করেন নি, বরং রাসুল (সা.)-কে সর্বোৎকৃষ্ট মহামানবরূপেই আখ্যায়িত করেছেন। সেকালের ফার্সি কবিরা আল্লাহর আসনে রাসুলের স্থান দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নি। যেমন–

محمد بشکل عرب آمده – عین را حذف کن که رب آمده

মোহাম্মদ এসেছেন আরবের আকার ধারণ করে, আরব' শব্দের আইন'-কে হয্‌ফ করে দাও তাহলে দেখবে যে বস্তুত রব এসেছেন।[৪৩০]

---

৪২৮. স্যার সৈয়দ আহমদ রচিত প্রথম উর্দু জীবনী গ্রন্থ। এটি সেল, মুইর ও স্পেঙ্গার প্রমুখের লেখার জবাবে রচিত হয়।
মোস্তফা চরিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪।

৪২৯. আমরম খাঁ, মোহাম্মদ, মোস্তফা চরিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৪।

৪৩০. মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫।

www.pathagar.com

মাওলানা মুসলমান লেখকদের অতিরঞ্জিত কাল্পনিক উপকথার যেমন বিরোধিতা করেছেন, তেমনি ইউরোপীয় লেখক, বিশেষ করে স্যার উইলিয়াম মুরের[৪৩১] অনেক অসত্য অভিযোগকে খণ্ডন করে তাঁর দেয়া তথ্যের অসারতা প্রমাণ করেছেন। কোনো কোনো খ্রিষ্টান লেখকের অভিমত হযরত ইব্রাহিম (আ.) বা ইসমাইল (আ.) আরব দেশে আগমন করেন নি এবং কাবা ঘরও নির্মাণ করেন নি। হযরত ইব্রাহিম (আ.) হযরত ইসমাইল (আ.)-কে কুরবানী করার যে সংকল্প করেছেন, কুরআনে এর সঠিক প্রমাণ নেই। তাঁর রাসুল (স.)-এর ওহি বিভ্রান্তিকর ও আপত্তিকর বলে বক্তব্য রাখেন। তাঁরা বলেন, রাসুল (স.) মৃগী বা মূর্ছা রোগে আক্রান্ত ছিলেন। এ জন্য হালিমার গৃহে থাকাকালীন মাঝে মধ্যে তিনি এই রোগে আক্রান্ত হয়ে অজ্ঞান হয়ে যেতেন। আর এ অবস্থায় তিনি আল্লাহর বাণী বা ওহিপ্রাপ্ত হতেন। মাওলানা আকরম খাঁ তাঁর মোস্তফা চরিতে এ সমস্ত বক্তব্যকে অন্যায় ও অযৌক্তিক বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

মোস্তফা চরিতের সাথে তৎকালীন অন্যান্য সিরাত গ্রন্থের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য

১৮৭০ সালে প্রকাশিত হয় স্যার সৈয়দ আহমদের *খুতবাতে আহমদিয়া* এবং ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয় সৈয়দ আমীর আলির The Spirit of Islam। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং দার্শনিক যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে স্যার সৈয়দ তাঁর *খুতবাতে আহমদিয়া* লেখেন। তাঁরই অনুসরণে লেখা হয় সৈয়দ আমীর আলির The Spirit of Islam (১৯২২)।[৪৩২] অবশ্য, এ গ্রন্থটি স্যার সৈয়দের গ্রন্থের তুলনায় কিছুটা উন্নতমানের। মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ এ দু'টি গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সাথে সাথে খুতবাতে আহমদিয়ার কিছুটা সমালোচনা করে বলেন :

> আমরা স্যার সৈয়দের সাধনার চরম ভক্ত হইলেও, এখানে ন্যায়ের অনুরোধে ইহাও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, তাহাদের অন্যান্য লেখার সাধারণ দোষটি এই পুস্তকেও সংক্রমিত হইয়াছে। সে দোষটি হইতেছে পাশ্চাত্য আদর্শের অন্ধ অনুকরণ প্রবৃত্তি। বিচারে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে তিনি যেন ধরিয়া লন যে, ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে ইউরোপের গৃহীত বিচার আদর্শ সমস্তই নিখুঁৎ এবং বৈজ্ঞানিক পাশ্চাত্যের প্রচারিত মতবাদ মাত্রই বৈজ্ঞানিক সত্য। এইরূপ একটা ধারণা পোষণ করিয়া তিনি এছলামকে লইয়া ঐসব আদর্শ ও মতবাদের সহিত সামঞ্জস্য করার চেষ্টা করিতে থাকেন। ইহাতে হিতে বিপরীত ফল হইতেও দেখা যায়। এই দোষ ব্যতীত পুস্তকখানি অন্য সব দিক দিয়া বিশেষ মূল্যবান।[৪৩৩]

---

৪৩১. বিখ্যাত ঐতিহাসিক। Life of Mohammad তাঁর অন্যতম গ্রন্থ।
মোস্তফা চরিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

৪৩২. সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮) ইসলাম ধর্ম, কৃষ্টি ও ঐতিহ্য, সিরাত সাহিত্যসহ আরও কয়েকটি বই লেখেন, (১) লাইফ এন্ড টিচিং অফ দি প্রফেট, ১৮৭৩, (২) এ সর্ট হিস্টরী অব দি সারাসিনস, (১৮৯৮), (৩) খ্রিশ্চিয়ানিটি ফর্ম দি ইসলামিক স্টান্ড পয়েন্ট ১৯০৬, (৪) ইসলাম, ১৯০৬। (৫) লিগ্যাস স্ট্যাটাস অব উইমেন ইন ইসলাম, ১৮৯১। (৬) মোহামেডান ল ১৮৮৪, (৭) পারসোনাল ল অব দি মোহামেডানস ১৮৮০, (৮) কমেন্টারী অব দি ইন্ডিয়ান এভিডেন্স এ্যাক্ট ১৮৯৮, (৯) কমেন্টারী অব দি সিভিল প্রোসেডু'র কোড, (১০) আইন-উল-হিদায়া, (১১) জিহাদ, (১২) কমেন্টারী অব দি বেঙ্গল।
আব্দুর রহীম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭), ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ. ১৪২।

৪৩৩. মোস্তফা চরিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪।

www.pathagar.com

কারও কারও মতে, মাওলানা আকরম খাঁ স্যার সৈয়দ আহমদের খুতবাতে আহমদিয়ার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছেন। আসলে মোস্তফা চরিতে কোনো কোনো স্থানে খুতবাত-ই-আহমদিয়ার কিছুটা মিল পরিলক্ষিত হলেও বহু ক্ষেত্রেই আকরম খাঁ স্যার সৈয়দের মতকে সমর্থন করেন নি। এ জন্য মোস্তফা চরিত স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

উপমহাদেশের প্রখ্যাত সিরাতকার আল্লামা শিবলী নুমানী[৪৩৪] সিরাতুন্নবি নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থটি খুতবাতে আহামদিয়ার নিছক যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিবাদ স্বরূপ রচনার পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য, গ্রন্থটি ছয় ভাগের দু'ভাগ রচনার পর তিনি ইন্তেকাল করেন। বাকি চার খণ্ড তাঁর স্বনামধন্য শিষ্য সৈয়দ সুলায়মান নদভী[৪৩৫] সমাপ্ত করেন। এ গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে খুতবাতে আহমদিয়ার যুক্তিবাদী অভিমতসমূহকে খণ্ডন করা হয়। মাওলানা আকরম খাঁ'র *মোস্তফা চরিত* প্রকাশিত হলে তিনি শিবলী রচিত সীরাতুন্নবীর কোনো কোনো অভিমতেরও বিরোধিতা করেন। অবশ্য, সে সময় সীরাতুন্নবীর বাকি খণ্ডগুলো প্রকাশিত না হওয়ার কারণে মাওলানা সাহেব আর মন্তব্য করার সুযোগ পান নি।

স্যার সৈয়দ আহমদ রচিত খুতবাতে আহমদিয়ার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ যেমন সিরাতুন্ নবি রচিত হয়, তেমনি *মোস্তফা চরিত*-এর প্রতিবাদে কবি গোলাম মোস্তফার 'বিশ্বনবি' ১৯৪২ সালে রচিত হয়। সৈয়দ সুলায়মান নাদভি সিরাতুন্ নবির তৃতীয় খণ্ডে রাসুল (স.)-এর অলৌকিক ঘটনাবলীকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে-সব যুক্তি প্রদর্শন করেছেন, বিশ্বনবিতে সে-সবেরই পুনরাবৃত্তি হয়েছে মাত্র। গোলাম মোস্তফার কবি সুলভ রস বাদ দিলে এ গ্রন্থে নতুনত্ব বলতে তেমনি কিছুই নেই। সাহিত্য রসে ভরা হৃদয়গ্রাহী ভাষার কারণে বিশ্বনবি সাধারণ পাঠকবর্গের নিকট মোস্তফা চরিতের চেয়ে জনপ্রিয়। এ পর্যন্ত গ্রন্থটির ২০টি সংস্করণ বের হয়েছে বলেও জানা গেছে। আসলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভিঙ্গি নিয়ে সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে মোস্তফা চরিত সিরাত সাহিত্য জগতের এক অতুলনীয় গ্রন্থ। বাংলা ভাষায় সিরাতের উপর এর চেয়ে উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ রচিত হয় নি।

মোস্তফা চরিত প্রকাশিত হওয়ার পর মাওলানা রুহুল আমীন তাঁর *সুন্নত আল-জামায়াত* পত্রিকায় খাঁ সাহেবের মোস্তফা চরিতের প্রতিবাদ নামে ধারাবাহিকভাবে প্রতিবাদ করেছেন।[৪৩৬]

মাওলানা আকরম খাঁ ছিলেন যুক্তিবাদী পণ্ডিত। জ্ঞান ও যুক্তি দিয়ে ধর্ম, সমাজ ও ইতিহাসকে বুঝবার প্রয়াস তিনি পেয়েছেন। যুক্তিবাদী মনীষী তাঁর ভাষাকে অদ্ভুত শক্তি ও দীপ্তি দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে একথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন, যখন মাওলানা আকরম

---

৪৩৪. শিবলী নু'মানী, মাওলানা আল্লামা (১৮৫৭-১৯১৪)। আজমগড়ের বান্দোল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শিবলী তাঁর কাব্যনাম। তিনি লখনৌতে 'নাদওয়াতুল উলুম' নামে একটি ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি প্যান ইসলামের সমর্থক ছিলেন।
বাংলা বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৩।

৪৩৫. সুলাইমান নাদভী, সাইয়িদ মৃ. ১৯৫৩। ভারতের পাটনা জেলার ডমনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কিছুদিন 'নদওয়া' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। আল-হিলাল পত্রিকায়ও কাজ করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বিলেতে ভারতের যে প্রতিনিধি দল প্রেরিত হয়, তিনি তার অন্যতম সদস্য ছিলেন।
প্রাগুক্ত পৃ. ৬৪৯।

৪৩৬. ছুন্নত আল জামায়াত, ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

www.pathagar.com

খাঁ জ্ঞান ও যুক্তির সাহায্যে ইসলামি সমাজের ইতিহাস পর্যালোচনা শুরু করেন তখন মুসলিম সমাজে যুক্তির কদর খুব একটা ছিল না এবং যুক্তিকে সমাজে অবজ্ঞা ও আশংকার চোখে দেখতো। এ সম্পর্কে মরহুম ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন বলেন :

> বাল্যকালে আমাদের বাড়ীর মৌলভী সাহেব আমাদের *মোস্তফা চরিত* পড়তে নিষেধ করতেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলেছিলেন যে, *মোস্তফা চরিত* পড়লে ঈমান 'যঈফ' হয়। কারণ, তিনি প্রচলিত অনেক বিশ্বাস সমর্থন করেন নি। বয়স হলে যখন *মোস্তফা চরিত* পড়বার সুযোগ ঘটল তখন বুঝতে পারলাম মৌলভী সাহেবের আপত্তির কারণ। গ্রামের মৌলুদ শরীফের মাহফিলে নবি করীম (সা.)-এর যে চিত্র তুলে ধরা হয় তার সঙ্গে *মোস্তফা চরিত্র*'র নবির মিল খুব কম, এদিক দিয়ে সৈয়দ আমীর আলির The Spirit of Islam-এর দৃষ্টিভিঙ্গির সঙ্গে তার অনেক মিল রয়েছে। 'মোস্তফা চরিতের' কোনো ইংরেজি অনুবাদ হয় নি। এটা খুব দুঃখের কথা। আমার বিশ্বাস, অনুবাদ হলে এটি যুগান্তকারী গ্রন্থ হিসেবে সর্বত্র স্বীকৃতি পাবে।[৪৩৭]

এ গ্রন্থের প্রকাশক : মুহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ, ২৯, আপার সার্কুলার রোড, কোলকাতা। মুদ্রক : মুহাম্মদ খায়রুল আনা খাঁ, মোহাম্মদী প্রেস, ২৯, আপার সার্কুলার রোড, কোলকাতা। প্রথম সংস্করণ : ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯২৫ খ্রিঃ, পৃঃ ১২=৭৭৫। মূল্য-৭ টাকা।[৪৩৮]

কোরআন শরীফ

মাওলানা আকরম খাঁ'র বিরাট অবদান বাংলা ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ ও তাফসির। এর পূর্বে কুরআনের অনুবাদ ও তাফসির প্রায়গুলোই ছিল ফার্সি অথবা উর্দু বা আরবি ভাষায়। এ জন্যে বাংলাভাষী ব্যাপক জনসাধারণের নিকট কুরআনের মর্মবাণী ছিল দুরূহ। এর প্রেক্ষিতে কুরআনের প্রচার-প্রসার যতটা প্রয়োজন ছিল, তা হয় নি। মাওলানা তা-ই আক্ষেপ করে তাঁর অত্র তাফসীরের 'নিবেদন'-এ বলেন :

> মুছলমান বাঙ্গলাকে নিজেদের মাতৃভূমি রূপে গ্রহণ করিয়াছে আট শতাব্দী পূর্বে। বিদেশাগত অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত, বাঙ্গলার বহু প্রাচীন অধিবাসী এছলাম গ্রহণ করিয়া মুছলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন। বাঙ্গলাই তাঁহাদের মাতৃভাষা এবং তাঁহাদের অন্তরের সব আদান-প্রদান সম্ভব হয়, একমাত্র এই মাতৃভাষারই মারফতে। এই মাতৃভাষার প্রতি অবহেলার ফলে, প্রতিবেশী দিগের নিকট আমরা এছলামকে পরিচিত করতে পারি নাই। একদিকে আমাদের অভাব, অন্যদিকে খ্রিষ্টান লেখকগণ কর্তৃক উপস্থাপিত এছলামের বিকৃত রূপের শোচনীয় প্রাদুর্ভাব। ফলে এছলাম ও মুসলমান তাহাদের দৃষ্টিতে অতি নিকৃষ্ট এবং অতি ভয়ঙ্কররূপেই চিত্রিত হইয়া আছে। এই প্রকার আত্মপরিচয়ের ও অপ-পরিচয়ের জন্য দেশে যে অকল্যাণের সৃষ্টি হইয়াছে, বস্তুত, তাহা অতিশয় শোচনীয়। আমার এই নগণ্য প্রচেষ্টার ফলে এই অকল্যাণ কিঞ্চিত পরিমাণে কমিয়া গেলেও, তাহাকে জীবনের একটা বড় সফলতা বলিয়া মনে করিব।[৪৩৯]

---

৪৩৭. আবু জাফর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০।
৪৩৮. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ৪র্থ ত্রৈমাসিক খতিয়ান, ১৯২৫ খ্রি., ক্রমিক সংখ্যা ৭২৪, পৃ. ৫৭।
৪৩৯. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, কোরআন শরিফ, ১ম খণ্ড, ১৭ই জুন, ১৩০, কোলকাতা, পৃ. ১-২।

www.pathagar.com

তাঁর এ তাফসিরখানি বাংলাভাষীদের জন্য সুপাঠ্য। ভাষার দিক দিয়ে অনবদ্য গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। মাওলানা আকরম খাঁ'র এ তাফসিরের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে নবি-রাসুল, ফিরিশতা ও অন্যান্য কিছু জটিল বিষয়ে চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী সাধারণ তাফসিরবিদগণের গতানুগতিক ধারার পরিপন্থী। যেমন- বনী ইস্রাঈল সম্পর্কিত অযৌক্তিক কল্পিত উপকথা উপাখ্যানের অবতারণা করা হয়েছে, এর বিরুদ্ধে তিনি সুচিন্তিত যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা ও মতামত পেশ করে পূর্ববর্তী তাফসিরকারদের অনুমাননির্ভর ভিত্তিহীন বক্তব্য খণ্ডন করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর অনূদিত *কোরআন শরীফ* প্রথম খণ্ডের 'নিবেদন' শিরোনামে বলেন:

> এক শ্রেণির অসতর্ক লেখকের কল্যাণে কোরআনের প্রকৃত তাফসির নানা প্রকার কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের আবর্জনায় আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছে। সেই আবর্জনারাশি অপসারিত করিয়া কোরআনের প্রকৃত মর্ম উদ্ধার করিতে আমাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছে।[৪৪০]

১৯২২ সালে আমপারার অনুবাদ ও তাফসির প্রকাশ করার পর মাওলানা তাঁর এ তাফসির লেখার কাজে হাত দেন। ১৯৩০ সালের শেষ দিকে তিনি *সুরা ফাতিহা, আল-বাকারা* ও *আল-ইমরান* পর্যন্ত তাফসির লিখে দু'খণ্ডে প্রকাশ করেন।[৪৪১]

মাওলানার এই তাফসিরের দু'টি খণ্ডের বিশদ বিবরণ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বিশিষ্ট গবেষক ড. মুজিবুর রহমান বলেন:

> তিনি (আকরম খাঁ) যদি এ বিশদ ব্যাখ্যাসম্বলিত পদ্ধতিতে গোটা কুর'আনের তাফসির সমাপ্ত করতে পারতেন, তাহলে নিঃসন্দেহে এটা হতো বাংলা ভাষায় *তাফসীরে কবির*।[৪৪২]

---

৪৪০. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, কোরআন শরিফ, প্রথম খণ্ড, ১৯৩০, 'নিবেদন' শিরোনাম, পৃ. ১-২।

৪৪১. প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল ১০ই জুন, ১৯৩০। খায়রুল আনাম খাঁ কর্তৃক প্রকাশিত, ৯১, আপার সার্কুলার রোড, কোলকাতা। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় একই বছর।
প্রকাশক ও মুদ্রাকর একই।
আলী আহম্মদ, বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

৪৪২. এ তাফসিরের পুরো নাম 'মাফাতীহুল গায়েব' লেখক, ইমাম মুহাম্মদ ইবন উমর ফখরুদ্দীন আল রাযী (১১৪৯-১২০৯ খ্রি.)। ইনি তাবারিস্তানের ওপরে 'রায্' শহরের অধিবাসী ছিলেন। পিতা জিয়া উদ্দীন 'রায' শহরের বিচারপতি ও খতিব ছিলেন, ৩২ খণ্ডে সমাপ্ত এই তাফসিরের জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। ইরানের হিরাত শহরে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এ গ্রন্থে সর্বদলের দলিল-প্রমাণসহ বিভিন্ন দলের আকাইদের মূলনীতি সম্পর্কিত যাবতীয় মতবাদ উল্লিখিত হয়েছে। পরবর্তী তাফসিরকারগণ বেশির ভাগই কোনো না কোনোভাবে তাঁর কাছে ঋণী। ১৯১০ সালে এই তাফসিরে কবীরের এক মানযিলের ৩৬০ পৃ.ব্যাপী উর্দু অনুবাদ করে অমৃতসর ইসলামিয়া লাইব্রেরি থেকে প্রকাশ করেন মাওলানা মোহাম্মদ ইসহাক।
'মাদ্রাসা আম আহলে ইসলাম গ্রন্থাগার ফিরিস্তি, পৃ. ৪, ড. আ. হক. 'কা কু উ, ১ম খণ্ড, করাচি, ১৯৬১। দাউদি, 'তাবাকাতুল মুফাসসিরীন' ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৩-১৭। 'মাগরবি আল-মুফাসসিরুন' (রিয়ায, দার তাই যেরা ১ম সংস্করণ, ১৪০৫/১৯৮৫, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭-৫১, রাযী, তাফসিরুল কবীরের ভূমিকা, পৃ. (,)।
উদ্ধৃতি, মুহা. আসাদ উল্লাহ আল-গালীব, আহলে হাদিস আন্দোলন উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ' ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৪১।
বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা– ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান। ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৬, পৃ. ১১৮-১১৯।

www.pathagar.com

অবশ্য, ১৯৪৮ সালে মাওলানা সাহেব তাঁর অসমাপ্ত বিশদ তাফসিরের কাজটি শেষ করার ইচ্ছা পোষণ করলেও বিভিন্ন কারণে হয়তোবা শারীরিক অথবা দীর্ঘ সময় দিয়ে এত বিস্তারিত ও ব্যাপক টিকাটিপ্পনী ব্যাখ্যাসম্বলিত তাফসিরের কাজটি যথাসময়ে শেষ করতে পারবেন কি-না, এই ভেবে তিনি আর এ তাফসিরে হাত দেন নি। বরং আবার নতুন আঙ্গিকে পূর্বের চেয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে একখানা পূর্ণাঙ্গ তাফসির ৫ খণ্ডে দু'বছরের মধ্যে সমাপ্ত করলেন। এর নাম দেন 'তাফসিরুল কোরআন।[৪৪৩]

বঙ্গানুবাদ কোরআন শরীফ

এটি বাংলায় উচ্চারণসহ দু'খণ্ডে সমাপ্ত। প্রত্যেক আয়াতের বাম পাশে বঙ্গানুবাদ এবং নিচে আয়াতের উচ্চারণ দেয়া হয়েছে। বঙ্গানুবাদ করেছেন মাওলানা আকরম খাঁ, বাংলা উচ্চারণ করেছেন আলহাজ্জ মোহাম্মদ নকীব উদ্দীন খাঁ। আকরম খাঁ'র কুর'আনের তাফসিরের ১ম খণ্ডের (ঝিনুক পুস্তিকা প্রকাশিত) শেষাংশে গ্রন্থ পরিচিতি অংশে এই গ্রন্থটি প্রকাশের বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যায়। তবে, সেখানে গ্রন্থটি প্রকাশের কোনো সন-তারিখ উল্লেখ নেই।[৪৪৪]

ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য

পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বিশেষ বিশেষ অংশ চয়ন করে মাওলানা ১২৪ পৃষ্ঠাসম্বলিত এ গ্রন্থটি রচনা করেন।[৪৪৫] মাওলানার নিজস্ব প্রতিষ্ঠিত 'মোহাম্মদী বুক এজেন্সী' নামক পুস্তক প্রকাশনী থেকে এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।[৪৪৬]

পাকিস্তাননামা

১৯৪০ সালের পর থেকেই পাকিস্তান আন্দোলনের জোয়ার জোরদার হয়ে ওঠে, ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় সমস্যার সমাধানের জন্য ক্রিপস মিশন, পার্লামেন্টারি ডেলিগেশন ও ক্যাবিনেট মিশন এই তিনটি মিশন পাঠান, কিন্তু সমস্যার সমাধান হলো না, এমনকি শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে একটি সমঝোতা সৃষ্টির জন্য মালাবার হিলে গান্ধী-জিন্নাহর কয়েকদিনের সাক্ষাৎকারও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

এ অবস্থায় দেশে রাজনৈতিক অঙ্গনে একটি ভয়াবহ ঘটনা ঘটে। কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ্‌র উপর এক আততায়ীর আকস্মিক আক্রমণের ফলে সমগ্র দেশে

মাসিক মুহাম্মদি-এর ১৩৩৯ বাংলা পৌষ সংখ্যা এবং ১৩৪৫ সাল ১২শ বর্ষ, মাঘ ৪র্থ সংখ্যার বিজ্ঞাপনে এই তাফসিরের প্রথম ও ২য় খণ্ডের বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য।
ড. মুজিবুর রহমান, বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আগস্ট ১৯৮৬, পৃ. ১২২।

৪৪৩. মোহাম্মদ মোদাব্বের, 'সাংবাদিকের রোজ নামচা', ১ম সংস্করণ, ঢাকা, সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭, পৃ. ২৪৪।

৪৪৪. কুরআন শরিফ, আকরম খাঁ, ১ম খণ্ড, ঝিনুক পুস্তিকা। প্রকাশকাল ১৩৮২, মূল্য, ১৫ টাকা।

৪৪৫. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, বাংলা ভাষায় মুসলিম লেখক গ্রন্থপঞ্জি, ১৯৮৫, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১১।
আবু জাফর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭।

৪৪৬. মাওলানা আকরম খাঁ বিশেষভাবে মুসলমান সাহিত্য সেবকগণের পুস্তক প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে মুহাম্মদি বুক এজেন্সী নামে একটি পুস্তক প্রকাশনী গড়ে তুলেছিলেন। নামকরণ করা হয় 'মোহাম্মদী পাবলিশিং কোং', মাওলানা সাহেবের রচিত গ্রন্থাবলী এই সংস্থা থেকেই প্রকাশিত হতো।
আবু জাফর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭।

www.pathagar.com

দেখা দিল দারুণ উত্তেজনা। প্রকাশ খাকসার নেতা আল্লামা মাশরেকীর এক ফ্যানাটিক শিষ্য জিন্নাহর সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে, তাঁকে লক্ষ্য করে ছুরিকা উত্তোলন করে। অসাধারণ মনোবলের জন্যেই এই আকস্মিক আক্রমণের কবল থেকে কায়েদে আজম প্রাণে রক্ষা পান।

উপরোক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে পাকিস্তান আন্দোলনকে ভিত্তি করে পাকিস্তাননামা পুস্তিকাটি মাওলানা প্রকাশ করেন। পুস্তিকাটির ভূমিকায় মাওলানা লিখেছেন, কায়েদে আজমের উপর আততায়ীর আকস্মিক আক্রমণে লেখকের মনে যে বেদনা পুঞ্জীভূত হয়েছিল তা হাল্কা করার জন্যই তিনি এই পুস্তিকা লিখেছেন। বইটি আরবি, ফার্সি, সাধু ভাষায় লিখিত।[৪৪৭] অবশ্য, এই বইটির মূল পাণ্ডুলিপি না-কি ড. আবদুল গফুর সিদ্দিকী রচনা করেছিলেন।[৪৪৮]

এ গ্রন্থের প্রকাশক : মুহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ, ৮৬ এ, লোয়ার সার্কুলার রোড, কোলকাতা। প্রথম সংস্করণ : ২১-৯-১৯৪৩ খ্রি. পৃ. ১৬। মূল্য- এক আনা।[৪৪৯]

যিশু কি নিষ্পাপ

খ্রিষ্টান পাদ্রীরা মুসলমান জনসাধারণকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য হযরত মোহাম্মদ (স.)-কে গুনাহগার প্রমাণ করার অযথা চেষ্টা করে বহু বই প্রচার করেছেন। অল্প শিক্ষিত জনসাধারণ ঐ সকল পুস্তক পাঠ করে ধোঁকায় পড়েন। অনেকেই ধর্মভ্রষ্ট হয়ে পড়েন। এই পুস্তকখানিতে বাইবেলের সাহায্যে 'মহাত্মা যিশু' যে পাপী ছিলেন এবং পাপী ব্যক্তি যে অন্যকে মুক্তি দান করতে পারেন না, তা-ই দেখান হয়েছে। এই গ্রন্থটি ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে-সব অপবাদ দেওয়া হয়েছে, খ্রিষ্টান পাদ্রীদের ঐ সমস্ত

---

৪৪৭. আবুল কালাম শামসুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯।

৪৪৮. আজাদে প্রকাশের জন্য ড. আব্দুল গফুর সিদ্দিকী পাকিস্তান আন্দোলনকে ভিত্তি করে লেখা পাকিস্তান নামা নামে একটি ক্ষুদ্রায়তন পুঁথিকাব্যের পাণ্ডুলিপি আমার হাতে দেন (আবুল কালাম শামসুদ্দীন)। পুঁথিকাব্য রচনায় ড. আবদুল গফুর সিদ্দিকীর দক্ষতা দেখে আমি বিস্মিত হই। পুঁথির ভাষা তিনি এত সুন্দরভাবে আয়ত্ত করেছিলেন যে, পাণ্ডুলিপিটি মাওলানা সাহেবকে দেখাতে তাঁর কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি তখন অফিসেই ছিলেন। তিনি সেটা কিছুদূর পড়ে বললেন, বড্ড বেশী আরবি-ফার্সী শব্দবহুল হয়ে গেছে। গ্রামের মুসলমানরা এটা বুঝতে পারবে না। মাওলানা সাহেবের এ মন্তব্য শুনে আমি বিস্মিত হলাম। কারণ আমার ধারণা ছিল, এ ধরনের পুঁথির ভাষাই গ্রাম্য মুসলমানরা বেশী বুঝে। এমনকি অক্ষরজ্ঞানবিহীন ব্যক্তিরাও। যাক, মাওলানা সাহেব বললেন, "এটা আমার কাছেই থাক। ভাষার কিছুটা রদবদল করে এটাকে প্রকাশযোগ্য করা যায় কি-না দেখব।"
তার বেশ কিছুদিন পরে দেখি পাকিস্তান নামা পুস্তিকা আকারে ছাপা হয়ে বেরিয়েছে। কিন্তু এর প্রণেতা ড. আবদুল গফুর সিদ্দিকী নন, স্বয়ং মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ। পুস্তিকার ভূমিকায় মাওলানা লিখেছেন, কায়েদ আজামের উপর আততায়ীর আকস্মিক আক্রমণে লেখকের মনে যে বেদনা পুঞ্জীভূত হয়েছিল, তা হালকা করার জন্যই এ পুস্তিকা লিখেছেন। পুস্তিকাটি পড়ে দেখলাম, বিষয়বস্তু এক হলেও ভাষা বদলে গেছে। আরবি, ফার্সী মিশ্রিত পুঁথির ভাষার স্থানে সাধু বাংলা ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই এটা যে ড. সিদ্দিকীর বই বলে দাবী করার অধিকার হারিয়েছে, তাতে ভুল নেই।
আবুল কালাম শামসুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯-৬০।

৪৪৯. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১৯৪৩ খ্রি.-এর ত্রৈমাসিক খতিয়ান, ক্রমিক সংখ্যা ৩৭, পৃ. ২৯।

www.pathagar.com

অপবাদের পাল্টা জবাব হিসেবে লিখিত হয়েছে।[৪৫০] বাইবেলে বর্ণিত যিশু যে নিষ্পাপ নন– বাইবেল থেকেই তার অকাট্য প্রমাণ দেয়া হয়েছে।

গ্রন্থের প্রকাশক : মুজাফ্ফরুদ্দীন আহমদ, ৩৩, ফুলবাগান রোড, কোলকাতা, মুদ্রক : মুনশী করিম বখশ, ৩৩, বেনেপুকুর রোড, কোলকাতা। প্রথম প্রকাশ : ২৫ মার্চ, ১৯১৫ খ্রি., পৃ. ২০। মূল্য- দুই পয়সা।[৪৫১]

উপরোক্ত রচনাবলী ছাড়াও মাওলানার কিছু গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে : বারোয়ারী (উপন্যাস) গ্রন্থটি ১২ কিস্তিতে ১২ জন লেখকের লিখিত উপন্যাস সংকলন। লেখকগণের মধ্যে ছিলেন :

(১) মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, ২) শাহাদাৎ হোসেন, ৩) গোলাম মোস্তফা, ৪) মোহাম্মদ গোলাম জিলানী, ৫) মোহাম্মদ কাসেম, ৬) নৃপেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৭) কাজী নাওয়াজখোদা, ৮) আবদুল কাদির কবি, ৯) মোহাম্মদ নূরুল আনাম খাঁ, ১০) এ. জেড. নূর আহমদ, ১১) হেমেন্দ্রনাথ রায়, ১২) মোহাম্মদ আবদুর রশিদ খাঁ।

মাসিক মোহাম্মদীতে বার কিস্তিতে বার মাসে উপন্যাসগুলো ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে এগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। সম্ভবত মাওলানা এটি সম্পাদনা করেন।

গ্রন্থটির প্রকাশক : মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ, মোহাম্মদী বুক এজেন্সী, ৯১, আপার সার্কুলার রোড, কোলকাতা। মুদ্রক : মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ, মোহাম্মদী প্রেস, ৯১, আপার সার্কুলার রোড, কোলকাতা, ১ম সংস্করণ, ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩ সাল, পৃ. ৪+১৮৮, মূল্যঃ এক টাকা।[৪৫২]

মিশ্র ও স্বতন্ত্র নির্বাচন (রাজনীতি)

এটি সংকলন গ্রন্থ। গ্রন্থটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে, মাসিক মোহাম্মদী ৪র্থ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৩৮ সাল, পৃঃ ৭২১-৭৩২ ও ১১ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৩৮ সাল, পৃ. ৭৯৩-৮০৩ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়।[৪৫৩]

এছলাম মিশন (ধর্ম)

"Aims and Objects of the Mission Supported by Quotations from the Quran."

গ্রন্থটির প্রকাশক ও মুদ্রক মুহাম্মদ আকরম খাঁ, মোহাম্মদী প্রেস, ২৯, আপার সার্কুলার রোড, কোলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২৮ মার্চ, ১৯১৭, পৃ. ২৮। এ পুস্তকটিতে গ্রন্থকারের নাম নেই। প্রকাশকরূপে আকরম খাঁ'র নাম দেখা যায়।[৪৫৪]

এছাড়াও মাওলানার জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত *দৈনিক আজাদ* পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলোর উল্লেখ পাওয়া যায়:

---

৪৫০. সুনীল কান্তি দে, ড., আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা ও মুসলিম সমাজ, কোলকাতা, প্রাগুক্ত, ১৯৯২, পৃ. ২৩।
৪৫১. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১৯১৫ খ্রি. ২য় ত্রৈমাসিক খতিয়ান।
৪৫২. বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬-১৭।
৪৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।
৪৫৪. বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ, ১৯১৭ খ্রি., ২য় ত্রৈমাসিক খতিয়ান, পৃ. ৭৫।

www.pathagar.com

১. আল-এছলাম গ্রন্থকার, কোলকাতা, ১৯১৫।
২. এছলাম ও মোহামেডান ল', ছুন্নত আল্-জামায়াত, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃ. ৯৩।
৩. মূল বাইবেল কোথায়?
৪. ইসলামের শাসননীতি।[৪৫৫]
৫. ইসলাম মনীষার আলোকে।[৪৫৬]
৬. গুলিস্তাঁ (বঙ্গানুবাদ)।[৪৫৭]
৭. হেজাজ ভ্রমণ (হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি)।[৪৫৮]
৮. কাদিয়ানী ফেরকা (মূল- মাকায়েদুল মসীহ)।[৪৫৯]
৯. কোরআনের হযরত ইছা ও বাইবেলের যিশুখ্রিষ্ট।[৪৬০]
১০. কোরআন শরীফ (কোরআন), অনুবাদক মৌলভী মুহাম্মদ আকরম খাঁ। মুদ্রক ও প্রকাশক: মৌলভী মুহাম্মদ আব্বাস আলি ৩, হুক লেন, কোলকাতা, প্রথম সংস্করণ: ১৭-৮-১৯০৫, পৃ. ৩২। মূল্য চৌদ্দ আনা, মুদ্রণ সংখ্যা ৫,০০০, গ্রন্থস্বত্ব: হাজী আবদুল্লাহ, ২৬, হুক লেন, কোলকাতা, তথ্য নির্দেশ: বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ, ১৯০৬ খ্রি. ১ম ত্রৈমাসিক খতিয়ান, ক্রমিক সংখ্যা ১ (১৩), পৃ. ৫১। বাংলা একাডেমী থেকে সংগৃহীত। বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জিতে আলি আহমদও অনুরূপ তথ্য সংযোজন করেছেন। অন্যান্য গবেষণা সন্দর্ভেও অনুরূপ অবিকৃত তথ্যই পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত ইসলামি বিশ্বকোষ ১ম খণ্ডে ৪২-৪৩ পৃষ্ঠায় মরহুম আব্বাস আলি সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ নিবন্ধ সংযোজিত হয়েছে। উক্ত নিবন্ধ এবং ড. মুফাখখারুল ইসলামের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি থেকে জানা যায় যে, উক্ত কোরআনের অনুবাদক ছিলেন আব্বাস আলি। তদানীন্তন সময়ে মাওলানা আকরম খাঁ আব্বাস আলি প্রতিষ্ঠিত মোহাম্মদি পত্রিকায় কর্মরত ছিলেন। সেই সুবাদে তিনি আব্বাস আলিকে অনুবাদে সহযোগিতা করেছেন। পরবর্তীসময়ে আব্বাস আলি সম্পূর্ণ কুরআনের অনুবাদ ও টীকা লেখেন বলেও জানা যায়। সম্ভবত মুদ্রণ প্রমাদবশত কুরআনের অনুবাদক হিসেবে মাওলানা আকরম খাঁ'র নাম ছাপা হয়ে থাকবে। অনুবাদক ও টীকাকার আব্বাস আলি বলেই প্রতীয়মান হয়।[৪৬১]

উল্লেখ্য, আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালার রিপোর্ট' প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯১৩ ও ১৯১৯ সালে। এ রিপোর্টকেও মাওলানার গ্রন্থ হিসেবে কেউ কেউ উপস্থাপন করে আসছেন। মূলত, মাওলানা আঞ্জুমানের মুখপাত্র হিসেবে রিপোর্টের প্রকাশকের দায়িত্ব পালন করেন। রিপোর্ট কমিটি কর্তৃক প্রণীত ও সম্পাদিত হওয়াই স্বাভাবিক। মাওলানার মৌলিক গ্রন্থ হিসেবে এগুলোকে নিরূপণ করা ঠিক হবে না।[৪৬২]

---

৪৫৫. দৈনিক আজাদ, ১৮ আগস্ট, ১৯৮০।
৪৫৬. প্রাগুক্ত।
৪৫৭. প্রাগুক্ত।
৪৫৮. প্রাগুক্ত।
৪৫৯. প্রাগুক্ত।
৪৬০. প্রাগুক্ত।
৪৬১. সংক্ষিপ্ত বাংলা বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২-৪৩।
মুফাখখারুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।
৪৬২. আলী আহমদ, বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধর্মীয় ভাবধারা

সাংবাদিক, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব– যেভাবেই মাওলানা আকরম খাঁ'র মূল্যায়ন করা হোক না কেন, এসবের পেছনে তাঁর একটি বিশেষ উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যাবে। আর তা ছিল ধর্মীয় মূল্যবোধ। তিনি যে কাজই করেছেন, পবিত্র কুরআন ও হাদিসই ছিল তাঁর মাপকাঠি। তাই তিনি অতি প্রগতিবাদী ও গোঁড়াপন্থী দু'নামেই আখ্যায়িত হয়েছেন। এ জন্য অবশ্য তিনি কোনো পক্ষের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে ধর্মীয় মিশন নিয়েই এগিয়ে যান। তাঁর সাংবাদিকতা, সাহিত্যচর্চা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা ছিল উপমহাদেশ তথা বিশ্ব মুসলিমকে উপলক্ষ করে। তিনি ছিলেন প্যান-ইসলামের গোঁড়া সমর্থক ও নিরলস প্রচারক। তিনি নিজেকে কখনও প্রচলিত অর্থে মুহাদ্দিস, মুফাসসির, মুফতি বা ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নেতা বলে দাবি করেন নি। তিনি কোনো মদ্রাসায় শিক্ষকতা বা মসজিদে ইমামতি করেন নি। সফল মুসলিম সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ হিসেবেই তিনি ছিলেন অধিক পরিচিত। তাঁর মূল মিশন ছিল ইসলাম ধর্মের প্রচার, প্রসার এবং এর সামগ্রিক উন্নতি। কর্মজীবনের প্রথম প্রভাতে তিনি দেখলেন, ইসলাম যে আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে একদিন পৃথিবীতে সোনালি যুগের সূচনা করেছিল, বর্তমানে মুসলিম সমাজ সে আদর্শ থেকে বিচ্যুত। ইসলামপন্থীরা নানা ধরনের কুসংস্কার, ফিরকাবন্দি, আত্মকলহ ও দলাদলিতে মশগুল। এ ব্যাধি বাঙালি মুসলিম সমাজে ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। ফলে, এতদঞ্চলের মুসলমানরা ইসলামের মূল আদর্শ থেকে বহু দূরে সরে পড়ে।

প্রতীচ্যের অন্যতম সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ জর্জ বার্নাড'শ যখন ভারতে এসেছিলেন, তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ইসলাম এবং মুসলমানদের সম্পর্কে। তিনি উত্তরে বলেছিলেন : "Islam is the best religion in the world, but Muslims are the worst people in the world. Because they are far away from their ideology."[১]

মাওলানা ছিলেন সমাজসচেতন ব্যক্তি। তাই বাঙালি মুসলমান সমাজের ধর্মীয় ক্ষেত্রে যে সব জটিল বিষয় নিয়ে পূর্বে তেমন আলোচনা-সমালোচনা হয় নি, তিনি সে সব ক্ষেত্রে যুক্তি ও তথ্যনির্ভর আলোচনার সূত্র লাভ করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন ইসলামি জীবনাদর্শ মানুষের জন্য সহায়ক, প্রতিবন্ধক নয়। এ ক্ষেত্রে চিন্তার রাজ্যে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন– যা চিন্তাশীল গবেষকদের প্রেরণার উৎস যোগাবে।

এ পর্যায়ে মাওলানার আলোচিত বিষয়গুলোর মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর অবতারণা করছি :

১) প্রচলিত বিদআত ও অনৈসলামিক কার্যকলাপ সম্পর্কে মাওলানার বক্তব্য;

২) ইসলামের দৃষ্টিতে সুদি লেন-দেন;

---

১. সাক্ষাৎকার, ড. এ বি এম হাবিবুর রহমান চৌধুরী, অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪/০২/৯৭ সময়, রাত ৮টা।

www.pathagar.com

৩) খ্রিষ্টান মিশনারিদের তৎপরতা রোধ;
৪) চিত্রকলা (ছবি, মূর্তি ও পুতুল সংক্রান্ত বিষয়);
৫) দাস প্রথা;
৬) ইজতিহাদ;
৭) মিরাজ;

মাওলানা দেখলেন ইহুদি, খ্রিষ্টান ও হিন্দুদের সংস্পর্শে আসার ফলে মুসলমানদের মধ্যে অনেক অনৈসলামিক ধর্মীয় বিশ্বাস, কুপ্রথা ও কুসংস্কার অনুপ্রেবেশ করেছে। এছাড়া নিজেদের মনগড়া বিভিন্ন ধরনের অনিকর ধ্যান-ধারণাও তাদের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে পড়েছে। আকরম খাঁ উপলব্ধি করলেন, মুসলিম মিল্লাতের উন্নতির জন্য এসব ভ্রান্ত ধর্মীয় বিশ্বাস, ক্ষতিকর রুসম-রেওয়াজ ও ভিত্তিহীন সংস্কার ধুয়ে-মুছে সত্যিকার ইসলামি শিক্ষা ও বাস্তব অবস্থা মুসলমানদের সম্মুখে তুলে ধরা অত্যাবশ্যক। কেননা, ইসলামের মূল শিক্ষা বিধর্মীদের হাতে যতটুকু না ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, মুসলমানদের হাতে তার চেয়ে বেশি বিপর্যস্ত হচ্ছে। পরিণামে মুসলমানগণ অবনতির নিম্নস্তরে তলিয়ে যাচ্ছে। এতে তিনটি ক্ষতির কারণ ঘটেছে :

প্রথমত, মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থায় দুর্বলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, অবিশ্বাসী ও ইসলাম বিদ্বেষীরা ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস ও সুযোগ পাচ্ছে।

তৃতীয়ত, বিশ্ববাসীর নিকটও ইসলাম হেয় প্রতিপন্ন হচ্ছে। কারণ, মুসলমানদের বিশ্বব্যাপী অবনতি ও দুর্গতির জন্য তারা ইসলামের শিক্ষাকেই দায়ী করছে।

মাওলানা বুঝতে পারলেন, মুসলমানদের সংক্রামক ব্যাধি দূর করার জন্য তাদেরকে ইসলামের মূল গ্রন্থ পবিত্র কুরআন ও হাদিসের প্রকৃত শিক্ষার দিকেই ফিরিয়ে আনতে হবে। তবেই তারা অন্ধ অনুসরণ, বিজাতীয় মনগড়া কুসংস্কার থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারবে। এ প্রসঙ্গে মাওলানার চিন্তাধারা স্পষ্ট হবে নিম্নের উদ্ধৃতির মাধ্যমে :

> মুসলমান মাত্রই ধর্মের হিসাবে কোরআন মান্য করিতে বাধ্য, কারণ তাহার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে কোরআন আল্লাহর কালাম। তাহার পর হযরত মোহাম্মদ মোস্ত ফার আদেশ ও নিষেধ মানিয়া চলিতে অর্থাৎ ধর্ম সম্বন্ধে তিনি যাহা কিছু বলিয়াছেন, যাহা কিছু করিয়াছেন অথবা যাহা কিছু অনুমোদন করিয়াছেন মুসলমান মাত্রই তাহা মানিয়া লইতে বাধ্য। কারণ হযরত প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহর নিকট হইতে প্রাপ্ত 'বাণী' (অহি) প্রাপ্ত হইতে থাকেন। অত:এব (ধর্ম সম্বন্ধে) তাহার ভুল হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই, ইহা মুছলমানের ধর্মবিশ্বাস। কিন্তু এই দু'য়ের পর যিনি যাহা বলিবেন বা লিখিবেন, তাহার সিদ্ধান্ত মাত্রই ভ্রম প্রমাদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং তাহা সর্বদাই পরীক্ষা সাপেক্ষ।[২]

উপরোক্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন :

> কাহারো মুখে বা কোনো পুস্তকে কিছু শুনিয়া বা দেখিয়াই যদি তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া লই, তাহা হইলে অন্ততঃ পরোক্ষভাবে ঐ লোকটিকে সম্পূর্ণ

২. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোস্তফা চরিত, ১৯৭৫, ঢাকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

www.pathagar.com

> ত্রুটিহীন মা'ছুম বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। অর্থাৎ তাহাকে নবির আসনে এবং তাহার কথাকে কোরআনের আয়াতের স্থলে বসাইয়া দিয়া আমরা নিজেদের দ্বীন-ঈমানের সর্বনাশ সাধন করি। আজকাল আমাদের দেশের বহু আলিম, নিজেদের রুচি ও বিশ্বাসমতে, শের্ক-বেদ-আৎ কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের প্রতিকার করার জন্য সময় সময় আগ্রহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের সমস্ত চোই যে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে বরং ঐ সকল পাপের মাত্রা যে দিন দিন আরও বাড়িয়া চলিয়াছে–ইহার প্রধান কারণ এই যে, এই মারাত্মক রোগের আসল জীবাণুগুলিকে ইহারা চিনিতে পারেন না। বরং অনেক সময় সেইগুলিকেই জীবনিশক্তির প্রধান উপকরণ বলিয়া বিশ্বাস করিয়া তাহার সংক্রমণের সহায়তাই তাহারা করিয়া থাকেন।[৩]

এ প্রসঙ্গে মাওলানা আক্ষেপ করে বলেন :

> পূর্ববর্তীদের অনুসরণের নামে বলিয়া মুসলমান সমাজে যে সকল তাগুতের সৃষ্টিহইয়াছে তাহাই হইতেছে সমস্ত সর্বনাশের মূল।[৪]

তিনি আরও বলেন :

> ওলামা সমাজ বহু যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন-হাদীসের দলীল দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন আল্লাহ ছাড়া আর কারও সিজদা করা যাবে না। আর কাকেও হাজের-নাজের বিশ্বাস করতে পারবে না। প্রশ্ন হলো যদি একখানা ছোট উর্দ্দু কিতাবের কোথাও লেখা থাকে যে, অমুক অলিআল্লাহ নিজের মুর্শেদকে সিজদা করেছেন, অথবা অমুক আলিম বলেছেন যে, রাসুলুল্লাহ (স.) আল্লাহর অংশবিশেষ, অথবা কোনো ব্যক্তি বলে দিল এ বেটাদের কথা শুন না, এরা পির-ফকির, ওলি-দরবেশ কিছুই মানে না। এরা নেচারী (প্রকৃতিবাদী) দেওবন্দী ওহাবী। সাথে সাথেই তোমার যুক্তি-প্রমাণ সব ভণ্ডুল হয়ে গেল।[৫]

মাওলানা এ জন্যই ক্ষোভের সাথে বলেছেন :

> মুসলমান জাতির সংস্কার করতে হলে তার মস্তিষ্কের সংস্কার আগে করতে হবে। তাদের মধ্যে বুঝার ক্ষমতা সৃষ্টিকরতে হবে যে, কোনো একটি কথা মেনে নেয়ার পূর্বে প্রশ্ন করতে হয়- কেন মানিব? মহান আল্লাহ তাঁর গ্রন্থে ঐরূপ মানতে বলেছেন কি? আল্লাহর রসুল ঐরূপ মানতে নির্দেশ দিয়েছেন কি?
>
> যদি উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর 'না' হয়, প্রশ্ন ওঠে ঐ ধরনের কথা সত্য বলে স্বীকার করবো কেন ? মাথা নত করে মানবো কেন? হয়তো এর উত্তরে বলা হবে, অমুক ইমাম বলেছেন, অমুক পির করেছেন, অমুক আলিম লিখেছেন– এঁরা হচ্ছেন বুজর্গানে দ্বীন, সালফে সালেহীন।[৬]

মক্কার কুফফার কুরাইশরা পবিত্র কুরআনের যুক্তি-প্রমাণের কাছে পরাজিত হয়ে যা বলেছিল এবং পৃথিবীর কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাতিগুলো যে সমস্ত যুক্তি-তর্ক ও দর্শনের মাধ্যমে নিজেদেরকে প্রবঞ্চিত করে আসছিল এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। যেমন-

---

৩. প্রাগুক্ত।
৪. প্রাগুক্ত।
৫. প্রাগুক্ত।
৬. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

বীর হনুমানের পুঁথি এবং মোহাম্মদী পঞ্জিকা'ও আজকাল ঐতিহাসিক ও শাস্ত্রীয় বিষয়ের প্রমাণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে আরম্ভ হয়েছে।[৭] তাই আকরম খাঁ মুসলমান জাতিকে তার বুনিয়াদি শিক্ষার দিকে ফিরে যাবার উপদেশ দিয়ে বলেন :

> মুসলমানকে আজ আবার নূতন করিয়া শিখাইতে হইবে যে, আল্লাহ ও তাঁহার রসুল ব্যতীত, তিনি যত বড় পির দরবেশ অলি বা আলিম হউন না কেন, যুক্তি প্রমাণ ও দলীলের বিপরীত হইলে তাঁহার কথা মানিব না। কারণ ইহা সম্পূর্ণ অনৈসলামিক শিক্ষা।[৮]

একথা অস্বীকার করা যাবে না, এ শিক্ষা ও বিশ্বাসের ফলেই মুসলমানের যত সর্বনাশ হয়েছে। এ সত্য আপামর মুসলমানকে ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে। আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ব, রসুল (স.)-এর রিসালাত ও পবিত্র কুরআনের সত্যতা প্রতিপাদন করার জন্য, স্বয়ং আল্লাহতা'য়ালা কোরআনে শত শত যুক্তি-প্রমাণ দিয়েছেন। বুঝা যাচ্ছে, এখানেও স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ যুক্তি-প্রমাণ ও বিচার-বুদ্ধির কথা বলেছেন। অথচ অপরপক্ষে একজন 'বুজুর্গ' বা কল্পিত 'বুজুর্গের' নাম করে সত্য-মিথ্যা, সঙ্গত-অসঙ্গত যা-ই বলা হবে বিনাপ্রমাণে বিশ্বাস করতে হবে ! এটা সম্পূর্ণ অনৈসলামিক এবং অন্ধবিশ্বাস। অন্ধবিশ্বাসের মূলোৎপাটন করার জন্যই নবি-রসুলের আগমন। এটাই ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা।

এ অন্ধ অনুকরণের বিরুদ্ধে মাওলানার স্পষ্ট বক্তব্য:

> কোরআন এবং ছহী ও বিশ্বাস্য হাদীছ ব্যতীত অন্য কোনো সূত্রে আমরা যে সকল ঐতিহাসিক বিবরণ অবগত হইব, তাহার সত্য-মিথ্যা, বিশ্বাস্য-অবিশ্বাস্য এবং প্রামাণিক-অপ্রামাণিক হওয়া সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া লইবার সম্পূর্ণ অধিকার আমাদের আছে। আরবি, ফার্সী ভাষায় লিখিত পুস্তক মাত্রই মুছলমানের ধর্ম শাস্ত্র নহে।[৯]

ইসলামের মৌলিক আদর্শকে তুলে ধরার লক্ষ্যে বিশ শতকের সূচনালগ্নেই উপ-মহাদেশের মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদদের মধ্যে সমাজকে ইসলামের আদলে গঠন করার আগ্রহ দেখা দেয়। এ উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য কয়েকটি সংগঠন, সংস্থাও গঠিত হয়। যেমন ১৯০৪ সালে 'ইসলাম মিশন', ১৯১১ সালে আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীনে বাঙ্গালা', ১৯১৩ সালে আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা'[১০] প্রতিষ্ঠিত হয়। শেষোক্ত সংস্থার

---

৭. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, প্রাগুক্ত, ১৯৭৫, পৃ. ২০-২১।

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১-২২।

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

১০. আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা গঠন করেন মাওলানা আকরম খাঁ, তৎকালীন বাঙালি মুসলিম সমাজকে ইসলাম সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানদান, ইসলামি রীতি-নীতি চর্চা, ইসলাম ধর্ম প্রচার ও মুসলিম সমাজকে অনৈসলামিক কার্যকলাপ থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে অবিরাম প্রচেষ্টা চালানোই এ সংগঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা'র অন্যতম পদক্ষেপ ছিল 'ইসলামি মিশন' বা ধর্ম প্রচার। অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম প্রচার, ভিন্নধর্মী প্রচারক দ্বারা ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে অভিযোগসমূহকে খণ্ডন করে পুস্তক রচনা, সারা বাংলা, রেঙ্গুন ও আসামের উপজাতীয়দের মধ্যে ইসলাম প্রচার করাই ছিল এ সংগঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য।
ড. সুনীল কান্তি দে, কোলকাতা, আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা ও মুসলিম সমাজ, ১৯৯২, পৃ. ২-৩।

www.pathagar.com

স্থায়িত্বকাল ছিল ১৯১৩ থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত।[১১] সংগঠনটির নেতৃত্বে ছিলেন মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ও মাওলানা মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী। এ প্রতিষ্ঠানটি ইসলাম ধর্মকে কেন্দ্র করে মুসলিম সমাজকে পুনর্গঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। স্বল্প সময়ের মধ্যেই বাংলা এবং আসাম প্রদেশের বিভিন্ন জেলা ও মহকুমায় সংগঠনের শাখা-প্রশাখা গঠিত হয়। এই সংস্থার মুখপত্র ছিল *আল-এছলাম*।' ইসলাম ধর্মবিষয়ক বিভিন্ন রচনা, প্রবন্ধ ও ফিচার প্রকাশ-প্রচার করতো পত্রিকাটি। এছাড়াও বিভিন্ন স্থানে সভা-সেমিনার করে এই সংস্থা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রচার করে। এভাবে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও গৌহাটি শাখাগুলো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ১৯১৯ সালে 'জমিয়তে ওলামায়ে বাঙ্গালা'[১২] প্রতিষ্ঠার পর আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা' ঐ সংস্থাটির সঙ্গে মিশে যায়। 'জমিয়তে ওলামায়ে বাঙ্গালা' ছিল সর্বভারতীয় 'জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ' সংগঠনের প্রাদেশিক শাখা। এ সময় আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালার নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা জমিয়তে 'ওলামায়ে বাঙ্গালার মাধ্যমেই তাদের উদ্দেশ্য সফল করার চেষ্টা করেন। অবশ্য বাংলায় এই ধরনের আরও কয়েকটি 'ওলামা' সংগঠনের অস্তিত্ব দেখা যায়। যেমন- আঞ্জুমানে তরাক্কিয়ে কাওম' (১৯১৯), আঞ্জুমানে আহলে হাদিস' ও 'জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম' (১৯৪৫)। এ কথা সত্য, সংগঠনগুলোর মধ্যে আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা' যে বিপ্লবী ভূমিকা পালন করেছে, অন্য কোনো সংগঠনের পক্ষে তা সম্ভব হয় নি।

মাওলানা আকরম খাঁ কর্মজীবনের সূচনালগ্নেই সাংবাদিকতায় আত্মনিয়োগ করলেও তিনি ছিলেন মূলত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিত্ব। বহুগুণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি 'মাওলানা আকরম খাঁ' নামেই সুপরিচিত। এ পরিচিতিকেই তিনি পছন্দ করতেন। কর্মজীবনে এসে মাওলানা ভাবলেন, শুধু ব্যক্তিগত প্রচোয় মুসলিম সমাজের কুসংস্কার দূর করা সম্ভব নয়। এ জন্য প্রয়োজন ব্যাপক আন্দোলন ও জাতীয় ঐকমত্য। তাই বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের প্রথমার্ধে মাওলানা আকরম খাঁ, মাওলানা মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী, মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকী এবং মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (পরে ডক্টর) প্রমুখ বঙ্গদেশের অপেক্ষাকৃত তরুণ আলিম মুসলিম সমাজের উন্নতিকল্পে নিজেদেরকে সংঘবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করেন। এই উদ্দেশ্য সাধনে তাঁরা ১৯১৩ সালের মার্চ (১৫-১৭) মাসে বগুড়ার বানিয়াপাড়ায় এক ওলামা সম্মেলনের ব্যবস্থা করেন এবং বঙ্গদেশের প্রত্যেক জেলার বিশিষ্ট আলিমগণকে সম্মেলনে উপস্থিত হবার অনুরোধ করে আমন্ত্রণপত্র প্রেরণ করেন।[১৩] এতে বঙ্গদেশের আলিম সমাজ

---

১১. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ,, রাজনীতিতে বঙ্গীয় ওলামার ভূমিকা, ইসলামিক ফাইন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫, পৃ. ৯৬।

১২. প্রাগুক্ত।

১৩. উল্লেখিত আমন্ত্রণপত্রে উল্লেখ করা হয় :

Nobody is unaware of the extremely miserable condition of Muslim Bengal. They have gone down in religion, education, wealth morality, character in trade and commerce. On the one hand the darkness of illiteracy is leading the society to immorality and poverty and on the other; the current of occidental education is leading the educated young men, as it were to anxieties and irreligiousness. Besides, missionaries belonging to other religion are working hard to strike at the root of Islam. Thus the Moslem community in Bengal is duly drifting to rack and ruin. In order to resist these evil currents God has

www.pathagar.com

থেকে প্রভূত সাড়া মেলে। বিভিন্ন জেলা থেকে বহু আলিম সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। এই সম্মেলনেই আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা' গঠন করা হয়। আঞ্জুমানের কার্যকরী কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন মাওলানা আবুল কালাম আজাদ। সেক্রেটারি ও জয়েন্ট সেক্রেটারি নির্বাচিত হন যথাক্রমে মাওলানা আকরম খাঁ ও মাওলানা মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী।[১৪]

আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

১. ইসলাম প্রচার : অর্থাৎ ধর্মজ্ঞানহীন মুসলমানদের মধ্যে ধর্ম ও জাতীয়তাবোধ দৃঢ় করার জন্য ধর্ম সম্পর্কে যে সব অহেতুক সন্দেহের সৃষ্টিহয়েছে, তা নিরসন করে মুসলমানদেরকে প্রকৃত মুসলমানরূপে প্রতিষ্ঠা করা;

২. গ্রন্থ প্রণয়ন এবং বক্তৃতা-বিবৃতি দ্বারা অমুসলিমদের মধ্যে ইসলামের শিক্ষা, মাহাত্ম্য ও সভ্যতা প্রচার করে তাঁদেরকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা;

৩. খ্রিষ্টান, আর্য ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের পক্ষ থেকে প্রচারিত ইসলাম ধর্ম, কোরআন শরীফ ও রসুলে করিম (স.) সম্বন্ধে মিথ্যা, ঘৃণিত ও কঠোর আক্রমণপূর্ণ পুস্তক-সমূহের প্রতিবাদ প্রকাশ করে বিনামূল্যে জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা;

৪. দেশীয় ভাষায় ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানদের জাতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে স্থায়ী সাহিত্য রচনা করা। অর্থাৎ, কুরআন, হাদিস, ফিকাহ, উসুল, আকায়েদ, কালামের উপর বিভিন্ন প্রকারের ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মতত্ত্ব বিস্তারিত ও কালোপযোগী টীকা, টিপ্পনীসহ দেশীয় ভাষায় প্রকাশ করা। সাথে সাথে মুসলমানদের গৌরবোজ্জ্বল সাহিত্য ও ইতিহাসসহ যাবতীয় বিষয় দেশীয় ভাষার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা;

৫. মুসলমান সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির আলিম ও তাঁদের অনুসারীদের মধ্য থেকে সাম্প্রদায়িক হিংসা-বিদ্বেষ ও বিবাদ-বিসম্বাদ দূরীকরণার্থে বিক্ষিপ্ত ও পরস্পরবিরোধী আলিম সমাজকে এক কেন্দ্রে সমবেত করে তাঁদেরকে ইসলাম ধর্ম ও মুসলমান জাতির সেবায় নিয়োজিত করা;

৬. মুসলমানদের মধ্য থেকে আত্মকলহ, গৃহবিবাদ, মামলা, মোকদ্দমা প্রভৃতি নিবারণপূর্বক সকলের মধ্যে একতা, জাতীয়তা ও ইসলামি ভ্রাতৃত্ববোধের সৃষ্টিকরা। এতদুদ্দেশ্যে জায়গায় জায়গায় শালিসী বোর্ড গঠন করা;

৭. প্রাচীন পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রাপ্ত আলিমদের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, ভূগোল-ইতিহাস, ইংরেজি-বাংলা প্রভৃতি ভাষা এবং ধর্ম প্রচার ও ধর্ম সম্বন্ধে আধুনিক তর্ক-পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া, ইংরেজি শিক্ষাপ্রাপ্ত ধর্মানুরাগী মুসলিম যুবকদেরকে উপযুক্তরূপে ধর্ম শিক্ষা দিয়ে এক দল সময়োপযোগী প্রচারক তৈরি করা;

---

created Ulamas and it is the duty to remove the evils and adopt themselves to time and place. No good result is at present expected through individual efforts. In order to remedy the evils and satisfy the wants, above referred to; the Ulamas must centralize their scattered energies and act collectively. It is for this reason that the conference has been called.

ড. সুনীল কান্তি দে, আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা, মল্লিক ব্রাদার্স, কোলকাতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪-১৫।

১৪. তিনি ছিলেন আল-এসলাম' পত্রিকার সম্পাদক। 'খেলাফত' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বৃটিশ সরকারকে বিশ্বাসঘাতক বলে আখ্যায়িত করেন।

www.pathagar.com

৮. সাধারণ শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে 'এসলাম মিশন' স্কুল, মকতব ও মাদ্রাসা প্রভৃতি স্থাপন ও স্কুল পাঠশালায় বালক-বালিকাদের পাঠোপযোগী জাতীয় আদর্শ ধর্ম ও নীতিমূলক সরল বাংলা ও অন্যান্য ভাষায় বিভিন্ন ধরনের পুস্তক-পুস্তিকা প্রচার করা;

৯. ইসলামের খেদমত করতে সমর্থ এবং উপযুক্ত আলিম ও প্রচারকের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য যথোপযুক্ত স্থানে একটি আদর্শ 'দারুল উলুম' স্থাপন এবং 'দারুল ইফতা' প্রতিষ্ঠা করা;

১০. একটি উচ্চমানের কুতুবখানা বা লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা;

১১. ইসলাম ধর্ম, মুসলমানদের জাতীয় ইতিহাস, কুরআন, হাদিস, ফিকাহ, আকায়েদ, কালাম প্রভৃতি বিষয় জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষায় একটি উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা।[১৫]

এ সিদ্ধান্ত ও ভাবধারা থেকে পরবর্তীকালে মাওলানা তাঁর মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকাগুলো প্রকাশ করেন।

এ সংগঠনের মাধ্যমে খ্রিষ্টান মিশনারিদের প্রচারণা থেকে মুসলমানদের রক্ষা করা, মুসলমান সমাজ থেকে শিরক-বিদআত ও কুপ্রথাসমূহ দূরীকরণ এবং অমুসলিমদেরকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে উৎসাহিত করাই ছিল মাওলানার মুখ্য উদ্দেশ্য। আঞ্জুমানের জয়েন্ট সেক্রেটারি মাওলানা মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী মিশনের অন্যান্য দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে 'ইসলাম ও মিশন' শীর্ষক নিবন্ধে উল্লেখ করেন :

> ইহার (মিশন) প্রধান ও প্রথম কার্য হইবে ধর্মান্ধ স্বার্থপর মৌলবী ও মোল্লা-কুলের হস্ত হইতে সমাজের মুক্তি প্রদান করা। যে সকল মোল্লা বা পির মোরশেদগণ ধর্মপ্রচারের ভান করিয়া প্রকারান্তরে স্বীয় ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধার করিয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন এবং সামাজিক উন্নতির মস্তকে কুঠারাঘাতপূর্বক ইহলোক ও পরলোকের সর্বনাশ সাধন করিতেছেন, মিশনের সাহায্যে ইহার সমুচিত প্রতিকার চেষ্টা না করিলে জাতীয় জীবনের আর কি কোনো অস্তিত্ব থাকা সম্ভবপর?[১৬]

লক্ষণীয় যে, মাওলানা আকরম খাঁ ও আঞ্জুমানের নেতৃবৃন্দ ভিন্নধর্মীদের মধ্যে ইসলাম প্রচার ও মুসলিম সমাজ থেকে শিরক-বিদআত-এর ন্যায় জঘন্য পাপাচার দূরীকরণের সাথে সাথে স্বীয় সমাজের ক্ষতিকারক 'তথাকথিত মোল্লা-মৌলবীদেরকে' প্রতিহত করার কথা ঘোষণা করেন। এবং মিশনের প্রচারকদেরকে ইসলাম ও ধর্মতত্ত্ব ভালভাবে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে কোলকাতায় ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন বিষয়ের উপর একটি সমৃদ্ধ কুতুবখানা (লাইব্রেরি) প্রতিষ্ঠা করেন। লাইব্রেরিতে বিভিন্ন সংবাদপত্র, বিভিন্ন জাতির ইতিহাস, তাদের উন্নতি-অবনতির কারণ, শিল্প-বাণিজ্য নীতি ও কৃষি প্রণালী বিষয়ক গ্রন্থ এবং হিন্দু, খ্রিষ্টান, ব্রাহ্মণ ও আর্য জাতির ধর্মতত্ত্ব ও তাঁদের আপত্তি খণ্ডন সম্বন্ধীয় ইংরেজি, বাংলা, উর্দু, আরবি ভাষায় লিখিত পুস্তক এবং মুসলমান জাতির অতীত গৌরব বিষয়ক গ্রন্থাবলি ছিল। এই সমস্ত পুস্তক পাঠ করে আঞ্জুমানের প্রচারকবৃন্দ

---

১৫. Mussalman, 23 October, 1914 Report on Natives Papers in Bengal, henecefourth adbreviated as R.N.P.(B).
আল এসলাম, মাঘ, ১৩২৫, পৃ. ৫৫৪-৫৬।

১৬. ড. সুনীল কান্তি দে, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫।

www.pathagar.com

ইসলাম ধর্ম ও অন্যান্য ধর্মের মূল তত্ত্ব ও প্রচারনীতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেতেন। তাদের প্রচার কার্যে ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ ও তাৎপর্য বিশ্লেষণে বিশেষ সহায়ক হয়।[১৭] এছাড়া উক্ত সংগঠন ইসলাম ধর্ম বিষয়ক ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে অহেতুক অভিযোগ খণ্ডনমূলক পুস্তক প্রণয়নেরও ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে।

তৎকালীন ইংরেজি 'সাপ্তাহিক মুসলমান' ১৯১৪ সালের ৩১ অক্টোবর সংখ্যার মন্তব্য:

> Some very earnest and well qualified members of the Anjuman, namely, Moulana Muhammad Akram Khan, Moulana Muhammad Maniruzzaman Islamabadi, Moulovi Muhammad Shahidullah M.A B.L and others are engaged in writing books and pamphlets in refutation of the accusations made by Christian missionaries against Islam and showing the hollowness of Christianity itself.[১৮]

১৯১৬ সালের দিকে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে কিছু গবেষণাধর্মী পুস্তকও রচিত হয়। এ সময়েই মাওলানা আকরম খাঁ তাঁর 'যিশু কি নিষ্পাপ বইটি রচনা করেন।[১৯] এই গ্রন্থে তিনি খ্রিষ্টানদের হযরত মুহাম্মদ (স.) সম্পর্কে অপপ্রচারের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেন। অবশ্য এই সময় খ্রিষ্টান তৎপরতার বিরুদ্ধে 'প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব' ও 'ভারতে ইসলাম প্রচার' নামক বই দু'টিও প্রকাশিত হয়।[২০] মাওলানা আকরম খাঁ জীবনের শুরুতেই সামাজিক কুসংস্কার, শিরক, বিদয়াতের ন্যায় সমাজবিধ্বংসী কার্যক্রম থেকে সমাজকে ইসলামের সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার সংগ্রামে ছিলেন আপোষহীন। আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালার মাধ্যমে এ সবের বিরুদ্ধে তিনি দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়াস পান। এ সম্পর্কে ইংরেজি সাপ্তাহিক 'মুসলমান'-এ বলা হয় :

> The Islam Mission started by the Anjuman has sent out preachers to various parts of the country. Preachers some of whom have devoted their lives to the cause of Islam and they have been using every endeavor to translate the objects of the Anjuman into action. Moulvi Mohamed Akram Khan, the founder secretary of the Anjuman, has devoted his life as well as his means to the cause of Islam and the Anjuman. The work before the Anjuman is a gigantic one and it requires to be adequately financed. It is a matter of great gratification to us that, as the readers of the "Mussalman" already known, the Anjuman has secured a permanent grant of RS 100 per month from two devoted sons of Islam viz, Mr. A.K.A.S Jamal CIE the merchant prince of Rangoon and Moulvi Abdul Karim, retired Inspector of schools.

---

১৭. আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালার রিপোর্ট, ২য় ভাগ, ১৯১৩/১৪*১৫*১৬, পৃ. ২১।
১৮. Mussalman, 31 October, 1914, R.N.P (B).
১৯. ড. সুনীল কান্তি দে, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।
২০. 'প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব' পুস্তকটি আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালার প্রচারক মৌলবী মোজাফ্ফর উদ্দীন কর্তৃক রচিত। 'ভারতে ইসলাম প্রচার' বইটির লেখক আঞ্জুমানের জয়েন্ট সেক্রেটারী মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী।
প্রাগুক্ত, পৃ.-২৪।

www.pathagar.com

> Besides these 200 rupees per month, the Anjuman has been receiving other donation and subscriptions also.[২১]

মাওলানা মুসলিম সমাজে প্রচলিত অনৈসলামিক কার্যকলাপ, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং মুসলমানদের মধ্যে একতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তুলে ধর্মীয় মূল্যবোধ সৃষ্টির জোরদার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করে আঞ্জুমানের নেতৃবৃন্দকে প্রশিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার আহবান জানান। দীর্ঘদিন থেকে গড়ে উঠা প্রচলিত শিরক্, বিদআত পরিহার করে ইসলামের প্রকৃত সত্যকে অনুধাবন করার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার পরামর্শ দেন। পবিত্র কুরআনের মূলতত্ত্ব বিশ্লেষণ, হাদিস সম্পর্কে জ্ঞান দান এবং বিভিন্ন লেখনীর মাধ্যমে প্রকৃত ইসলামি রীতিনীতি তুলে ধরে সমাজ থেকে সকল প্রকার কুসংস্কার ও কুপ্রথা দূরীকরণের উপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

প্রাচীন এসিরিয়ান, ইজিপশিয়ান, কাল্ডেভিয়ান, কাথোজিয়ান, ফিনিসিয়ান, আরবের হামিয়র জাতি, পুরাতন গ্রিক প্রভৃতি জাতির পতনের কারণ হচ্ছে কুসংস্কার বিজড়িত শিরক ও বিদআত। এ জন্য ইসলাম ধর্ম শিরক ও বিদআত সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছে। পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে:

> আল্লাহর সাথে যে শিরক করে সে পাপ তিনি কখনই ক্ষমা করবেন না, এছাড়া অন্যান্য পাপ সম্বন্ধে তিনি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করতে পারেন।[২২]

> যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার সাথে শিরক করে সে সম্পূর্ণরূপে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়।[২৩]

এতে প্রমাণিত হয়, আল্লাহর একচ্ছত্র ক্ষমতা ও অধিকারে অন্যকে অংশীদার করা মহাপাপ।

উভয় বাংলায়, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এবং ভারতের বাহিরে মুসলমানদের শিরকের ন্যায় পাপ কার্যে অধিক সহায়তা করেছে সুফি-সাধক, পির-ফকির, সাধু পুরুষদের কবর, মাযার বা সমাধি ও মন্দির। অথচ যে মহাপুরুষগণ আমৃত্যু ইসলামের খেদমতে জীবন উৎসর্গ করে গেছেন, ধর্ম প্রচার, সমাজ সংস্কার, কুসংস্কার দূরীকরণ, বিদেশে ও বিধর্মীদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে শাহাদাত-বরণ যাঁদের জীবনের প্রধান ব্রত ছিল, আজ তাঁদেরই কবর, আস্তানা, শিরক এবং বিদআতের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়েছে। এসব কুসংস্কার থেকে মুসলিম সমাজকে রক্ষা করার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়াই মাওলানা জাতীয় কর্তব্য মনে করতেন।[২৪]

এ সময়ের আর একজন ত্যাগী প্রাণপুরুষ ছিলেন ইসমাঈল হোসেন সিরাজি[২৫] তিনি তাঁর 'এছলামের শিক্ষা প্রবন্ধে বলেন :

---

২১. Editorial, Mussalman, 22 December 1916, R.N.P. (B).
২২. সুরা নিসা, রুকু-৭, আয়াত ৪৮।
২৩. সুরা নিসা, রুকু-১৮, আয়াত ১১৬।
২৪. মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।
২৫. ইসমাঈল হোসেন সিরাজী পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ শহরে ১৮৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর জন্মস্থানের নামানুসারে তিনি সিরাজী বলে পরিচিত। উচ্চবিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি পত্র-পত্রিকা পাঠ, সাহিত্য ও ইতিহাসচর্চা এবং প্রবন্ধ ও কবিতা রচনা প্রভৃতি বিষয়ে মনোযোগ দেন, পরবর্তীকালে সমাজসেবা ও রাজনীতিতে নিজকে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯০৫ সালে বিদেশী দ্রব্য বর্জনের আন্দোলনে যোগ দেন। মুসলিম অতীত কাহিনী ও অধঃপতনের বিষয় 'অনল প্রবাহ' নামক কাব্যগ্রন্থ লেখার অপরাধে ইংরেজ সরকার বইটি বাজেয়াপ্ত করেন এবং তাঁকে গ্রেফতার

www.pathagar.com

বৈরাগ্য, ঔদাসীন্য, আলস্য, সন্ন্যাস ও মূর্খতা হইতে মানব জাতিকে জ্ঞানের পথে, ধর্মের পথে, বীরত্বের পথে, কৃষ্টিতত্বের পথে, উন্নতির পথে, জয়ের পথে টানিয়া তুলিবার জন্য তিনি (মুহাম্মদ স.) যে ধর্মের প্রচার করিয়াছিলেন, আজ বুদ্ধ ও জরদস্ত বেদান্তের প্রচ্ছন্ন মতাবলম্বী এছলামের পরম শত্রু আধুনিক সুফি ও দরবেশগণ ও তাহাদের শিষ্যমণ্ডলী, সেই ধর্ম প্রচার করিতে যাইয়া সমাজের অঙ্গে অঙ্গে জাতির প্রাণে বৈরাগ্যের কথা, ঔদাস্য ও কর্মবিমুখতার কথা এবং বিজ্ঞান-বিরুদ্ধতার ভাব এমন করিয়া বিষ ধারার ন্যায় ঢালিয়া দিয়াছে যে, তাহাতে গোটা মোছলমান জাতির প্রাণ মৃত্যুর নিদারুণ অবসাদে আচ্ছন্ন এবং মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। সুফি ও দরবেশগণ প্রায় ৫ শত বৎসর এছলামের যে বিকৃত ও ভিত্তিহীন ব্যাখা দিয়া শত শত হাজার হাজার কেতাব লিখিয়াছেন, সেই সমস্ত কেতাব পড়া বিদ্যায় ভূষিত তথাকথিত পির আলিমগণ এছলামের মস্তক একেবারে চর্বন করিয়া মোছলমান জাতিকে অধঃপতন ও ধ্বংসের পথে লইয়া চলিয়াছেন।[২৬]

জনাব এম, এ, ওয়াহেদ উপরোক্ত বক্তব্যকে[২৭] সমর্থন করে বলেন :

মোসলেম একেশ্বরবাদী হইলেও হিন্দু সমাজের ন্যায় বর্তমানে বহুবাদী বা প্রায় ৩৩ কোটি দেবতার উপাসক হইয়া পড়িয়াছে। তাহার প্রকাশ্য দৃষ্টান্ত পির পূজা, কবর পূজা, মাজার পূজা, পীরের সম্মান, পীরের কবরের সম্মান, খোদা তালার সম্মান অপেক্ষা যেন পিরভক্ত মুষ্টিরদগণের নিকট অধিক। পিরকে ছেজদা করা, কবরের ছেজদা, পীরের নিকট মনোবাঞ্ছা ভিক্ষা করা এ সকল বর্তমান যুগের নিত্যনৈমিত্তিক কার্য। সুতরাং মোছলমানগণ লক্ষ্যভ্র হইয়া খোদার উপাসনা ছাড়িয়া পির পয়গম্বরগণের পূজা ও উপাসনা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। পীরের কবরে ওরছ উপলক্ষে বৎসর বৎসর হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ উপস্থিত হয়। কেউ সন্তান প্রার্থনা করে, কেউ ধন, কেউ স্বাস্থ্য, কেউ মুকদ্দমার জয়লাভ প্রার্থনা করে ক্রন্দন করে মস্তক ভূলুণ্ঠিত করে, আবার কেউ পীরের নামে জেকের ও অজিফা পাঠ করে। পিরকেই যথাসর্বস্ব বলিয়া জ্ঞান করে। সুতরাং একমাত্র খোদা তা'আলার সম্মান, শ্রদ্ধা ও উপাসনা কোথায় থাকিল ? ইহা লক্ষ্যভ্রতা নয় কি? এই লক্ষ্যভ্রতাই আমাদের পতনের চরম ও পরম কারণ।[২৮]

একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করা, মস্তক অবনত করা, সৃষ্টিকর্তা ব্যতীত কোনো সৃষ্টিকে সিজদার ন্যায় শিরক, ঘৃণিত ও গর্হিত কাজ যে ইসলামসম্মত নয়-আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালার জয়েন্ট সেক্রেটারি মাওলানা মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী তারই ব্যাখ্যায় বলেন :

দেশের যে যে স্থানে স্ত্রী পুরুষেরা পীরের দরগাহে যাইয়া ও জীবিত পীরের নিকট যাইয়া বর্ণিতরূপে শিরক বিদআত রূপে মহাপাপ অর্জন করিতেছে। তাহাদিগকে ঐ কুপথ হইতে ফিরাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। ঈমানদার ভ্রাতৃগণ

করেন। মুক্তির পর ১৯১২ সালে ভারতের মুসলিম প্রতিনিধি হিসাবে তুরস্ক গমন করেন। তিনি অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেন। ১৯৩১ সালের ১৭ই জুলাই সিরাজগঞ্জে ইন্তিকাল করেন। সংক্ষিপ্ত ইসলামি বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, ইসলামি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২, পৃ. ২০১-২।

২৬. এছলামাবাদী, সমাজ সংস্কার, আল এছলাম, শ্রাবণ, ১৩২৬, পৃ. ১৯৮-৯৯।

২৭. সুনীল কান্তি দে, ডা., আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা, এপ্রিল, ১৯৯২, পৃ. ৩৫।

২৮. এম, এ ওয়াহেদ- মোছলেম সমাজের লক্ষ্যভ্রষ্টতা, প্রাগুক্ত, ১৩২৬, পৃ. ৫৩৭-৩৮।

www.pathagar.com

> একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া এ সকল কুপ্রথা উঠাইয়া দেউন। কবরে, দরগাহে, মাযারে বাতি জ্বালান, মানত চড়ান সমূহ বিনাশ করা আবশ্যক। দেশের আলিম, ফাজেল, মুনশী সরদার সকলেই এই মহাপাপের বীজ উৎখাত করার জন্য বদ্ধপরিকর হউন।[২৯]

শিরক-বিদআত প্রতিরোধকল্পে আলিম-ওলামা সমাজকে এগিয়ে আসার অনুরোধ জানিয়ে আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালার তৃতীয় অধিবেশনের (চট্টগ্রাম ১৯১৮) অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি মৌলবি গোলাম কাদের আক্ষেপের সাথে বলেন :

> এসলামাবাদ (চট্টগ্রাম) মোছলমান ও আলিমপ্রধান জেলা; কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, আলিমগণের চোখের উপর কত শেরক, বেদাৎ-মহাপাপের অভিনয় হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কবর পোরাস্ত, দরগাহ পোরাস্তি, পির পোরস্তি, গায়ের আল্লাহর নিকট বর প্রার্থনা, নামাজ রোজা ছাড়িয়া পীরের ধ্যানে লিপ্ত হইয়া, হিন্দুদের ন্যায় গানবাদ্যকে ধর্মের অঙ্গীভূত করা, পির পয়গাম্বরকে ভবিষ্যৎজ্ঞানী বলিয়া বিশ্বাস করা ইত্যাদি নানা মারাত্মক দোষ সমাজে সংক্রমিত হইয়া পড়িয়াছে। ... আশ্চর্য পরিতাপের বিষয় এই যে, আলিমগণের এবং আধুনিক শিক্ষিতদের মধ্যে অনেকেই এ সকল মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত। সমবেত আলিমমণ্ডলী আমাদের সমাজদেহের এ সকল মারাত্মক রোগের প্রতিকার কল্পে যত্নবান হইবেন, ইহাই আমাদের অনুরোধ।[৩০]

ইসলাম সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ধর্ম হিসেবে পৃথিবীতে প্রভাব বিস্তার করেছিল। এ দেশে একশ্রেণির মুসলমান নিজেদেরকে আশরাফ বা শরিফ শ্রেণি দাবি করে মুসলমানদের মধ্যে ভেদ-নীতি সৃষ্টিকরেছে। মাওলানা আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা'র মাধ্যমে এই ভেদনীতি সমূলে উৎপাটন করার অবিরাম প্রচেষ্টা চালান। 'ইসলামে বংশ-কৌলীন্যের স্থান নেই' এটি আরাফাতের ময়দানে রসুল (স.)-এর যুগান্তকারী ভাষণের একটি অংশ।[৩১] এর মাধ্যমে একজন মেথর ও চণ্ডাল ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করামাত্রই সৈয়দ, মোগল, পাঠানের সাথে এক সঙ্গে বসে পানাহার করতে পারে, এক মসজিদে একই কাতারে দাঁড়িয়ে ইবাদাত করতে পারে। মসজিদে কুলীন, বড়লোক আর গরীব লোকের জন্য নির্দিষ্ট স্থান নেই। একজন রাস্তার কুলি, পথের ভিখারী মসজিদে নামাজের সময় পূর্বে উপস্থিত হয়ে সর্বাগ্রবর্তী কাতারে দাঁড়াতে পারে। যে ধর্মে এরূপ বিধান বিদ্যমান, সে সমাজে শরীফ-আতরাফ ভেদাভেদ অপরাধ। মুসলিম সমাজের দুর্দশার জন্য মূলত দায়ী আশরাফ-আতরাফ বিভেদনীতি। এ সম্পর্কে মোহাম্মদ এন আলি রামপুরী প্রশ্ন উত্থাপন করেন:

> তুমি তোমার কুরআন হাদিসে কোথাও আতরাফের প্রতি আশরাফের এরূপ নৃশংস ব্যবহার করিবার যুক্তি দেখাইতে পার কি?[৩২]

তিনি আক্ষেপ করে আরো বলেন:

---

২৯. এছলামাবাদী- সমাজ সংস্কার, আল-এসলাম, মাঘ ১৩২৫, পৃ. ৫৪১-৫৪২।
৩০. আল-এসলাম, ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩২৫, পৃ. ৫৮১-৮২।
৩১. স্যার সৈয়দ আমীর আলী, দ্য স্পিরিট অব ইসলাম, মল্লিক ব্রাদার্স, কোলকাতা, এপ্রিল, ১৯৮৭, পৃ. ১৯৩
৩২. মোহাম্মদ এন আলী, রামপুরী, আশরাফ-আতরাফ, প্রাগুক্ত, চৈত্র, ১৩২৬, পৃ.-৬৬২।

www.pathagar.com

> হায়! যে এছলাম সন্তানগণ ভেদনীতির প্রশ্রয়ে যে প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছে, যে এছলাম জগৎকে আপন সাম্যগুণে আপন করিয়া লইয়াছিল, অদ্য তুমি ভেদনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তোমার আপন ভাইকে পায়ে ঠেলিয়া দূরে ফেলিতেছ। চক্ষু খুলিয়া দেখ, ছবক্তগীন আলপ্তগীনের ক্রীতদাস হইয়াও তাহার জামাতা ও সিংহাসনের অধিকারী হইয়াছিলেন। কুতুবুদ্দিন, আলতামাস গিয়াসুদ্দিন প্রভৃতি দোর্দণ্ড প্রতাপশালী নৃপতিগণও দাস ছিলেন। হে আশরাফ! তোমরা কি মান-মর্যাদায়, অর্থবৈভবে, প্রভাব-প্রতিপত্তিতে তাহাদিগকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছ? অতিক্রম তো দূরের কথা, তোমরা যে তাহাদের জাতি বা বংশ, এ কথা কোনো নিরপেক্ষ জ্ঞানীকে বুঝাইতে পারিবে কি? আজ বিশাল বঙ্গের কে তোমার ক্রীতদাস? আতরাফ কি ক্রীতদাস অপেক্ষাও নগণ্য? তবে তুমি আতরাফ নামে এত নাসিকা কুঞ্চিত কর কারণ কি? তুমি তাহাকে এত হিংসা কর কেন? এখনও সময় আছে, এখনও সাবধান হও। মোহনিদ্রা হতে জাগরিত হও। আঞ্জুমানে ওলামার মহৎ উদ্দেশ্য সর্বত্র ঘোষণা কর। দেশে দেশে সত্যের মহিমা বিস্তার কর।[৩৩]

ইসলাম মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় যে কঠোর বাণী পবিত্র কুরাআন ও হাদিসের মাধ্যমে উল্লেখ করেছে, তা অনুসরণ-অনুকরণ করলে মানুষে মানুষে কোনো ভেদনীতি থাকবে না। প্রতিষ্ঠিত হবে খিলাফতে রাশেদার ন্যায় অনুপম আদর্শ। সেই সোনালি যুগের আদর্শকে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যেই মাওলানা আঞ্জুমানের কর্মীবাহিনী দ্বারা সমাজের গুরুত্বপূর্ণ মহৎ কার্যে হাত দিয়েছিলেন। কর্মসূচিগুলো সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নরূপ :

১. সামাজিক শাসন দ্বারা মুসলমানদেরকে নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি ধর্মকর্মের প্রতি আকর্ষণ করা;

২. মুসলিম সমাজে একতা, সম্প্রীতি, সমবেদনা ও সৌজন্য বৃদ্ধির জন্য নিকটবর্তী কয়েক গ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঈদের জামাতের লোকদের একটি কেন্দ্রে ঈদের জামাতের ব্যবস্থা করা;

৩. মুসলমানদের মধ্যে একতা ও ভ্রাতৃভাব বন্ধনকল্পে ছোট ছোট জামাতের পরিবর্তে একটি কেন্দ্রে বড় বড় জামাতে জুমার নামাজের ব্যবস্থাকরণ;

৪. মুসলিম সমাজকে অযথা মামলা-মোকদ্দমা এবং পুত্র-কন্যার অকাল বিবাহ ইত্যাদি অনর্থক কারণে সুদি কর্জ নেওয়া থেকে বিরত রাখা, ব্যবসায়ী ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণির সুদদাতা ও তৎসাহায্যকারী ব্যক্তিদের প্রতি কঠোর সামাজিক শাসন প্রয়োগ করা এবং মামলা-মোকদ্দমা গ্রাম্য সালিশি কমিটি কর্তৃক নিষ্পত্তিকরণ;

৫. বাল্যবিবাহ প্রথা, বিবাহে অতিরিক্ত জেওর, মোহর ধার্য রহিত করা, বিবাহোৎসবে ঢোল বাদ্য, বাজনা, নাচ, গান, বাজী পোড়ান ও বরযাত্রীদের জন্য অতিরিক্ত আহারীয় ব্যয় ইত্যাদি কুপ্রথা সামাজিক শাসন দ্বারা রহিতকরণ;

৬. কন্যার কান ছেদানী ও পুত্রের খৎনা ইত্যাদি উপলক্ষে নাচ, গান, আমোদ-আহলাদের মত প্রচলিত কুপ্রথা পরিহার করা;

৭. ইসলাম ধর্ম-বিরুদ্ধ বিজাতীয় উৎসব ও মেলায় মুসলমানদের যোগদানে বিরত রাখা;

---

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ.-৬৬২-৬৪।

www.pathagar.com

৮. পিতা-মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যু উপলক্ষে ধার-কর্জ করে বা অতিরিক্ত ব্যয়ে জেয়াফৎ দেওয়া এবং ঐরূপ জেয়াফতে প্রকৃত হকদার ফকির-মিছকিন ও দীন-দরিদ্র লোকদের ভোজদানের পরিবর্তে অবস্থাপন্ন লোকদের ভোজদান রহিত করা;

৯. মুসলিম সমাজে কুরআন শরীফ ও ধর্ম সংক্রান্ত মাছয়ালাদি শিক্ষাদান এবং প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক গ্রামে আদর্শ মকতব ও নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করা এবং এই সব পরিচালনাকল্পে নিম্নলিখিত উপায়ে গ্রাম গ্রামে একটি বায়তুল মাল তহবিল গঠন করা;

ক. মুষ্টি চাউল সংগ্রহ অর্থাৎ গ্রামের প্রত্যেক পরিবারে দুই বেলা রান্নার জন্য যে সকল চাউল নির্দিষ্ট করে নেওয়া, তা থেকে দুই মুষ্টি একটি পরবর্তী পাত্রে রেখে দেওয়া;

খ. যাকাত, ছদকা, ফিতরা ও কোরবানীর চামড়ার মূল্যের অন্তত সিকি অংশ;

গ. বিবাহ শাদীতে ধার্য জেওর মোহরের উপর শতকরা ১ টাকা হিসাবে চাঁদা গ্রহণ করা;

ঘ. জানাযা, কবর যিয়ারত, তাহলীল, কুরআনখানি ইত্যাদি উপলক্ষে বায়তুল মালের জন্য এক বরাত খয়রাত রেখে দেওয়া;

১০. বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলায় যে সকল দীঘি-পুষ্করিণী অব্যবহার্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে তাতে ব্যক্তিগতভাবে বা যৌথ মূলধন নিয়ে মৎস্য চাষে মনোনিবেশ করা;

১১. কামার কুমার সোনার হালুয়াই, বারুই, গোয়ালা ও নূতন প্রণালীতে বস্ত্রবয়ন ইতাদি লাভজনক ও প্রয়োজনীয় হালাল ব্যবসা মুসলিম সমাজে প্রচলিতকরণ;

১২. বরাতে ও অন্যান্য জিয়াফাতের মজলিসে শিরা নির্দেশ তথাকথিত কুলীন ও অকুলীন এক সঙ্গে আহার করতে আপত্তি ইত্যাদি একতা ও ভ্রাতৃভাব নীতির প্রতিকূল দেশাচার সম্পূর্ণরূপে রহিতকরণ :

১৩. সামাজিক শাসন দ্বারা চুরি ডাকাতি ব্যভিচার মদ্যপান বদমায়শী, মিথ্যা মামলা মোকদ্দমা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া ও প্রবঞ্চনাজনিত ব্যবহার রহিত-করণ;

১৪. মুসলমানদের কুসীদজীবী মহাজনদের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য বিনা সুদে কর্জ দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক গ্রামে বা এক কেন্দ্রে নিম্নলিখিত উপায়ে একটি ধর্মগোলা স্থাপন করা-

ক) অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে কৃষক ধান্যাদি গোলাজাত করার পূর্বে অবস্থানুযায়ী তাদের নিকট হতে কিছু কিছু চাঁদা স্বরূপ ধান্যাদি ধর্মগোলায় জমা করা;

খ) সুপারী, নারিকেল, লঙ্কা-মরিচ, খেসারী, মুগ, তামাক, পাট, সরিষা, রাই, তিসি ইত্যাদি ফসল কিছু কিছু গৃহস্থ হতে সংগ্রহ করে বিক্রয়লব্ধ মূল্য বিশ্বাসী আমানতদার ক্যাশিয়ারের নিকট গচ্ছিত রাখা;

গ) প্রত্যেক ধর্মগোলার কর্তব্যকার্য পরিচালনার জন্য কয়েকজন সদস্য নিয়ে এক একটি কমিটি গঠন করে বিশ্বাসী আমানতদার ব্যক্তির বাড়িতে ধর্মগোলার হিসাব-নিকাশ স্বতন্ত্র সেক্রেটারির নিকট রাখা;

১৫. স্ত্রী-পুরুষ উভয়কে সমভাবে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বালকদের ন্যায় বালিকাদের জন্যও কোরআন শরীফ ও প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাকরণ;

www.pathagar.com

১৬. সবল, কার্যক্ষম ও অবস্থাপন্ন ভিক্ষা-ব্যবসায়ীকে ভিক্ষা দেওয়ার প্রথা নিবারণ করা।[৩৪]

ইসলামের মৌলিক আদর্শ ও মর্মবাণীকে মুসলিম জনগণের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালার মাধ্যমে উপরোক্ত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সংগঠনটি মূলত ছিল শরিয়তপন্থী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। এই সংস্থা বাংলার বিভিন্ন মতবাদের অনুসারী ওলামা সমাজকে একই মঞ্চে একত্রিত করে মুসলিম মিল্লাতের সেবায় নিয়োজিত করতে উদ্যোগী হয়েছিল। সংস্থাটি মুসলমানদের মধ্যে একতা, জাতীয়তা ও ইসলামিক ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালায়।[৩৫] আঞ্জুমান মুসলিম সমাজকে সুসংহত করতে ধর্মীয় শিক্ষা ও ইসলামি রীতিনীতি অনুসরণের উপর গুরুত্ব দেওয়ার সাথে সাথে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ওপর গুরুত্বারোপ করেছিল। এছাড়া অমুসলিম জনগণের মধ্যে ইসলামের শিক্ষা, মাহাত্ম্য, সভ্যতা প্রচারেও সচেষ্ট ছিল।

বাংলা ও আসামে প্রচারক নিয়োগ করে একটি সংস্থার মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম প্রচারের কৃষ্টিতত্ত্ব একমাত্র মাওলানাদেরই। এর আগে সুফি-সাধক, পিরগণই ছিলেন মূলত ধর্ম প্রচারের ভূমিকায় অগ্রণী। ১৯০৪ সালে 'ইসলাম মিশন' নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়েছিল। কিন্তু এর স্থায়িত্ব খুব বেশি দিন ছিল না।[৩৬] স্বল্প সময়ের মধ্যেই লুপ্ত হয়ে যায়। আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই সংস্থা ইসলাম প্রচারে বিপ্লবী ভূমিকা গ্রহণ করে এবং এ উদ্দেশ্যে কলিকাতায় একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়।[৩৭] সেখানে ইসলাম ধর্ম বিষয়ক ও অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে পুস্তিকা, ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য সভ্যতা বিষয়ক পত্র-পত্রিকা ও জার্নাল থাকতো। প্রচারকগণ সেখান থেকে জ্ঞান আহরণ করতো, বিশেষ করে ভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনেরও সুযোগ ছিল। প্রচারকগণ প্রচারের সময় অনান্য ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা করে ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতেন এবং অমুসলিমদেরকে ইসলাম গ্রহণে উৎসাহ দিতেন। উল্লেখ্য যে, মাওলানার এবং আঞ্জুমানের কর্মীদের অন্যতম প্রধান কর্মসূচি ছিল খ্রিষ্টান মিশনারিদের প্রচারণা থেকে মুসলমানদের রক্ষা করা এবং ইসলাম সম্পর্কে ভিন্নধর্মীদের উত্থাপিত অভিযোগ খণ্ডন করা। মাওলানা আকরম খাঁ'র 'যিশু কি নিষ্পাপ' বইটি এ উদ্দেশ্যেই রচিত।

আঞ্জুমানের কাজ আরম্ভ হওয়ার পর উদ্যোক্তারা বিধর্মী কর্তৃক যতটা বাধার সম্মুখীন হয়েছেন, তার চেয়ে বেশি বাধার সম্মুখীন হয়েছেন স্বধর্মাবলম্বী আলিমগণের কাছে। বিরোধী আলিমগণ এ সংস্থার বিরুদ্ধে 'কুফরির ফতওয়া' দিতেও দ্বিধা করেন নি।[৩৮] আহলে হাদিস-এর আলিমদের একাংশ এ সংগঠনের তীব্র সমালোচনা করেন।[৩৯] মৌলবী এফাজুদ্দিনের নেতৃত্বে তাঁরা এ সংস্থার প্রচোকে ধোঁকাবাজি বলে আখ্যায়িত করেন। মোসলেম হিতৈষী ও আহলে হাদিস পত্রিকায় এ সম্পর্কে

---

৩৪. এছলামাবাদী, আঞ্জুমানে ওলামা ও সমাজ সংস্কার, ৪ আল এসলাম, পৌষ, ১৩২৬, পৃ. ৪৮৮-৪৯১।

৩৫. আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা, প্রাগুক্ত, পৃ.-৭০।

৩৬. প্রাগুক্ত।

৩৭. আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৩।

৩৮. আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালার পঞ্চবার্ষিকী রিপোর্ট, মাসিক মুহাম্মদি, ঢাকা, আশ্বিন, ১৩৭১, বঙ্গাব্দ, পৃ. ৮৮৬-৮৮৭।
মূল রিপোর্ট উর্দু ভাষায়, আকরম খাঁ'র রচনা, অনুবাদ, মুনতাছির আহমদ রহমানী।

৩৯. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

অপপ্রচারও চালান।[৪০] এসব বিরোধিতা সত্ত্বেও এ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে থেমে থাকেন নি। তাঁরা তাঁদের মিশন পরিচালনায় অবিচল থাকেন।

প্রচলিত বিদআত ও অনৈসলামিক কার্যকলাপ সম্পর্কে মাওলানার বক্তব্য

হযরত মুহাম্মদ (স.) পৃথিবীতে এসেছেন আল্লাহর মনোনীত পরিপূর্ণ ধর্ম ইসলামকে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে। দীর্ঘ প্রায় তেইশ বছর তিনি নবুওয়াতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা এলো : হে মুসলিম সমাজ, আজিকার এ দিনে তোমাদের মঙ্গলের জন্য দ্বীনকে পূর্ণতা দান করে দিলাম এবং তোমাদের কল্যাণের জন্য আমার নিয়ামতকে সুসমাপ্ত করে দিলাম, আর ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন রূপে মনোনীত করলাম।[৪১]

আয়াতের মর্ম উপলব্ধির জন্য আমাদেরকে বুঝতে হবে যা পরিপূর্ণ হয়ে আছে, বাইরের কোনোকিছুর সামান্যতম স্থানও তাতে হতে পারে না। যদি হয় তাকে পূর্ণ বলা যায় না। অথচ পবিত্র কুরআনে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রসুল (স.)-এর মাধ্যমে ইসলামকে পরিপূর্ণ ধর্মের সমাপ্তির কথা ঘোষণা দিয়েছেন। এ জন্যেই প্রত্যেক মুসলমানকে দ্বিধাহীনচিত্তে স্বীকার করতে হবে যে, আল্লাহর কালাম ও রসুলের প্রামাণ্য হাদিস ব্যতিরেকে অন্য কোনো আদেশ, নিষেধ বা আকিদা আদৌ ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। হলে তা হবে বিদআত এবং স্থানবিশেষে শিরক ও কুফর।

সুফিদের কার্যক্রম

ইসলামের প্রাথমিক যুগের পর প্রকৃত ইসলাম ধর্মের নামকরণে মুসলিম সমাজের মধ্যে যে-সব মারাত্মক অনাচারের প্রাদুর্ভাব ঘটে তা বিস্ময়কর। এক শ্রেণির লোক ইসলামের পরিবর্তে আর একটা মস্তিষ্কপ্রসূত উদ্ভট ধর্মেরই সৃষ্টিকরে। এ প্রসঙ্গে মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী[৪২] বলেন :

قدماصوفیہ کا جادہ سلوک وطریقت شریعت اسلام وسنت نبوی کے قدم بہ قدم تھا
اور رفتہ رفتہ جن بدعات کو شعار تصوّر سمجھ لیا گیا ہے ان سے قدیم اکابر طریقت کا
دامن بالکل پاک تھا۔

---

৪০. প্রাগুক্ত।

৪১. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا.
এই আয়াত বিদায় হজ্বের সম্মেলনে আরাফাত ময়দানে অবতীর্ণ হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এটি পবিত্র কুরআনের শেষ আয়াত। এরপর বিধি-বিধান সম্পর্কিত আর কোন আয়াত নাযিল হয়নি। এও বলা হয় যে, শুধু উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শনমূলক কয়েকখানি আয়াত এরপর নাযিল হয়েছে। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রসুল (সা.) মাত্র একাশি দিন পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন। কেননা, দশম হিজরীর ৯ জিলহজ তারিখে এ আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং একাদশ হিজরির ১২ রবিউল আওয়াল রসুল (সা.) ওফাত পান।
সুরা-মায়িদা, আয়াত-৩।
মাআরেফুল কোরআন, প্রাগুক্ত, আয়াত ৩-এর তাফসির।

৪২. মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী বিখ্যাত সূফি মতাবলম্বী ছিলেন। তাঁর লিখিত অনেকগুলো পুঁথিপুস্তক দীর্ঘকাল ধরে মুসলমান সমাজে প্রচারিত হয়ে আসছে। লন্ডনের সাময়িক পত্রিকায় তাঁর কুরআন মজিদের ইংরেজি তরজমা ও তাফসিরের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল।
মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, প্রাগুক্ত, নভেম্বর, ১৯৬৫, পৃ. ১৬৪।

www.pathagar.com

পূর্ববর্তী সুফিদের কর্মপদ্ধতি ইসলামি শরিয়ত এবং রসুলুল্লাহ সুন্নাতের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। কালক্রমে যে-সব বিদআতকে তাছাউফের নিদর্শন ধরে নেয়া হয়েছে। তরিকতের প্রধান আলিমগণের দামন তা থেকে সম্পূর্ণ পাক ছিল।[৪৩]

মাওলানা আকরম খাঁ বলেন ঃ[৪৪] নিকলসন ও অন্যান্য পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদের লেখা গ্রন্থের উপর নির্ভরশীল হয়ে যাঁরা ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম জাতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাঁদের অবগতির জন্য এডওয়ার্ড ফেন্দিক নামক জনৈক পাশ্চাত্য পণ্ডিতের একটা মন্তব্য উদ্ধৃত করছি। পুস্তকখানার নাম-[৪৫] اكتفاء القنوع بما هو مطبوع।

এ গ্রন্থে আরবি তথাকথিত সুফিদের অপকর্ম ও অনাচার সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছিল এভাবে :

ومن تسموا فى هذا العصر بالصوفية اكثرهم ليسوا على طريق الصوفية من المتقدمين بل ليسوا على سنن الدين الاسلامى. ٨١ صـ

বর্তমান যুগে সুফি নাম দেওয়া হয় যাহাদিগকে, তাহাদের অধিকাংশই পূর্ববর্তী সুফিদিগের নিয়ম-পদ্ধতির অনুসরণ করেন না বরং এ কথা বলা যায় যে, তাহারা ইসলাম ধর্মের কোনো নিয়ম-নীতিরই অনুসরণ করে না।[৪৬]

বলার অপেক্ষা রাখে না, প্রকৃত সুফিগণ তাঁদের কার্যাবলীর মাধ্যমে ইসলামের মর্মবাণীকে জনসাধারণের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য নিঃসন্দেহে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছিলেন। সুফি নামধারী কোনো কোনো ব্যক্তির অপপ্রচার ও অনাচারের ফলে তৎকালীন মুসলিম সমাজের ধর্মীয় ও নৈতিক অধঃপতনের যে ধস নেমেছিল, তা অদ্যাবধি সমাজের নিম্নস্তর থেকে উঁচুস্তর পর্যন্ত সবাইকে রাহুর ন্যায় গ্রাস করে রেখেছে। ফলশ্রুতিতে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, এমনকি সমাজের বুদ্ধিজীবী বক্তিবর্গ, রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে নিয়োজিত রাষ্ট্রীয় কর্ণধারবৃন্দ পর্যন্ত ইসলামের সেবার নামে কত অনৈসলামিক কার্যকলাপ ও অনাচারে লিপ্ত হয়েছেন, বাংলাদেশসহ বিশ্বের মুসলিমপ্রধান দেশসমূহের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

পির-ফকির ও খন্দকার সমাজ

কিছু-সংখ্যক পির, ফকির, খন্দকার সমাজ ও ভবঘুরে ব্যক্তি মুসলমান সমাজে যেভাবে ইসলামের নামে অনাচার ছড়িয়েছে, তারই ফিরিস্তি বর্ণনা করে বাংলার এক ঐতিহাসিক তাঁর গ্রন্থে লেখেন :

---

৪৩. বক্তব্যটি মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদীর একটি প্রবন্ধের অংশবিশেষ। প্রবন্ধটি সৈয়দ সুলায়মান নদভী 'মাসিক' মাআরেফ পত্রিকায় প্রকাশ করেন। প্রবন্ধের শিরোনাম (تاریخ تصوف کے چند اوراق) 'তাসাউফ-ইতিহাসের কয়েক পাতা'।
মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, প্রাগুক্ত।

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪-৬৫।

৪৫. ৮৯৬ সাল পর্যন্ত কুরআন, তাফসির, হাদিস বিভিন্ন মাযহাবের ফিকহ্ ইত্যাদি যে কোনও দেশে কোনও বিষয়ে আরবি ভাষায় গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছে, তার বিবরণ ও লেখকদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এ পুস্তকে সন্নিবেশিত ও আলোচিত হয়েছে।
প্রাগুক্ত।

৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫।

www.pathagar.com

زان حین بعضی از آوارگان جهان نورد وسیاحان صحرا گرد از فقرا
مساکین اسلام می امدند...... بتدریج سبب آمد شد مسلمانان هم
پیدا شد

অর্থাৎ, সেই সময় কতিপয় ভবঘুরে পর্যটক, ফকির ও মিসকীন মুসলমান (চাটগাঁয়ে) আগমন করে এবং হিন্দুদের মন্দির আর মগদের গীর্জার মোকাবেলায় বিখ্যাত সুলতানুল আরেফিন বায়েজিদ বোস্তামি (র.) ও হযরত শায়েখ আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) প্রমুখের নামে কয়েকটি মিথ্যা কবর ও জিয়ারত কেন্দ্র গড়ে তোলে। অথচ এই বুজর্গ ব্যক্তিগণ কখনও ভারতের দারুল কুফরে আগমন করেন নি। এ সমস্ত কবরের সাহায্যে তারা লোকজনকে সমবেত করার আর নিজেদের জীবিকা নির্বাহের একটি ফন্দি করে নিয়েছিল। তাই পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে মুসলমানদের গমনাগমনের কেন্দ্রে পরিণত হয়।[৪৭]

খন্দকার সমাজের জীবনাচার সম্পর্কে উপরোক্ত ঐতিহাসিক আরও বলেন :

قول کلی درسیرت اکثر خوندکاران حال بانقلاب روزگار نسلا بعد نسل
بتدریج جهل وغرور ونادانی بل بدعت وشرک وبی ایمانی در اکثر
ایشان راه یافته هیچ ..... بغیر ان آن اطعمه خوردن جائز نمیداشتند وهم
چنیں بیهودگی های دیگر می اموختند

খন্দকারদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হলে দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে কোনো সৎগুণ প্রায় শূন্যের কোঠায়। অপরদিকে অহংকার এবং হীনমন্যতার প্রাদুর্ভাব ছিল বেশি। অধিকাংশের মধ্যে বিদাত আর শির্ক এবং বেঈমানী প্রবেশ করতে থাকে, তাদের মোটামুটি পরিচয় হলো, তারা নিজেদের কাঁধে ও মস্তকে কোনো বোঝা উঠায় না, নিজেরা ক্ষেত খামার ও কৃষ্টি কাজ করে না। কাছা দেয় না। এক কথায় পরিশ্রমে তাঁরা ছিল অপারগ। কিন্তু পার্থিব সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, সম্ভোগ করার প্রবল ইচ্ছায় ও প্রবৃত্তির তাড়নায় নানা ধরনের ছল-চাতুরী ও কলা-কৌশলের মাধ্যমে অর্থ

৪৭. মরহুম খান বাহাদুর হামিদুল্লাহ রচিত আহাদিসুল খাওয়ানীন', পৃ. ১৬-১৭। তাঁর উপরোক্ত ইতিহাস মুদ্রিত হয়েছিল ১৮৭১ সালে। সুতরাং আজ হতে ৯৩ বছর পূর্বে স্থানীয় মুসলমান সমাজ দীর্ঘকাল এই রূপ অনৈসলামি আচার-ব্যবহার এবং কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসে পরিবেষ্টিত থাকার পর একজন স্বনামধন্য আলিম এবং আর একজন ধর্মপ্রাণ সূফী সাহেবের সাধনার ফলে তাঁরা ইসলামের সন্ধান লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। খান বাহাদুর ছাহেবের পরবর্তী বিবরণে এ দু'জনকে আমরা যথাক্রমে হাজী, গাজী, আলিম, ফাজেল ও মোজাদ্দেদ মাওলানা এমামুদ্দীনরূপে এবং গাজী, হাজী, পির ও মুর্শেদ সূফি নুর মোহাম্মদরূপে দেখতে পাচ্ছি। মাওলানা আকরম খাঁ এদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, আল্লাহর রহমত সহস্রাধারে বর্ষিত হউক ইহাদের আত্মার প্রতি। এই সাধকগণের সাধনা ও জীবন সংগ্রামের পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হওয়া একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেছি। উপস্থিতির মত আমরা এইটুকু বুঝিয়া স্বস্তি লাভ করিতেছি যে, তাহারা শুধু কেতাব খানার মাওলানা বা হুজরার সূফি ছিলেন না। তাহারা ছিলেন ময়দানের মর্দে মোমেন ও মোজাহেদ।"
মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭-৬৮।

www.pathagar.com

আহরণের পথ বেছে নেয়। বর্তমানে তাদের সাধারণ পেশা হচ্ছে ভিক্ষা-বৃত্তি, জাদুটোনা, অযথা ভিত্তিহীন কাহিনী রচনা করা কুরআন বিক্রয় (অর্থাৎ তাবীজ দেওয়ার ব্যবসা) ও প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ আয় করা। এরা হিংসা, বিদ্বেষ, ঝগড়া-ঝাটিতে লিপ্ত ছিল। মানুষ হিসেবে ছিল এরা অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির। ত্রিপুরা ও রওশন-আবাদ প্রভৃতি এলাকার মানুষগুলো ছিল অতি সরল ও সাধারণ। মূর্খতার মধ্যে ধর্ম-কর্ম তারা বেশ-ভাবেই পালন করতো। কিন্তু এ খন্দকার গোষ্ঠী সেখানে গমন করে সহজ সরল লোকগুলোকে গোমরাহীর অন্ধকারে নিমজ্জিত করে তাদের বিশ্বাসকে বিনষ্ট করে দেয়।

তারা সাধারণ মানুষগুলোর অন্তরে এমন এক ভয়ের উদ্রেক করে যে, তারা (খন্দকার) ব্যতীত তাদের সমস্ত কাজই নিষ্ফল ও ব্যর্থ। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে, খন্দকার ছাড়া কারও হাতে কোনো জীব-জানোয়ার জবাই করা নাজায়েয। কারণ এ মহৎ কাজটির একমাত্র তারাই হকদার, সহজ-সরল ও মূর্খ জনসাধারণকে ধোঁকা দেওয়ার নূতন কৌশল গ্রহণ করে। যেমন খঞ্জর অথবা ছুরিতে ফুঁক দিয়ে সে অস্ত্র তাহাদিগকে প্রদান করতো। সরল লোকগুলো সে খঞ্জর বা ছুরি ছাড়া অন্য অস্ত্রে কখনও জবাই করা জায়েয মনে করতো না। এমন কি তারা ধর্মীয় মৌলিক কাজেও ধোঁকা দিতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। কোনো কোনো খন্দকার তাদের অনুপস্থিতিতে নামাজের জামায়াত, ইমামত, খোৎবা দেওয়া, ঈদের নামায পড়া পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিল। তারা সাধারণ মানুষগুলোকে প্রতারণা করার জন্য এক অভিনব কায়দা বের করে। যেমন তারা জাহেল মুরীদদের জন্য বাঁশের চোঙ্গায় ফুঁক দিয়ে উহার মুখ বন্ধ করে অশিক্ষিত মুরীদদিগের হাতে দিয়ে নির্দেশ দিত যে, পীরের অনুপস্থিতকালে (ঠেকাবশতঃ) বিভিন্ন আবশ্যকীয় নির্দিষ্ট দিবসের ফাতেহা প্রভৃতির আহারাদিতে উক্ত চোঙ্গার মুখ খুলে দিয়ে খাদ্য-দ্রব্যের উপর ঘুরাতে হবে। অন্যথায় সে খানা খাওয়া যায়েজ হবে না। এছাড়াও তারা নানা ধরনের বেহুদা রুসম-রেওয়াজের প্রচলন করেছিল।[৪৮]

মৃত্যুর পর বিভিন্ন দিবসে জিয়াফতের রুসম

মাওলানা আকরম খাঁ কঠোরভাবে শিরক-বিদআতের বিরুদ্ধে কলম ধারণ করেন। মৃত্যুর পর জিয়াফত আমাদের সমাজের প্রচলিত রীতি। এ সম্পর্কে মাওলানা বলেন :

পিতা-মাতার মৃত্যু হলে, তাঁদের রূহের বা আত্মার কল্যাণের জন্য বিভিন্ন অবধারিত তারিখে খানা, মেহমানী বা তাআমদারীর যে প্রথা মুছলিম সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে আল্লাহর কেতাবে অথবা তাঁহার রসুলের কোনো প্রামাণ্য হাদীছে ঐরূপ তাআমদারী করার কোনো প্রমাণ মওজুদ আছে কিনা? যদি না থাকে এবং তাআমদারীর কাজগুলি যদি অন্ততঃ মৃত বক্তির রূহের জন্য ছওয়াব হাসেলের উপলক্ষ্য বলিয়া আল্লাহর হুজুরের গ্রহণযোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, এছলাম দ্বীন পূর্ণ নহে। কারণ তাহাতে মোর্দারের খানার ন্যায় এত বড় একটা পুণ্য কার্য্য সম্বন্ধে কোনো ব্যবস্থা করা হয় নাই![৪৯]

---

৪৮. মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬-৬৭।
৪৯. মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯।

www.pathagar.com

উপমহাদেশের আলিমগণের অনেকেই এ ধরনের প্রথাকে 'নিকৃষ্টতম' শ্রেণির বিদআত বলে প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়েছেন। কেউ কেউ এটাকে পৌত্তলিক হিন্দুদের আচরিত কদাচারের অন্ধ অনুকরণ বলেও আখ্যায়িত করেছেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র.) তাঁর অছিয়ত নামায় বলেন :[৫০]

از بدعات شیعه مامردمان اسراف است درماتم ها وسوم وچهلم
ششماهی و فاتحه های سالینه و این همه را در عرب اول وجود نبود
مصلحت آن است که غیر تعزیه وارثاں میت تاسه روز وطعام
اینشاں یک شبا روزسے نه باشد.

শাহ ছাহেবের উপরোক্ত বক্তব্যে দেখা যাচ্ছে-

১. মাতম, ছিয়াম চেহলাম (তৃতীয় ও চল্লিশ দিনের) ষান্মাসিক ও বার্ষিক জিয়াফত খাওয়ানোর ব্যবস্থা নিকৃতম বিদআত।[৫১]
২. উপরোক্ত প্রথাগুলো অপব্যয়মাত্র;
৩. ইসলামের প্রাথমিক যুগে এ ধরনের কোনো অস্তিত্বই ছিল না;
৪. তিনদিন পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশদের সাথে সহানুভূতি প্রদর্শন ও খানাপিনা তৈরি করে মৃত ব্যক্তির বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া।[৫২]

হাদিসগ্রন্থ ইবনে-মাজার প্রান্তটীকাকার ইমাম সিন্ধী মাদানীর মতে :

ফিকাহর আলিমগণের অনেকেই বলেছেন যে, মৃতব্যক্তির পরিজনদের নিকট হতে জিয়াফত (খাদ্যদ্রব্য) আদায় করা একটা না মাকুল কাজ। কারণ জিয়াফত হয় খুশীর ব্যাপার, দুঃখের সময় এর প্রচলন হতে পারে না।[৫৩]

ইমাম ইবনে হুমাম ফতহুল-কাদীর গ্রন্থে লিখেছেন :

মৃত ব্যক্তির পরিজনবর্গের নিকট হতে জিয়াফত গ্রহণ করা মাকরূহ। কারণ, শরীয়তে জিয়াফত অনুমোদিত হয়েছে আনন্দজনক মুহূর্তে। দুঃখজনক মুহূর্তে নহে। ইহা হচ্ছে অতি নিন্দনীয় বিদআত।[৫৪]

ফতোয়ায়ে আলমগিরীতে বলা হয়েছে :

قرأة الكافرون الخـ مع الجمع مكروهة لانها بدعة. لم ينقل ذالك عن الصحابة

অর্থাৎ, মৃত ব্যক্তিকে ছাওয়াব পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে জনসমাবেশে 'কুলইয়া' সুরা শেষ পর্যন্ত পাঠ করা মাকরূহ। কারণ, ছাহাবায়ে কিরাম হতে এরূপ প্রমাণিত হয় নি।[৫৫]

---

৫০. প্রাগুক্ত।
৫১. প্রাগুক্ত।
৫২. মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০।
৫৩. প্রাগুক্ত।
৫৪. প্রাগুক্ত।
৫৫. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

হানাফি মাযহাবের নির্ভরযোগ্য ফিকহ্‌গ্রন্থ নেছাবুল এহ্‌তিছাবেও বলা হয়েছে যে, 'তাবেয়ীগণের থেকেও এরূপ বর্ণিত হয় নি।[৫৬] ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল 'তাযকিরাহ কুরতুবী' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন :

> মৃত ব্যক্তির গৃহে যে খানা তৈরি হয় এবং নারি-পুরুষ সকলে ভক্ষণ করে, ইহা হচ্ছে এমন এক সমাজের রীতি, ইসলাম ধর্মে যার কোনো অংশ নেই।[৫৭]

মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইসহাক মুহাদ্দিস দেহলভী-এর সাথে একমত পোষণ করলেও তিনি مائه مسائل গ্রন্থে বলেন :

> লোকেরা মনে করে যে, ঐ সব দিনে মৃত ব্যক্তিদের রূহ সেখানে উপস্থিত হয়। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ প্রমাণহীন কথামাত্র।[৫৮]

মাওলানা মুসলিম সমাজের এসব প্রথার চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন। তাঁর মতে, এসব রীতিনীতি নিছক হিন্দুদের অনুসরণ। প্রমাণস্বরূপ তিনি উপস্থাপন করেন :

> হিন্দু সমাজের স্বীকৃত বরাহপুরাণে এসব প্রথার প্রথম সন্ধান পাওয়া যায়। এই সমাজ মৃত পিতৃবর্গকে প্রেত হওয়ার দুর্ভোগ হতে মুক্তি দেওয়ার ও তাহার উৎপাত হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত করতে হয়।[৫৯]

মাওলানা তাঁর *মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস* গ্রন্থের টীকায় প্রাচীন হিন্দি-উর্দু অভিধান, 'ফার্হাঙ্গে আছাফীয়া'র উদ্ধৃতিও উল্লেখ করেছেন :

উপরোক্ত উৎপাতের বিষয় বেদআতী মুসলমানদিগের আচার-ব্যবহারে সমানভাবে প্রকট হইয়া আছে। তাহারাও বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে, মানুষ মরিয়া যাওয়ার পর আরওয়াহ' নিজের স্বজনের মধ্যে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে এবং নিজের আকাঙ্ক্ষিত বস্তুপ্রাপ্ত হইবার জন্য চারিদিকে ডামাডোল করিয়া বেড়ায়। অধিকন্তু সময় সময় নিজের পরিত্যক্ত পরিজনের উপর নির্যাতন চালাইতেও কুণ্ঠিত হয় না।[৬০]

মাওলানা বলেন :

আমাদের মুসলিম সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি যেমন বৃহস্পতিবার দিনগত রাতে এবং শবে বরাতে মুসলমানগণ নিজেদের পরলোকগত আত্মীয়স্বজনের পরিতুষ্টির জন্য নানাপ্রকার ভোগের আয়োজন করে থাকেন। শবে বরাতের হালওয়া-রুটি ইহার প্রধানতম উপকরণ।[৬১]

হিন্দু শাস্ত্রের বিধানানুসারে ব্রাহ্মণকে এগার দিন, ক্ষত্রিয়কে তের দিন, বৈশ্যকে ষোলদিন এবং শূদ্রকে একত্রিশ দিনে এ ধরনের শ্রাদ্ধপ্রথা পালন করতে হয়। এছাড়াও হিন্দু শাস্ত্রানুসারে মাসিক ও বাৎসরিক মিলে ষোল প্রকার শ্রাদ্ধের নির্দেশও তাদের রয়েছে।

---

৫৬. প্রাগুক্ত।
৫৭. প্রাগুক্ত।
৫৮. প্রাগুক্ত।
৫৯. প্রাগুক্ত।
৬০. প্রাগুক্ত (টীকা দ্রঃ)।
৬১. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

মাওলানার মতে :

> এক শ্রেণির মুসলমানও ১২ দিনের শ্রাদ্ধ বা ইয়াজদাহম একত্রিশ দিনের সিয়ম سیوم বা ৩০ দিনের শ্রাদ্ধ, এবং ষান্মাসিক ششماهی পালন করতে শুরু করেছেন। এ ছাড়াও জন্ম দিবস, স্মৃতি দিবস উপলক্ষেও তারা শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে মৃতব্যক্তির চল্লিশ দিনের 'চেহলাম' (چهلم) পালনের প্রচলনের কথাও তিনি উল্লেখ করেন।[৬২]

মাওলানা আকরম খাঁ বলেন, আমাদের মধ্যে যাঁরা এ ধরনের প্রথা পালন করেন, তাঁরা বলেন যে, মৃত পিতৃবর্গের রূহে ছাওয়াব পৌঁছানোর জন্য এবং তাদের মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে আমরা এ অনুষ্ঠানসমূহ পালন করে থাকি।

হিন্দু শাস্ত্র মতে- মানব মৃত্যুমুখে পতিত হলে প্রেতভাবাপন্ন হয়ে পড়ে, পরে তাঁর ওয়ারিশগণ শ্রাদ্ধক্রিয়ার অনুষ্ঠান করলে মৃত ব্যক্তির আত্মা এর পুণ্যফলে প্রেতলোক হতে মুক্তি লাভ করে।[৬৩]

আমাদের মুসলিম সমাজও প্রায় একই রূপ সংস্কারের বশবর্তী হয়ে বলে থাকে, আমাদের মৃত পিতা-মাতার আত্মা এই ছাওয়াবের বরকতে আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাত লাভ করতে পারেন। তাই, আমরা ইছালে ছাওয়াব ও উপরে বর্ণিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি পালন করি। এ ব্যাপারে মাওলানা নিম্নরূপ প্রশ্ন রাখেন :

> আমরা যে ছাওয়াবের আশা পোষণ করে আসছি এ ছাওয়াব লাভের আশ্বাস আমরা কোথা হতে পেলাম। আল্লাহর কিতাব হতে না রসুল (স.)-এর কোনো হাদিস থেকে? পূর্বেই বলা হয়েছে, পবিত্র কুরআন হাদিসের কোথাও এই আশ্বাসের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এ ধরনের প্রথার কোনো অস্তিত্বই ছিল না। পরবর্তী যুগের আলিম ও মুফতিগণ সকলেই এ ধরনের কু-প্রথার নিন্দাবাদ জ্ঞাপন করেছেন। এবং এটাকে একটা নিকৃষ্টতম বিদআত বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৬৪]

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াতের মতানুযায়ী :

> কোনো ব্যক্তি আল্লাহকে ডাকলে আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করেন।[৬৫]
>
> ادعونی استجب لکم রসুল (স.)-এর বাণী : 'দুআ হলো খাঁটি ইবাদত। তিনি আরও বলছেন : তিন বক্তির দুআ কবুল হয়। ...[৬৬]

স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ ছিলেন সমসাময়িক ইসলামি চিন্তাবিদ। বিশিষ্ট গবেষক ড. আবদুল্লাহর মতে, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ স্যার সৈয়দের চিন্তাধারায় বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন। স্যার সৈয়দ এ সম্পর্কে বলেন :

---

৬২. মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১।
৬৩. প্রাগুক্ত।
৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১।
৬৫. আল-কুরআন, সুরা বাকারা, আয়াত-১৮৬।
৬৬. হাদীস। তিরমিজি।
ثلاث دعواة مستجاباة لا شك فیهن دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم.

www.pathagar.com

আন্তরিকভাবে দোয়া করলে তা আল্লাহর নিকট কবুল হয়। কিন্তু কবুল হওয়ার মানে উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়া নয়। উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য আল্লাহ কতগুলো প্রাকৃতিক কারণ নির্ধারণ করে রেখেছেন। সেগুলো পাওয়া গেলেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে থাকে।[৬৭]

দোয়া কবুল হওয়ার মানে- মানুষের মনে সেই ধৈর্য ও সান্ত্বনা সৃষ্টি হওয়া, যার আপদ-বিপদ ও অকৃতকার্যতার সময় মানসিক অস্থিরতা ও দুঃখ-কষ্টকে লাঘব করে। রসুলে করিম (স.) বলেন :

দুআ হলো ইবাদতের মূল।

তিনি আরো বলেছেন :

আল্লাহ বলেন, فاذكرونى اذكركم الاية আমাকে ডাক, আমি তোমাদের দুআ কবুল করবো। অর্থাৎ, আমার ইবাদত কর, আমি তোমাদের ইবাদত কবুল করবো'।

সুতরাং বুঝা গেলো যে, আল্লাহ ইবাদত কবুল করার ওয়াদা করেছেন, কিন্তু তাঁর দিক থেকে বান্দার উদ্দেশ্য পূর্ণ করার কোনো ওয়াদা নেই। উদ্দেশ্য হাসিলের উপকরণসমূহ যদি বিদ্যমান থাকে এবং দুআ শেষে যদি কারো মনস্কাম পূর্ণ হয় তবে বলতে হবে যে, এটা সন্নিপাত এবং গতানুগতিক ব্যাপার।[৬৮]

স্যার সৈয়দের দুআ কবুলের এই ব্যাখ্যাটি এবং এতদসংক্রান্ত মাওলানা আকরম খাঁ'র উপরের দীর্ঘ আলোচনার বিষয়বস্তু মেনে নিলে ইসলামের আধ্যাত্মিকতা ক্ষুণ্ন হয় এবং মানুষের অনিশ্চয়তা ও জড়বাদের দিকে ধাবিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। উপরোক্ত ব্যাখ্যায় আল্লাহর উপর ভরসা করার পথে অন্তরায় সৃষ্টিরও যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। সাথে সাথে এও স্বীকার করতে হবে যে, মাওলানা আকরম খাঁ অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে মুসলিম সমাজে প্রচলিত বিদআতসমূহকে তুলে ধরেছেন যার প্রয়োজন ছিল।

ইসলামে কবর বা মাযার পূজা নিষিদ্ধ

কবর পূজা মানে কোনো কল্যাণ লাভ বা অনিষ্ট হতে রক্ষার জন্য কবরস্থ ব্যক্তির কাছে প্রার্থনা করা। সুখ-দুঃখের আশায় নযর-নিয়ায দেয়া, মান্নত মানা ইতাদি। এছাড়াও কবর পূজার কয়েকটি উপাদান রয়েছে। যেমন- কবর পাকা করা, কবরের উপর ঘর করা, কুব্বা প্রস্তুত করা, কবরের উপর আলোবাতি জ্বালান, কবরকে সিজদার স্থানে পরিণত করা ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, উপমহাদেশে দু'ধরনের কবরের অস্তিত্ব পাওয়া যায়।

এক, জীবিত ব্যক্তির ওয়ারিশ ও আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী ইত্যাদির কবর;

দুই, পির, মাশায়েখ, ওলি-দরবেশ, বুজুর্গ ব্যক্তিবর্গের কবর।

---

৬৭. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ,, স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ'র ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা, ঢাকা, প্রাগুক্ত, জুন ১৯৮২, পৃ. ৫৩৩।

৬৮. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ,, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

প্রথমটির অস্তিত্ব সম্পর্কে ওয়ারিশদের সবাই ওয়াকিফহাল। দ্বিতীয় শ্রেণির কবরের মধ্যে কারো কারো কবর সম্পর্কে সঠিক তথ্য থাকলেও বেশির ভাগ কবরের সঠিক সন-তারিখ ও তথ্য অজ্ঞাত। কবর আছে, অথচ যাকে দাফন করা হলো তার অস্তিত্বই নেই। এমনও শোনা যায়, বাংলাদেশের অমুক অঞ্চলে অমুক বুজর্গের কবর (মাযার) বিদ্যমান। অথচ ইতিহাস সাক্ষ্য বহন করে যে, বাংলাদেশ তো দূরের কথা, পাক-ভারতের কোনো অঞ্চলেই তিনি কস্মিনকালেও কদম রাখেননি। এর চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কি হতে পারে? স্বয়ং রসুল (স.) এ ধরনের কবর বানানই নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এ ধরনের কবর জিয়ারতকারীদের উপরও তিনি অভিসম্পাত করেছেন।[৬৯]

মাওলানা আকরম খাঁ বলেন:

> কবর পাকা করা, কবরের উপর কোনো অট্টালিকা বা এমারত তৈরি করা, কবরে নামাজ পড়া, ছিজদা করা এবং নযর নায়ায ও মানত করা সম্পূর্ণভাবে হারাম।[৭০]

এ সম্পর্কে তিনি কিছু হাদিসের উদ্ধৃতিও পেশ করে বলেন:

ইমাম মুসলিম, তিরমিযি, নাসায়ী ও ইবনে মাযায় আছে, হযরত জাবির -ইবন আবদুল্লাহ বলেছেন :

عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يجصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه.

অর্থাৎ, রসুল (স.) কবর পাকা করা, কবরের উপর স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা এবং কবরের উপর উপবেশন করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।[৭১]

তিরমিজি শরীফে এও বর্ণিত হয়েছে-

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تجصص القبور وان يكتب عليها وان يبنى عليها وان توطا.

অর্থাৎ রসুল (স.) কবর পাকা করতে, উহাতে কিছু (কবরস্থ ব্যক্তির নাম ইত্যাদি) লিখতে, কবরের উপর ঘর নির্মাণ করতে এবং উহাকে পদদলিত করতে নিষেধ করেছেন।[৭২]

উপরোক্ত হাদিসে সুস্পভাবে প্রমাণিত হয় যে, কবর পাকা করা, ঘর বানানো সম্পূর্ণরূপে হারাম-নিষিদ্ধ।

আবু দাউদ, তিরমিজি এবং নাসায়ী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাসের রিওয়ায়াত এসেছে এভাবে :

অর্থাৎ, রসুল (স.) শরিয়ত বিগর্হিতভাবে কবর জিয়ারত গমনকারিনি স্ত্রীলোকদের প্রতি এবং যারা কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করে আর কবরে বাতি জ্বালায় তাদের প্রতি অভিসম্পাত (লা'নত) করেছেন।[৭৩]

এমনকি রসুল (স.) ইনতেকালের পূর্ব মুহূর্তে অছিয়ত করেছেন :

---

৬৯. মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২।
৭০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩।
৭১. প্রাগুক্ত।
৭২. প্রাগুক্ত।
৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪।

www.pathagar.com

'সাবধান ! তোমরা কবরকে মসজিদে পরিণত করবে না।'[৭৪]

ইমাম মুসলিম হযরত আয়িশা (রা.) বর্ণিত হাদিস বর্ণনা করেছেন। রসুল (স.) তাঁর অন্তিম সময়ে ইরশাদ করেছেন :

আল্লাহর গযব বর্ষিত হোক ইয়াহুদ এবং নাছারাদের উপর, তারা তাদের নবিদের কবরগুলোকে মসজিদে (সিজদার স্থান) পরিণত করেছে।[৭৫]

সহিহ মুসলিম শরিফে আবদুল্লাহ ইবন হারিছ নজরানী বর্ণনা করছেন, রসুল (স.) ইরশাদ করেছেন :

الاوان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبورا انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد انى انهاكم عن ذلك.

দেখ ! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা (ইয়াহুদ ও নাছারা) তাদের নবি ও সত্য ব্যক্তিদের কবরগুলোকে মসজিদ করে নিয়েছিল। অতএব সাবধান ! তোমরা (হে মুসলিম সমাজ) কবরকে মসজিদে পরিণত করবে না, বস্তুত আমি তোমাদিগকে উহা হইতে নিষেধ করতেছি।[৭৬]

উল্লিখিত হাদিস ছাড়াও সহিহ বুখারি ও মুয়াত্তা গ্রন্থে এইমর্মে হাদিস বর্ণিত হয়েছে। এ সমস্ত হাদিসের মর্মানুযায়ী প্রমাণিত হয় :

ক. কবরের উপর উদ্দেশ্যমূলকভাবে কোনোপ্রকার ঘর, গম্বুজ, সৌধ নির্মাণ করা ইসলামি শরী'য়তে হারাম বা নিষিদ্ধ।

খ. কবরে মসজিদ বানান, অথবা কবরের দিকে সিজদা করা সম্পূর্ণ অবৈধ।

গ. কবরে বাতি, চেরাগ, আগরবাতি, মোমবাতি প্রভৃতি জ্বালান শরী'য়ত নিষিদ্ধ কাজ।

ইমাম মুসলিম তাবেয়ী আবুল হাইয়াজ আসাদির সূত্রে বর্ণনা করেন :

হযরত আলি আমাকে বললেন, আমি তোমাকে সেই কাজে নিযুক্ত করছি, যে কাজে রসুলুল্লাহ (স.) আমাকে নিযুক্ত করেছিলেন। অর্থাৎ যেখানেই কোনো প্রতিমা দেখবে তা নিশ্চিহ্ন করবে এবং যেখানেই কোনো উঁচু কবর দেখবে তা ভেঙ্গে সমান করে দেবে।[৭৭]

ইমাম আবু হানীফা (র.) কবরের উপর ঘর, কুব্বা এবং গম্বুজ বানাতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন : এগুলো হারাম। যেমন-

روى عن ابى حنيفة رحمة الله تعالى انه قال لا يجصص القبر ولا يطين ولا يرفع عليه بناء وسقط.

কবর পাকা করা, মাটির দ্বারা লেপন এবং কবরের উপর ঘর আর তাঁবু যেন প্রতিষ্ঠা করা না হয়।[৭৮]

---

৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪।
৭৫. প্রাগুক্ত।
৭৬. প্রাগুক্ত।
৭৭. মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, প্রাগুক্ত, ঢাকা, ১৯৬৫, পৃ. ১৭৫।
৭৮. ফতওয়ায়ে কাজীখান, পৃ. ১৭৮।

www.pathagar.com

ইমাম আবু হানীফা (র.) আরও বলেন :

পাকা ইট এবং লাকড়ি কবরে লাগাবে না, কবরে মাটি ছাড়া অপর মাটি বৃদ্ধি করে কবরকে উঁচু করা মাকরূহ। কবরকে (উটের) ঝোঁটি স্বরূপ এক বিঘত পরিমাণ উঁচু করবে। কিন্তু চতুষ্কোণ এবং পাকা করবে না। কবরের উপর কোনো প্রকার সৌধ নির্মাণও মাকরূহ- হারাম।[৭৯]

হানাফি মাযহাবের বিখ্যাত আলিম আল্লামা কাজি ইবরাহিম তাঁর 'মাজালিসুল আবরা' গ্রন্থে লিখেছেন :

কবরের উপর নির্মিত মসজিদগুলো সম্বন্ধে শরিয়তের নির্দেশ এই যে, উহা ভেঙ্গে ভূমির সমপর্যায় করা উচিত। অনুরূপভাবে কবরের উপর যে সমস্ত কুব্বা নির্মিত হয়েছে তাহাও ভেঙ্গে ফেলা ওয়াজিব। কারণ উহা আল্লাহর রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে নির্মাণ করা হয়েছে, আর যাহা রসুলুল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করে নির্মাণ করা হয়েছে তা ভেঙ্গে ফেলা মসজিদে 'যেরার'[৮০] অপেক্ষা সমধিক আবশ্যক। বস্তুত: রসুল (স.) কবরের উপর মাসজিদ অথবা অনান্য গৃহ নির্মাণকারীদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন।[৮১]

আল্লামা সাইয়্যেদ মাহমুদ আলুসি তাঁর তাফসিরে লিখেছেন :

কবরের কাছে নামাজ পড়া, কবরকে মসজিদে পরিণত করা, অথবা কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করা গুরুতর হারাম এবং শির্কের উপকরণ। যথাশীঘ্র তাহা ভেঙ্গে ফেলা ওয়াজিব, কেননা তাহা মসজিদে যেরার অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকারক; বস্তুত: উহা রসুলুল্লাহর না-ফরমানির উপর প্রতিষ্ঠিত। রসুল (স.) উহা নিষেধ করেছেন। এবং উচ্চ কবরগুলোকে ভেঙ্গে দেয়ার হুকুম প্রদান করেছেন। অনুরূপভাবে কবরে যে ফানুস অথবা প্রদীপ জ্বালান হয়ে থাকে তাহা অপসারণ করাও ওয়াজিব। তাহাতে কিছু ওয়াকফ করা বা কিছু মানত করাও জায়েয নহে।[৮২]

মাওলানা আকরম খাঁ উপরোক্ত হাদিসসমূহ ও ইমামগণের মতামত উদ্ধৃত করার পর পবিত্র কুরআনের সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে কবরপূজার অসারতা প্রমাণ করেন। আল্লাহ তা'য়ালার ঘোষণা :

يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.

---

৭৯. ফতওয়ায়ে আলমগিরী, পৃ. ১৭৬।

৮০. মদিনার মুনাফিকগোষ্ঠী বিভিন্ন সময় জামাতে উপস্থিত হতে বিলম্ব করলে, বা উপস্থিত না হবার কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলতো, হুজুর! মসজিদে নববী এবং কোবা মসজিদ আমাদের থেকে অনেক দূরে বিধায় আমাদের জামাতে হাজির হতে কষ্ট হয়। অনুগ্রহপূর্বক আমাদেরকে অনুমতি দিলে আমরা আমাদের এলাকায় একখানা মসজিদ তৈরি করে যথাসময়ে ইবাদাতে হাজির হতাম। রসুল (সা.) তাবুক যুদ্ধে যাবার পূর্বে তাদেরকে মসজিদ তৈরির অনুমতি দেন। অভিযান থেকে ফেরার পথে তাদের পরিকল্পিত 'যেরার' মসজিদ ধ্বংস করার ঘোষণা এলে রসুল তা-ই করার নির্দেশ দেন।

রহমান মুজনিব, তাবুক অভিযান, বিশ্বের প্রথম ঐতিহাসিক লংমার্চ, কাওমী ডাইজেস্ট, জুন, ১৯৮৫, লাহোর, পাকিস্তান।

৮১. কাজি ইবরাহীম, মাজালিসুল আবরার, সন অনুঃ, পৃ. ১২৮-২৯।

৮২. আল্লামা সৈয়দ মাহমুদ আলূসী, রুহুল মায়ানী (৫), তাফছিরে সুরা কাহাফ

www.pathagar.com

হে মোমেনগণ! নিশ্চয়ই যাবতীয় মাদকদ্রব্য, সকল প্রকারের জুয়া এবং সমস্ত 'স্থান' (আল্লাহ ব্যতীত যা পূজিত হয়ে থাকে) এবং আজলাম[৮৩] অতি মারাত্মক শয়তানি কাণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নহে, অতএব বর্জন কর এই জঘন্যতাকে যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।[৮৪]

মাওলানার মতে, আয়াতে উল্লেখিত আনছাব'[৮৫] শব্দের অর্থ হচ্ছে সে সমস্ত যাবতীয় বস্তু, আল্লাহ ব্যতীত যার পূজা হয়ে থাকে। সুতরাং কবরে নির্মিত ও পূজিত সমুদয় বস্তু তার মধ্যে গণ্য হয়ে অপবিত্র-নাজাস বস্তুতে পরিণত হয়। মুসলমানকে উক্ত 'নাজাস' হতে দূরে থাকার জন্য পবিত্র কুরআনে নির্দেশ করা হয়েছে-

فاجتنبوا الرجس তোমরা অপবিত্র বস্তু থেকে বেঁচে থাক।[৮৬]

অর্থাৎ, অপবিত্র বস্তুর নিকটবর্তী হবে না।

ইমাম শাফেয়ি (র.) বলেছেন- মক্কার সমস্ত ইমামকে আমি দেখেছি তারা কবরের উপর নির্ম্মিত গোম্বজ ও পাকা ঘর প্রভৃতি ভেঙ্গে ফেলতে নির্দেশ দিতেন।[৮৭]

অনুরূপ ফতওয়ায়ে কাজীখান, বাজ্জাজীয়া, কানজুদ্দাকায়েক এবং এর ভাষ্য জয়লয়ী, বাহরুররায়েক, হিদায়া প্রভৃতি ফিকহ্ গ্রন্থে হানাফি, শাফেয়ি এবং বিভিন্ন মাযহাবের বিশিষ্ট আলিমদের ফতওয়া দ্বারা কবর পাকা করা, সৌধ নির্মাণ করা হারাম প্রমাণিত হয়েছে এবং এগুলো ভেঙ্গে ফেলতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[৮৮]

আল্লামা ইবনে হাজর মক্কি শাফেয়ির মতে:

সকল মতের সমস্ত আলিম সমবেতভাবে ফতওয়া দিয়েছেন যে, মিশর-প্রান্তে যে সমস্ত গোম্বদ, কুব্বা প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়েছে তাহা ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ করা উচিত। এমনকি ইমাম শাফেয়ির কবরের উপর যে কুব্বা জনৈক সম্রাট বানিয়েছেন তাহাও ভেঙ্গে ফেলার ফতওয়া তারা দিয়েছেন। প্রত্যেকের জন্যই তা ভেঙ্গে ফেলা ওয়াজিব।[৮৯]

মাওলানা আকরম খাঁ দীর্ঘ আলোচনার পর দুঃখ করে মুসলিম সমাজের অধঃপতনের কথা তুলে ধরেছেন এভাবে :

পরিতাপের বিষয়, বর্তমানে এক শ্রেণির লোক মিথ্যা স্বপ্নের আশ্রয় নিয়ে নিজেদের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার মানসে যত্রতত্র নিত্যনূতন কবর আবিষ্কার করছে এবং ইহা

---

৮৩. জুয়া খেলার জন্য নির্দিষ্ট তীর।
মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, প্রাগুক্ত।

৮৪. আল্ কুরআন, সুরা মায়িদা, আয়াত-৯০।

৮৫. কাজি ইবরাহিম তাঁর 'মাজালিসুল আবরার' গ্রন্থে লিখেছেন, আনছাব' বলতে সে সব স্থান ও বস্তুকে বোঝায়, যেখানে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর পূজা করা হয়। বৃক্ষ, প্রস্তর অথবা কবর বা অন্য যে কোন বস্তু-সবই এর অন্তর্ভুক্ত।
মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, প্রাগুক্ত।

৮৬. আল-কুরআন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯।

৮৭. মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭।

৮৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬।

৮৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮।

www.pathagar.com

> ক্রমশ বেড়েই চলছে। কবর পূজা প্রভৃতি শির্কের কলুষ কালিমায় আজ মুসলিম সমাজের সামাজিক জীবন কলুষিত হয়ে ওঠেছে। আরও অধিক দুঃখের বিষয় এই যে, এ শির্ক ও অনাচারের অনুভূতিও মুসলমান সমাজ হারাতে বসেছে। শরীয়তের প্রকৃত নির্দেশ এবং আল্লাহ ও রসুলের বাস্তব হুকুম কি তাহা মুসলমান সমাজের সম্মুখে বিস্তারিতভাবে উপস্থিত করার জন্য আমরা পবিত্র কুরআন, হাদিস, ফিকাহ এবং ইমামগণের উক্তি দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত করতে চেষ্টা করছি যে, কবর পাকা করা, কবরের উপর কোনো অট্টালিকা বা ইমারত নির্ম্মাণ করা, কবরে নামাজপড়া সিজদা করা এবং নযর-নায়ায ও মানত করা সম্পূর্ণভাবে হারাম। মুসলমান সমাজকে ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে আমাদের আলোচিত দলীলগুলো বিচার করে শির্ক ও বিদআতের ন্যায় জঘন্যতম পাপ হতে আত্মরক্ষা করার জন্য অনুরোধ করছি।[৯০]

রসুলুল্লাহ (স.)-ও কবর পূজার বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ার-বাণী উচ্চারণ করেছেন। ইন্তেকালের মাত্র পাঁচ দিন পূর্বে অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায়ও সমবেত সাহাবায়ে কিরামকে সম্বোধন করে বলেন :

> তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহ তাদের পরলোকগত নবি ও মহান ব্যক্তিদের কবরগুলোকে উপাসনার মন্দিরে পরিণত করেছে। সাবধান ! তোমরা এ ধরনের মহাপাপে লিপ্ত হবে না। খ্রিষ্টান ও ইয়াহুদীগণ এই পাপে অভিশপ্ত হয়েছে। দেখ, আমি তোমাদিগকে নিষেধ করছি, আমি আমার দায়-দায়িত্ব সমাধা করে যাচ্ছি। আমি তোমাদিগকে স্পষ্টাক্ষরে নিষেধ করে যাচ্ছি। সাবধান ! আমার কবরকে যেন তোমরা 'সিজদাগাহ' বানিয়ে নিও না। আমার এ অনুরোধ অমান্য করলে তজ্জন্য তোমরাই আল্লাহর নিকট দায়ী হবে। হে আল্লাহ ! আমার কবরকে পূজাস্থলে পরিণত করতে দিও না।[৯১]

পৃথিবীতে যতপ্রকার নরপূজা, পৌত্তলিকতা ও শিরক অনুষ্ঠিত হচ্ছে তার মূল কারণ অনুসন্ধানে প্রমাণিত হয়, প্রথমত মানুষ তাদের পির, ফকির ও মুর্শিদের কবর, চিত্র, প্রতিমূর্তি বা অন্যান্য স্মৃতিচিহ্নের প্রতি প্রথম প্রথম ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে থাকে, পরে তা অন্ধভক্তিতে পরিণত হয়ে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গের কোনো দোষ-ত্রুটি তাদের চোখে পড়ে না।

কালক্রমে মানুষ এসব মহামানবকে, অতি-মানবরূপে গ্রহণ করে নানা ধরনের অনৈসলামিক কার্যকলাপ ইসলামের নামে চালিয়ে দেয়। রসুল (স.) এ জন্যেই তাঁর উম্মতকে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও সতর্ক করে বলেছেন :

> কবর পাকা করবে না, তাতে গম্বুজ বানাবে না, এমনকি মাটির কবরও অধিক উঁচু করবে না। কবরে প্রদীপ জ্বালান এবং তার উপর নামায পড়াও এই জন্য নিষিদ্ধ।[৯২]

---

৯০. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, প্রাগুক্ত, ১৯৬৫, পৃ. ১৮০।
৯১. বিদায় হজ্জেও তিনি অনুরূপ বক্তব্য দিয়েছেন।
মোস্তফা চরিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬৩।
৯২. মোস্তফা চরিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬৪।

www.pathagar.com

ইসলামের দৃষ্টিতে সুদি লেনদেন

মানবজাতির জন্য 'সুদ' বড় সমস্যা। ইসলাম সুদকে হারাম করেছে। পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে: احل الله البيع وحرم الربوا আল্লাহ ব্যবসাকে করেছেন হালাল আর সুদকে হারাম।[৯৩]

অন্যত্র বলা হয়েছে আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং সদকাকে বৃদ্ধি দান করেন।[৯৪]

সুদের বিলোপ সাধন করে মানব জীবনের অর্থনৈতিক বিষয়াবলীকে ইসলাম কিভাবে পরিচালনা করতে চায়? তার বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। সুদ যে অবৈধ, এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের সাত জায়গায় বলা হয়েছে এবং এতদসংক্রান্ত চল্লিশটিরও বেশি হাদিস বর্ণিত হয়েছে।[৯৫]

সুদের আলোচনার প্রথমে 'রিবা'[৯৬] শব্দটির ব্যাখ্যা প্রয়োজন। কুরআনে ঘোষিত এ সুদ কি? এর সীমানা কতটুকু? সুদ হারাম হবার যে-সব বিধান ইসলাম দিয়েছে, সেগুলো কোন ব্যাপারে ও কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং কি অবস্থার প্রেক্ষিতে, কখন সুদ হারাম করা হয়েছে? কুরআনে বর্ণিত 'রিবা'র প্রকৃত অর্থ কী? এ সমস্ত প্রশ্নের সমাধানের মাধ্যমেই 'রিবা' বা সুদের প্রকৃত ইতিহাস বেরিয়ে আসবে।

ইসলাম-পূর্ব যুগে 'রিবা'

'রিবা' শব্দটি আরবি। এটি বহুল প্রচলিত শব্দ। রসুল (স.)-এর নবুওয়তপ্রাপ্তি এবং কুরআন অবতরণের পূর্বে, জাহিলিয়াতের যুগেও আরবে এ শব্দটি প্রচলিত ছিল।[৯৭] যেমন- 'কাতাদাহ' জাহেলিয়াত যুগের 'রিবা' সম্পর্কে বলেন:

> এক ব্যক্তি অন্যজনের কাছে কোনো জিনিষ বিক্রি করতো এবং মূল্য পরিশোধ করার জন্য তাকে নির্দিষ্ট সময় দিতো। উক্ত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর সে যদি

---

৯৩. সুরা আল্ বাকারা, আয়াত, ২৭৫।
৯৪ . প্রাগুক্ত, আয়াত-২৭৬।
৯৫ . মুফতি মুহাম্মদ শাফী (র.), মা'আরেফুল কুরআন, ১ম খণ্ড, অনুবাদ, মুহিউদ্দীন খান, সুরা আল্ বাকারা প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।
৯৬ . কুরআন মজিদে সুদের প্রতিশব্দ হিসেবে 'রিবা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর মূলে তিনটি অক্ষর রয়েছে। যেমন- ر – ب – و
অর্থ বৃদ্ধি, বিকাশ, চূড়া প্রভৃতি। আরবীতে ربا (রাবা) অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া ও বেশি হওয়া। ربا فلان الرابية অর্থ সে টিলায় চড়লো। اربى الشئ অর্থ জিনিসটি বৃদ্ধি করেছে। অর্থাৎ কুরআন মজিদে এ শব্দটির মূল থেকে নির্গত শব্দাবলী যেখানে ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানেই বৃদ্ধি, উচ্চতা ও বিকাশ অর্থ পাওয়া যায়।
সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং, সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, অনুবাদ, আব্দুল মান্নান তালিব ও আব্বাস আলী খান, আধুনিক প্রকাশনী, প্রাগুক্ত, ঢাকা, পৃ. ৮৪।
আবুল ফজল মাওলানা আবদুল হাফীজ, মিসবাহুল লুগাত, এইচ, এম, সাঈদ কোম্পানী, আদব মনজিল, করাচী পৃ. ২৭৭।
৯৭ . সুরা নিসার আয়াতে জানা যায় যে, 'রিবা' শব্দ এবং লেনদেন হযরত মুসা (আ.) অর্থাৎ তওরাতের আমলেও সুবিদিত ছিল। তওরাতও একে হারাম ঘোষণা করেছে। হযরত মুসা (আ.)-এর উম্মতের জন্যও 'রিবা' বা সুদ হারাম ছিল।
মুফতি মুহাম্মদ শফি, তাফছিরে মা'আরিকুল কুরআন, অনুবাদ, মুহিউদ্দীন খান, সুরা বাকারা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২।

www.pathagar.com

মূল্য আদায় না করতো তাহলে তাকে আরও অতিরিক্ত সময় বাড়িয়ে দিত এবং সাথে সাথে মূল্যও বাড়িয়ে দিতো।[৯৮]

মুজাহিদ বর্ণনা করেন :

জাহিলী যুগের 'রিবা' হলো এক ব্যক্তি অন্যের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করে তাকে বলতো- যদি তুমি আমাকে অমুক দিন থেকে অমুক দিন পর্যন্ত সময় দাও তাহলে আমি তোমাকে এ পরিমাণ বেশি দেবো।[৯৯]

আবু বকর আল জাস্সাসের মতে, 'জাহেলী যুগে ঋণদাতা ও গ্রহীতা এমনভাবে চুক্তি সম্পাদন করতো যাতে ঋণগ্রহীতাকে মূলধন থেকে বেশি পরিমাণ অর্থ দিতে হতো।'[১০০]

ইমাম রাযী 'রিবা' সম্পর্কে বলেন :

জাহেলি যুগে লোকদের নিয়ম ছিল তারা যখন কাউকে ঋণ দিতো তার নিকট থেকে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণে সুদ আদায় করতো। মেয়াদ উত্তীর্ণ সময়ে যদি তা আদায় সম্ভব না হতো সময় বাড়িয়ে দিয়ে সুদও বাড়িয়ে নিতো[১০১]

এ ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্যকে আরবরা নিজেদের ভাষায় 'রিবা' নামে অভিহিত করে। পবিত্র কুরআন মজি'দ একে হারাম ঘোষণা করেছে।

কুরআনে বর্ণিত আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, আসল এর উপর যা কিছু বাড়তি হবে তা-ই 'রিবা' হিসেবে পরিগণিত হবে। অবশ্য, কুরআন মজিদ ঢালাওভাবে সব রকমের বৃদ্ধিকে হারাম বলে নি। শরিয়ত নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত সীমা-পরিসীমা দিয়েছে মানবজাতির কল্যাণের জন্যই।

বলা আবশ্যক যে, বৃদ্ধি ব্যবসায়েও হয়। কুরআন একটি বিশেষ ধরনের বৃদ্ধিকে হারাম বলেছে। এ বৃদ্ধিকেই 'রিবা' নামকরণ করেছে। ইসলাম-পূর্ব যুগে আরবে এ বিশেষ পর্যায়ের লেনদেনকে ঐ একই নামে অভিহিত করা হতো। জনসাধারণ তখন 'রিবা'কে ব্যবসায়ের ন্যায় বৈধ মনে করতো। যেমন- আধুনিক জাহেলিয়াতে মনে করা হয়। ইসলাম ঘোষণা দেয় যে, ব্যবসায়ের ফলে মূলধনে যে বৃদ্ধি হয় তা 'রিবা'র বৃদ্ধি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। কুরআনে এ সম্পর্কে ঘোষিত হয়েছে:

সুদখোরদের এহেন পরিণতি হবার কারণ হচ্ছে এই যে, তারা বলছে ব্যবসা তো 'রিবা'র মতই, অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল এবং 'রিবা'কে হারাম গণ্য করেছেন।[১০২]

অবশ্য কুরআন মজিদে 'রিবা'র কোনো ব্যাখ্যা দেয়া হয় নি। রিবা একটি বিশেষ ধরনের বৃদ্ধির নাম। সে সময় 'রিবা' সর্বজন পরিচিত ও প্রসিদ্ধ ছিল। পবিত্র কুরআন এ ব্যাপারে এতটুকু বলাই শ্রেয় মনে করেছে যে, আল্লাহ রিবাকে হারাম করেছেন, কাজেই তোমরা এটাকে পরিহার করো।

---

৯৮. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬-৮৭।
৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭।
১০০. প্রাগুক্ত।
১০১. প্রাগুক্ত।
১০২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬।

www.pathagar.com

'রিবা'র প্রকৃত অর্থ

'রিবা' বা সুদ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণার জন্য প্রথমেই বলে নেয়া দরকার, কুরআনের নির্দেশানুযায়ী, 'রিবা' সকল যুগে সর্বাবস্থায় হারাম বা নিষিদ্ধ। কিন্তু 'রিবা' কাকে বলে, তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা পবিত্র কুরআনে নেই। রসুলে করিম (স.)-ও যে এর কোনো বিশদ বিবরণ দিয়েছেন, তার প্রমাণ নেই। রসুল (স.)-এর বিশিষ্ট সাহাবিগণ থেকেও এমন কথা শোনা যায় যদ্বারা প্রমাণিত হয়, রসুল (স.) সুদের ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়ার পূর্বেই ইন্তিকাল করেছেন।[১০৩]

'রিবা' সম্পর্কে কুরআনের আয়াত ও হাদিসসমূহ বর্ণিত হয়েছে। এর অবৈধতা সম্পর্কেও কঠোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম (রা.) রসুল (স.)-কে এ সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করেন নি- বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটা আশ্চর্যজনক মনে হবে। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে স্পষ্ট হয়ে যাবে, এতে অবাক হবার কিছুই নেই। রসুল (স.)-এর প্রতি যখন 'রিবা'র নিষেধমূলক আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়, তখন 'রিবা' সম্পর্কে আরববাসী সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল ছিল। আরবি ভাষায় এ শব্দটি বহুল প্রচলিত শব্দ বিধায় কোনো সংজ্ঞা দেবার বা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন পড়েনি। পূর্বোক্ত আলোচনার নির্যাস এবং স্বনামধন্য আলিম ও ঐতিহাসিকদের সর্বসম্মত অভিমত নিম্নরূপ :

লোকে এই শর্তে টাকা ধার দিত যে, খাতক মহাজনকে প্রতিমাসে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা প্রদান করবে অথচ আসল কমবে না। এইরূপে আসল টাকা পরিশোধ করার সময় উপস্থিত হইলে খাতক যদি টাকা দিতে অসমর্থ হইত, তবে সে মহাজনকে বলিয়া সময় বাড়াইয়া লইত এবং আসল টাকাও বাড়াইয়া দিত।[১০৪]

এর নিরিখে বলা যায়, আমাদের দেশের মহাজনরা টাকা ঋণ দিয়ে যে-রূপ সুদ ও চক্রবৃদ্ধি হারের সুদ আদায় করে, আরবে তখন তা-ই 'রিবা' বলে পরিচিত ছিল। কুরআন এই সর্বজনবিদিত রিবার উল্লেখ করেছে এবং উভয়কেই হারাম করে দিয়েছে।

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় সুদ

আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় সুদ একটি প্রধান আলোচ্য বিষয়। অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের মাপকাঠি হিসেবে সুদ বিবেচিত হয়ে আসছে। সুদ ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ কি অবৈধ- এ নিয়ে দীর্ঘদিন থেকে আমাদের দেশে নানাপ্রকার বক্তব্য ও আলোচনা চলে আসছে। কোনো কোনো ইসলামি চিন্তাবিদ প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, কুরআনে

---

১০৩. আরবরা যাকে রিবা বলতো এবং যার লেনদেন করতো কুরআন তাকেই হারাম করেছে। রসুল (স.) এ বিধানকে শুধু নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতেই নয়, কল্যাণ রাষ্ট্রের আইন হিসেবেও জারি করেন। তবে এমন কতকগুলো প্রকারকেও তিনি 'রিবা'র অন্তর্ভূক্ত করে দেন, যেগুলোকে সাধারণত রিবা মনে করা হতো না। এগুলো নির্ধারণ করার ব্যাপারেই হযরত ওমর ফারুকের (রা.) মনে খটকা দেখা দিয়েছিল। এগুলোর ব্যাপারেই মুজতাহিদ ইমামগণ মতভেদ পোষণ করেছেন। হযরত ওমর (রা.) বলেন- রিবা সম্পর্কিত আয়াত কুরআনের এমন সব আয়াতের অন্তর্ভুক্ত যেগুলো শেষের দিকে নাযিল হয়। এগুলো সম্পর্কিত যাবতীয় বিধান আমাদের উপরে সুস্পষ্ট করার আগেই রসুল (স.) ইন্তেকাল করেন। কাজেই, যে বস্তুটি নিশ্চিত সুদ, সেটি পরিহার করতে হবে। সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং- সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, অনুঃ আবদুল মান্নান তালিব ও আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪।

১০৪. মুফতি মুহাম্মদ শফি, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫২.

www.pathagar.com

নিষিদ্ধ 'রিবা' এবং আমাদের দেশে প্রচলিত সুদ এক জিনিস নয়। আলিমদের অন্য এক জামা'তের মতে, 'দারুল হরবে'[১০৫] হরবি অমুসলিমদের নিকট থেকে সুদ নেয়া জায়েয। প্রগতিপন্থীরা মনে করেন, সুদ ছাড়া বর্তমান জগত অচল। ইসলামের সেকেলে ধারা এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আধুনিক বিজ্ঞানের বিশ্বে অচল। প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থা এবং সুদকে তারা দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করেন। বর্তমানে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেকগুলো দেশে প্রায় শতকোটি মুসলমানের কাঙ্ক্ষিত *ইসলামি ব্যাংক* ব্যবস্থা চালু হওয়ার ফলে তাদের এ ধারণা অমূলক এবং ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে।

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় সুদও এক ধরনের সমস্যা। সুদ সম্পর্কে যে সমস্যার কথা আলোকপাত করা হয়েছে, মূলত এটা সমস্যাই নয়। অজ্ঞতা ও ভ্রান্তনীতির কারণেই এটিকে সমস্যা হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে। পবিত্র কুরআন-হাদিসের মূল বাণী যথাযথভাবে আঁকড়ে ধরলে আর কোনো সমস্যাই থাকার কথা নয়।

পবিত্র কুরআনে নির্দেশিত ইসলামের আদেশ-নিষেধগুলো সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করলে এ কথা পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, প্রতিটি নিষেধের সাথে একটি আদেশ এবং প্রত্যেক বর্জনের সাথে একটি অর্জন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সেই বর্জন ব্যতিরেকে অর্জন নিষ্ফল। অথচ দেখা যায়, আমরা অনেক সময় এ অর্জন-বর্জনের একটিকে গ্রহণ করি, অন্যটিকে ত্যাগ করি। মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ এ সম্পর্কে সুন্দর একটি উদাহরণ দিয়েছেন :

> বীজের একটা ভাগকে স্বতন্ত্রভাবে মাটিতে পুঁতিলে তাহাতে যেমন অঙ্কুর উদগম হইতে পারে না, এই শ্রেণির আদেশ-নিষেধগুলোকে পরস্পর হইতে পৃথক করিয়া আল্লাহ-রাসুলের নির্দ্ধারিত কল্যাণকে প্রাপ্ত হওয়া তেমনি মুসলমানের পক্ষে সম্ভব হইয়া ওঠে না।[১০৬]

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় বেশিরভাগ মানুষ সুদ দিতে বাধ্য। দারিদ্র্যের কশাঘাতে অধিকাংশ মানুষ জর্জরিত। এ অভাবের সময়ই মানুষ মহাজনের দ্বারস্থ হয়ে উচ্চহারে টাকা ঋণ নিতে বাধ্য হয়। মাওলানা আকরম খাঁ এ প্রসঙ্গে বলেন :

> মানুষের এইসব সাময়িক অভাব পূরণের সুব্যবস্থা যতদিন না করা হয় ততদিন তাহাকে কর্জ্জ করিতে নিষেধ করা নিষ্ফল ও অস্বাভাবিক প্রহসন মাত্র[১০৭]

এটা সত্য যে, দেশের আলিম সমাজ সুদের বিরুদ্ধে ওয়াজ-নসিহত এবং লেখালেখি যতই করেছেন, অভাবগ্রস্তের জঠরের তীব্র জ্বালাকে নিবারণ করা যায় নি। সুদখোর মহাজনদের সুদ থেকে তাদেরকে বিরত রাখতে সমর্থ হয় নি। অথচ 'সুদ খাওয়া ও সুদ দেয়া উভয়ই সমান'[১০৮] -হাদিসটি আমাদের আলিম সমাজ অহরহ প্রচার করা সত্ত্বেও

---

১০৫. দারুল হরব, আল্লাহ তা'য়ালার কালাম এবং শেষ নবি (স.)-এর নির্দেশাবলী থেকে গৃহীত আইন যে দেশে কার্যকর না থাকে তা-ই অনৈসলামিক দেশ। সে রাষ্ট্রকে অনৈসলামিক রাষ্ট্রই মনে করতে হবে। 'দারুল হরব' সেই অমুসলিম রাষ্ট্র যা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে রত। যার সাথে ইসলামি রাষ্ট্রের কোন চুক্তি নেই।
সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং, সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, অনুবাদ, আবদুল মান্নান তালিব ও আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২।

১০৬. আকরাম খাঁ, মোহাম্মদ, সমস্যা ও সমাধান, কোলকাতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩।

১০৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩।

১০৮. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

অগণিত মুসলমান উচ্চাভিলাষী মহাজনের কাছে আত্মসমর্পণ করে নিঃস্ব হয়ে জীর্ণশীর্ণ অবস্থায় দিনাতিপাত করছে।

পবিত্র কুরআন মজিদ সুদকে বর্জন করার আদেশ দিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে যাকাত প্রদান করার হুকুমও দিয়েছে। উল্লেখ্য, সুদ হারাম করার পূর্বে ইসলাম যাকাতের বিধি-ব্যবস্থাকে মুসলমান সমাজে প্রতিষ্ঠা করার যুগান্তকারী উদ্যোগ নিয়েছে, এরপর সুদকে হারাম ঘোষণা করেছে। সুদ ও যাকাত সম্পর্কীয় আয়াত নাযিলের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায়, সুদ নিষেধ সম্পর্কে যেভাবে কঠোর নির্দেশ জারি করা হয়েছে, যাকাত প্রদানও অনুরূপভাবে ফরয করা হয়েছে। যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের সম্পর্কে হযরত আবু বকর (রা.) জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন। প্রত্যেক অবস্থাপন্ন মুসলমানের বছরান্তে সমস্ত উদ্বৃত্তের শতকরা আড়াই টাকা এবং সমস্ত কৃষিজাত ফল-শস্যের ১০ম অবস্থাভেদে ২০ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হয়। গরু, ছাগল, মহিষ, ঘোড়া প্রভৃতি পশুরও নিয়মিতভাবে প্রতি বছর যাকাত আদায় করতে হয়।[১০৯]

ইসলামের দৃষ্টিতে যাকাত অনুগ্রহ নয়, এটা অধিকার। যাকাতের প্রাপক কে, কুরআন তাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে : সাদাকা তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাস মুক্তির জন্য, ঋণভারাক্রান্তদের, আল্লাহর পথে সংগ্রামকারী ও মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহর বিধান, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[১১০] সকল প্রকার দুস্থ ও অভাবগ্রস্ত মুসলমানই যাকাত পাওয়ার অধিকারী। বিপন্ন অভাবগ্রস্ত মুসলমান এমনকি অমুসলিমের যাকাত গ্রহণের অধিকার রয়েছে।

যাকাত প্রদানের ফরযকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করে সুদকে বর্জন করা সম্ভব নয় পক্ষান্তরে সমাজের মধ্যে যাকাতের বিধানকে কার্যকর করার পর এমন অবস্থা সৃষ্টি হবে, যাকাত প্রত্যাশী অভাবগ্রস্ত লোকই আর সমাজে থাকবে না। ইসলামের ইতিহাসে এর প্রচুর প্রমাণ রয়েছে।

যাকাত ব্যবস্থার মাধ্যমে 'বায়তুল মাল তহবিল' গঠন হবে, আর এ তহবিলের মাধ্যমে দুস্থ, অভাবগ্রস্ত, অসহায় লোকদেরকে 'দারিদ্র্য দূরীকরণের ব্যবস্থা' গ্রহণ করলে দেশে অভাবী লোক থাকবে না। যাকাত গ্রহণ করার মত লোকও পাওয়া যাবে না। ইসলামের সোনালি যুগে দেখা যায়, এক বছর পূর্বে যাঁকে যাকাত দেয়া হয়েছিল, পরের বছর তার কাছে যাকাত নিয়ে গেলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন- আল্লাহর অশেষ রহমতে আমি এ বছর নিজেই যাকাত দেয়ার যোগ্যতা রাখি।[১১১]

সুদ সমস্যা আরেকটু পরিষ্কার করার লক্ষ্যে বলতে হয়, অসুখ হলে ওষুধ খাওয়ার চেয়ে অসুস্থ ব্যক্তির রোগের আক্রমণ থেকে পূর্বাহ্নেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা অভিজ্ঞ ডাক্তারদের পরামর্শ।

এও সুস্পষ্ট যে, সুদভিত্তিক সমাজব্যবস্থা গড়ে সমাজের দুই-তৃতীয়াংশ লোককে মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য করে। গুটিকয়েক লোককে সমাজে প্রতিষ্ঠা করা

---

১০৯. সমস্যা ও সমাধান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।
১১০. انما الصدقات للفقراء والمساكين الاية
সুরা তাওবা, আয়াত ৬০।
১১১. সমস্যা ও সমাধান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।

www.pathagar.com

কতবড় মানবতাবিরোধী, বিদগ্ধজনেরাই তা একমাত্র উপলব্ধি করতে পারে। এ প্রসঙ্গে মাওলানা আকরম খাঁ বলেন :

> সুদ খাওয়া হারাম আর যাকাত দেওয়া ফরয, অর্থাৎ যাকাত না দেওয়া হারাম। দুইটিই কুরআনের আদেশ-দুইটিই ইসলামের ব্যবস্থা এবং একে অন্যের উপর নির্ভরশীল[১১২]।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আমরা আল্লাহর হুকুমের এক অংশকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করি বটে, কিন্তু তাকে সার্থক করার জন্য অন্য যে অংশের অগ্রেই আবশ্যক হয়ে থাকে, তাকে নিতান্ত উপেক্ষার চোখে দেখছি। তাই আমাদের অজ্ঞতা ও অবজ্ঞা একসঙ্গে মিলে দুনিয়ার যত সমস্যা এনে আমাদের চলার পথকে বিঘ্নসঙ্কুল করে তুলছে। মাওলানা আকরম খাঁ এ প্রসঙ্গে বলেন :

> আমরা নিজেদের অজ্ঞতা ও অবজ্ঞার এই কুফলগুলিকে অবলীলাক্রমে ইসলামের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া সংস্কার বা সংহারের নামে বাবদুকতা প্রকাশে কুণ্ঠিত হইতেছি না।[১১৩]

সুদ সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (স.)-এর কয়েকটি নির্দেশ

১. রসুল (স.) বাণী প্রদান করেছেন : তোমরা সাতটি মারাত্মক বিষয় থেকে বেঁচে থাক। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে রসুল (স.) সেগুলো কি? উত্তরে তিনি বললেন- ক. আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করা, খ. যাদু করা, গ. অন্যায়ভাবে হত্যা করা, ঘ. সুদ খাওয়া, ঙ. এতীমের মাল খাওয়া, চ. যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে আসা, ছ. কোনো সতী নারির প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা।[১১৪]

২. অন্য এক হাদিসে রসুল (স.) বলেন- আমি আজ রাতে দেখেছি, দু'ব্যক্তি আমাকে বায়তুল মুকাদ্দস পর্যন্ত নিয়ে গেছে। এরপর আমরা সামনে অগ্রসর হলে একটি রক্তের নদী দেখলাম। নদীর মধ্যে এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান। অপর এক ব্যক্তি নদীর কিনারে দণ্ডায়মান। নদীস্থিত ব্যক্তি যখন নদী থেকে উপরে উঠতে চায়, তখন কিনারের ব্যক্তি তার মুখে পাথর নিক্ষেপ করে। পাথরের আঘাত খেয়ে সে আবার পূর্বের জায়গায় চলে যায়। অতঃপর সে আবার তীরে উঠার চেষ্টা করে। কিনারের ব্যক্তি আবার তার সাথে একইরূপ আচরণ করে। মহানবি (স.) বললেন : আমি স্বীয় সঙ্গীদ্বয়কে প্রশ্ন করলাম- আমি এ কী ব্যাপার দেখছি? তারা বললো : রক্তের নদীতে বন্দী ব্যক্তি সুদখোর। সে স্বীয় কার্যের শাস্তি ভোগ করছে।[১১৫]

৩. নাসায়ি শরিফে হযরত আলি (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত আলি (রা.) বলেন : আমি হযরত (স.) কে সুদদাতার, সুদগ্রহীতার, তার লেখক ও সাক্ষীগণের এবং যাকাত দানে অস্বীকৃত ব্যক্তির উপর লানৎ করতে শুনেছি।[১১৬]

---

১১২. সমস্যা ও সমাধান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।
১১৩. প্রাগুক্ত।
১১৪. মুফতি মোহাম্মদ শফি, তাফছিরে মাআরিফুল কুরআন- প্রাগুক্ত- পৃ. ৮০৯।
১১৫. প্রাগুক্ত।
১১৬. সমস্যা ও সমাধান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬।

www.pathagar.com

৪. রসুল (স.) ইরশাদ করেছেন : চার ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, তাদেরকে বেহেস্তে প্রবেশ করাবেন না এবং জান্নাতের নিয়ামতের স্বাদ গ্রহণ করতে দেবেন না। এ চার ব্যক্তি হলো- ক. মদ্য পানে অভ্যস্ত ব্যক্তি, খ. সুদখোর, গ. অন্যায়ভাবে এতীমের মাল ভক্ষণকারী, ঘ.পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান।[১১৭]

৫. নবি করিম (স.) বলেন : এক দিরহাম সুদ খাওয়া সত্তরবার ব্যভিচার করার চাইতেও বড় গোনাহ। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে; হারাম মাল দ্বারা যে গোশত গঠিত হয়, তার জন্যে আগুনই যোগ্য। অন্য বর্ণনায় আছে, মুসলমানের মানহানি করা সুদের চাইতেও কঠোর গোনাহ।[১১৮]

৬. এক বর্ণনায় রসুল (স.) বলেছেন : কোনো জনপদে যখন ব্যভিচার ও সুদের ব্যবসা প্রসার লাভ করে, তখন সে জনপদ যেন আল্লাহর শাস্তিকে আমন্ত্রণ জানায়।[১১৯]

৭. রসুল (স.) ইরশাদ করেন : যখন কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে সুদের লেনদেন প্রচলিত হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তা'য়ালা তাদের উপর নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ক্রমবর্ধমান উর্ধ্বগতি ঘটান এবং যখন কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘুষ ব্যাপক হয়ে যায়, তখন তাদের উপর শত্রুর ভয়ও প্রাধান্য লাভ করে।[১২০]

৮. রসুল (স.) বলেন : মিরাজের রাতে যখন আমরা সপ্তম আকাশে পৌঁছলাম, তখন আমি উপরে বজ্র ও বিদ্যুৎ দেখলাম। এরপর আমরা এমন এক সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে গেলাম, যাদের পেট একেকটি ঘরের ন্যায় ফোলা এবং বিস্তৃত ছিল। তাদের উদর সর্প দ্বারা ভর্তি ছিল। সর্পগুলো বাইরে থেকেই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। আমি জিব্রাইল (আ.)-কে জিজ্ঞেস করলাম : এরা কারা? তিনি বললেন, এরা সুদখোর।[১২১]

৯. রসুল (স.) থেকে বর্ণিত, আওফ ইবন মালিক (রা.)-কে বললেন : যে-সব গোনাহ মাফ করা হয় না, সেগুলো থেকে বেঁচে থাকা। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে যুদ্ধলব্ধ মাল চুরি করা ও অপরটি সুদ খাওয়া।[১২২]

১০. রসুল (স.) বলেন : যে ব্যক্তিকে তুমি কর্জ দিয়েছ, তার হাদিয়াও গ্রহণ করবে না। সে কর্জের বিনিময়ে হাদিয়া দিতে পারে; এমতাবস্থায় তা সুদ হবে। এ কারণে তার হাদিয়া গ্রহণ করার ব্যাপারেও সাবধান হওয়া উচিত।[১২৩]

মুসলিম শরীফে হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, 'সুদ লেন-দেনকারী উভয়ই সমান।[১২৪]

---

১১৭ . তাফছিরে মাআরেফুল কুরআন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১০।
১১৮ . প্রাগুক্ত।
১১৯. প্রাগুক্ত।
১২০ . প্রাগুক্ত।
১২১ . প্রাগুক্ত।
১২২ . প্রাগুক্ত।
১২৩ . প্রাগুক্ত।
১২৪ . মোহাম্মদ আকরম খাঁ, সমস্যা ও সমাধান-কোলকাতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬।

www.pathagar.com

হযরত জাবির (রা.), হযরত আলি এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামের উপরোক্ত বর্ণনাগুলো একত্র করলে যে ভাবার্থ দাঁড়ায় তা হলো- সুদদাতা, সুদগ্রহীতা, সুদের সাক্ষী, সুদ সংক্রান্ত দলিলের লেখক ও যাকাত প্রদানে অসম্মত ব্যক্তির উপর অভিসম্পাত করা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে 'সুদ দাতা-গ্রহীতা উভয়ই সমান।'

উপরোক্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যায় মাওলানা আকরম খাঁ বলেন :

> হযরত রসুলে করিম (স.) যাকাত দানে অসম্মত ব্যক্তিকে সুদ-দাতা ও গ্রহিতা প্রভৃতির সাথে এক পর্য্যায়ভুক্ত করে দিয়েছেন। কারণ, সুদ দিয়ে সুদ সংক্রান্ত দলীলের লেখক ও সাক্ষী হয়ে এক দল লোক যেমন মহাজনকে সুদ খেতে সাহায্য করতে থাকে, সেরূপ যাকাত দানে অসম্মত ব্যক্তি যাকাত বন্ধ করে অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে সুদি কর্জ্জ নিতে বাধ্য করে থাকে। ফলে, এই ব্যক্তিই হচ্ছে তার কর্জ্জ নেয়ার ও সুদ দেয়ার প্রধান কারণ।[১২৫]

'সুদ দাতা-গ্রহীতা সমান'। অত্র হাদিসের ব্যাখ্যায় মাওলানা আকরম খাঁ বলেন :

> সব সমান কথার সচরাচর যে অর্থ করা হয় তাহা ঠিক নহে। একজন নিজের হীন অর্থলালসা চরিতার্থ করার জন্য বিপন্ন প্রতিবেশীর হৃৎপিণ্ড চর্ব্বণ করার জন্য লালায়িত, আর একজন দায়ে ঠেকিয়া নিরুপায় অবস্থায় তাহাকে সুদ দিতে স্বীকৃত হয়ে আপাততের মত আত্মরক্ষা করতে চেষ্টা করিতেছে এই দুই জনের পাপ সমান, ইহা কখনই হাদিসের উদ্দেশ্য নহে।[১২৬]

এটা জানা কথা যে, সম্পদশালী ও অবস্থাপন্ন লোকেরা শরি'য়তের বিধানানুযায়ী যথারীতি যাকাত আদায় করলে এবং *বায়তুল মাল* তহবিল থেকে অনাথ-ইয়াতিম-অভাবী লোকদেরকে সাহায্য দিলে, এরা কখনও মহাজনের দ্বারস্থ হতো না।

মাওলানা আকরম খাঁ এ সম্পর্কে বলেন :

> যদি কেহ হযরত জাবের ও হযরত আলির বর্ণিত হাদিস দুইটিকে স্বতন্ত্র ঘটনার বিবরণ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে চান আমাদের আপত্তি বা ক্ষতি কিছুই নাই। হযরত (স.) একই পদে সুদখোর, সুদ দাতা প্রভৃতির সহিত যাকাত দিতে অসম্মত ব্যক্তিকে এক পর্য্যায়ভুক্ত এবং একই লানতের ভাগী করিয়া বর্ণনা করিতেছেন। যাকাত দিতে অসম্মতি ও সুদের প্রসার বৃদ্ধির মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই হযরত এখানে সুদের কথার সঙ্গে সঙ্গে যাকাতের প্রসঙ্গের এমনভাবে অবতারণা করিয়াছেন, অন্যথায় তাহা অবান্তর বলিয়া নির্দ্ধারিত হইত।[১২৭]

সুদ ব্যবস্থা নিয়ে আমাদের সমাজে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে এবং এ সম্পর্কে আমাদের আলিম সমাজ কুরআন হাদিসের যে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ পেশ করে সুদের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখছেন– তা নিঃসন্দেহে সাধুবাদের দাবি রাখে। তারপরও প্রশ্ন করা সঙ্গত যে, সুদের বিকল্প আমরা তেমন কী পন্থাই-বা মানুষের সামনে পেশ করেছি? তেমন কিছুই নয়। এ সম্পর্কে মাওলানা আকরম খাঁ কুরআনের সুরা বাকারার ৩৮ রুকু এবং সুরা রুমের ৪র্থ রুকুর উপক্রম ভাগ ও উপসংহারের দিকে ইঙ্গিত দিয়ে বলেন:

---

১২৫. প্রাগুক্ত, পৃ+ ৫৭।
১২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭ (টীকা)।
১২৭. মাওলানা আকরম খাঁ, সমস্যা ও সমাধান- প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭-৫৮।

www.pathagar.com

সর্ব্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তায়ালার শাশ্বত বাণী কুরআন ঐ সকল স্থানে সুদ বর্জনের সহিত যাকাতকে কিরূপ অভেদ্যভাবে একত্রে গ্রথিত করিয়া দিয়াছে। সুরা বাকারার ৩য় রুকুতে প্রথমে দানশীলতার মহিমা কীর্তন করা হইয়াছে।[১২৮] অতঃপর কুসীদজীবীদের মানসিকবৃত্তির কঠোর নিন্দাবাদ করে সঙ্গে সঙ্গে বলে দেয়া হয়েছে- 'যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল এবং যারা নামাযকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে রাখে ও যাকাত প্রদান করতে থাকে, আল্লাহর নিকট তাদের পুরস্কার আছে। তাদের কোনো ভয় নেই। আর তারা মর্মাহতও হবে না।[১২৯]

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন–

অতএব স্বজনগণকে এবং কাঙ্গাল ও বিদেশী পথিকদিগকে তাদের প্রাপ্য দাও, আল্লাহর সন্তোষ প্রার্থনা যারা করে তাদের পক্ষে এটাই উত্তম,- আর এ সব লোকই হচ্ছে সফলকাম। পরের ধনকে গ্রাস করে বর্দ্ধিত হবে মনে করে তোমরা যে ধন, সম্পদ সুদে খাটিয়ে থাক, আল্লাহর সন্নিধানে তা কদাচিৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে পারবে না।[১২৯ক]

অথচ যাকাত সম্পর্কে কুরআন বলছে :

আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে তোমরা যে যাকাত প্রদান করে থাক। (জেনে রাখ) এ শ্রেণির লোকেরাই তো (জাতীয় সম্পদ) বহুগুণে বর্দ্ধিত করে থাকে।[১৩০]

ইসলামের সাধারণ নীতির প্রতি লক্ষ্য রেখে উল্লেখিত আয়াত ও হাদিসের প্রতি গভীরভাবে চিন্তা করে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলে, সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হবে যে, ইসলামের আদেশ ও নিষেধগুলোকে এক সাথে গ্রহণ করে কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হলে সুদখোর মহাজনদের দ্বারস্থ হওয়ার কোনো প্রয়োজনই মুসলমানদের থাকবে না। মুসলমানের জাতীয় জীবনে এই সমস্যা উপস্থিত হতেই পারে না। এই জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রথমে যাকাতকে তাদের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে তার পর সুদের নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন।

দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত ও বিপন্ন মুসলিম জনগণকে সুদের দায় থেকে মুক্ত করার একমাত্র উপায় যাকাতের মাধ্যমে 'বায়তুল মাল' তহবিল গঠন করা। এর মাধ্যমে দীন হীন মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা। দুর্ভাগ্যের বিষয়, মুসলিম সমাজের অনেকেই যাকাত দেয়া বন্ধ করে দিয়েছে। যারা কিছু কিছু দিয়ে থাকেন, তাও মনগড়া, শরিয়তের বিধি অনুসারে নয়। তাদের মূল উদ্দেশ যশ-কীর্তি ও খ্যাতির লোভ। কিছু সংখ্যক লোককে অনুগ্রহের মাধ্যমে তাদের করায়ত্ত করা, তাদের প্রয়োজনের সময় এ লোকগুলোকে ব্যবহার করা। এর দ্বারা সমাজ থেকে অভাব দূর হয় না, বরং ভিক্ষুকের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে যায়।

যাকাত ব্যবস্থার মাধ্যমে আল্লাহ মানুষের জন্য যে মঙ্গল নিহিত রেখেছেন, বর্তমান ব্যবস্থার মাধ্যমে তা আংশিকও পূরণ হওয়া সম্ভব নয়। তাই, মুসলমানদের মধ্যে আজও অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ফিরে আসছে না।

---

১২৮ . প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।
১২৯ . প্রাগুক্ত।
১২৯ক.প্রাগুক্ত.
১৩০ . প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

www.pathagar.com

> পরের ধন লাভের অদম্য স্পৃহাই সুদখোর মহাজনদের একান্ত বাসনা। মানুষের মানবতাবোধ ও সৎবৃত্তিকে সম্পূর্ণভাবে জলাঞ্জলি দিতে না পারলে অসহায়, নিঃস্ব, সম্বলহীন মানুষের তিলে তিলে শোষণের এ নিষ্ঠুর ব্যবস্থা কোনো বিবেকবান লোক অবলম্বন করতে পারে না।

'রিবা' সম্পর্কীয় বিষয়গুলোর ওপর আলোকপাত করার পর আমাদের সামনে আসে বর্তমানে প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থা, বীমা ব্যবস্থা, সমবায় সমিতির মুনাফার অংশ, ব্যাংকের গচ্ছিত টাকা সুদ পর্যায়ভুক্ত কী-না?

এ ব্যাপারে মিশর ও ভারতের নাম করা কিছু আলিম মত প্রকাশ করেছেন যে, এগুলো রিবার পর্যায়ে পড়ে না বিধায় এগুলোর অনুকূলে সুদ গ্রহণে কোনো বাধা নেই।[১৩১]

মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁও এ প্রসঙ্গে বলছেন :

> সুদ-সমস্যা মুসলমানের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিতেছে এছলামকে অতিক্রম করিয়া- তাহাকে অবলম্বন করিয়া নহে। এছলাম এ সমস্ত সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধানের সম্যক ব্যবস্থা করিয়াই নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছে।[১৩২]

মাওলানা এ সম্পর্কে আরও বলেন :

> আজকাল আমাদের দেশে রেবার স্বরূপ ও প্রকার সম্বন্ধে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া সাধারণত: যেরূপ সহজ মনে করা হয়ে থাকে, আমাদের পূর্ববর্তী এমাম ও মোহাদ্দেছগণ তাহাকে ততটা সহজ বলিয়া মনে করিতেন না।[১৩৩]

মানুষ ব্যাংকে যে টাকা জমা দেয় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তা খাটিয়ে লভ্যাংশের একটি নির্দিষ্ট অংশ বার্ষিক শতকরা সুদের হিসেবে টাকার মালিককে দিয়ে থাকে। ব্যাংক কখনও দেউলিয়া হলে ডিপোজিটকারীদের টাকাও খোয়া যায়। অপরপক্ষে, মানুষ ব্যাংক হতে টাকা কর্জ নিয়ে তা খাটিয়ে যথেষ্ট মুনাফা লাভ করে। এবং লভ্যাংশের একটি অংশ একটা নির্দিষ্ট হারের সুদের হিসেবে ব্যাংককে প্রদান করে থাকে। যার ফলে উভয়পক্ষই আদান-প্রদানের দ্বারা মুনাফা লাভ করে। আবার সময় সময় লোকসানের অংশও উভয়পক্ষকে সমানভাবে বহন করতে হয়।

> 'রিবা' ও ব্যবসায়ে যে-সব তারতম্য উপরে দেখানো হয়েছে, এখানেও সে-সব তারতম্য বিদ্যমান। আর তাই ভারত ও মিশরের একদল ইসলামি চিন্তাবিদ ব্যাংকের সুদ 'রিবা' পর্য্যায়ভুক্ত নয় বলে মত প্রকাশ করেছেন।
>
> মাওলানা আকরম খাঁও একই মত পোষণ করে বলেন :
>
> আমরাও নিজেদের সামান্য জ্ঞান অনুসারে এ মতকে সঙ্গত বলে মনে করি।[১৩৪]

---

১৩১. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, সমস্যা ও সমাধান, কোলকাতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১।

১৩২. প্রাগুক্ত।

১৩৩. وباب الربا من اسكل الابواب على كثير من اهل العالم
"সুদের অধ্যায়টি অধিকাংশ আলিমের নিকট একটা কঠিনতম বিষয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে"
মোহাম্মদ আকরম খাঁ, সমস্যা ও সমাধান, কোলকাতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১।

১৩৪. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, কোরআন শরিফ (বাংলা অনুবাদ ও বিস্তারিত তাফসির), কোলকাতা, পৃ. ৪৪৭।

www.pathagar.com

সুদের উক্ত আলোচনা ও মাওলানা আকরম খাঁ'র উপরোক্ত অভিমত থেকে এই স্বীকৃতি দেয়া সম্ভবত ঠিক হবে না যে, সুদ গ্রহণের ফতোয়া পাওয়া গেছে। বরং সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করতে হবে, মাওলানা কেন এ কথাটি বলেছেন। এর উত্তরও তিনি তাঁর গ্রন্থে দিয়েছেন এভাবে :

> সুদের অর্থাৎ দিন-দুনিয়ার সকল প্রকার ধ্বংসের হাত হতে মুসলমানকে রক্ষা করতে হলে, কুরআনের ধারা তাহার স্পষ্ট শিক্ষা অনুসারে, সর্ব-প্রথমে 'বায়তুল মাল' তহবিল গঠনের প্রাণপণ চেষ্টা তাঁহাদিগকে করিতে হইবে। তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, যাকাত আদায়ের ও 'বায়তুল মাল' তহবিলের সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে শেষ না হওয়া পর্যন্ত সুদের নিষেধাজ্ঞা সম্পূর্ণ প্রচারিত হয় নাই।[১৩৫] হযরত ওমর (রা.) ইহাকে আহকাম সংক্রান্ত শেষ আয়াত বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন।[১৩৬]

ইসলামের সমস্ত বিধি-ব্যবস্থা সম্পন্ন করার পর সব শেষে সুদের নিষেধাজ্ঞামূলক আয়াত কেন অবতীর্ণ হয়েছিল, তাও চিন্তার বিষয়। এ প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ সঙ্গত। কোনো মানুষের সমস্ত শরীরে যদি ক্ষত দেখা দেয়, সে যদি শুধু একটিমাত্র ক্ষতস্থানে ওষুধ দিয়ে রোগ নিবারণের প্রচেষ্টা করে তা হলে তার এ প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। রোগ সম্পূর্ণ নিবারণের জন্য তাকে সমস্ত শরীরের সব ক'টি ক্ষতস্থানে ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে তা হলেই রোগ নিরাময়ের আশা করা যায়।

মাওলানা এ দৃষ্টিকোণকে সামনে রেখেই সুদ সম্পর্কে তাঁর মতামত হয়তো পেশ করে থাকবেন। অপরপক্ষে বর্তমান ব্যাংক ব্যবস্থা ও সুদ ব্যবস্থা বিশ্ব মানবতার যে কি ক্ষতি সাধন করেছে, সে সম্পর্কে মওলানা তাঁর সমস্যা ও সমাধান গ্রন্থের টীকায় লেখেন :

> সুদ সমস্যার আলোচনা প্রসঙ্গে অনেককে National debt, National wealth নেশনের Lending ও Securing Capacity প্রভৃতি পরিভাষাগুলি বহুলভাবে ব্যবহার করতে দেখা যায়। কিন্তু এ সময় তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, নেশন স্বাধীন না হইলে স্বাধীন স্টেটের অভ্যুদয় হইতে পারে না এবং স্বাধীন স্টেট কর্তৃক রক্ষিত ও পৃষ্ঠপোষিত না হইলে ব্যাংকগুলি বিফল বরং বহুক্ষেত্রে ক্ষতিজনক। পক্ষান্তরে ব্যাংকের মধ্যদিয়া Capitalism এবং তাহার মধ্যদিয়া Imperialism যেরূপে বিশ্বমানবের সুখ-শান্তি ও স্বাধীনতাকে বিভীষিকাপূর্ণ করিয়াছে এবং ইহাকে কেন্দ্র করিয়া ধনিকে-শ্রমিকে যে সর্বনাশী সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া মনে হয় বর্তমান অবস্থায় এই ব্যাংকই হইতেছে দুনিয়ার প্রথম সমস্যা, উহা সমাধান আদৌ নহে।[১৩৭]

---

১৩৫. সমস্যা ও সমাধান- প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২।

১৩৬. 'রিবা' সম্পর্কিত আয়াতগুলো কুরআনের এমন সব আয়াতের অন্তর্ভুক্ত যেগুলো শেষের দিকে নাযিল হয়। এবং এগুলো সম্পর্কিত যাবতীয় বিধান আমাদের উপর সুস্পষ্ট করার আগেই রাসুল্লাহ (স.)-এর ইন্তিকাল হয়ে যায়। কাজেই যে বস্তুটি নিশ্চিত সুদ তোমরা সেটি পরিহার করো। এবং যে বস্তুটি সম্পর্কে সুদ হবার সংশয় দেখা দেয়, সেটিও পরিহার করো।

সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪।

১৩৭. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, কোরআন শরিফ, বাংলা অনুবাদ, বিস্তারিত তফসীর, ১ম খণ্ড, কোলকাতা, পৃ. ৪৪৭।

www.pathagar.com

আধুনিক বিশ্বে মিশ্র অর্থব্যবস্থা বিরাজমান থাকায় দরিদ্র জনসাধারণ নিষ্পেষিত হচ্ছে। ইসলামি অর্থ ব্যবস্থারপ্রচলন সমাজ ব্যবস্থায় থাকলে এরূপ সমস্যা হতো না। ইসলামের সোনালি যুগের ইতিহাস এর জ্বলন্ত প্রমাণ। আশার কথা এই যে, বর্তমান বিশ্বের অনেক দেশেই মিশ্র অর্থব্যবস্থার পাশাপাশি ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থা সফলতার সাথে এগিয়ে যাচ্ছে। এর পাশাপাশি যাকাত প্রদানে সরকারিভাবে বাধ্য-বাধকতা থাকলে দেশের দরিদ্র জনসাধারণ সবচাইতে বেশি উপকৃত হতো। অবশ্য, এসব কিছুর জন্যই পবিত্র কুরআনের শাসন ব্যবস্থার কোনো বিকল্প নেই। ইসলামি সমাজ ব্যবস্থাই উদ্ভূত সমস্যার সমাধান দিতে পারে।

খ্রিষ্টান মিশনারি তৎপরতা রোধ

মাওলানা আকরম খাঁ ছিলেন অত্যন্ত সচেষ্টতন মানুষ। সমাজের প্রতিটি বিষয়ের প্রতিই তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পড়েছে। সাথে সাথেই তিনি সৃষ্ট-ক্ষতিকর দিকের প্রতি সাধারণ মানুষকে সচেতন করেছেন। খ্রিষ্টান মিশনারি তৎপরতা উপমহাদেশে এবং আজকের বাংলাদেশে যে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে মুসলমানদেরকে ধর্মান্তরিত করছে, এটা তাদের পূর্ব ইতিহাসের ধারাবাহিকতামাত্র। রসুল (স.)-এর নবুওতের প্রথম যুগে ইসলামের প্রধান শত্রু ইহুদিদেরকে নিয়েই তিনি ব্যস্ত ছিলেন। তাই, খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের প্রতি সদ্ভাব বজায় রেখে চলাই ছিল তাঁর রাজনৈতিক 'পলিসি'। তারা এ সুযোগ গ্রহণ করে। হিজায, শাম, ইরাক, মোসোপটেমিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের খ্রিষ্টানরা এবং তাদের আশ্রয়দাতা হাবশা-রাজ, রোম সম্রাট ও গ্রীক রাজই ছিল ইসলাম ধর্ম ও আরব স্বাধীনতার প্রধান দুশমন। মুহাম্মদ (স.)-এর নবুওত লাভের সময় পবিত্র কুরআনের যে আয়াত নাযিল হয়েছিল[১৩৮] এবং এর পরও যে সুরাগুলো নাযিল হয়েছিল,[১৩৯] তাতে খ্রিষ্টান ধর্মবিশ্বাসের অসারতা কঠোরভাবে ঘোষিত হয়েছে। এছাড়া হিজরতের পর তাদের বিরুদ্ধে কয়েকটি যুদ্ধও সংঘটিত হয়েছিল।

উল্লেখ্য যে, ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে খ্রিষ্টানদের আক্রমণ আরম্ভ হয় প্রধানত দু'টি কারণে :

এক. রাজনৈতিক কারণে ও

দুই. যুদ্ধের ময়দানে।

কিন্তু মুসলমানদের কুস্তনতুনিয়া বিজয়ের পর থেকে পোপ পুরোহিতদের বিপুল বাহিনীও যুগপৎভাবে এই সংগ্রামে যোগদান করে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এ প্রচারণা চলতে থাকে অপ্রতিহতগতিতে। এটা ছিল মুসলিম জাহানের জন্য মারাত্মক আত্মবিস্মৃতির অভিশপ্ত যুগ। আমাদের দেশের এক শ্রেণির মুসলমান খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে আসছে বহুদিন থেকে। মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহের উল্লাহ[১৪০] তাঁর জীবদ্দশায় এর

---

১৩৮. হেরা পর্বতের গুহায় কুরআনের প্রথম পাঁচ আয়াত রসুল (স.)-এর উপর নাযিল হয়েছিল। "ইকরা বিইস্মি রাব্বিকাল্লাজি খালাকা ...।"
আয়াতগুলো, আলাকের প্রথম দিকের। আল্ কুরআন, সুরা আলাক, আয়াত ১-৫।

১৩৯. সুরা ফাতিহা, সুরা ইখলাস, সুরা আলাক।

১৪০. মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহের উল্লাহ যশোর জেলার অধিবাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন আলিম মানুষ। খিস্টান ধর্মের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে তিনি ক্ষুরধার লেখনী ধারণ করেন। তিনি গ্রন্থও রচনা করেন। এর মধ্যে 'মেহেরুল ইসলাম', 'রদ্দে খ্রিস্টিয়ান ও দলিলোল ইসলাম' গ্রন্থদ্বয় মুসলিম

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। এর পর আঞ্জুমান ওলামায়ে বাঙ্গালা' ব্যতীত খ্রিষ্টান মিশনারিদের অপতৎপরতার বিরুদ্ধে বাংলাদেশে তেমন কোনো আন্দোলন গড়ে ওঠে নি। এর জন্য প্রয়োজন, ইসলামের প্রচার-প্রসার এবং খ্রিষ্টান মিশনারিদের প্রচারণার যথার্থ প্রতিবাদ। অথচ মুসলমান সমাজের পক্ষ থেকে তেমন প্রতিবাদের সাড়াই নেই। বরং কেউ এদের তৎপরতার বিরুদ্ধে কথা বললে উল্টো তারই মুণ্ডপাত করার চেষ্টা করা হয়। অপরপক্ষে, তারা ইসলাম ধর্মের উপর বিভিন্ন কূট-কৌশলের মাধ্যমে জঘন্য আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। অসত্য ও অন্যায়ের আশ্রয় নিয়ে যিশু খ্রিষ্টের ও খ্রিষ্টান ধর্মের গুণগান প্রচার-প্রসার করছে। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ভাষায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে লক্ষ লক্ষ পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ ও প্রচার করা হচ্ছে নামমাত্র মূল্যে অথবা বিনামূল্যে। মাওলানা আকরম খাঁ সেই সময়ই আক্ষেপের সাথে বলেছিলেন :

> এই অভিশাপকে সহিয়া থাকা ও বহিয়া চলা আর সম্ভব হইতেছে না। কেহ যদি সঙ্গে আসুক খুব ভাল, অন্যথায় একাই চলিতে হইবে।[১৪১]

এরপর মাওলানা খ্রিষ্টান মিশনারিদের তৎপরতার বিরুদ্ধে তাঁর কার্যপদ্ধতি ঘোষণা করেন এভাবে :

১. খ্রিষ্টানরা ইসলাম ধর্মের, কুরআন মজিদের হযরত রসুলে করিম (স.)-এর বিরুদ্ধে যে-সব অপবাদ রটনা করে আসছেন, অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে সে সমস্তের সুসঙ্গত প্রতিবাদ করা।

২. হযরত ঈসার নামকরণে মিশনারিরা যে ধর্মের প্রচার করছেন, তাওরাত, ইঞ্জিল আখ্যা দিয়ে যে-সব পুঁথি-পুস্তক দুনিয়াময় প্রচার করে আসছেন। বস্তুত তাহা কোরআনের বর্ণিত আল্লাহর নাযিল করা তাওরাত ইঞ্জিল নহে। সেগুলোর অস্তিত্ব পৃথিবী হতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বহু বৎসর পূর্বে। ঐতিহাসিক ও দার্শনিক যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করা।

৩. যিশুর ক্রুশে আরোহণ, তার রক্ত বিশ্বাসী গোনাহগারদিগের নাজাতের ব্যবস্থা তাঁকে অতিমানবিক গুণের অধিকারী ঈশ্বরের অংশ বা পুত্র বলে গ্রহণ করা।[১৪২]

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, খ্রিষ্টান মিশনারিরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে সব অলীক কথার অবতারণা করেন তার অধিকাংশই সঞ্চিত হয়েছে মুসলিম সমাজে প্রচলিত পৌরাণিক পুঁথি-পুস্তক থেকে। উদাহরণ :

> মরা হাড় হাজার সালের
> আল্লার হুকুমে পারি জিলাইতে ফের।[১৪৩]

সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে। সমাজসেবা এবং খ্রিস্টান ধর্মের কবল থেকে ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানদের রক্ষা করাই ছিল তাঁর সাহিত্য কর্মের মূল প্রেরণা।

মুহাম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৩৯৫ বাং, পৃ. ৯২।

১৪১. আকবর খাঁ মোহাম্মদ, বাইবেলের নির্দেশ ও প্রচলিত খ্রিস্টানধর্ম ঢাকা, ১৯৬২ ভূমিকা দ্রঃ।

১৪২. প্রাগুক্ত, পৃ.- ৫।

১৪৩. শাহ্ গরীবুল্লাহ মরহুমের একখানা পুঁথির নাম আদম আশক'। আদম নামক এক ব্যক্তি এগুলির নায়ক। আদম ছিলেন নিজ স্ত্রীর প্রতি অতিমাত্রায় আসক্ত বা আশেক। স্ত্রীও ছিল তদ্রূপ। তাদের

www.pathagar.com

এখানে মৃত ব্যক্তির পচা হাড়গুলো হযরত ঈসা (আ.)-এর 'কুম বিইযনিল্লাহ' বলার সাথে সাথে মানুষরূপে জিন্দা হওয়ার কথা পুঁথির ভাষায় বলা হয়েছে। এই জাতীয় ভিত্তিহীন কিচ্ছা-কাহিনী দীর্ঘদিন দরে এক শ্রেণির উর্দু-বাংলা পুঁথি-পুস্তকে বহুলভাবে প্রচারিত থাকার ফলে বাংলার মুসলিম সমাজ সকল দিক দিয়ে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মিশনারিদের প্রভাব-প্রতিপত্তি দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার এটাও একটি কারণ।

হযরত ঈসা (আ.) ও যিশুখ্রিষ্ট এক ব্যক্তি নন

পবিত্র কুরআনে হযরত ঈসা (আ.)-এর যে বিবরণ দেয়া হয়েছে এবং বাইবেলে যে যিশু খ্রিষ্টের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁরা উভয় এক ও অভিন্ন বলে খ্রিষ্টানরা জোর প্রচারণা করে আসছেন। গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করলে প্রমাণিত হবে, এটা সত্য নয়। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, বাইবেলের যিশু হচ্ছেন হযরত ঈসার একটা পৌরাণিক ও পৌত্তলিক সংস্করণ। শৌল বা পৌল নামক জনৈক ইহুদির প্রতিষ্ঠিত নব সৃষ্টি। রোম সম্রাটের খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণের তথা ঈসা (আ.) প্রবর্তিত তাওহিদ ধর্মের সাথে Paganism বা মুশরেকি মতবাদের আপোষ-নিষ্পত্তির স্বাভাবিক কুফল। গণতন্ত্রের অবসানের পর সম্রাট কনসটেনটাইন রোম রাজ্যে পুনরায় যে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার ভিত্তিকে দৃঢ় করার জন্যই একটা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের মূল নায়ক ছিলেন এই পৌল মহাশয়। যাঁকে মুসলিম ইতিহাসের আবদুল্লাহ ইবনে-ছাবা বলা যেতে পারে। মাওলানা আকরম খাঁ'র মতে :

> খ্রিষ্টান ধর্ম বলে যে জিনিসটা বর্তমান দুনিয়ার সম্মুখে উপস্থিত করা হয়েছে, বস্তুত তাহা হইতেছে এই পৌলের আবিস্কৃত প্রবর্তিত একটা অভিনব ব্যাপার।[১৪৪]

এই জন্যেই হযরত ঈসা (আ.) সম্বন্ধে বাইবেলের বিবরণ ও কোরআনের বর্ণনার মধ্যে স্বাভাবিক কারণেই পার্থক্যের উদ্ভব হয়েছে। পৃথিবীব্যাপী খ্রিষ্টান মিশনারিদের তৎপরতার ফলে তাদের যে সফলতা আজ দেখা দিয়েছে, তাদের এই অপতৎপরতা থেকে বাঁচার জন্য মুসলিম সমাজকে প্রতিকারের ব্যবস্থা নিতে হবে। এ প্রসঙ্গে আকরম খাঁ জোর দিয়ে বলেন :

> করিতে হইবে', 'নিতে হইবে', বলে বসে থাকলে চলবে না। আজই, এখনই তাহা আরম্ভ করিয়া দিতে হইবে। নিজের সামান্য শক্তি নিয়া আমি তাহা আরম্ভ করিয়া দিয়াছি।[১৪৫]

মধ্যে কথা ছিল, যে আগে মরবে পরেরজন বিয়ে আর করবে না। অতঃপর স্ত্রীর আগে মৃত্যু হলে স্বামী স্ত্রীর কবরের পাশে ১৪ বছর পর্যন্ত কাটিয়ে দেয়ার পর আল্লাহ হযরত ঈশা (আ.)-কে তাঁর কাছে পাঠান। ঈসা (আ.) তাকে পচা হাড়গুলো তুলে আনতে বলেন। আনার সাথে সাথে তিনি তাঁকে জিন্দা করে দিলেন। স্ত্রী জিন্দা হয়ে এক রাজপুত্রের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন, আদম তার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করলেন এবং স্বামী হিসেবে হযরত ঈসার নাম দিলেন। কিন্তু বাদশাহের দরবারে বিবি আদমকে অস্বীকার করলে হযরত ঈসা (আ.) তাঁকে আবার মৃত করে শুকনো হাড়ে পরিণত করে দেন। মানুষের জীবন, মরণের ব্যাপারে ঈসা নবির কতখানি অধিকার আছে 'কাছাছুল আম্বিয়া' কেতাবে তা জানা যায়।
মোহাম্মদ আকরম খাঁ, বাইবেলের নির্দেশ ও প্রচলিত খ্রিস্টান ধর্ম, প্রাগুক্ত, ১৯৬২, পৃ. ৪-৫।

১৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২।

১৪৫. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

খ্রিষ্টান পাদ্রি-পুরোহিতরা তাঁদের ধর্ম প্রচার করার ও অন্য ধর্মের লোকদেরকে স্বধর্মে দীক্ষিত করার জন্য দীর্ঘকাল থেকে চেষ্টা করে আসছেন। তারা এদেশের হতভাগ্য ছিন্নমূল অর্ধশিক্ষিত, কুশিক্ষিত এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবীদেরকেও নানা প্রলোভনে অন্ধকার (তাদের ভাষায়) থেকে আলাদা দিকে মুক্তি ও মঙ্গলের পথে টেনে এনেছে। ধনবল-জনবল ও প্রচারণার কলাকৌশল তাঁদের মোকাবেলায় মুসলমানদের না থাকলেও এ কথা সত্য, মুসলমানদের রয়েছে সত্যোর শক্তি, যুক্তি-প্রমাণের শক্তি, আল্লাহর কালামের শক্তি, ঈমানের শক্তি এবং তাওহীদের অব্যয়, অক্ষয় ও অজেয় শক্তি। অথচ মুসলিম সমাজ ঐ সব শক্তির অস্তিত্বের কথা আজ ভুলে বসেছে। আমরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে ভুলেছি, তাঁর কিতাব ও হাদিসকে বিসর্জন দিয়েছি। মাওলানা মুসলিম জাতির অধঃপতনের কথা উল্লেখ করে বলেন :

> আমরা একদল হাদীছের দোহাই দিয়া কোরআনের শিক্ষাদানে উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছি। আবার হাদীছের নামকরণে যে সব মিথ্যা, মাওজু ও সর্ব্বনাশকর অপকথা ও উপকথা আমাদের তাফছীরে, ইতিহাসে, কাছাছুল আম্বিয়া জাতীয় পুঁথি-পুস্তকে সঞ্চিত হইয়া আছে- আল্লাহর দেয়া মুক্ত জ্ঞান আড় করিয়া ফেলিয়া রসুলের সতর্কবাণীগুলিকে ধামাচাপা দিয়া... সর্ব্বস্ব পঙ্গু পল্টনে পরিণত করিয়া রাখিয়াছি।[১৪৬]

মাওলানা আধুনিকপন্থি তথা অতি প্রগতিবাদিদের যারা শুধু ধর্মের মধ্যে খুঁত তালাশ করেন, অথচ ধর্মের কোনো কাজই তাদের দ্বারা কোনোদিন হয় নি, তাদের সম্পর্কে বলেন :

> আর একদল ঘরে তেলাকাটার উৎপাত হইতে দেখিয়া ঘরে আগুন দিয়া সমস্ত ঝঞ্ঝাট মিটাইয়া বসিতে চাহিতেছেন। এ জন্য আমার সুচিন্তিত ও দৃঢ় অভিমত, কোরআন মজীদের ... আলোকে ... এই অন্ধকার জীবনের সকল দিক হইতে দূর করিয়া দিতে হইবে-খ্রিষ্টান প্রচারণার প্রাদুর্ভাব আপনা-আপনিই বিলুপ্ত হইতে থাকিবে।[১৪৭]

বর্তমান বিশ্ব মুসলিম সমাজের ভাবা উচিত, খ্রিষ্টানদের আচার-আচরণ ও ব্যবহার এবং তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি আমাদের মন-মস্তিষ্কে ক্রমান্বয়ে অনুপ্রবেশ করছে। এটা অবশ্যই দুশ্চিন্তার বিষয়। তাদের এই ক্রমবর্ধমান আক্রমণের গতিধারা যদি প্রতিহত করা না যায়, তাহলে এর ফলশ্রুতিতে কোথায় থাকবে মুসলিম জাতিসত্তা, আর কোথায় থাকবে মুসলমানদের সোনালি যুগের সেই ইসলামি রাষ্ট্র। অবশ্য, আমরা বিশ্বাস করি, الاسلام يعلو ولا يعلى। জ্ঞানের ধর্ম, প্রেমের ধর্ম, যুক্তি-প্রমাণের ধর্ম আল্লাহর প্রবর্তিত সত্য ধর্ম-এই ইসলাম অসত্যের মোকাবেলায় কোনো অবস্থাতেই অবনমিত হয় নি, হবে না, হতে পারে না।[১৪৮]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, মুসলমানদের এই অবনতির জন্য কেবলমাত্র খ্রিষ্টান মিশনারিরাই দায়ী নয়। মুসলমানরাও এর অংশীদার। মুসলমানদের রচিত বাংলা, উর্দু, ফার্সি পুঁথি-পুস্তকে বহু মারাত্মক উপকথা রয়েছে যা ইসলাম-বিরোধী আকীদার জন্ম দিয়েছে। মুসলিম সমাজে বিশেষত মুসলিম বাংলায় তারা খ্রিষ্টানি ভাবধারার প্রচার

---

১৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।
১৪৭. প্রাগুক্ত।
১৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।

www.pathagar.com

প্রসারের জন্য একটা সহজ কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত রাখার যথেষ্ট সহায়তা করে আসছে বহুদিন যাবৎ। এছাড়া, আমাদের তাফসিরের কিতাবসমূহে এবং পুরাকালের ইতিবৃত্ত সংক্রান্ত বই-পুস্তকে আহলে কিতাবদের পৌরাণিক উপকথা বহুল পরিমাণে অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এটা বিজ্ঞ আলিমদের সর্বস্বীকৃত মত। স্বয়ং রসুল (স.) উম্মতকে পূর্ব থেকেই এ সম্পর্কে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে ইরশাদ করেছেন :

عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم حين اتاه عمر فقال انا نسمع احاديث من يهود تعجبنا الفترى ان تكتب بعضها! فقال صلى الله عليه وسلم امتهو كون كما تهوكت اليهود والنصارى! لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حياما وسعه الا اتباعى. احمد, بيحقى, مشكوة.

> অর্থাৎ, হযরত জাবির সেই সময়ের কথা বলছেন, যখন হযরত ওমর (রা.) রসুল (স.)-কে বললেন, আমরা ইহুদির মুখে এমন সব কথা শুনে থাকি, যা আমাদের নিকট আশ্চর্যজনক মনে হয়। আমরা কি এর কোনো কোনোটা লিখে রাখতে পারি? হযরত (স.) উত্তর করলেন : তোমরা কি ইহুদি খ্রিষ্টানদের মত দিশেহারা হয়ে পড়েছ? নিশ্চয়ই জেনে রাখ মুসা যদি জীবিত থাকতেন তা হলে আমার আনুগত্য করা ব্যতীত তাঁর গত্যন্তর থাকতো না।[১৪৯]

জাবির (রা.) থেকে এ সম্পর্কীয় গুরুত্বপূর্ণ অন্য হাদিসও বর্ণিত হয়েছে :

> একদা হযরত ওমর ফারুক (রা.) তাওরাত কিতাবের একটি 'নোস্খা' সঙ্গে নিয়ে রসুল (স.)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন : হে আল্লাহর রসুল ! এটি তাওরাতের একটি 'নোস্খা'। শুনে রসুল (স.) চুপ করে রইলেন, তখন ওমর (রা.) সেই 'নোস্খা' পাঠ করতে লাগলেন। অথচ হযরতের চেহারার ভাব পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছিল, তখন হযরত আবু বকর (রা.) হযরত ওমর (রা.)-কে (সতর্ক করে দিয়ে) বললেন : ওমর ! কি করছ, হযরতের চেহারার প্রতি লক্ষ্য করছ না? ওমর ফারুক (রা.) নবি করিম (স.)-এর চেহারার প্রতি লক্ষ্য করে অনুতপ্ত স্বরে বললেন আল্লাহর গযব হতে এবং রসুলের গযব হতে (রক্ষা পাওয়ার জন্য) আল্লাহর স্মরণ করছি। আমরা সন্তুষ্ট মনে গ্রহণ করছি আল্লাহকে নিজেদের প্রভু হিসেবে। ইসলামকে নিজেদের দ্বীন হিসেবে এবং মোহাম্মদ (স.)-কে নিজেদের রসুল হিসেবে। সে সময় রসুল (স.) (সকলকে সম্বোধন করে) বলেন : মুহাম্মদের জান যাঁর হাতে, সেই আল্লাহর কসম, স্বয়ং মূসা যদি তোমাদের সম্মুখে প্রকাশ হতেন আর তোমরা আমাকে ছেড়ে তাঁর তাঁবেদারী করতে তা হলেও তোমরা নিশ্চয় সৎপথ হতে ভ্রষ্ট হয়ে যেতে। আর মুসা নবি যদি আমার নবুওতকালে জীবিত থাকতেন এবং আমার নবুওয়তকাল প্রাপ্ত হতেন, তা হলে তিনি আমার আনুগত্য করতেন।[১৫০]

হাদিসদ্বয়ে পূর্বোল্লিখিত পুঁথি-পুস্তকের উপকথা ও খ্রিষ্টান মিশনারিদের ভিত্তিহীন অপতৎপরতা এবং জাল ও দুর্বল হাদিস বর্ণনাকারীদের অসারতা প্রমাণিত হয়েছে।

---

১৪৯ . আহমদ, বায়হাকী, মিশকাত, পৃ. ৩০।

১৫০ . মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মাওলানা, বাইবেলের নির্দেশ ও প্রচলিত খৃষ্টান ধর্ম, ঢাকা, ১৯৬২, পৃ. ১১।

www.pathagar.com

খ্রিষ্টান মিশনারিদের বিরুদ্ধে মাওলানা ১৯১৩ সালে 'যিশু কি নিষ্পাপ' বইটি রচনা করেন। তখন তিনি আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালার' সেক্রেটারি ছিলেন।[১৫১] সংস্থার তিন নম্বর ধারায় ছিল :

> খ্রিষ্টান আর্য প্রভৃতি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের পক্ষ থেকে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচারিত মিথ্যা অপবাদের প্রতিবাদ প্রকাশ করে বিনামূল্যে বিতরণ করা।

> আর সে জন্যেই, মাওলানা উপরোক্ত বইটি প্রকাশ করেন। অবশ্য সে সময় খ্রিষ্টান পাদ্রীগণের বিরুদ্ধে 'প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব' নামে একটি বইও প্রকাশিত হয়েছিলো।[১৫২]

মূলকথা, আঞ্জুমানের' প্রতিষ্ঠাই ছিল, খ্রিষ্টান মিশনারি অপতৎপরতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। আকরম খাঁ তারই ধারাবাহিকতায় দীর্ঘদিন পর ১৯৬২ সালে 'বাইবেলের নির্দেশ ও প্রচলিত খ্রিষ্টান ধর্ম' বইটি প্রকাশ করেন। বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর সরাসরি লন্ডন থেকে এক পাদ্রী মাওলানার সাথে সাক্ষাৎ করেন।[১৫৩]

উক্ত গ্রন্থে আকরম খাঁ যিশুখ্রিষ্ট ও তাদের ধর্মীয় গ্রন্থসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। যেমন- মথি, মার্ক, লুক ও যোহন লিখিত সুসমাচার বা ইঞ্জিল নামে খ্রিষ্টানগণ যে প্রচারণা চালিয়ে আসছে, এগুলো কুরআনে বর্ণিত ইঞ্জিল নয়।[১৫৪] কারণ খ্রিষ্টান মিশনের কয়েকজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তিও ঐসব পুস্তকের সংশোধনের দাবি করেছেন।[১৫৫] বাইবেলের অনুবাদকও স্বীকার করেছেন : মথির ব্যক্তিগত জীবনের বিশেষ কোনো পরিচয় পাওয়া যায় নি। মথি কোন ভাষায় এই প্রথম 'ইঞ্জিল' বা সুসমাচারখানা রচনা করেছিলেন, সে সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। অনেকের মতে, মথি লিখিত হয়েছে ইবরানী ভাষায়, খ্রিষ্টানদের হাতে এসেছিল 'গ্রিক অনুবাদ'।

মাওলানা বলেন :

> আমরা পেয়েছি গ্রিক অনুবাদের ইংরেজী ও আরবি অনুবাদ। আর সেই অনুবাদের বাংলা, উর্দু প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদিত বাইবেলের Authorised Version- এর সংশোধিত ভার্সনের অনুবাদ। এইভাবে 'সাত নকলে আসল খাস্তা' মথি নামক জনৈক অজ্ঞাত পরিচয় মানুষের লিখিত ইনজিলের বা সুসমাচারের একটা অনুবাদ- আল্লাহ কর্তৃক হযরত ঈসার নাযিল করা ইনজিল নয়।[১৫৬]

যিশুখ্রিস্টের পিতৃহীন জন্মগ্রহণ সম্পর্কে খ্রিষ্টানদের দাবিকে অসারতা প্রমাণ করে মাওলানা বলেন :

> খ্রিষ্টান বাইবেলগুলোর আলোচনা করলে জানা যাবে যে, যিশুর বিনা বাপে জন্মগ্রহণ করার উপাখ্যানটি পরবর্তী পর্যায়ের পাদ্রী পুরোহিতদিগের উদ্দেশ্যমূলক কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এবরানী ও আরবি ভাষার সিদ্ধান্ত ইহাই। তখনকার

---

১৫১. ড. সুনীল কান্তি দে, আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা, কোলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ১৫।

১৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

১৫৩. সাক্ষাৎকার- মোঃ বদরুল আনাম খাঁ (আকরম খাঁর পুত্র), আজাদ অফিস, ঢাকেশ্বরী রোড, ঢাকা, তাং- ১০/১/৯২, সময় সকাল ১০টা।

১৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

১৫৫. প্রাগুক্ত।

১৫৬. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, বাইবেলের নির্দেশ ও প্রচলিত খৃষ্টান ধর্ম, ঢাকা, ১৯৬২, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

www.pathagar.com

স্থানীয় জনসাধারণের সমবেত সাক্ষী এটাই। এবং স্বয়ং যিশু খ্রিস্টের ও তাঁর সাধ্বী জননী বিবি মরিয়মের লক্ষ্যও ইহাই।[১৫৭]

যিশুর পিতৃহীন জন্ম হবার থিওরিটি হচ্ছে খ্রিষ্টান ধর্মের মূল ভিত্তি। তার Original Sin বা মৌরূসী পাপের ধারণা, যিশুর ক্রুশে নিহত হবার কল্পনা, যিশুর রক্তে বিশ্বাস করলেই মানুষের সমস্ত পাপ মাফ হয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি এবং সে জন্য গোনাহ্ বা পুণ্য অর্জনের অর্থাৎ, কোনো আমল না করার কিছুই সার্থকতা নেই বলে আশ্বাস দেন। খ্রিষ্টান মিশনারিরা মুসলমানদিগকে স্বধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা করছেন এ শ্রেণির যুক্তি-প্রমাণের উপর নির্ভর করে।[১৫৮]

যিশু যে জনকের সংশ্রব ব্যতীত জন্মগ্রহণ করেন নি, বরং তাঁর জন্ম হয়েছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে, তাঁর পিতা যোসেফের ঔরসে। নিম্নে তার কতগুলো প্রমাণ যথাসম্ভব বাইবেল হতে উদ্ধৃত করছি :

যোহন' হচ্ছেন যিশুর প্রথম শিষ্য ও তাঁর শুভাগমনের প্রথম ঘোষণাকারী। তিনি রূহ্ বা আত্মা নামক বস্তুটাকে কবুতরের আকারে স্বর্গ হতে নেমে আসতে ও যিশুর উপর অবস্থান করতে দেখেছিলেন। এই যোহন বা *ইউহার চেষ্টায়* যিশুর প্রকাশ্য প্রচারের অব্যবহিত পূর্বে ফিলিপ প্রভৃতি লোককে তিনি তাঁর (যিশুর) নামে দীক্ষা প্রদান করেন। ... 'পরদিন যিশু গালিলে যাবার সময় ফিলিপের দেখা পেলেন। আর বললেন আমার পশ্চাতে আস।[১৫৯] এই যাত্রাকালে 'নথলেন' নামক এক ব্যক্তিও ফিলিপের সঙ্গী হলেন। সে সময় ফিলিপ 'নথনেলকে' বললেন : মোশি ও অন্যান্য ভাববাদীগণ যাঁর কথা লিখেছেন, আমরা তাঁর দেখা পেয়েছি।

وهو يسوع بن يوسف الذى من الناصرة.

তিনি যোশেফের পুত্র নাসরতীয় যিশু।[১৬০]

অতএব ইহুদিগণ তাঁর বিষয়ে বচসা করতে লাগলো। কেননা তিনি বলেছিলেন, আমি সে খাদ্য যা স্বর্গ হতে নেমে এসেছি। তারা বললো, এ কি যোশেফের পুত্র, যার পিতা-মাতাকে আমরা জানি? অতএব তিনি কি করে বলতে পারেন, আমি আসমান হতে নেমে এসেছি।

فجعل اليهود يتذمرون عليه لانه قال انى انا الخبذ الحى نزلت من السماء

আমি সেই জীবন্ত রুটি যা আসমান হতে নেমে এসেছে।'[১৬১]

---

১৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।
১৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।
১৫৯. প্রাগুক্ত।
১৬০. যোহন, পৃ. ১-৪৫।
প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।
১৬১. আর তিনি (যিশু) স্বদেশে এসে লোকদের সমাজগৃহে উপদেশ দিতে লাগলেন, তাতে তারা চমৎকৃত হয়ে বললো, এর এমন জ্ঞান ও এমন পরিক্রম কোথা হতে এলো ! একি সূত্রধরের পুত্র নয়? এর মাতা কি মরিয়ম নয়? এবং যাকোব, যোশেফ, শিমোন ও যিহুদা কি এর ভ্রাতা নহে, আর এর ভগ্নীরা কি সকলে আমাদের কাছে নয়?
প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০-৩১, মথি, পৃ. ১৩-৫৪, ৫৫।
শামী বা Syriac ভাষায় লিখিত বাইবেলের একখানা পুরাতন মুসাবিদা কিছুকাল পূর্বে দু'জন খ্রিষ্টান মহিলা কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়। এই মুসাবিদা রক্ষিত হয়েছিল সিনাই পর্বত বা 'তুরে সিনার' খ্রিস্টান যাজকদের আশ্রমে। মিসেস লুইস ও মিসেস গিবসন (Lewis, Gibson) আবিষ্কৃত এই

এতে প্রমাণিত হয়, যিশুর জীবনকালে এমন কি তাঁর নবি জীবনের প্রারম্ভকালেও তাঁরই স্বজাতীয় ইহুদিরা বিশ্বস্তভাবে জানত যে, যিশু যোশেফের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এ অধ্যায়টি সম্পূর্ণ পড়লে এটাও পরিষ্কার হয়ে যাবে। আলোচ্য সম্মেলনে বহু ইহুদির সমাগম হয়েছিল। কিন্তু যিশু ঘুণাক্ষরেও এর প্রতিবাদ করেন নি।

যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা

মাওলানা তাঁর গ্রন্থে যিশুর ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে নিহত হবার অলীক ঘটনাটি সংযোজন করেছেন। তিনি বাইবেলের উদ্ধৃতি ও সমসাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনা দিয়ে এটা একটি কল্পকাহিনী হিসেবে বিশদ বিবরণের মাধ্যমে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। বাইবেলের পুরাতন নিয়মে বলা হয়েছে :

> যদি কোনো মানুষ প্রাণদণ্ডযোগ্য পাপ করে আর তার প্রাণদণ্ড হয় এবং তুমি তাকে (ক্রুশ) কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দাও, তবে তার 'শব' রাত্রিতে (ক্রুশ) কাষ্ঠের উপর থাকতে দিবে না, কিন্তু নিশ্চয়ই সেদিনই তাকে কবর দিবে; কেননা যে ব্যক্তিকে (কাষ্ঠে) টাঙ্গান যায়, সে ঈশ্বরের দ্বারা অভিশপ্ত; তোমার ঈশ্বর সদা-প্রভু অধিকারার্থে যে ভূমি তোমাকে দিতেছেন; তুমি তোমার সেই ভূমি অশুচি করবে না।[১৬২]

আরবি বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে :

وان اذنب رجل ذنبا يستوجب القتل .... اعطاك الرب الا الخ

অর্থাৎ, এবং কোনো ব্যক্তি যদি এমন কোনো অপরাধ করে, যাতে প্রাণদণ্ড নিশ্চিত! সে অবস্থায় যদি বিচারে তার মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দেয়া হয় এবং তাকে কাষ্ঠের উপর ঝুলিয়ে দেয়া হয়, তার 'শব' কাঠের উপর থাকতে দিবে না, সেদিনই তাকে দাফন করে ফেলবে। কারণ যাদেরকে কাষ্ঠে লটকান হয় তাদের প্রত্যেক ব্যক্তিই আল্লাহ্ কর্তৃক মাল'উন (অভিশপ্ত) আর তোমার প্রভু পরওয়ারদিগার যে ভূমি তোমাকে উত্তরাধিকার সূত্রে দান করেছেন; (এই আদেশ অমান্য করে) তুমি তাকে নাপাক করবে না।[১৬৩]

উপরের উদ্ধৃতি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ক্রুশ বা কাঠের উপর যাদের মৃত্যু হয় তারা মাল'উনরূপে পরিগণিত হয়। এমন কি, তার লাশ পর্যন্ত নাপাকরূপে গণ্য করা হয়। অথচ খ্রিষ্টান মিশনারি সম্প্রদায় বলছেন: যিশুকে ক্রুশে নিহত করা হয়েছিল।' অবশ্য, এ কথা না বললে খ্রিষ্টান ধর্মের মূল ভিত্তিটাও নড়বড়ে হয়ে যায়। আকরম খাঁ বলেন :

> এরূপ অবস্থায় খ্রিষ্টান প্রচারকদের হয় স্বীকার করতে হবে যে, ক্রুশে মৃত্যু হওয়ায় যিশু আল্লাহর নির্দেশ মতে মালউন ও নাপাক হয়েছেন, না হয় বলতে হবে, যিশু ক্রুশের উপর প্রাণত্যাগ করেন নি। প্রথম অবস্থায় তাদের বর্ণিত যিশুর সমস্ত

মুসাবিদায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে যে, "Jesus father was Goseph and his mother Mary" অর্থাৎ, যিশুর পিতা যোশেফ এবং তার মাতা মেরী।

Lewis the old syriac Gospel-2
মোহাম্মদ আকরম খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃ.-৪০।

১৬২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।

১৬৩. উপরোক্ত বক্তব্যে আরবী خشبة শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে- যার আভিধানিক অর্থ কাষ্ঠনির্মিত কোন পদার্থ। ইসরাঈলদের ধর্মীয় পরিভাষায় এর অর্থ দাঁড়ায় صليب বা ক্রুশ কাষ্ঠ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

www.pathagar.com

> বৈশিষ্ট্য, একেবারে নস্যাৎ হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয় অবস্থায় বাইবেলের বর্ণনাগুলো সমস্তই মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হবে।[১৬৪]

যিশুর ক্রুশে মৃত্যু হওয়া, তাঁর লাশ সমাধিস্থ হওয়া এবং আবার জীবন্ত উত্থান করা সম্পর্কে বাইবেলে যে-সব বর্ণনা দেয়া হয়েছে সেগুলো এত পরস্পরবিরোধী এবং এমন অযৌক্তিক যে, পাশ্চাত্যের বিশিষ্ট মনীষীগণও তাকে অবিশ্বাস্য, আজগুবি, ভিত্তিহীন বলে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলছে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় 'বাইবেলিকা' বিশ্বকোষের নিম্নের উদ্ধৃতির মাধ্যমে :

> The sealing and watching of the sepulchre (M. 27-62-66, 28411-15) is now very generally given up even by those scholars who still hold by the resurrection narratives as a whole.[165]

অর্থাৎ, যে-সব পণ্ডিত ব্যক্তি পুনরুত্থান পর্বের গল্পকে সত্য বলে জানতেন, তাঁরাও সকলে যিশুর কবরের উপরে মুদ্রাঙ্কন করা এবং সে কবরটি (রক্ষণাবেক্ষণের জন্য) পাহারা দেয়ার কথাকে অমূলক মনে করছেন। তারা বলছেন :

> "The whole story is a very late production."[১৬৬]

অর্থাৎ, সম্পূর্ণ গল্পটাই বহুকাল পরে রচিত হয়েছে।

যিশুর স্বর্গারোহণ

খ্রিষ্টান ধর্ম যে ক'টি বিশ্বাস ও সংস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বের দাবি রাখে যে ক'টি বিষয় তা হচ্ছে, ১. বিনা বাপে তার জন্মগ্রহণ, ২. ক্রুশবিদ্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যু, ৩. তৃতীয় দিনে কবর থেকে জিন্দা হওয়া, ৪. ভৌতিক দেহে স্বর্গারোহণ।

এ পর্যায়ে আমরা যিশুর 'স্বর্গারোহণ' সম্বন্ধে আলোচনা করছি। মাওলানা আকরম খাঁ তাঁর গ্রন্থের শেষ পর্যায়ে 'যিশুর স্বর্গারোহণ' সম্পর্কে তথ্যনির্ভর বিশ্লেষণধর্মী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আলোচনার প্রারম্ভেই তিনি বলেছেন :

> ভক্তি যেখানে অন্ধ, যুক্তি সেখানে অচল। রাজনৈতিক স্বার্থবিরোধ যেখানে সত্যের আসন অধিকার করে বসে, বিচার বিবেকের সেখানে 'প্রবেশ নিষেধ'।[১৬৭]

মাওলানা সাধারণ যুক্তি-প্রমাণকে বাদ দিয়ে সরাসরি বাইবেলের উদ্ধৃতি দিয়ে যাবতীয় অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন করেছেন।

বাইবেলের প্রমাণ থেকেই দেখা যায়, মথি ও যোহন এ দু'জনের কেউই যিশুর স্বর্গারোহণ সম্পর্কে কোনো কথাই বলেন নি। এতে প্রমাণিত হয়, এ দু'জন বাইবেলের লেখক তথাকথিত স্বর্গারোহণের ব্যাপারে কিছুই জানেন না, তা না হলে এত বড় ঘটনা তারা কেন উপেক্ষা করবেন? এ ঘটনার উল্লেখ করে লুক বলছেন :

> কয়েকজন ভক্ত কবরের আশেপাশে যিশুর 'মৃত দেহের' সন্ধান করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, এমন সময় দু'জন পুরুষ তাদের নিকট এসে বললেন-তোমরা

---

১৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।

১৬৫. Ency. Bibalica. Vol. VI, P.4065.

১৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৬৫।

১৬৭. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, বাইবেলের নির্দেশ ও প্রচলিত খ্রীস্টান ধর্ম, ঢাকা-১৯৬২, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫।

www.pathagar.com

মৃতদের মধ্যে জীবিত অন্বেষণ করছ কেন? তিনি এখানে নেই, কিন্তু ওঠে গেছেন....।[১৬৮]

উল্লেখ্য, চারখানা বাইবেলের মধ্যে দু'খানার লেখক মথি ও যোহন। তারা কেউই স্বর্গারোহণ সম্পর্কে কিছুই আভাস পেলেন না, বরং যোহনের বর্ণনা হতে জানা যায়, যিশুর হাওয়ারিগণ তাঁকে 'কবর' হতে অপসারিত করার পর কোথায় নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর সদা-সজাগ আপন শিষ্যমণ্ডলী তা জানতে পারেনি। এ ব্যাপারের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য হিসেবে গৃহীত 'মগদলিনী-মরয়ম' কবর তদন্তের পর শিমোন পিটারকে বলছেন :

লোকে প্রভুকে কবর হতে তুলে নিয়ে গিয়েছে তাঁকে কোথায় রেখেছে তা আমরা অবগত নই। লুকের পূর্বোল্লিখিত বর্ণনায় স্বর্গারোহণের কথা বর্ণিত হলেও তা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য এবং ঐতিহাসিক ও দার্শনিক বিচারের দিক দিয়েও একটা অলীক কল্পনামাত্র। বাইবেলের ব্যাখ্যাকার G. R. Dummelow স্বর্গারোহণ বর্ণনার আলোচনা প্রসঙ্গে বলছেন, "after ancient authorities omit these words" প্রাচীন অথরিটিদের কতিপয় এই অংশের উল্লেখ করেন নি।[১৬৯]

এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, পরে এইরূপ হলো তিনি (যিশু) আশীর্বাদ করতে করতে তাঁদের হতে পৃথক হলেন এবং উর্দ্ধে স্বর্গে নীত হতে লাগলেন।[১৭০]

মূলত লূকের বর্তমান সংস্করণে বর্ণিত এই অংশটা পরবর্তী যুগের প্রক্ষিপ্ত বা অতিভক্তদের অন্যায় সংযোজন। মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ বিভিন্ন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, উপমা-উৎপ্রেক্ষা দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, বাইবেল নামীয় চারখানা নব সংস্করণ-মথি, মার্ক, লুক, যোহন-এ সব গ্রন্থের দ্বারা যিশুর স্বর্গারোহণের ঘটনা আদৌ প্রমাণিত হয় না।

চিত্রকলা

মাওলানা আকরম খাঁ ছিলেন অনুসন্ধিৎসু গবেষক। সমাজ জীবনের উদ্ভূত সমস্যার তিনি শরী'য়তের নিরিখে সমাধানের চেষ্টা করেছেন। চিত্রকলা নিয়ে আমাদের সমাজে এক সময় ইসলামি চিন্তাবিদদের মধ্যে মতভেদের ঝড় ওঠে। এ ব্যাপারে মাওলানা আকরম খাঁ যুক্তিনির্ভর আলোচনা করেছেন।

জীব-জন্তুর ছবি আঁকা, মূর্তি তৈরি করা বা এসবের ব্যবহার ইসলামে বৈধ কি-না, এ নিয়ে চিন্তা, গবেষণা, আলোচনা-সমালোচনা দীর্ঘদিন যাবৎ চলে আসছে। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ নিয়ে ইসলামি চিন্তাবিদগণ আলোচনা চালিয়ে আসছেন। আমাদের জানা মতে, এ বিষয়ে যুক্তিপ্রমাণ দিয়ে সর্বপ্রথম স্বাধীনভাবে আলোচনা করেন মিসরের বিখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ মরহুম মুফতি মুহাম্মদ আব্দুহু। এরপর তাঁর প্রধান শিষ্য আল্লামা রশীদ রেজা পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে প্রামাণ্য দলিল সহকারে এর উপর বিশ্লেষণধর্মী ব্যাখ্যা প্রচার করেন।[১৭১] এ ছাড়া মিসর, সিরিয়া, ত্রিপলির বিখ্যাত আলিমগণ চিত্রকলা সম্পর্কে এ সিদ্ধান্তে পৌছেছেন :

---

১৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬।
১৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮।
১৭০. প্রাগুক্ত।
১৭১. মুহাম্মদ আবদুহু মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিক, মিসরের আধুনিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা, আল-উরয়াতুল-উসকা' নামক সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা এবং ঐ নামের মুখপত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক।

www.pathagar.com

> জীব-জন্তুর ছবি তোলা, আঁকা, ছাপা বা সেগুলোর ব্যবহার করা ইসলামের বিধান অনুসারে নিষিদ্ধ হতে পারে না। এমন কি জীবজন্তুর মূর্তি গড়া ও তার ব্যবহার নিষিদ্ধ নয়।[১৭২]

অবশ্য তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলেছেন :

> কোনো প্রকার পৌত্তলিকতার উদ্দেশ্যে যে চিত্র বা মূর্তি প্রস্তুত করা হবে, অথবা যে চিত্র বা মূর্তিকে অবলম্বন করে জাতির মধ্যে কোনোক্রমে পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় লাভের আশংকা থাকবে, তা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ও সর্বতোভাবে বর্জনীয়।[১৭৩]

আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শেখ, মুফতি ও ইমামগণ ছবি উঠাতে বা অন্যের ছবি ব্যবহার করতেও আপত্তি করেন না।[১৭৪] এ প্রসঙ্গের অবতারণা করে মাওলানা আকরম খাঁ বলেন :

> নজদের প্রধান প্রধান আলেম এবং 'ইখওয়ান' (ওহাবি) সম্প্রদায়ের শাইখুল ইসলাম আল্লামা আবদুল্লাহ বেন্ বোলাএহেদ-এর নিকট ইচ্ছাপূর্বক এই প্রসঙ্গের উত্থাপন করি। বিরুদ্ধ মতের সমর্থক হিসাবে অন্যপক্ষের (ছবির বিপক্ষে যারা) যুক্তি-প্রমাণগুলোর অবতারণা করিয়া ইহাদের কাজে নিন্দা করিতে থাকি। কিন্তু ইহারা আমার কথাগুলির বিশেষ গুরুত্ব না দিয়া সেগুলি হাসি-ঠাট্টায় উড়াইয়া দিতে চাহিলেন। একজন বলিলেন, শেখ ! দর্পণ ব্যবহার করা কি আপনারা হারাম মনে করেন? আর একজন বললেন- হজ্বে আসার সময় যে নোট ও টাকা আনিয়া ছিলেন, তাহাতে কি কাফের বাদশার মূর্তি আঁকা নাই? সেই বুৎগুলি সঙ্গে লইয়া কা'বার হরমে প্রবেশ করিতেছেন কি করিয়া? ... বুঝিতে পারিলাম যে, নজদের 'অতি গোঁড়া' আলেমরাও ফটো চিত্রগুলিকে সম্পূর্ণভাবে নির্দোষ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন।[১৭৫]

উপমহাদেশের বেশির ভাগ আলিম সাধারণত ছবি তোলা, ছবি আঁকা, ছবি ছাপা ও ছবি রাখাকে মারাত্মক অন্যায় মনে করেন। এ জন্য বিপরীত মতাবলম্বী দু'টি দল সৃষ্টি হয়েছে। একদল আলিম মনে করেন, জীবজন্তুর ছবি উঠালে এবং এগুলো ব্যবহার করলে মানুষ পৌত্তলিক বা মুশরিক হয়ে যায়। আবার আধুনিক শিক্ষিত একদল চিত্রকলার সূত্র ধরে নিজেদের শিষ্যদেরকে ইসলামের বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে বলছেন-

> ইসলাম এখানে অচল হয়ে পড়েছে। আজ আর যুগধর্মের সাথে তাল রেখে চলতে পারছে না। তাই যুগ-ধর্মের সঙ্কেত অনুসারে পুরাতন ইসলামকে নিজেদের প্রয়োজনমত কাটছাঁট করে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।[১৭৬]

মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে তাঁর 'সমস্যা ও সমাধান' গ্রন্থে 'চিত্রকলা ও এছলাম' প্রবন্ধে ব্যাপক আলোচনা করেন। পবিত্র কুরআন ও হাদিসের দলিল- প্রমাণ ছাড়াও তিনি মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন ইসলামি চিন্তাবিদের

---

১৭২. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, সমস্যা ও সমাধান, কোলকাতা, অনুঃ পৃ. ১০১।
১৭৩. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, সমস্যা ও সমাধান, কোলকাতা, সন অনুঃ পৃ. ১০১।
১৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩।
১৭৫. প্রাগুক্ত।
১৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪।

www.pathagar.com

সুচিন্তিত মতামত, যুক্তি এবং ভারতবর্ষের প্রখ্যাত আলিমগণের মতামত ও চিন্তাধারাসহ যুগ-ধর্মের আলাকে বিষয়টির বিশ্লেষণাত্মক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন।

এ প্রসঙ্গের অবতারণা করে মাওলানা তাঁর উক্ত প্রবন্ধ লেখার কারণ সম্পর্কে ভূমিকায় বলেন :

আমার সম্পাদনায় মাসিক মোহাম্মদী প্রকাশিত হইল সচিত্র আকারে। আমার এই 'কুমতি' দেখিয়া বাঙ্গলার আলেম সমাজের মধ্যে অনেকে সত্যসত্যই মর্মাহত হলেন। আমার ... ওস্তাদ ... মাঃ নেয়ামত উল্লাহ ছাহেব ... একখানা পত্র লেখেন। ঐ পত্রে কতকগুলি হাদীছের উল্লেখ করিয়া, সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য জানিতে চান। দুইখানা সংবাদপত্র এই লইয়া আমাকে পুতুল-পূজক মোশরেক প্রভৃতি বলিয়া গালাগালি দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই-তাঁহাদের বিশিষ্ট 'খাঁটি মুসলমানী' গালগুলি উহার উপর অধিকন্তু।[১৭৭]

অতঃপর মাওলানা বলেন :

এইসব কারণে চিত্রকলা সম্বন্ধে সূক্ষ্ম ও নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করার ইচ্ছা অনেক দিন হইতে পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু নানা কারণে এতদিন তাহার সুযোগ করিয়া উঠিতে পারি নাই।.......।[১৭৮]

মাওলানা আকরম খাঁ'র মতে-

আমার প্রমাণ প্রয়োগে, বিচার পদ্ধতিতে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভ্রম-প্রমাদ সংঘটিত হওয়া আদৌ বিচিত্র নহে। সমাজের সূক্ষ্মধর্মী ব্যক্তিরা সেই ভ্রম-প্রমাদগুলি ধরিয়া দিলে যৎপরোনাস্তি বাধিত হইব। তাঁহাদের মন্তব্যগুলি কৃতজ্ঞতার সহিত পত্রস্থ করিব এবং ভ্রম বুঝিতে পারিলে প্রকাশ্যভাবে নিজের মতামতগুলি প্রত্যাহার করিয়া লইব। যে সকল বন্ধু চিত্রকলাকে এছলামের সমস্যা বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন, এই আলোচনার প্রতি বিনিতভাবে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।[১৭৯]

ছবি ও মূর্তি সম্পর্কে উপমহাদেশে প্রথম কলম ধারণ করেন মৌলবি চেরাগ আলি।[১৮০] তিনি লিখেছেন, পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে : হযরত সোলায়মানের জন্য (باذن ربه) আল্লাহর সম্মতিক্রমে তামাসীল (تماثيل) [১৮১] বা ছবি মূর্তি তৈরি করা হতো এবং হযরত সুলায়মান তা ব্যবহার করতেন।[১৮২]

---

১৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭।

১৭৮. প্রাগুক্ত।

১৭৯. প্রাগুক্ত।

১৮০. মৌলবি চেরাগ আলী (১৮৪৪-৯৫)। পাক-ভারতীয় মুসলিম শিক্ষাব্রতী ও গ্রন্থকার। যুক্ত প্রদেশে সরকারি কর্মচারি হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। স্যার সৈয়দের সাথে শিক্ষাবিস্তার আন্দোলনে যোগ দেন। উর্দু, আরবি, ফার্স, ইংরেজি, ল্যাটিন, গ্রিক প্রভৃতি ভাষায় তাঁর বুৎপত্তি ছিল। আন্ডার দি মুসলিম রুলস, রিসালায়ে চেরাগ আলী, রিফর্মস আন্ডার দি মুসলিম রুলস তাঁর রচনাবলীর মধ্যে অন্যতম।
বাংলা বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬২।

১৮১. تماثيل শব্দটি تمثال-এর বহুবচন। অর্থ চিত্র। ইবনে আরাবী আহকামুল কুরআনে' বলেন, চিত্র দু'প্রকার ১. প্রাণিদের চিত্র, ২. অপ্রাণিদের চিত্র। অপ্রাণিও দু'প্রকার। এক জড় পদার্থ, যাতে হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না; যেমন পাথর মৃত্তিকা ইত্যাদি। দুই হ্রাস বৃদ্ধি হয় এমন পদার্থ; যেমন বৃক্ষ, ফসল ইত্যাদি। জিনরা হযরত সুলাইমানের (আ.) জন্যে উপরোক্ত সর্বপ্রকার বস্তুর চিত্র নির্মাণ

www.pathagar.com

প্রশ্ন দাঁড়ায়, পৌত্তলিকতা হলো শিরকের ন্যায় জঘন্যতম গুনাহ। আল্লাহর নবি-রসুল এ ধরনের গোনাহে কবিরা থেকে 'মাছুম (নিষ্পাপ)। পৌত্তলিকতার মূলোচ্ছেদ, মূলোৎপাটন করাই হলো নবি-রসুলের কাজ এবং প্রধান উদ্দেশ্য। অথচ কুরআনের উপরোক্ত বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে যে, চিত্র বা মূর্তি নির্মাণ আল্লাহর নির্দেশেই হচ্ছে। হযরত সুলায়মান (আ.) সেগুলো ব্যবহারও করেছেন। চিত্র বা মূর্তি নির্মাণ গুণাহ ও অন্যায় হলে আল্লাহ অনুমতি কখনও দিতেন না। নবিও পৌত্তলিকতার প্রতীকগুলো ব্যবহার করতেন না।

মৌলবি চেরাগ আলির পর দীর্ঘদিন পর্যন্ত এ নিয়ে তেমন আলোচনা হয় নি। বহুদিন পরে একদল বিশিষ্ট আলিমের ছবি পত্রিকায় ছাপা হয় তাঁদের মধ্যে ছিলেন : মাওলানা শিবলী নু'মানী, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, মাওলানা সৈয়দ সুলায়মান নদভী প্রমুখ।[১৮৩] সংবাদপত্রে ছবি ছাপা হলে হিন্দুস্তানের আলিম সমাজের মধ্যে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। যথেষ্ট আলোচনা-সমালোচনা হয়। এই অবস্থার পরিসমাপ্তি না হতেই মাওলানা আবুল কালাম আজাদ[১৮৪] তাঁর আল-হেলাল'[১৮৫] পত্রিকায় মুসলিম বিশ্বের প্রধান প্রধান আলিম, মুফতি, ইসলামি চিন্তাবিদ ও অন্যান্য খ্যাতিসম্পন্ন লোকদের ছবি ছাপতে আরম্ভ করেন। এতে হিন্দুস্তানের আলিমদের মধ্যে বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টিহয়। ভক্তরা মাওলানা আজাদের মত সমর্থন দিতে থাকেন, আর অন্যরা তাঁর নিন্দাবাদ আরম্ভ করেন।[১৮৬]

উপ-মহাদেশের প্রখ্যাত আলিম সৈয়দ সুলায়মান নদভী জাতির এ ক্রান্তিলগ্নে এগিয়ে এলেন। তিনি 'চিত্র সংক্রান্ত' মাস'আলার ধর্মীয় দিক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে কুরআন-হাদিসের প্রামাণ্য দলিল দিয়ে মাসিক 'মা'আরিফ' পত্রিকায় প্রমাণ করেছেন :

> চিত্র সম্বন্ধে আমাদের আলিমগণ সাধারণত যে ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন, বস্তুত এছলামের কোনো বিধানই তাহার সমর্থন করে না।[১৮৭]

মাওলানা নদভী সাহেবের উক্ত প্রবন্ধ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ায় হিন্দুস্তানের আলিম সমাজ পড়ার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু এর কোনো প্রকার প্রতিবাদ এঁরা কেউ করেন নি। অথচ এর কিছুদিন পর 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদীর' বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায় ছবি প্রকাশিত হতে থাকলে আলিম সমাজের এক দল 'মোহাম্মদী'কে বয়কট করে এর বিরুদ্ধে বক্তব্য দিতে থাকেন।[১৮৮]

করতো। প্রথমতঃ تَمَاثِيل শব্দের ব্যাপক ব্যবহার থেকে এ কথা জানা যায়। দ্বিতীয়তঃ ঐতিহাসিক বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, সুলায়মান (আ.)-এর সিংহাসনের উপর প্রাণিদের চিত্র অংকিত ছিল।

মুফতি মুহাঃ শফি, মা'আরিফুল কুরআন, ৭ম খণ্ড, মুহিউদ্দীন খান অনূদিত, ইঃ ফাউন্ডেশন, ঢাকা, সন ১৯৮৩, পৃ. ২৮৮।

১৮২. আল্ কুরআন, সুরা সাবা, আয়াত নং ১২-১৩।
১৮৩. আকরম খাঁ, মাওলানা, সমস্যা ও সমাধান, কোলকাতা, ১৮ই মার্চ, সন ১৯০১, পৃ. ১০৫।
১৮৪. প্রাগুক্ত।
১৮৫. প্রাগুক্ত।
১৮৬. প্রাগুক্ত।
১৮৭. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, সমস্যা ও সমাধান, কোলকাতা, ১৯৩১, পৃ. ১০৬।
১৮৮. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

ছবি হারাম হওয়ার প্রমাণ

ভারতবর্ষের অধিকাংশ আলিমের মতে, ছবি এবং মূর্তি তৈরি এবং এর ব্যবহার সম্পূর্ণ হারাম। এর সমর্থনে তাঁরা নিম্নের হাদিস দলিল হিসেবে পেশ করেন :

১. বুখারি ও মুসলিমে আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ থেকে বর্ণিত, রসুল (স.) ইরশাদ করেছেন-

ان اشد الناس الخـ

অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন সর্বাপেক্ষা কঠোর আযাব হবে তাদের, যারা তাছবীর বা ছবি প্রস্তুত করে থাকে।[১৮৯]

২. রসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন :

الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة الاخـ.

অর্থাৎ, ছবি নির্মাণ করে যারা, কিয়ামতের দিন তারা দণ্ডপ্রাপ্ত হবে। তাদেরকে বলা হবে তোমরা যা সৃষ্টি করেছ, তাকে জীবন দান কর।[১৯০]

৩. হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেন, আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন :

ومن اظلم ممن ذهب يخلف كخلقى.

অর্থাৎ, আমার সৃষ্টির ন্যায় যে সৃষ্টি করতে চায়, তার অপেক্ষা অধিক জালিম আর কে হতে পারে।[১৯১]

৪. আল্লাহর নবি বলেছেন :

لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير

অর্থাৎ, যে গৃহে কুকুর অথবা ছবি থাকে, ফিরিশতাগণ সে গৃহে প্রবেশ করেন না।[১৯২]

৫. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন :

فان كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لاروح فيه.

অর্থাৎ, নিতান্তই যদি করতে হয়, তবে গাছাপালা বা ঐরূপ প্রাণহীন বস্তুর ছবি আঁকতে পার।[১৯৩]

৬. অন্য একটি হাদিসে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন :

كل مصور فى النار

---

১৮৯. বুখারি-মুসলিম।
মুহাম্মদ বিন জামীল যাইনু, ব্যক্তি ও সমাজ সংশোধনে ইসলামি দিক-নির্দেশনা, মক্কা আল-মোকাররমা, সৌদী আরব, পৃ. ৬৯।

১৯০. বুখারি-মুসলিম।
প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।

১৯১. বুখারি-মুসলিম।
প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।
মুফতি মুহাম্মদ শফি (রহ.), গুনাহে বে-লয়যত, করাচী, পৃ. ৬১।

১৯২. বুখারি-মুসলিম।
প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।

১৯৩. বুখারি-মুসলিম।
প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

অর্থ্যাৎ, প্রত্যেক চিত্রকর জাহান্নামে যাবে।[১৯৪]

৭. হযরত আয়িশা (রা.) একখানা চিত্রযুক্ত পর্দা খরিদ করেছিলেন, রসুল (স.) তাতে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।[১৯৫]

উপরোক্ত হাদিস, এ ছাড়া বুখারি-মুসলিম শরীফের আরও অনেক হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জীব-জন্তুর ছবি বা মূর্তি প্রস্তুত করা বা এগুলো ব্যবহার করা হারামের পর্যায়ে পড়ে।

মাওলানা আকরম খাঁ এ হাদিসগুলো সম্পর্কে বলেন :

আমি উপরোক্ত হাদিসগুলো প্রামাণ্য দলিল হিসেবে স্বীকার করে নিচ্ছি।[১৯৬]

সাথে সাথে মাওলানা এ কথাও বলেন, এই নিষেধের সম্পূর্ণ বিপরীত প্রমাণও পাওয়া যায়। রসুল (স.)-এর হাদিস সাহাবিগণের নিম্নোক্ত বিবরণে প্রমাণিত হয় :

(ক) সকল প্রকার ছবি ও মূর্তির ব্যবহার সাধারণভাবে হারাম করা হয় নি।

(খ) রসুল (স.) জীবজন্তুর চিত্র-সম্বলিত কোনো কোনো জিনিস স্বয়ং ব্যবহার করেছেন।

(গ) রসুল (স.)-এর পরিবারে ঐ প্রকার চিত্রিত পর্দার এবং জীব-জন্তুর মূর্তির ব্যবহার প্রচলিত ছিল। রসুল (স.) অবগত হওয়া সত্ত্বেও কাউকে সেগুলো ব্যবহার করতে নিষেধ করেন নি।

(ঘ) সাহাবিগণও জীবজন্তুর চিত্র-অঙ্কিত বস্ত্রাদি ব্যবহার করতেন।[১৯৭]

(ঙ) বলা হয়ে থাকে যে, জীবজন্তু ব্যতীত অন্যান্য বস্তুর ছবি আঁকা ও ব্যবহার করা যেতে পারে। এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। রসুল (স.) ছবি বা ক্রুসের ছবিগুলো ধ্বংস করে দিতে আদেশ করেছেন।

(চ) রসুল (স.)-এর নির্দেশ মতে, শিরক বা পৌত্তলিকতার উপকরণ মাত্রই নিষিদ্ধ, তা অচেতন বা উদ্ভিদ হলেও নিষিদ্ধ। এ জন্য তিনি পাকা ও উঁচু কবরগুলো ধ্বংস করার আদেশও দিয়েছিলেন। অপরপক্ষে, পৌত্তলিকতার উপকরণ বা সহায় না হলে জীব-জন্তুর ছবি ও প্রতিমূর্তি ব্যবহার করার অনুমতিও তিনি প্রদান করেছেন।

(ছ) ভারতবর্ষের আলিমগণ চিত্র ও মূর্তি সম্পর্কে যেরূপ কঠোর নিষেধাজ্ঞা প্রদান করেন, তা বিভিন্ন মুহাদ্দিছ ও হাদিছের টীকাকারদের সিদ্ধান্তের বিপরীত।[১৯৮]

ছবি ও মূর্তি ব্যবহারের পক্ষের দলিল

ছবি নিষেধ সম্পর্কীয় যে-সব হাদিস প্রমাণস্বরূপ পেশ করা হয়, তন্মধ্যে হযরত আয়িশা (রা) এর পর্দা সংক্রান্ত বিবরণ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। উক্ত হাদিসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ :

---

১৯৪. মুফতি মুহাম্মদ শফি, তাফসিরে মা'আরেফুল কুরআন, ৭ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, ১৯৮৩, পৃ. ২৯১। মোহাম্মদ আকরম খাঁ, সমস্যা ও সমাধান, কোলকাতা, ১৯৩১, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯।

১৯৫. বুখারি-মুসলিম। গুনাহে বে-লয্যত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।

১৯৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯।

১৯৭. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০।

১৯৮. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০-১১১।

www.pathagar.com

রসুল (স.) এক সময় বিদেশ গমন করলে হযরত আয়িশা (রা.) একটা জীব-জন্তুর চিত্র-অঙ্কিত পর্দা খরিদ করেন এবং সেটাকে কক্ষের কোনো এক স্থানে ঝুলিয়ে রাখেন। নবি করিম (স.) ফিরে এসে তা দেখে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। ছবি নিষেধ হওয়ার এটাই প্রমাণ।[১৯৯]

এ সম্পর্কে মাওলানা আকরম খাঁ বলেন :

> আমার মতে, এই হাদীছটি নিষেধের প্রমাণ কখনই হতে পারে না। বরং এর দ্বারা তাছবীর ব্যবহারের স্পষ্ট অনুমতিই প্রতিপন্ন হইতেছে। কারণ সৌভাগ্যক্রমে বর্ণনাটা এখানে শেষ হয় নাই। এই সঙ্গে সঙ্গে আরও বর্ণিত হইয়াছে যে, অতঃপর বিবি আয়িশা সেই পর্দা কাটিয়া দুই গদি বা বালিশ প্রস্তুত করিলেন, হযরত তাহা ব্যবহার করিতেন- জীব-জন্তুর ছবিগুলি তাহাতে অবিকৃত আকারে বিদ্যমান ছিল।[২০০]

হাদিসের মূল উদ্ধৃতি এর প্রমাণ। হযরত আয়িশা (রা.) বলেছেন :

انها كانت قد اتخذت على سهوة لها سترا فيه تماثيل فتهلكه النبى صلعم فاتخذت منه الاخـ

অর্থাৎ, তিনি তাঁহার কামরায় একটি পর্দা লটকিয়ে ছিলেন, সে পর্দায় বহু তাছবীর ছিল। হযরত সেই পর্দাখানা ছিঁড়ে ফেললেন। অতঃপর আমি তা দিয়ে দুটি বালিশ বা গদি প্রস্তুত করলাম, ঐ দুটি বাড়িতে ছিল, হযরত (স.) তার উপর উপবেশন করতেন।[২০১]

ছবি ও ফিরিশতা

কাসেম বিন মোহাম্মদ হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে বলা হয়েছে :

> যে গৃহে ছবি থাকে, ফিরিশতারা সে গৃহে প্রবেশ করে না।[২০২]

কিন্তু ইমাম মুসলিমের এক বর্ণনায় দেখা যায়, হযরত আয়িশা (রা.) এমন কথা বলেননি।

---

১৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯।

২০০. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪।

২০১. উক্ত হাদিসের সমর্থন হযরত আয়েশা (রা.)-এর ছয়টি হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে মাওলানা প্রমাণ করেছেন যে, আয়েশার হাদিসগুলো দ্বারা জীব-জন্তুর ছবি ব্যবহার নিষেধ প্রমাণ করতে যাবার মত হঠকারিতা আর নেই। ব্যাপারটা ছিল ঐ চিত্রগুলো সম্মুখে লটকান থাকাতে হযরতের নামাজে বিঘ্ন হতো। দুনিয়ার বিলাস স্মৃতি দ্বারা তাঁর পারলৌকিক চিন্তার ব্যাঘাত ঘটতো। এই জন্য তিনি ঐগুলোকে সম্মুখ হতে সরিয়ে নিতে আদেশ করেছেন। এরপর আয়েশা ঐগুলো দিয়ে বালিশ তৈরি করলে তিনি সেগুলো ব্যবহার করেছেন। বিরুদ্ধপক্ষ বলবেন, ছবি বিকৃত হয়ে গিয়েছিল, তাই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এটা একটা অন্যায় অনুমান। পর্দা সংক্রান্ত বর্ণনাগুলোর কোন স্থানে এই অনুমানের প্রমাণ পাওয়া যাবে না। অথচ, হাদিসে স্পষ্টতই বর্ণিত আছে, ছবিগুলো অবিকৃতই ছিল।
মুসনাদ আহমদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৪৭।
মোহাম্মদ আকরম খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭।

২০২. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮।

www.pathagar.com

হাদিসটির উদ্ধৃতি নিম্নরূপ :

عن زيد بن خالد الجهنى عن ابى طلحة الانصارى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب لا تماثيل. قال فاتيت عائشة .... فلم يعب ذالك على.

অর্থাৎ, যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানি আবু তালহা আনসারি হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : আমি হযরতকে বলতে শুনেছি : যে গৃহে কুকুর অথবা ছবি থাকে ফিরিশতারা তাতে প্রবেশ করেন না। যায়েদ বলছেন, অতঃপর আমি বিবি আয়িশার নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে বললাম- আবু তালহা আমাকে সংবাদ দিচ্ছেন যে, হযরত বলেছেন ...। উপরোক্ত হাদিস সম্পর্কে আপনি কি হযরতকে ঐ রূপ বলতে শুনেছেন? বিবি আয়িশা বললেন, না।[২০৩]

দেখা যাচ্ছে যে, প্রথম বর্ণনায় বলা হচ্ছে, যে গৃহে ছবি থাকে, ফিরিশতারা সে গৃহে প্রবেশ করেন না।-এই উক্তি আয়িশা (রা.) হযরতের জবানি বর্ণনা করছেন। অর্থাৎ, হযরতকে তিনি ঐ রূপ বলতে শুনেছেন বলে প্রকাশ করছেন। কিন্তু সহিহ্ মুসলিমের এই বর্ণনায় স্বয়ং হযরত আয়িশার মুখে জানা যাচ্ছে যে, তিনি হযরতকে ঐ রূপ কথা বলতে কখনো শুনেন নি।

এ প্রসঙ্গে মাওলানা আকরম খাঁ বলেন :

> অতএব দেখা যাইতেছে যে, ইহা পরবর্তী রাবীদের প্রমাদ ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং তাছবির ঘরে থাকলে ফিরিশতারা প্রবেশ করেন না-বলিয়া তাছবীরকে হারাম বলার কোনোই হেতু থাকিতেছে না।[২০৪]
>
> ফিরিশতাদের নিয়ে আর একটি সমস্যা দেখা দেবে। জীব-জন্তুর ছবি ঘরে থাকলেই যদি ফিরিশতাদের সেখানে একবারেই প্রবেশ নিষেধ হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহর সৃষ্টি তো অচল হয়ে যাবে। কারণ, জমীন ও আসমানের মধ্যে যা কিছু ঘটছে সমস্তই ফিরিশতাদের কাজ। ফিরিশতারাই দিন-রাত মানব সমাজের রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিয়োজিত। ফিরিশতারা মানুষের দু'কাঁধের উপর বসে থেকে আমলনামা লিখে থাকেন। ছবির কারণে যদি ফিরিশতা প্রবেশ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়ে, আকরম খাঁ'র মতে, দুষ্ট লোকেরা তখন ইচ্ছা করলে কতগুলো ছবি প্রস্তুত করে অন্যায় কাজে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ পাবে। কারণ, ফিরিশতারা তো তখন ঘরের ত্রিসীমানায় আসতে পারবে না। যার পরিপ্রেক্ষিতে আমলনামাও লিখা যাবে না। এ ছাড়া ছবি দ্বারা আযরাইল ফিরিশতার প্রবেশ নিষেধ ঘটিয়ে মানুষ একেবারেই অমর হয়ে যেতে পারবে।[২০৫]

অবশ্য, টীকাকারগণ এ সমস্যার সমাধান দিয়েছেন,- ফিরিশতা অর্থে সব ফিরিশতা নয়। এক শ্রেনির ফিরিশতা। ছবি থাকলে রহমত ও বরকতের ফিরিশতারা গৃহে প্রবেশ করেন না। আর অন্য সব ফিরিশতার জন্য কোনো বাধা নেই। আকরম খাঁ'র মতে, এ

---

২০৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯।
২০৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০।
২০৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩।

www.pathagar.com

কথাটা আগাগোড়াই অসামঞ্জস্য। রসুল (স.)-এর পক্ষে এমন উক্তি করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।[২০৬]

> স্বয়ং হযরত জিব্রাঈল, হযরত আয়িশা (রা.)-এর একখানা ছবি সবুজ রেশমের কাপড়ে জড়িয়ে হযরত (স.)-এর নিকট উপস্থিত করেছিলেন।[২০৭]

হাদিসে প্রমাণিত হয়, জিব্রাঈল (আ.)-এর ছবির প্রতি আদৌ কোনো বিদ্বেষ নেই। ছবির প্রতি বিদ্বেষ থাকলে হযরত সুলায়মান (আ.) ও হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর বাড়ির পাশেও ফিরিশতাগণের আশা সম্ভবপর হতো না।[২০৮]

উপরোক্ত আলোচনার পর মাওলানা আকরম খাঁ'র এ সম্পর্কীয় বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, পর্দা সংক্রান্ত হযরত আয়িশার (রা.) হাদিসটি গভীরভাবে অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, এই উপলক্ষে হযরত মুহাম্মদ (স.) কি বলেছিলেন বা করেছিলেন। হযরত আয়িশা-ই এর প্রধান ও একমাত্র সাক্ষী। হযরত যায়েদ (রা.) নিজে সাহাবি হলেও হযরতের সময় এই প্রকার নিষেধাজ্ঞা তাঁর কর্ণগোচর হয় নি, অন্যথা একটি বিদিত বিষয়ের তদন্তের জন্য মূল রাবি হযরত আয়িশার নিকট উপস্থিত হয়ে সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করলেন (সত্য উদঘাটিত হয়ে গেল)। তাঁর মুখে জানতে পারলেন, ঐ সব বর্ণনার মূলে কোনো সত্য নেই।[২০৯]

উপমহাদেশের স্বনামধন্য আলিম মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শফি (রহ.) ছবি বা তাসবির সংক্রান্ত আলোচনায় বলেন :

> মূল হারাম বস্তু যেমন নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তেমনি তার উপায় ও নিকটবর্তী সহায়ক কারণসমূহকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মূল অপরাধ হচ্ছে শিরক ও মূর্তি পূজা। একে নিষিদ্ধ করার সাথে সাথে যে-সব ছিদ্রপথে মূর্তি পূজার আগমন হতে পারে, সে-সব পথেও পাহারা বসিয়ে দেয়া হয়েছে এবং মূর্তি পূজার উপায় ও নিকটবর্তী কারণসমূহকেও হারাম করে দেয়া হয়েছে। এই নীতির ভিত্তিতেই প্রাণীদের চিত্র নির্মাণ ও ব্যবহার হারাম করা হয়েছে। অনেক সহিহ ও মুতাওয়াতির হাদিস দ্বারা এই নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত আছে।[২১০]

---

২০৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩।

২০৭. তিরমিজী, অধ্যায়- মানাকের লি-যাওয়াজিন্নবী (স.), পৃ. ৫৭৩।
মোহাম্মদ আকরম খাঁ, প্রাগুক্ত পৃ. ১২৪।

২০৮. উল্লেখ্য যে, টাকা-পয়সা আশরাফিতে, নাছারা-বাদশাহর ছবি অঙ্কিত এমন কি মূর্তিও নির্মিত থাকে। আমাদের হাদী ও পির-মুরশিদগণ মসজিদে বসে তা গ্রহণ করেন এবং সেই ছবি ও মূর্তিগুলো নিয়ে মিহরাব ও মিম্বরে বসেন, তখন কি রহমত ও বরকতের ফিরিশতারা ঐ ছবির ত্রি-সীমানায় পৌছাতে পারেন?
মোহাম্মদ আকরম খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪।

২০৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫-২৬।

২১০. মুফতি মুহাম্মদ শফি জমি'য়তুল 'ওলামা-ই-ইসলাম-এর প্রতিষ্ঠাতা-এর সদস্য। ১৯৪৫ সালে সংগঠনটি কোলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামি আইন অনুযায়ী দেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাঁরা পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করেন এবং মুসলিম লীগের পক্ষে প্রচারণা চালান। এঁদের মধ্যে আরও প্রসিদ্ধ ছিলেন, মাওলানা এহতেশামুল হক থানভী, মাওলানা আব্দুল হামিদ বাদাউনী। নেতৃত্বে ছিলেন মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী (১৮৮৭-১৯৪৯)।
মুফতি মুহাম্মদ শফি, তাফছিরে মা'আরিফুল কুরআন, ৭ম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ২৮৯।

www.pathagar.com

মুফতি শফি সাহেব উক্ত আলোচনায় ছবির বা চিত্রের অবৈধতা সম্পর্কে মোটামুটি আলোচনা কালেও ছবি সংক্রান্ত হাদিসগুলোর তেমন কোনো বিশদ বিবরণ বা কোনো বিশ্লেষণাত্মক ব্যাখ্যা প্রদান করেন নি। অবশ্য, তিনি ছবির অবৈধতা সম্পর্কে একটি যুক্তি প্রদর্শন করেছেন যা ঐতিহাসিক ও বাস্তব সত্য :

> পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা গেছে যে, তাঁরা পুণ্যবান ব্যক্তিদের স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁদের চিত্র নির্মাণ করে উপাসনালয়ে রাখতো, যাতে তাঁদের উপাসনার কথা স্মরণ করে তারাও (পুণ্যবানরা) উপাসনায় উদ্বুদ্ধ হয়। কিন্তু আস্তে আস্তে তারা এসব চিত্রকেই উপাস্য স্থির করে নিয়েছে। এবং প্রতিমা পূজা শুরু করে দিয়েছে। এভাবে পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের মধ্যে প্রাণীদের চিত্র মূর্তি পূজা প্রচলনে সহায়ক হয়েছে।[২১১]

বর্তমান যুগ-জিজ্ঞাসার আলোকে আমরা উপরের প্রশ্নগুলোর সম্মুখীন হই। যেমন অপরাধী সনাক্তকরণ, ব্যবসা-বাণিজ্যে চিত্রকে জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়েছে। এতে মূর্তিপূজা ও উপাসনার কোনো চিন্তাধারা বা কল্পনা পর্যন্ত নেই। কাজেই, বর্তমানে চিত্র সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হওয়া উচিত। এ সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে মাওলানা মুহাম্মদ শফি তাঁর 'মা'আরিফুল কুরআনে' বলেন :

> 'প্রথমত এ কথা বলাই ঠিক নয় যে, আজকাল চিত্র মূর্তিপূজার উপায় নয়। বর্তমানেও এমন অনেক সম্প্রদায় রয়েছে, যারা তাদের মহাপুরুষদের চিত্রের পূজা পাঠ করে। কোনো বিধান কোনো কারণের উপর নির্ভরশীল হলে সে কারণ প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান থাকা আবশ্যক নয়। এছাড়া চিত্র নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ কেবল একটিই নয় যে, এটা মূর্তি পূজার উপায়; বরং সহিহ হাদিসসমূহে এর নিষেধাজ্ঞার অন্যান্য আরও কারণও আছে। যেমন- চিত্র নির্মাণে আল্লাহ তায়ালার একটি বিশেষ গুণের অনুকরণ করা হয়। চিত্র নির্মাতা (مُصَوِّرْ) আল্লাহ তা'য়ালার সুন্দরতম নামসমূহের অন্যতম এবং এটা প্রকৃতপক্ষে তাঁর জন্যই শোভনীয়[২১২]

বস্তুত, সমগ্র সৃষ্টি-বৈচিত্র্য মহান আল্লাহর সত্তারই ক্ষমতাধীন। এই সৃষ্টিবস্তুর প্রত্যেকেরই ব্যক্তিসত্তা বিদ্যমান। কারো আকার-আকৃতির, কারও সাথে কোনো প্রকার মিল নেই। নারি-পুরুষের সাথে পরস্পর আকৃতিগত কোনো মিল দেখা যায় না। এমন দু'জন মানুষও কি পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া যাবে, উভয়েরই পুরোপুরি মিল রয়েছে? এই আকার-আকৃতি সৃষ্টি আল্লাহ ছাড়া কার সাধ্য আছে?

অপরপক্ষে, যে ব্যক্তি কোনো প্রাণি-মূর্তি অথবা রং ও তুলির সাহায্যে কোনো প্রাণির চিত্র নির্মাণ করে, সে যেন কার্যত দাবি করে যে, সেও আকার নির্মাণে সক্ষম। হাদিসে বলা হয়েছে:

> কিয়ামতের দিন চিত্র নির্মাতাদের বলা হবে তোমরা যখন আমার অনুকরণ করেছ, তখন একে পূর্ণাঙ্গ করে দেখাও। আমি তো কেবল আকারই নির্মাণ করিনি, তাতে

২১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮-৮৯।
২১২. প্রাগুক্ত, ২৯০।

www.pathagar.com

> আত্মাও সঞ্চারিত করেছি। তোমাদের সাধ্য থাকলে তোমার সৃষ্টি আকারসমূহে আত্মা সঞ্চার করে দেখাও।[২১৩]

বর্তমানে অনেকে মনে করেন, আয়নায় নিজের মুখ দেখা যেমন জায়েয, তেমনি ফটোর চিত্রও জায়েয। এ ধরনের প্রশ্নের উত্তরে মাওলানা মুফতি শফি বলেন :

> প্রতিবিম্ব তখন পর্যন্ত প্রতিবিম্ব থাকে, যতক্ষণ তাকে কোনো উপায়ে বদ্ধমূল ও স্থায়ী করে নেয়া না হয়। যেমন, পানি ও আয়নাতে আপনার প্রতিবিম্ব স্থায়ী নয়। আপনি সামনে সরে গেলেই প্রতিবিম্ব খতম হয়ে যায়। যদি আয়নার উপর কোনো যন্ত্রের সাহায্যে প্রতিবিম্বকে স্থায়ী করে নেয়া হয়, তবে একেই চিত্র বলা হবে। যার নিষেধাজ্ঞা সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।[২১৪]

উপরোক্ত আলোচনায় সুস্পষ্টভাবে মুফতি শফি সাহেব ছবি বা মূর্তি নির্মাণ অথবা ব্যবহার কুরআন-হাদিসের দৃষ্টিতে সমর্থনযোগ্য নয় বলে মত প্রকাশ করেছেন।

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ২৩ বছরের নবুওয়তকালে অল্প অল্প করে পরিপূর্ণ কুরআন নাযিল হয়েছে। রসুল (স.)-ও ক্রমান্বয়ে আরবজাতির কু-প্রথাগুলো সংস্কার করেছিলেন। যেমন কুরআন প্রথমে মাদকাসক্তির প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে। পরবর্তী সময়ে আরবদের চিন্তা-চেতনার গতিধারা পরিবর্তন হওয়ার সঙ্গে আদেশ হলো- মাতাল অবস্থায় নামাজ পড়া অন্যায়। অথচ নামাজ পরিত্যাগ করা গুনাহে কবীরা। এরপর নির্দেশ হয়, সকল প্রকার মাদকদ্রব্য হারাম। শুধু তাই নয়, রসুল (স.) সাথে সাথে আদেশ দিলেন- মদের পাত্রগুলোও ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। সোনা ও রেশমি কাপড় স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের জন্য নিষিদ্ধ।[২১৫]

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আরবদের সৌখিনতা ও বিলাসিতা এবং অপব্যয় দেখে রসুল (স.) প্রথমে নর-নারি উভয়ের জনই স্বর্ণ ও রেশমি বস্ত্রের ব্যবহার হারাম ঘোষণা করেছিলেন। এরপর পুরুষরা সংযত হয়ে এলে নারিদেরকে ঐগুলো ব্যবহারের অনুমতি দিলেন। আরবদের পৌত্তলিকতার প্রতি আসক্তি দেখে হযরত মুহাম্মদ (স.) প্রথমে কবর যিয়ারতও নিষিদ্ধ করেন। তাদের মধ্যে তাওহিদের মর্মবাণী সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আবার তিনি কবর যিয়ারতের অনুমতি প্রদান করেন। মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ এই প্রসঙ্গের অবতারণা করে বলেন :

> চিত্র অঙ্কন ও মূর্তি গঠন সংক্রান্ত ব্যবস্থারও এইরূপ দু'টি স্তর আছে এবং এই দু'স্তরের জন্য হযরত দু'প্রকার আদেশ প্রদান করেছেন। আমাদের আলিমগণ প্রথম স্তরের হাদিসগুলো গ্রহণ করেছেন এবং দ্বিতীয় স্তরের ও পরবর্তী সময়ের হাদিসগুলোকে বর্জন করছেন। এতেই যত সমস্যার সৃষ্টিহয়েছে।[২১৬]

বাহ্যিক দৃষ্টিতে অনেক সময় মনে হয়, রসুল (স.) একই বিষয়ে পরস্পরবিরোধী আদেশ প্রদান করেছিলেন। আদেশ-নিষেধের ঐ ঐতিহাসিক স্তরগুলোর সন্ধান পাওয়ার পর সহজে অনুমিত হয় যে, রসুল (স.)-এর ঐ হাদিসগুলো পরস্পরবিরোধী নয় বরং স্থান-কাল-পাত্রভেদে বিভিন্ন স্তরে ও অবস্থার প্রেক্ষিতে হাদিসগুলো বর্ণিত হয়েছে।

---

২১৩. মুফতি মুহাম্মদ, শফি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০।
২১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১।
২১৫. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, সমস্যা ও সমাধান, কোলকাতা, ১৯৩১, পৃ. ১১২।
২১৬. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩।

www.pathagar.com

পুতুল সংক্রান্ত বিষয়

পৃথিবীতে প্রাচীন যুগ থেকে পুতুলের ব্যবহার চলে আসছে। ইসলাম-পূর্ব যুগেও যেমন, ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও পুতুলের ব্যবহার বিদ্যমান। স্বয়ং নবি (স.)-এর ঘরেও পুতুল ছিল। হযরত আয়িশা (রা.) স্বামীগৃহে সাথীদের সাথে পুতুল নিয়ে খেলতেন। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে :

عن عائشة قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك او خيبر وفى سهوتها ستر فهبت الريح فكشفت تاحية الستر عن بنات لعائشة لعب. فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت بناتى.........

> হযরত আয়িশা (রা.) বলছেন, রসুল (স.) তাবুক অথবা খায়বর থেকে ফিরে এলেন, তাঁর কামরার উপর একটা পর্দা ছিল। এই সময় বাতাসে পর্দার এক পাশ উড়ে যাওয়ায় তাঁর খেলনাগুলো হযরত (স.)-এর নযরে পড়ে। তাতে নবি (স.) জিজ্ঞাসা করলেন- আয়িশা এগুলো কি ? আয়িশা উত্তরে বললেন- আমার খেলনা। খেলনাগুলোর মধ্যে একটি ডানাওয়ালা ঘোড়ার উপর হযরতের নজর পড়লো। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, মাঝখানে ওটা কি? আয়িশা বললেন : ঘোড়া। হযরত বললেন- ওর উপর ওগুলো আবার কি দেখা যাচ্ছে যে। আয়িশা বললেন : ও দু'টি ডানা। হযরত বললেন- ঘোড়ার আবার ডানা। আয়িশা বলছেন- আমার কথা শুনে হযরত এত হাসলেন যে, আমি তাঁর মাড়ির দাঁত দেখতে পেলাম।[২১৭]

মাওলানা আকরম খাঁ উক্ত হাদিসের ব্যাখায় বলেন : হাদিসে নিম্নের বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে-

(১) হযরত (স.) গৃহে জীব-জন্তুর পুতুল ছিল।

(২) তাঁর স্ত্রী আয়িশা (রা.) তা ব্যবহার করতেন।

(৩) হযরত (স.) এর তা জানা ছিল। অথচ তিনি নিষেধ করেন নি। বরং খেলাধুলার উপকরণ বলে বিবি আয়িশার কথায় আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন।

(৪) হযরত মৌন থেকে এই কার্য্যে সম্মতি দিয়েছেন, মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় ইহা তাকরিরি হাদিস।[২১৮]

(৫) এই ঘরে প্রবেশ করতে কোনো ফিরিশতাকে কখনও কোনো আপত্তি করতে শোনা যায়নি। অথচ ছবির তুলনায় পুতুল অধিক আপত্তিজনক।[২১৯]

---

২১৭. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, প্রাগুক্ত, পঃ ১২৬-২৭।

২১৮. হাদিস তিন প্রকার, কাওলী হাদিস (قولى) বক্তব্যমূলক হাদিস, দ্বিতীয়তঃ ফেলী হাদিস (فعلى) কর্মমূলক হাদিস, তৃতীয়তঃ তাকরিরি হাদীস (تقريرى) অনুমোদনমূলক হাদিস।
অর্থাৎ, রসুল (স.)-এর নিকট অনুমোদন ও সমর্থনপ্রাপ্ত (সাহাবিদের) কথা ও কাজ। হযরত (স.)-এর সম্মুখে ইসলাম শরিয়তের বিপরীত কোন কথা বলা হলে বা কোন কাজ করা হলে রসুল (স.) তার প্রতিবাদ বা নিষেধ করে নি। এ ধরনের কোন কথা বা কাজের বিবরণ হতেও শরী'য়তের দৃষ্টিভঙ্গি নিঃসন্দেহে জানতে পারা যায়। ইসলামি শরী'য়তে এটাও একটি উৎস। যে হাদিসে এ ধরনের কোন ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়, তা হচ্ছে তাকরিরি হাদিস।
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম', হাদিস সংকলনের ইতিহাস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ২২।

২১৯. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, সমস্যা ও সমাধান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৮।

www.pathagar.com

জীব-জন্তুর মূর্তি খেলনা হিসেবে ব্যবহারে কোনো দোষ নেই। কিন্তু ছবি ও মূর্তি নির্মাণ বা এগুলো ব্যবহার করা সম্বন্ধে এতগুলো হাদিস বর্ণনা করার সাথে সাথে হযরত মুহাম্মদ (স.) আবার এই পুতুলগুলো ব্যবহার করার অনুমতি দিলেন- 'কোন নীতি অনুসারে'। আসলে রসুল (স.)-এর আদেশ-নিষেধগুলো সুগভীর ও স্বাভাবিক উসুলের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। এর মধ্যে কোনো প্রকার অসামঞ্জস্য নেই। জানদারের ছবি আর বেজানের ছবি বলে রসুল (স.)–এর কোনো বিদ্বেষ বা পক্ষপাত ছিল না। অথবা ছবিই তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল না, যে শিক্ষা ও আদর্শকে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাঁর আগমন আর তাতে বিঘ্ন সৃষ্টিকরবে যে বস্তু, তা-ই হারাম। যে বস্তু কোনো বিঘ্ন সৃষ্টিকরবে না, বরং মানুষ নির্দোষ নির্মল আনন্দ পায়, তা বৈধ।[২২০]

এটাই হচ্ছে সকল উসুলের মূলনীতি, এ নীতিরই অনুসরণ করে, ইসলাম কতগুলো ছবিকে হারাম ও কতকগুলোকে হালাল নির্ধারণ করেছে। কিন্তু এই নীতির প্রতি লক্ষ্য না রেখে কোনো কোনো আলিম ছবি সংক্রান্ত হাদিসগুলোকে পরস্পরবিরোধী মনে করছেন এবং বলছেন, একটিকে অন্যটির দ্বারা 'মানসুখ' বা রহিত নির্ধারণ করতে হবে। যাঁরা ছবি না-জায়েয হওয়ার পক্ষপাতি তাঁরা বলছেন :

> যে সকল হাদিস দ্বারা ছবি বা পুতুল ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে তা ইসলামের প্রাথমিক যুগের ব্যবস্থা। নিষেধাত্মক হাদিসগুলো দ্বারা পরবর্তী সময়ে ঐ ব্যবস্থাকে 'মানসুখ' বা রহিত করা হয়েছে।[২২১]

মাওলানা আকরম খাঁ বলেন :

> এটা তাদের খেয়াল ও অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি ভিত্তিহীন দাবী ব্যতীত আর কিছুই নয়।[২২২]

উসূলে হাদিসের নিয়মানুযায়ী কোনো হাদিসকে 'মানসুখ' দাবি করতে হলে, যে সকল অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ আবশ্যক, মুহাদ্দিসগণ তা খুব ভালভাবেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। প্রাসঙ্গিক কারণে এখানে একটি যুক্তি উপস্থাপিত হল :

মুহাদ্দিসগণ বলছেন- অমুক হাদিসটি অমুক হাদীসের দ্বারা রহিত বা মানসুখ হয়েছে। এটা বলতে হলে সর্বাগ্রে অকাট্য ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করতে হবে যে, যেটাকে মানসুখ বলা হয়েছে। বস্তুত সেটা পূর্ববর্তী সময়ের হাদিস এবং যে হাদিসের দ্বারা রহিত করা হচ্ছে, তা নিশ্চয়ই পরবর্তী সময়ে বর্ণিত।[২২৩] যেমন ১৫ হিজরির হাদিস দ্বারা ৫ হিজরির হাদিস রহিত হতে পারে, কিন্তু ৫ হিজরির হাদিস দ্বারা ১৫ হিজরির হাদিস রহিত হতে পারো না। সুতরাং মানসুখ বা রহিতের কথা আনতে গেলে সর্বাগ্রে উভয় আদেশের সময় নির্ধারণ করতে হবে। অন্যথা, তাঁরা যেমন বলছেন যে, নিষেধাত্মক হাদিসগুলো দ্বারা অনুমতিসূচক হাদিসগুলো রহিত হয়ে গেছে। অপরপক্ষ, তখন সেইরূপ বলতে পারেন যে, অনুমতিসূচক হাদিসগুলো দ্বারা নিষেধাত্মক হাদিসগুলো রহিত হয়ে গেছে। তাহলে এ পক্ষের দাবিকে তাঁরা বাতিল করবেন কোন যুক্তির বলে? অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এ 'সময়' নির্ধারণের প্রমাণের

---

২২০. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮।
২২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।
২২২. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০।
২২৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৯-৩০।

www.pathagar.com

দায়িত্বও মানসুখবাদীদের উপর ন্যস্ত হয়। কিন্তু এই প্রকার কোনো প্রমাণ তাঁরা কোথাও প্রদান করেন নি। সুতরাং তাঁদের দাবি গ্রহণযোগ্য নয়।

এসব উপমা দিয়ে মাওলানা আকরম খাঁ যদিও চিত্র, ছবি ও পুতুল তৈরির সপক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম তার এ মতামত গ্রহন করেন নি। অবশ্য, এ ব্যাপারে ইসলামি চিন্তাবিদদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। বিষয়টি চুলচেরা বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

দাসপ্রথা

দাসপ্রথা মানবতা বিধ্বংসী একটি জঘন্যতম অপরাধ। অথচ এই দাসপ্রথাই এক সময় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চালু ছিল। এর বিরুদ্ধে কেউ কোনোদিন সোচ্চার কণ্ঠে কথা বলেনি, বরং এই নির্মম প্রথাকে সমর্থন ও উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই করেছে। ইতিহাস সাক্ষ্য বহন করে যে, বিশ্বের তথাকথিত ধর্মযাজকগণ রাজা-মহারাজা, ধনিক, বণিক শ্রেণি এবং সমাজের বিত্তশালী উচ্চ শ্রেণির লোকেরা এই দাসপ্রথা চালু রেখেছিল। বিভিন্ন জাতির ধর্ম গ্রন্থ আলোচনা করলে দাস প্রথার ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়। মাওলানা আকরম খাঁ তাঁর রচিত মোস্তফা চরিতের বৈশিষ্ট্য গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক গবেষণাধর্মী বিবরণ দিয়েছেন। এর মাধ্যমে পৃথিবীর জাতিপুঞ্জের মধ্যে দাসদাসীদের প্রতি নির্যাতনের করুণ চিত্র এবং 'ইসলাম' পৃথিবীতে দাসদাসীদের প্রতি কিভাবে তাদের 'মুক্তি সনদ' ঘোষণা করেছে- তার বাস্তবরূপ প্রতিভাত হয়েছে।

বিভিন্ন জাতির মধ্যে দাসপ্রথা

বর্তমান তাওরাতকে অবিকৃত হিসেবে গ্রহণ করলে স্বীকার করতেই হবে যে, মোসির ধর্ম শাস্ত্রে দাসপ্রথার পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। ইহুদি জাতির ইতিহাসেও জানা যায়, অন্য জাতির নরনারীকে বলপূর্বক দাসদাসী বানাতে তাদেরকে সকল প্রকার পাশবিক অত্যাচার করতে তারা কোনো দ্বিধা করে নি; বরং বন্দী অবস্থায় তাদের উপর নানা ধরনের অত্যাচার-উৎপীড়ন করতো। অথচ মোসি এসবের কোনো প্রতিবাদ করে নি। বরং তাঁর স্থলাভিষিক্ত ভাববাদীদের আনীত ধর্মশাস্ত্রগুলো 'যেহোভার' নামে সে সব নৃশংসতার সমর্থনই করেছে।[২২৪]

ইতিহাসে জানা যায়, যিশুখ্রিষ্টের আবির্ভাবের পূর্বে ও পরে দাসদাসীদের আর্তনাদই ছিল বিশ্বমানবের প্রধান অভিশাপ। শাস্ত্র ও রাষ্ট্রের অভিভাবকবৃন্দ পশুদের চেয়েও ঘৃণিত জীবন যাপনে তাদেরকে বাধ্য করতো। রোমানরাই ছিল তখন পাশ্চাত্যের সর্বাপেক্ষা সভ্য ও উন্নত জাতি। যিশুর আবির্ভাবকালে রোম রাজ্যে দাসদাসীদের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক। এক পরিসংখ্যানে বিশেষজ্ঞরা হিসেব করে দেখিয়েছেন :

> খ্রিষ্টপূর্ব ১৪৬-২৩৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ইটালীতে স্বাধীন মানুষের সংখ্যা ছিল ৬৯ লক্ষ, ৪৪ হাজার। দাসদাসীর সংখ্যা ছিল ২ কোটি ৮ লক্ষ ৩২ হাজার। রাজা অগস্টসের সময় এক ধনী ব্যক্তিই ৪১১৬৫ দাসদাসীর সম্বন্ধে উইল করে গেছেন।[২২৫]

---

২২৪. আকরম খাঁ, মাও, মোঃ, মোস্তফা চরিতের বৈশিষ্ট্য, কোলকাতা, ১৩৩৯ বাং, পৃ. ৬১।
২২৫. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

তখন নিয়ম ছিল, 'দাস বংশের সন্তান দাস হবে' এবং পরাজিত শত্রুজাতির সমস্ত সন্তান-সন্ততিকে দাসদাসী করে নেয়াই তাদের ধর্মীয় বিধান ছিল। এমনকি, সে সময় দালাল এজেন্ট নিযুক্ত করে আফ্রিকাসহ বিভিন্ন দেশ থেকে নরনারীদেরকে এনে দাস-দাসীতে পরিণত করতো।

যিশুখ্রিষ্ট এবং পাশ্চাত্য জাতিসমূহের কাছে এটা কোনো দোষের কাজ ছিল না।[২২৬] অত্যন্ত জঘন্য ও কঠোর কাজ এদের দ্বারা করানো হতো। যা ছিল সম্পূর্ণ মানবতাবিরোধী। কিন্তু প্রতিবাদ করার মত সাহস তাদের ছিল না। দাসদাসীদের জীবন-মরণের একমাত্র মালিক ছিলেন মানবরূপী তার প্রভু। সামাজিক অধিকার তো দূরের কথা, প্রভু ইচ্ছা করলেই বিনা অপরাধে যথেচ্ছা হত্যা করতে পারতো। দাসীরা প্রভুর পাশবিক বৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য উপকরণ রূপে বিবেচিত ছিল, প্রভু ইচ্ছা করলে তার সতীত্ব সর্বতোভাবে খর্ব করতো। কিন্তু কোনো দাসের সাথে বিবাহ করার অধিকারও তাঁর ছিল না। দাস যদি কোনো স্বাধীন নারীর সাথে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হতো, তাকে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করাই ছিল ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা।

মাওলানা আকরম খাঁ তাঁর গ্রন্থে তখনকার অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন :

> amphi-theatres প্রভৃতি তামাশাগুলিতে যখন রোমের সুসভ্য নর-নারিদিগের প্রমোদ মেলা বসিত, তখন রঙ্গমঞ্চের লৌহ শলাকাবেষ্টতি প্রাঙ্গণে সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও বন্য মহিষাদি হিংস্র পশুদিগকে ছেড়ে দেয়া, তার মধ্যে পুরিয়া দেওয়া হইত হতভাগ্য দাসদিগকে। দাস আত্মরক্ষার জন্য ঐ সকল হিংস্র পশুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত, আঘাতের পর আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া প্রাণভয়ে আকুল আর্তনাদ করিতে থাকিত। আর এই আমোদ উপভোগে উৎফুল্ল দর্শক নরনারীদিগের কণ্ঠ আনন্দ ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিত।[২২৭]

যিশুখ্রিস্টের আবির্ভাব যুগ হতে খ্রিষ্টান জগতের দু'হাজার বছরের ইতিহাস দাস-দাসীদের করুণ চিত্রের ইতিহাস বলা যায়। ফরাসি, জার্মানি, স্পেন, ইংরেজ ও খ্রিষ্টান জাতি চিরকালই দাসপ্রথার সমর্থন করে আসছে। শুধু সমর্থনই নয়, তারা মূলধন খাটিয়ে ও কোম্পানি গঠন করে স্বাধীন নর-নারিদেরকে ধরে এনে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিক্রয় করতো। এ জন্য বিলাতের পার্লামেন্ট 'বৃটিশ আফ্রিকান কোম্পানীকে' যথেষ্ট Subsidy দিতে হয়েছে।[২২৮]

মাওলানা তাঁর বইতে এ সম্পর্কীয় দীর্ঘ ফিরিস্তি দিয়ে বলেন :

> উইলিয়াম মেরির সময় হতে ইংরেজ জনসাধারণকে এই ব্যবসা করার অনুমতি দেয়। ফলে ১৬৮০ থেকে ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মাত্র ২০ বৎসরে ইহারা ৩ লক্ষ নিরপরাধ নিগ্রোকে ধরিয়া আনিয়া দাস রূপে বিক্রয় করে।[২২৯]

---

২২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫।
২২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫।
২২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫।
২২৯. ১৭০০-১৭৮৬ খ্রি. পর্যন্ত ৬ লক্ষ ১০ হাজার নিরপরাধ মানুষ বিক্রয় হয়েছিল। বৃটিশ উপনিবেশগুলোতে গড়ে প্রতি বছর ২০ হাজার নর-নারীকে চিরস্থায়ী দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হতো, এদেরকে ধরে আনার জন্য ইংরেজরা ১৯২ খানা জাহাজ নিযুক্ত করেছিল। জাহাজে ৪৭১৪৬ জন নিগ্রোকে বহন করার স্থান নির্ধারিত ছিল।
প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮।

www.pathagar.com

মূলত এটাকে কেবল দাস ব্যবসা বললে ঠিক হবে না; এটা ছিল দাস সৃষ্টির ব্যবসা। যিশুখ্রিষ্ট, খ্রিষ্টান সমাজ, খ্রিষ্টান ধর্ম এর প্রতিবাদ করেনি। খ্রিষ্টান ধর্মের প্রভাব প্রতিপত্তি কমে এলে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন চাঙ্গা হতে থাকে। ১৮৫০ খ্রি. পূর্ব পর্যন্ত খ্রিষ্টান দেশ এই জঘন্য ব্যবসায়ের মোহ হতে মুক্ত হতে পারে নি। অতঃপর মাওলানা ভারতবর্ষের ধর্মগুলো দাসপ্রথাকে কিভাবে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করেছে, তার বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। প্রথমেই আর্য পণ্ডিতগণ জনসাধারণকে করায়ত্ত রাখার যে অপকৌশল গ্রহণ করেছে সে সম্পর্কে তিনি বলেন :

> আর্য পণ্ডিতগণের দার্শনিক মস্তিষ্ক এই সত্যকে উত্তমরূপেই বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিল। তাই নিজেদের সমস্ত প্রতিভার সদ্ব্যয় করিয়া তাঁহারা জনসাধারণ (নীচ হিন্দুদেরকে) বুঝাইয়া দিলেন-তাহারা যে আজ নীচ জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়া হীন পশুর জীবন যাপন করিতেছে ইহার জন্য দায়ী একমাত্র তাহারাই। নিজেদের পূর্ব্বজন্মের পাপগুলির প্রতিফলেই তাহারা আজ এই নিকৃষ্ট জীবন লাভ করিয়াছে। সন্তুষ্টচিত্তে যথাশাস্ত্র এই জীবনটাকে বহন করিয়া মরিতে পারিলেই তাহারা আবার উৎকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া মোক্ষ লাভ করিতে সমর্থ হইবে। ইহা বুঝিয়া তাহাদিগকে আন্তরিক নিষ্ঠার সহিত জাতির দাসত্ব স্বীকার করিতে এবং গাব্রাহ্মণাদির পূজায় সম্পূর্ণভাবে তন্ময় হইয়া থাকিতে হইবে। এই জন্মান্তরবাদের কুহক রচনা করিয়া আর্য্যঋষিরা ভারতের কোটি কোটি নরনারিকে অতি জঘন্য দাসত্ব পাশে চিরস্থায়ীভাবে আবদ্ধ করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।[২৩০]

উল্লেখ্য, হিন্দু শাস্ত্রে শূদ্র আর দাস-একই অর্থবাচক হিসেবে চলে আসছে যুগ যুগ ধরে। ভগবান মনু বলছেন-

> শূদ্রন্তু কারয়েদ্দাস্যং ক্রীতমক্রীত মেব বা
> দাস্যায়ৈর হি সৃষ্টোহ সে ব্রাহ্মণস্য স্বয়ম্ভুবা।
> ন স্বামিনা সৃষ্টোহপি শূদ্রো দাস্যদ্বিনুচ্যতে
> নিসর্গজংহি তওস্য কস্তখাযোওদপোহতি।[২৩১]

অর্থাৎ, শূদ্রগণ ক্রীত হোক বা অক্রীত তাকে অবশ্যই দাসত্ববরণ করতেই হবে। ব্রাহ্মণের দাসত্ব গ্রহণ করার জন্যই বিধাতা শূদ্রের সৃষ্টি করেছেন। মরণ পর্যন্ত যেমন শূদ্রের শূদ্রত্ব নষ্ট হয় না, সেইরূপ শূদ্র স্বামী কর্তৃক মুক্ত হলেও তার দাসত্বের মোচন হওয়া সম্ভব নয়।

শূদ্র-দাস ব্যতীত হিন্দু শাস্ত্রকারেরা শ্রী ভগবানের নামকরণে সাত প্রকার দাসত্বের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। যেমন যুদ্ধের বন্দীমাত্রই দাস, অর্থের দ্বারা কেনা ক্রীতদাস, দাস বংশে জন্মগ্রহণ ব্যক্তিমাত্রই দাস, অন্নলোভে ব্রাহ্মণের বাড়িতে যে চাকরি গ্রহণ করে, সে দাস।

ঋগ্বেদে উল্লেখিত হয়েছে যে-

> ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইয়াছেন ঈশ্বরের মুখ হইতে আর শূদ্রের সৃষ্টিহইয়াছে তাঁহার পা হইতে (১০:৯০)।[২৩২]

---

২৩০ . মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোস্তফা চরিতের বৈশিষ্ট্য, কোলকাতা, ১৩৩৯ বাং, পৃ. ৭০।
২৩১ . প্রাগুক্ত।
২৩২ . মোহাম্মদ আকরম খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।

www.pathagar.com

শ্রীভগবান আরও বলছেন-

> শূদ্র যদি ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের লোকের প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করে, তবে ঐ শূদ্রের জিহবাচ্ছেদ করিয়া দিতে হইবে। কারণ, ব্রহ্মার পদরূপ নিকৃষ্ট অঙ্গ হইতে তাহার জন্ম হইয়াছে। ... শূদ্র যদি উচ্চ বর্ণের লোককে মারিবার জন্য হস্তপদাদি কোনো অঙ্গ উত্তোলন মাত্র করে তবে রাজা তাহার সে অঙ্গ কাটিয়া দিবেন। ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে বসিলে শূদ্রের পাছা কাটিয়া দেওয়া হইবে।[২৩৩]

ভগবান মনু আরও বলছেন-

> মৌণ্ড্যং প্রাণান্তিকো দণ্ডো ব্রাহ্মণস্য বিধীয়তে
> ইতরেষাণ্ড বর্ণানাং দণ্ডঃ পাণান্তিকো ভবেৎ।
> ন জ্যাতু ব্রাহ্ম হন্যাৎ সর্ব্বপাপেদ্বপি স্থিতম
> রাষ্ট্রাদেনং বহিঃ কুর্য্যাৎ সমগ্র ধনমক্ষতম।[২৩৪]

যে অপরাধের জন্য প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা আছে ইতর (নীচ জাতীয়) লোকদের সম্বন্ধে ঐ দণ্ডই বলবৎ থাকবে। কিন্তু ঐ সকল অপরাধের জন্য ব্রাহ্মণের শুধু মাথা মুড়িয়ে দেয়া হবে- ইহা শাস্ত্রের ব্যবস্থা। যে কোনো জঘন্য পাপাচারী হলেও ব্রাহ্মণকে কখনও বধ করা যাবে না। তবে, ব্রাহ্মণ যদি এমন কাজ করে তা হলে ঐ অবস্থায় সমস্ত ধন-সম্পদসহ অক্ষত শরীরে রাজা তাকে রাজ্যের বাইরে পাঠিয়ে দিবেন।

সমগ্র পৃথিবী যখন এমনি ধরনের অকল্যাণ ও নির্মমতার শিকলে আবদ্ধ হয়ে মানবতাকে হারিয়ে ফেলেছিল এবং ধর্মের ধর্মশাস্ত্রের, শ্রী ভগবানের ও সদা প্রভুর নাম করে জগতের যাজক পুরোহিতগণ আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিঅগণিত মানুষকে মারাত্মক পশুত্বের অবস্থায় ঠেলে দিচ্ছিলো, এমনি সংকটাপন্ন অবস্থায় মুহাম্মদ (স.) এসে মানুষকে মুক্তির পয়গাম শুনালেন। সমস্ত দাসত্বের মূলোৎপাটন, অসাম্য ও অত্যাচারের সব উপাদানকে পৃথিবী হতে সমূলে উৎপাটিত করে, মানবতার কল্যাণকামী ব্যবস্থা দৃঢ়হস্তে প্রতিষ্ঠিত করে দিলেন দুনিয়ার বুকে। তাঁর শিক্ষা ও সাধনার কল্যাণে মানুষ মুক্ত ও স্বাধীন হয়ে গেল। তিনি আল্লাহর বাণী প্রচার করে বললেন-

> হে মুমিনগণ ! এক সমাজের লোক যেন অন্য সমাজের লোকদিগকে বিদ্রূপ না করে- হয়ত ইহাদিগের অপেক্ষা তাহারাই উত্তম।[২৩৫]

পবিত্র কুরআনে আরও বলা হয়েছে-

> হে মানব ! তোমাদের সকলকেই একই নর-নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। এবং তোমাদিগকে শাখা ও গোত্রে বিভক্ত করেছি তোমাদের নিজেদের পরিচয়ের জন্য।

---

২৩৩. শূদ্র যদি ব্রাহ্মণীর অঙ্গ স্পর্শ করে তাহা হলে তাহার প্রাণদন্ডের ব্যবস্থা করিতে হইবে। অপকৃষ্ট জাতীয় কন্যা যদি সম্ভোগার্থ উৎকৃষ্ট জাতীয় পুরুষের ভজনা করে তাহাতে সেই কন্যার কোন দন্ড হইবে না। কিন্তু অধম জাতির পুরুষ যদি উচ্চ জাতির কোন কন্যাকে ভজনা করে, তাহা হইলে তাহার প্রাণদন্ডের ব্যবস্থা ইত্যাদি।
মোহাম্মদ আকরম খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩।

২৩৪. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।

২৩৫. يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم
সুরা হুজুরাত, আয়াত, ১১।

www.pathagar.com

> নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি যত অধিক সৎ কর্মশীল, আমার নিকট সে-ই তত অধিক মহৎ।[২৩৬]

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় মাওলানা হযরত বিলাল (রা.)–এর ঘটনাটি উল্লেখ করেন :

বিলাল (রা.) ছিলেন হাবশি গোলাম। মক্কা বিজয়ের পর মদিনার মসজিদে নববির মুয়াজ্জিন হিসেবে রসুল (স.) তাঁকেই নির্বাচিত করেছেন। কুরেশগণ আভিজাত্যের কারণে বিলালের এই পদমর্যাদার প্রতি প্রতিবাদ করায় উপর্যুক্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। এবং সাথে রসুল (স.)- ও বলেন:

> বংশের জন্য কারও প্রতি কোনো প্রকার হেয়তা প্রদর্শন করা সঙ্গত নয়। তোমরা সকলে আদমের সন্তান। ছাঁচেঢালা দু'টি পরিমাপ পাত্র, যেমন পরস্পর ঠিক সমান হয়, তোমরা সকল বংশের সকল গোত্রের সকল মানুষ পরস্পর ঠিক সেইরূপ সমান। নিজের ব্যক্তিগত ধর্ম ও সংযম ব্যতীত, বংশের হিসেবে কারও উপর কারও কোনো মর্যাদা নেই।[২৩৭]

পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মযাজক ও পুরোহিত শ্রেণি অধস্তন ও দাসদের সাথে অমানবিক আচরণের এ করুণ চিত্রের সাথে ইসলামের অনুপম আদর্শের তুলনামূলক আলোচনা করলে এ সত্যটি বেরিয়ে আসবে। বিশ্বে দাসদের মুক্তির ঘোষণা ইসলামই প্রথম দিয়েছে। ইসলামের নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) ও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণকারীরা এর প্রত্যক্ষ সাক্ষী। উদাহরণস্বরূপ মাওলানা আকরম খাঁ বলেন :

> একবার হেজাজের রাজা সুলতান ইবনে সউদ হজের কিছুদিন পূর্বে মক্কায় আগমন করেন। মক্কায় প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে যথারীতি তাঁহাকে খানায়ে কাবা তওয়াফ করিতে আসিতে হয়। আমরাও সে-সময় হরমে উপস্থিত থাকিয়া সুলতানের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিলাম। দেখিলাম-হেজাজ ও নজদের প্রবল পরাক্রান্ত রাজাও জনসাধারণের মত একখানি মাত্র সাদা তহবন্দ পরিয়া ও একখানা সাদা চাদর গায়ে দিয়া নগ্নপদে নগ্নমস্তকে মাতাফে প্রবেশ করিলেন, জনসাধারণের সঙ্গে মিলিয়া একইভাবে দৌড়িয়া দৌড়িয়া তাওয়াফ করতে লাগিলেন। একবার তাওয়াফের পর হজরে আসওয়াদ চুম্বনের সময় সেখানে একটু বেশি ভিড় হইল। রক্ষক সুলতানকে অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, দুইজন যাত্রীকে সরাইয়া দিবার জন্য 'দাকা সুলতান, দাকা মলেক' অথ্যাৎ রাজা, রাজা বলিয়া যাত্রীদিগকে সতর্ক করিতে চাহিলে একজন বেদুঈন বৃদ্ধ উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল : রাজা, রাজা ! কিসের রাজা? এটা তোমার বাবার বাড়ী নয়, রাজারও বাড়ী নয়। এটা আমাদের প্রভুর ঘর। এখানে তিনিই কেবল রাজা, আর আমরা সকলেই তাঁর বান্দা ও ভাই।[২৩৮]

সুলতান অদূরে দাঁড়িয়ে বেদুঈন বৃদ্ধের মুখে ইসলামের এই তেজোদ্দীপ্ত বাণী শ্রবণ করে ভাবাবেগ সম্বরণ করতে পারলেন না, হঠাৎ উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠলেন :

---

২৩৬. يا ايها الناس إنا خلقنكم من ذكر وانثى وجعنكم شعوبا..... ان أكرمكم عند الله اتقاكم
সূরা হুজুরাত, আয়াত-১৩।

২৩৭. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭।

২৩৮. মোস্তফা চরিতের বৈশিষ্ট্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯।

www.pathagar.com

ঠিক কথা পিতঃ ! তুমি সত্য কথা বলেছ। আল্লাহ তোমার দীর্ঘায়ু করুন ! কিন্তু তিনি রাজা সর্বত্রই, আর তাঁহার অনুগ্রহে আমরা সকলেই তাঁহার দাস ও পরস্পরের ভ্রাতা ![২৩৯]

উল্লেখিত ঘটনায় যে অপরূপ দৃশ্যের অবতারণা হয়, তার প্রতি ইংগিত করে মাওলানা বলেন :

চোখের জলে আমার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল, সেখানেই সেজদায় পড়িয়া বলিলাম,-শত ধন্যবাদ তোমাকে হে কাবাধিপতি! মুছলমানের প্রাণশক্তি এখনও জীবন্ত হইয়া আছে, এখনও তাহার আশা আছে।[২৪০]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, দাসপ্রথা সভ্যতার ইতিহাসের এক করুণ অধ্যায়। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্বের ঘৃণ্য প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। মানব সমাজের ক্রমবিকাশের সাথে সাথে বিবর্তন আসে সমাজে। সামন্ত সমাজে ভূস্বামী ও শাসক শক্তিমান পুরুষ অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও দরিদ্র মানুষকে দাসানুদাসে পরিণত করতো। তাদেরকে বিভিন্ন কাজে লাগাতো। দাসপ্রথার সূচনা মূলত এভাবেই। দাসদের ইতিহাস করুণ। সংক্ষিপ্তাকারে দাসপ্রথার তিনটি অধ্যায় নিম্নরূপ :

ক. ইসলাম-পূর্ব দাসদের অবস্থা ও অবস্থান,

খ. ইসলামে দাসদের মর্যাদা এবং

গ. বর্তমান বিশ্বে দাসদের (?) স্থান।

বলা দরকার যে, দাসরা সর্বযুগেই আর্থ-সামাজিকভাবে অবহেলিত, ঘৃণিত স্বার্থান্বেষীদের কাছে। স্বার্থবাদীরা নির্মমভাবে দাসদের ওপর অত্যাচার করে অবর্ণনীয় কাজে বাধ্য করে। দাসদের পশুর চাইতে নিকৃষ্ট মনে করা হয়, হাটে-বাজারে বিক্রির মহড়া চলে পশুর ন্যায়ই। এটা প্রাক-ইসলাম যুগে যেমন ছিল, ইসলাম-উত্তর যুগেও আছে।

আগেই বলে নেয়া দরকার যে, মানবতার এ অধঃপতন থেকে সর্বপ্রথম ইসলামই মানুষের মর্যাদায় ভূষিত করে দাসদের। মানবেতিহাসে দাসপ্রথার উচ্ছেদের ক্ষেত্রে ইসলামের ভূমিকার তুলনা নেই। ইসলাম দাসপ্রথাকে নিছক ঘৃণ্য প্রথা হিসাবে নির্ণিত করেই ক্ষান্ত হয় নি, এর মূলোৎপাটনের জন্য তদানীন্তন প্রেক্ষাপটে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করে বিশ্বের দরবারে নজির স্থাপন করেছে।

দাস শব্দের আরবি প্রতিশব্দ হচ্ছে আবদ। দাসত্বের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে : সমাজের আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে প্রতিষ্ঠিত কোনো শক্তিধর পুরুষ বা শ্রেণির কাছে গরিব বা দুর্বল ব্যক্তি তার স্বাধীনতা, সম্ভ্রম, বিবেক, মনুষ্যত্ব, হিতাহিত জ্ঞান বিকিয়ে দিয়ে সেই শক্তিধরের আজ্ঞাবহ পাত্র হিসাবে থাকা।

আবার স্বাভাবিক অর্থে দাসপ্রথা বলতে বুঝায়, 'জীবিকা নির্বাহের জন্য নিজের শ্রমকে অন্যের কাছে বিক্রি করা।[২৪১]

অবশ্য, প্রাচীনকালে দাস বলতে বুঝানো হতো : নিজের জীবনকে অন্যের কাছে বিক্রি করা, সেখানে নিজের ব্যক্তিস্বাধীনতা বলতে কিছুই থাকতো না।

২৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০।
২৪০. প্রাগুক্ত।
২৪১. দ্যা স্পিরিট অব ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬।

www.pathagar.com

অর্থাৎ, "In a Slave, a servant completely divested of freedom and personal right."

এবং "Property of others are called slave."

দাসপ্রথার উৎপত্তি এবং এর চরমাবস্থায় একদিনেই পৌঁছেনি। স্মরণাতীতকাল থেকেই পৃথিবীর প্রতিটি স্থানে দাস-ব্যবস্থা জমজমাট, অবাধ ও স্বাধীন ছিল। তবে সমাজে দাসপ্রথার প্রচলন কে বা কারা করে এবং কোথা থেকে এর উৎপত্তি তা বলা মুশকিল। এতটুকু বলা যায় যে, মানুষ আর্থ-সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে শিখলেই সমাজের শক্তিশালীরা দাসপ্রথার প্রচলন আরম্ভ করে। দাসপ্রথার উৎপত্তি কখন, সে দিন-ক্ষণ-ইতিহাস বলতে না পারলেও এর চরমত্ব লাভ করেছিল খ্রিষ্ট-পূর্ব সপ্তম শতকে। এটা ছিলো এ্যথনীয় তথা গ্রিক সভ্যতার চরম বিকাশের সময়। এ প্রথা চরমে পৌঁছে ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত। ইসলামের আবির্ভাবকালীন সময়ে বিশ্বের প্রতিটি দেশে ও সমাজে এ জঘন্যতম প্রথা প্রচলিত ছিল।

রোম, পারস্য, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, এশিয়া, আরব, ভারত, চীনসহ অন্যান্য দেশে দাসদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। প্রাক-ইসলামি সমাজ ব্যবস্থায় দাসদের জীবনচিত্র ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। রোমান সাম্রাজ্যে দাসদের মানুষ হিসাবে গণ্য করা হতো না। এরা ছিলো পণ্যসামগ্রী মাত্র। তাদের অধিকার বলতে কিছুই ছিলো না। পশুর চাইতেও নিকৃষ্টতম আচরণ করা হতো সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষের সাথে। মাঠে-ঘাটে, তাদের দিয়ে অমানুষিক পরিশ্রম করনো হতো। কঠিন কাজ করার সময় তারা যাতে পালিয়ে যেতে না পারে, সে জন্য কড়া নজর রাখা হতো। মালিক পক্ষ ছিলো অত্যন্ত কঠোর। দাসদের হাতে-পায়ে লোহার শিকল ও বেড়ি লাগানো হতো। পানাহার থেকে তারা বঞ্চিত থাকতো। কাজ করার ক্ষমতাটুকু টিকিয়ে রাখার জন্য সামান্য কিছু খেতে দিতো। জীবনে কোনো রকমে তারা বেঁচে থাকতো। মানুষরূপী প্রভুরা কথায় কথায় মারধর করে সুখানুভব করতো। কাজের শেষে ইঁদুর-পোকার নিবাসের ন্যায় আঁধারি কুঠুরিতে শৃঙখলে বাঁধা অবস্থায় তাদের নিক্ষেপ করা হতো। তারা কোনোমতে সেখানে রাত কাটাতো। দাসদেরকে যুদ্ধের কাজেও লাগানো হতো। মনিবদের চিত্তবিনোদনমূলক মরণপণ যুদ্ধেও তাদের ঠেলে দিত। তাদের জৈবিক লালসার উপায়-উপকরণের ব্যবস্থা করা হতো এদের দিয়েই। নারী দাসীদের তো নিস্তারই ছিলো না। অমানবিকভাবে তাদের ব্যবহার করা হতো। ভোগ্যবস্তু ছিলো তারা। আবুল ফারাজ ইসপাহানী বিরচিত গ্রন্থ 'কিতাবুল আগানীতে' প্রাক-ইসলামি যুগের বহু প্রকার দাসপ্রথার বিবরণ দেখা যায়।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে পৃথিবীর আর সব দেশের মতো আরবেরও আর্থ-সামাজিক ও উৎপাদনের অপরিহার্য অঙ্গ ছিলো দাসপ্রথা। ইতিহাস এ যুগকেই আইয়্যামে জাহেলিয়া' বলে অভিহিত করেছে। অজ্ঞানতার এ যুগে আরবে বিভিন্ন রকমের দাসপ্রথার হদিস পাওয়া যায়। আফ্রিকা ও আবিসিনিয়ায় ক্রীতদাস, লুণ্ঠিত বা বলপূর্বক প্রাপ্ত নর-নারী, বালক-বালিকা হাটে-বাজারে বিক্রি হতো। বিবদমান গোত্রের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে হতভাগ্য যুদ্ধবন্দীদের চিরতরে দাসত্বের নিগড়ে বন্দী করা হতো। ইরাক, তুর্কিস্তান থেকে আরবে দাস-দাসী আমদানি হতো। দাস ব্যবসায়ীরা সিরিয়া

www.pathagar.com

থেকেও অনেক দাস-দাসী কিনে এনে বিক্রি করতো। এদের মধ্যে অনেকেই থাকতো গায়িকা। অনেকেই থাকতো নর্তকী। এরা সাধারণত নৃত্য, গান-বাদ্য এবং মাতলামির জন্যেই ব্যবহৃত হতো।

সৈয়দ আমীর আলি 'দ্য স্পিরিট অব ইসলাম' গ্রন্থে লিখেছেন,

> তখনকার আরবে ভৃত্য বা ভূমি দাসের ভাগ্যে ক্ষীণ আশা ও এক কণা সূর্যরশ্মিও কবরের (ইহজীবনে) এদিকে জুটতো না।[২৪২]

এটা ইসলাম আবির্ভাবকালীন দাস জীবনের চিত্র। দাস জীবনকে মানব জীবনের পূর্ণ মর্যাদায় ভূষিত করেছে ইসলাম। ইসলামই সমাজ জীবনে বিপ্লব এনেছে।

বিশ্বের সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলাম। এর সুশীতল ছায়াতলে এসে মানব জাতি জীবন চলার সঠিক পথনির্দেশ পেয়েছে। সাম্যের কথা বলেছে ইসলাম। আদল-ইনসাফের বিজয়কেতন উড়িয়েছে ইসলাম। প্রাক-ইসলামি যুগের প্রতিটি ন্যক্কারজনক এবং ঘৃণ্য প্রথাকে ইসলাম শিকেয় উঠিয়েছে। তেমনি, ইসলাম বিশ্বমানবতাকে ঘৃণ্যতম দাসত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তির ঘোষণা দিয়ে বলেন :

> আমি আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছি।[২৪৩]

প্রভুদের উদ্দেশ্যে ঘোষিত হলো :

> তোমরা একই উৎস হতে এসেছো। আল্লাহর চোখে সেই শ্রেষ্ঠ, যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়াবান।[২৪৪]

নবি করিম (স.) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের সৃষ্টিকর্তা এক এবং তোমাদের পিতা এক, তোমরা আদম থেকে সৃষ্ট, আর আদম মাটি হতে সৃষ্ট, কেবলমাত্র ধর্মপরায়ণতা ছাড়া একজন আরবের অনারবের ওপর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই এবং কালোবর্ণ মানুষের ওপর রক্তবর্ণ মানুষের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই।[২৪৫]

দাসদের সাথে মালিকরা কিভাবে আচরণ করবে, তারও শিক্ষা রয়েছে পবিত্র কুরআনে :

> পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন এবং মালিকানাধীন সবার প্রতি সদ্ব্যবহার কর।'[২৪৬]

বুঝা যাচ্ছে, মনিব ও দাসদের সম্পর্ক প্রভুত্ব ও দাসত্বের নয়, রাজা-প্রজার সম্পর্কও নয়, সম্পর্ক হচ্ছে আত্মীয়তার, ভ্রাতৃত্বের। তাই, স্বাধীন ব্যক্তিদের অনুমতি দেয়া হয়েছে দাসীদের বিয়ে করার। আবার মনিবদের দাসদের ভাই হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়েছে। হাদিসে এসেছে :

> তোমাদের দাসরা তোমাদের ভাই। সেহেতু, যার মালিকানায় তার কোনো ভাই রয়েছে, তার উচিত সে নিজে যা খায় ও পরে, তাকেও তা খেতে ও পরতে দেয়া।

---

২৪২. দ্য স্পিরিট অব ইসবলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬।
২৪৩ . ইসলা, আয়াত-৮০।
২৪৪ . খোদাভীরু (মুত্তাকী)।
হুজুরাত, আয়াত-৩১।
২৪৫ . মাজমা'উল ফাওয়াইদ, ইমাম তাবারী, পৃ. ৮৪।
২৪৬ . কুরআন, ৪ ঃ ৪৫।

www.pathagar.com

তাদের সাধ্যের বাইরে কোনো কাজ তাদের ওপর চাপিও না। কঠিন কাজে তাদের সাহায্য করা'[২৪৭]

মানবেতিহাসের জঘন্যতম শব্দ, দাস ধারণাটি পাল্টানোর জন্য নবি করিম (স.) ইরশাদ করেন:

আমাদের দাস, আমাদের দাসী-একথা বলো না বরং আমার ছেলে, আমার মেয়ে-এ কথাই বলো।[২৪৮]

স্মরণ করা যেতে পারে যে, কুরআনুল কারিমের একটিমাত্র আয়াত[২৪৯] ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো আয়াতে আবদ' বা দাস শব্দটি ব্যবহৃত হয় নি। কেননা, ইসলাম দাসপ্রথাকে অত্যন্ত নিন্দার চোখে দেখে। এ প্রথার মূলোৎপাটনে সদা তৎপর এবং বাস্তব ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে একমাত্র ইসলামই। ইসলামের বৈপ্লবিক কর্মসূচির দরুন দাসরা পণ্যসামগ্রী আর বেচাকেনার বস্তু থাকে নি। মানুষ হিসাবে বিবেচিত হলো। তাদের আত্মা মনিবের আত্মার মর্যাদা পেয়েছে। ইতিহাস সাক্ষ্য বহন করে, ইসলামের এ কর্মসূচি অন্যান্য কর্মসূচির ন্যায়ই সফল হয়েছে। ইসলামবিদ্বেষী পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকরাও লিখেছেন,

ইসলামের প্রারম্ভিক পর্বে দাসরা যে মর্যাদার আসন অলংকৃত করেছিল, পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও তার তুলনা মেলে না।

ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রচার-প্রসারে আরব-অনারব, মালিক-ভৃত্য সবাই এক সাথে অংশগ্রহণ করে। যে লোকটি ক্রীতদাস, সে তো পূর্বে জীবন্ত যন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হতো, তারাই পরবর্তীসময়ে ধন-সম্পত্তি ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জন করে এবং উচ্চাসনে সমাসীন হয়। তাই ক্রীতদাস তার অধিকার আদায়ের জন্য আদালতে বিচার দায়ের করতে পারে। ক্রীতদাসের উত্তম চরিত্র হলে মামলায় তার সাক্ষ্য গ্রহণীয় বলেও বিবেচিত হয়।[২৫০]

দাসদের সুশিক্ষা দেয়ার জন্য একমাত্র ইসলামই উৎসাহিত করেছে। নবি করিম (স.)-এর বাণী :

যে ব্যক্তির অধীনে কোনো একটি দাসী রয়েছে এবং সে দাসীকে সুশিক্ষা দান করে আর মুক্ত করে নিজে বিয়ে করে, সে সৃষ্টিকর্তার কাছে দ্বিগুণ পুরস্কারপ্রাপ্ত হবে।[২৫১]

বালাজুরী 'ফুতুহুল বুলদান' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন :

একবার রোমের চার হাজার যুদ্ধবন্দীকে হযরত ওমর (রা.) শিক্ষার উদ্দেশ্যে মদিনার এক পাঠশালায় পাঠিয়েছিলেন।

বিশেষ কারণে সময়ের প্রেক্ষিতে মানুষকে দাসত্ব শৃঙখলে আবদ্ধ করা ইসলাম অনুমোদন করে। যেমন-

১) যুদ্ধবন্দী-ইসলাম সর্বপ্রথম তদানীন্তন আর্থ-সামাজিক ও সামরিক প্রেক্ষিতে যুদ্ধবন্দীদেরকে সাময়িকভাবে বা প্রয়োজনবোধে দাসত্ব শৃঙখলে আবদ্ধ করার

২৪৭ . বুখারি, কিতাবুল জারিয়াত, পৃ. ১০১৩।
২৪৮ . মুসলিম, সুনানে আবু দাউদ, পৃ. ৮৯৫।
২৪৯ . সুরা নাহলের ৭৫তম আয়াত।
২৫০ . বুখারি, তালিমুল জারিয়াত, পৃ. ১০৫৭।
২৫১ . বুখারি ঃ তা'লিমুল জারিয়াত, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

অনুমতি দিয়েছে। অবশ্য, এসব যুদ্ধবন্দীকেও দাসে পরিণত করার প্রতি ইসলাম চূড়ান্ত বা নীতিগত অনুমোদন দেয়নি।

কোনো মুক্ত মানুষকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা ইসলাম সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করেছে। মহানবি (স.) ইরশাদ করেছেন :

যে ব্যক্তি কোনো স্বাধীন মানুষকে বিক্রি করে তার প্রাপ্ত মূল্য ভোগ করবে, শেষ বিচারের দিন তার বিপক্ষে আমি যুক্তি উত্থাপন করবো।[২৫২]

যে ব্যক্তি কোনো মুক্ত মানুষকে দাসে পরিণত করে, তার নামায আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।[২৫৩]

বিশ্বের বুকে একমাত্র ইসলামই মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় দাসদের পূর্ণ আযাদি লাভের বন্দোবস্ত করেছে-

ক. মনিবদের স্বতঃপ্রণোদিত মুক্তিদান ব্যবস্থা।

খ. মুক্তিপণে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা।

স্বেচ্ছায় দাস মুক্তকরণে ইসলাম মনিবদের নানাভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। মহানবি (স.) স্বয়ং তাঁর অধীনস্থ দাসদের মুক্তি দিয়ে উদাহরণ সৃষ্টিকরেছেন। সাহাবায়ে কিরামও তাঁর আদর্শ অনুসরণ করেন। হযরত আবু বকর (রা.) প্রচুর অর্থ দিয়ে পৌত্তলিক কুরাইশ মনিবদের থেকে বহু দাস ক্রয় করে দাসত্বের শৃঙখলমুক্ত করেছেন। এ ক্ষেত্রে এমনিতেই হযরত বিলাল (রা.)-এর নাম এসে যায়। এটা জ্বলন্ত ইতিহাস।

বায়তুল মাল থেকে অর্থ দিয়েও দাস কিনে মুক্ত করা এবং শিক্ষা দানের মাধ্যমে দাস মুক্তির ব্যবস্থা করা সম্পর্কে নবি করিম (স.) ইরশাদ করলেন,

যে দাস দশজন মুসলমানকে লেখাপড়া শেখাবে অথবা মুসলিম সমাজে অনুরূপ কোনো মূল্যবান সেবা করবে, সে মুক্তি পাবে।[২৫৪]

কুরআনের ১৯টি আয়াতে ক্রীতদাস মুক্ত করার বিভিন্ন উপায় ঘোষিত হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের পাপ ও পদস্খলন থেকে ত্রাণ লাভের অন্যতম ব্যবস্থা হিসাবে দাস মুক্তির নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। যেমন-

ক. ভুলবশত কোনো মুসলিম বা জিম্মিকে হত্যা করলে।[২৫৫]

খ. প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কাফফারা স্বরূপ।[২৫৬]

গ. স্ত্রীর সাথে জিহারের কাফফারা স্বরূপ। [২৫৭]

ঘ. যাকাতের সম্পদ দিয়ে।[২৫৮]

ঐতিহাসিক সাক্ষ্য এই যে, ইসলামের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বিপুলসংখ্যক দাস স্বেচ্ছায় মুক্তিদানের নজির ইসলাম ছাড়া বিশ্বের অন্যকোন মত ও পথে নেই।

---

২৫২. বুখারি ঃ কিতাবুল বুয়ু, পৃ. ৮১৭।
২৫৩. সুনাসে আবু-দাউদ, তিরমিজী।
২৫৪. বুখারি, কিতাবুল জারিয়াত, প্রাগুক্ত।
২৫৫. নিসা, আয়াত ৯২।
২৫৬. সুরা মুহাম্মদ।
২৫৭. মুজাদিলা, আয়াত-৩।
২৫৮. তাওবা, আয়াত-৬০।

www.pathagar.com

ইসলামের দ্বিতীয় পন্থায় ক্রীতদাস মালিককে যখনই মুক্তিপণের টাকা দিতে সমর্থ হতো, তখনই মুক্তি পেতো অনায়াসে। এক্ষেত্রে কতিপয় চুক্তি মুকাতাব, মুদাব্বির, উম্মে ওয়ালাদ, আংশিক আযাদিপ্রাপ্ত এসব পন্থায় ক্রীতদাস শর্ত পূরণ করে আযাদ হয়ে যেতে পারে।

বলা বাহুল্য যে, মুক্তিপণ পদ্ধতিতে ইসলাম দাসদেরকে মনিবের স্বেচ্ছাচার থেকে চিরতরে নিস্কৃতি দিয়েছে। ইউরোপ চতুর্দশ শতকে যা করেছে, ইসলাম তার সাতশ' বছর পূর্বেই তা করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

প্রশ্ন জাগাটা স্বাভাবিক, দাসপ্রথা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হলো না কেন? এর উত্তরে বলতে হয় যে, কতগুলো সঙ্গত গুরুত্বপূর্ণ কারণেই দাসপ্রথা সমূলে বন্ধ হয় নি। যেমন-

১. আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট,
২. সাংস্কৃতিক প্রয়োজন এবং
৩. সামরিক কারণ।

ইসলাম শাশ্বত ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। ইসলামের আবির্ভাবকালীন দাসপ্রথা গোটা বিশ্বের স্বীকৃত আর্থ-সামাজিক রীতি হিসেবে চালু ছিলো। কেউ এটাকে বাধা দেয়ার বা পরিবর্তনের চিন্তা করার ছিলো না। সর্বব্যাপী ব্যবস্থার সংস্কার স্বভাবতই সময়ের অন্যতম দাবি। সেহেতু ইসলাম ক্রমবিলুপ্তির ধারা অবলম্বন করেছে। এর প্রয়োজনও ছিল।

ঐতিহাসিক সত্য এই যে, ইসলাম মানব-প্রকৃতিকে বদলাতে চায়নি। ইসলাম তো তা-ই সংশোধন করে উন্নততর করতে চেয়েছে। জোর-জবরদস্তি করে নয়। সময়-সুযোগ দিয়ে স্বাভাবিক দুর্বলতা কাটানোর পরই ইসলাম বিধি-নিষেধ জারি করেছে। দাসপ্রথার নিত্য-নতুন উৎস না থাকলে আরব উপদ্বীপের মতোই ইসলাম বহু আগে মুসলিম দুনিয়ার বুক থেকে কার্যত দাসপ্রথা বিলুপ্ত করে দিত বা হয়ে যেতো। যেহেতু ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমদের মত ও পথের স্বাধীনতা ছিল এবং অমুসলিম বিশ্বে এ প্রথা নতুনরূপে, নব-উদ্যোগে চলছিল, সেহেতু সর্বতোভাবে এর মূলোচ্ছেদ ব্যাহত হয়েছিল। এদিকে, ইসলামের পর হাজার বছরের বেশি সময় লেগেছিল পাশ্চাত্য জগৎ থেকে দাসপ্রথা উচ্ছেদ করতে।

দাসপ্রথা চিরতরে রহিত না করার সবচেয়ে বড় কারণ হিসেবে সামরিক প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এ কারণটি তো যে কোনো সময়ই দেখা দিতে পারে। এটা থাকবেও পৃথিবী লয় হওয়া পর্যন্ত। এসব সঙ্গত কারণেই দাসপ্রথা চিরতরে রহিত হয় নি।

দাস প্রথার ন্যায় এ অমানবিক অবস্থা থেকে ইসলাম মানুষকে স্বাধীন যে ব্যবস্থা করেছে। শুধু মুসলমান নয়, অন্যরাও এর প্রশংসা করেছেন। মাওলানা আকরম খাঁ তাঁর গ্রন্থে Lord Headly- এর উক্তি তুলে ধরেছেন এভাবে :

> "Consider the generations of men who worked to abolish slavery in this country alone. Thrice a bill was introduced into Parliament, and thrice it was rejected. Consider the amount of money that England and other countries had to pay in order to bring the slave-trade to an end. England had to pay three hundred thousand pounds to the Portuguese for giving up the trade in the north of the Equator. She paid Spain an indemnity of

www.pathagar.com

four hundred thousand pounds to bring the Spanish trade to an end, and an enormous sum went to pay off the companies and private adventurers, including the Church."[২৫৯]

ইজতিহাদের আবশ্যকতা

ধর্মের বিভিন্ন বিষয়ের উপর অন্ধ অনুকরণ মাওলানা আকরম খাঁ পছন্দ করতেন না। তিনি মনে করতেন, আবশ্যক হলে ইজতিহাদও করতে হবে। অবশ্য সাথে সাথে তিনি এ কথাও বলেছেন যে, মুজতাহিদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকতে হবে। ধর্মীয় বিশ্বাস ও চিন্তাধারার দিক থেকে মাওলানা বিশেষ কোনো মাযহাব বা সম্প্রদায়ের গোঁড়া সমর্থক ছিলেন না। তিনি এ ক্ষেত্রে অনেকটা তাঁর পূর্বসূরি স্যার সৈয়দের মতই অনুসরণ করেছেন। তিনি অন্ধ তাকলিদের বাঁধনে আবদ্ধ না থেকে স্বাধীন ও বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাধারায় বিশ্বাসী ছিলেন। এ জন্য তাঁর ধর্মীয় ভাবধারায় কিছুটা উদারনীতির ছাপও দেখা যায়। তিনি ইজতিহাদের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু কখনও নিজকে মুজতাহিদ বলে দাবি করেন নি।[২৬০] তবে, ইসলামের সঠিক রূপ তিনি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। মূলত এ ধরনের কাজ যাঁরা করেন তাঁদেরকে 'মুহাককিক' বা সত্যসন্ধানী বলা যেতে পারে। মাওলানা আকরম খাঁ তাঁদেরই একজন।

ইজতিহাদ সম্পর্কে মাওলানা আকরম খাঁ তাঁর পূর্ববর্তী অনেক ইমাম ও আলিমের বরাত দিয়ে বলেন:

> আমাদের পূর্ববর্তী এমাম ও আলেমগণ তাহাদের হস্তগত দলিল-প্রমাণগুলির বিচার আলোচনা করিয়া, নিজ নিজ জ্ঞান ও বিবেক অনুসারে এজতেহাদ দ্বারা, এক একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। আর আমরা তাঁহাদের ভক্তি শ্রদ্ধার প্রমাণস্বরূপ এজতেহাদের দরওয়াজাগুলিকে অর্গলবদ্ধ করিয়া দিয়াছি; দুর্মোচ্য গজালি ঠুঁকিয়া সেই সর্বকল্যাণময় জ্ঞানের ভাণ্ডারকে আলেম সমাজের পক্ষে চিরদিনের জন্য নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছি। সমাজের যে সব মোহাদ্দেসদের পদতলে বসিয়া বৎসর বৎসর হাজার হাজার ছাত্র ছেহাছেত্তার হাদীছ সম্বন্ধে পারদর্শিতা লাভ করিতেছেন, যাঁহারা অসাধারণ যোগ্যতার সহিত কোরআন মাজীদের তাফছীর লিখিতেছেন, বোখারী, মোছলেম প্রভৃতির ব্যাখ্যা করিতেছেন, মজহাবী বাক-বিতণ্ডা উপলক্ষে অসাধারণ নিপুণতার পরিচয় দিতেছেন, তাঁহারাও এজতেহাদের অধিকারী। ধর্মীয় বিধি-ব্যবস্থাগুলি সম্বন্ধে, আজ মুসলমান সমাজের সম্মুখে, যে সব নূতন নূতন সমস্যার উদ্ভব হইতেছে এবং তাহার সমাধান কার্য্যত: অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইতেছে। ইজতেহাদ বা স্বাধীনভাবে বিচার আলোচনা করার অধিকারের অভাবই তাহার প্রধান কারণ। প্রসঙ্গক্রমে এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, এজতেহাদের জন্য বিশেষ যোগ্যতারও দরকার। বিচার্য্য বিষয়ের দলিল প্রমাণ

---

২৫৯. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোস্তফা চরিতের বৈশিষ্ট্য, কোলকাতা, ১৩৩৯ বাং, পৃ. ৯৬।

২৬০. 'ইজতিহাদ' অর্থ কোন কিছু হাসিলের উদ্দেশ্যে সর্বাঙ্গীণ চেষ্টা। ইসলামের পরিভাষায় শরী'য়তের কোন নির্দেশ সম্পর্কে সুষ্ঠু জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে সর্বাঙ্গীণ চেষ্টা ও সাধনার নাম ইজতিহাদ। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ'র ভিত্তিতে কিয়াস প্রয়োগ করে যিনি ইজতিহাদ করেন তাঁকে মুজতাহিদ বলা হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি যুক্তি-প্রমাণ ছাড়া অপরের মত মেনে নেয় তাকে 'মুকাল্লিদ' বলা হয়।
সংক্ষিপ্ত ইসলামি বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২, পৃ. ১০৮।

www.pathagar.com

সম্বন্ধে যিনি অজ্ঞ, তাঁহার পক্ষে এছলাম সম্বন্ধে স্বাধীন বিচার আলোচনা করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নহে।[২৬১]

মাওলানা আকরম খাঁ'র পূর্বেও স্যার সৈয়দ ইজতিহাদের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভির[২৬২] গ্রন্থ থেকে প্রমাণ করেন যে, শাফেয়ি, মালেকি, হাম্বলি মাযহাবের ইমামগণ এজতিহাদকে ফরয-এ-কিফায়া।[২৬৩] বলে অভিহিত করেছেন।[২৬৪]

স্যার সৈয়দ বলেন :

প্রত্যেক যুগে মুজতাহিদ থাকা প্রয়োজন। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'ত'-এর লোকরা মনে করেন যে, ইজতিহাদের যুগ ফুরিয়ে গেছে। এখন আর মুজতাহিদ নেই। তাঁদের এই ধারণা নিছক ভুল। এই ভুল ধারণা দ্বীন ও দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রে মুসলিম জাতির খুবই ক্ষতিসাধন করেছে। সুতরাং আমাদের এ ধারণা ত্যাগ করা এবং দ্বীন-দুনিয়ার প্রত্যেকটি বিষয়ে গবেষণা করা উচিত। আমাদের মনে রাখা উচিত, যুগ পরিবর্তনশীল। তাই নতুন বিষয়, নতুন সমস্যা ও নতুন প্রয়োজনের উদ্ভব হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং আমাদের মাঝে যদি 'জিন্দা মুজতাহিদ' না থাকে, তবে যুগে যুগে উদ্ভূত নতুন নতুন প্রশ্নাবলীর সমাধান সম্পর্কে 'মুরদা মুজতাহিদদের কি করে জিজ্ঞেস করবো? তাঁদের যুগে তো এমন সব সমস্যার সৃষ্টিহয় নি যা এখন হচ্ছে। সুতরাং আমাদের জন্য যুগধর্মী মুজতাহিদের প্রয়োজন রয়েছে।[২৬৫]

মুকাল্লিদগণের মুখপাত্ররা বলছেন :

ইজতিহাদের দরওয়াজা বহু পূর্বে চিরস্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ইসলাম সম্বন্ধে কোনো বিষয়ের স্বাধীনভাবে বিচার-আলোচনা করার অধিকার এখন আর কারো নেই।[২৬৬]

বলা বাহুল্য, মুসলিম জাতির জ্ঞান-সাধনার পূর্বধারা এই সিদ্ধান্তের সময় হতে সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত হয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে মাওলানা আকরম খাঁ বলেন-

---

২৬১. আকরম খাঁ মোহাম্মদ, তাফছীরুল কোরআন, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮।

২৬২. শাহ ওয়ালি উল্লাহ ভারত উপমহাদেশের মুগল বাদশাহীর পতনের যুগে হি. ১১১৪ সনে, ১৭০২/৩ খ্রি. জন্মগ্রগণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম আবূ আল-ফায়্যাদ আহমদ কু-ত-ব আল্দীন। তিনি যুগশ্রেষ্ঠ একজন ইসলামি চিন্তাবিদ ছিলেন। পনের বছর বয়সে তিনি আরবি, ফার্সি ভাষাসহ তাফসির, হাদিস, ফিক্হ, উসূল, মানতিক, কালাম, তাসাউফ, চিকিৎসা, দর্শন, জ্যামিতি ইত্যাদি শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর দৃষ্টিতে কুরআনে মানসুখ আয়াতের সংখ্যা ৫টি। তিনি প্রায় দুইশত গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে ৩৪টি প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ- حجة الله البالغة 'হুজ্জাতুল্লাহিল-বালিগা'। ১৭৬২ সালে তিনি ইনতিকাল করেন।
সংক্ষিপ্ত ইসলামি বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, ১৯৮২, পৃ. ২৬১-৬৩।

২৬৩. ফরযে কিফায় শরী'য়তের এমন অত্যাবশ্যকীয় বিধান যা সবার উপর ফরয হলেও সমাজের কোন এক অংশ পালন করলেই দায়িত্ব পালিত হবে। যেমন জানাযার নামায।
মিছবাহুল লুগাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪৬।
বুখারি, কিতাবুল জানায়েয, পৃ. ৫৪৪।

২৬৪. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ'র ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা, ঢাকা, ১৯৮২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭২।

২৬৫. স্যার সৈয়দ আহমদ, খাঁ, মাকালাত (১), পৃ. ২৯১।

২৬৬. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, তাফসিরুল কোরআন, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৪-৫।

www.pathagar.com

আধুনিক প্রচারকগণের অনেকের কথা শুনিয়া মনে হয় তাঁহাদের মতে প্রত্যেক গাঁয়ের মোকাল্লেদই যেন এক একজন মোজতাহেদ! কিন্তু সত্যকথা এই যে, এই দুইয়ের মধ্যে আর একটা স্তর আছে। সেই স্তরের লোকদিগকে আমরা মোহাক্কেক বা সত্যসন্ধানী বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি।[২৬৭]

মিরাজ : প্রচলিত ধ্যান-ধারণা ও মাওলানা আকরম খাঁ'র অভিমত

মিরাজ নবি করিম (স.)-এর জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে অন্যতম। ইসলামের ইতিহাসে ঘটনাটি মতপার্থক্যের জন্ম দিয়েছে। কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াতের শাব্দিক অনুবাদ ও ব্যাখ্যা এবং বিভিন্ন রাবি থেকে বর্ণিত হাদিস এ মতপার্থক্যের জন্ম দেয়। মুসলিম মনীষীরা এ সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন। এ পর্যায়ে বিষয়টির বিশ্লেষণ করে মাওলানা আকরম খাঁ ও অন্যান্য রাবিদের মতামত সন্নিবেশিত হলো।

'মিরাজ' আরবি-'উরুজ' শব্দ হতে উদ্ভূত। অর্থ উর্ধ্বারোহণের মাধ্যম বা সোপান। ইসলামি পরিভাষায় হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর মক্কা হতে মসজিদুল আকসা[২৬৮] উপস্থিতি, সেখান থেকে সপ্তাকাশ ভ্রমণ করে আল্লাহর সান্নিধ্যে হাযির হওয়ার ঘটনাকেই মিরাজ বলে।

ঘটনাটি দু'টি অংশে বিভক্ত। রসুলুল্লাহ (স.)- এর মসজিদে হারাম[২৬৯] হতে রাত্রিকালে মসজিদে আকসা পর্যন্ত পৌছাকে 'ইসরা' বলা হয়। আর মসজিদে আকসা

---

২৬৭. প্রাগুক্ত।

২৬৮. মসজিদুল আকসা বা দূরবর্তী মসজিদ জেরুযালেমে অবস্থিত। এ পবিত্র ঘরকে আল-বায়তুল মুকাদ্দস'ও বলা হয়। রসুলুল্লাহ (সাঃ) ১৬। ১৭ মাস এ পবিত্র ঘরকে কিবলারূপে গ্রহণ করেন। এটা পৃথিবীর বহু প্রাচীন জাতির উত্থান-পতনের নীরব সাক্ষী। হযরত সুলায়মান জ্বিনদের দ্বারা স্বর্ণ-রৌপ্য, মণি-মুক্তা সংগ্রহ করে এ পবিত্র মসজিদ নির্মাণ করেন। সমকালীন লোক ও বনী ইসরাঈল জাতির বার বার নাফরমানীর কারণে বহুবার এ পবিত্র মসজিদের ক্ষতি সাধিত হয়। বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ কর্তৃক এ পবিত্র ঘরের ধন-রত্ন, মণি-মুক্তা লুণ্ঠিত হয়। সর্বশেষ রোম সম্রাট বায়তুল মুকাদ্দস-এর সমস্ত সম্পদ রোমের স্বর্ণ-মন্দিরে নিয়ে যায়। ঐ সম্পদ এখনও সে মন্দিরে সংরক্ষিত রয়েছে এবং থাকবে। শেষ যামানার হযরত ইমাম মাহদী (আ.) আবির্ভূত হয়ে এগুলোকে আবার বায়তুল মুকাদ্দসে ফিরিয়ে আনবেন। এখানেই মহান আল্লাহ পূর্ববর্তী মানুষকে একত্রিত করবেন। এ পবিত্র মসজিদ আল্লাহর নিকট মহাসম্মানিত।

BGA III 168-171, মুজীর আল্-দীন আল্-জালীল, কায়রো ১২৮৩, পৃ. ২৪৮।

মুহাম্মদ শফি, তাফছিরে মাআরিফুল কুরআন (বাংলা), ৫ম খণ্ড, ঢাকা ১৯৮২, পৃ. ৪৯২-৪৯৬।

সংক্ষিপ্ত ইসলামি বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, পৃ. ১৮৪।

২৬৯. বায়তুল্লাহর চতুষ্পার্শ্বে নির্মিত মসজিদকে 'মসজিদে হারাম' বলে। এটা বিশ্বের সর্বপ্রথম মসজিদ। বায়তুল্লাহ, যমযম, মাকামে ইবরাহিম-এ তিনটি পবিত্র স্থানের সংযোগ স্থানে এটা অবস্থিত। অষ্টম হিজরিতে রসুলুল্লাহ (সা.) এ স্থানটিতে সালাতের জন্য বিশেষভাবে আদিষ্ট হন। এর পূর্বে আল্-বায়তুল মুকাদ্দস-এর দিকে ফিরে সালাত আদায় করা হতো। ১৫৭২-১৫৭৭ সাল সুলতান দ্বিতীয় সালিমের রাজত্বকালে মসজিদটির আকার পরিপূর্ণতা লাভ করে। এর অভ্যন্তর ভাগের পরিমাপ নিম্নরূপ,

উত্তর-পশ্চিম দিক ৫৪৫ ফুট, দক্ষিণ পূর্ব দিক ৫৫৩ ফুট, উত্তর-পূর্ব দিক ৩৬০ ফুট, দক্ষিণ-পশ্চিম দিক ৩৬৪ ফুট। কোণগুলো সমকোণ নয়। সমগ্র ঘরটির আকার মোটামুটিভাবে একটি সামন্তরিকের ন্যায়। দাজ্জাল সমগ্র বিশ্ব পরিভ্রমণ করলেও ৪টি স্থানে প্রবেশ করতে পারবে না :

১. মসজিদ-ই-হারাম, ২. মসজিদ-ই-নববি, ৩. মসজিদ-ই-আকসা, ও ৪. মসজিদে তুর।

JL Burck hart, Travels in Arabia, London. 1829. pp. 243-295.

A. F. Burton, Personal Narrative of Pilgrimage to Mecca and Medina, Leipzig, 1873, iii, 1-37G

www.pathagar.com

হতে সপ্তাকাশ ভ্রমণকে মিরাজ বলা হয়। সাধারণত ইসরা[২৭০] ও মিরাজ-উভয় ঘটনাকেই মিরাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে স্পভাবে উল্লেখ হয়েছে :

'তিনি পবিত্র ও মহিমময় সত্তা যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রিকালে মসজিদ-ই-হারাম হতে মসজিদে আকসা পর্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়েছেন।'[২৭১]

উল্লিখিত আয়াত দ্বারা 'ইসরা' (রাত্রিভ্রমণ) প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত। আর মিরাজ আল্ কুরআনের সুরা আন-নাজম-এর ১৩১৮- নং আয়াত এবং বনি ইসরাইল এর ৬০ নং আয়াত দ্বারা পরোক্ষভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

ইবন আব্বাস ও আবূ হাব্বাহ আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে, রসুলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেছেন: 'সপ্তাকাশ পরিভ্রমণের পর আমাকে উর্ধ্বারোহণ করানো হয়, যেখানে কলমের শব্দ (ছরিফাল আকলাম) শোনা যাচ্ছিল। অতঃপর জিবরাইল আমাকে নিয়ে সিদরাতুল মুনতাহার[২৭২] নিকট পৌঁছলেন। সেখান থেকে বেহেশতের অভ্যন্তরে নিয়ে গেলেন, যার গম্বুজসমূহ মুক্তা এবং জমিন মিশ্‌ক বা কস্তুরীর তৈরি ছিল।[২৭৩]

মিরাজের ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (স.) এবং সাহাবা-ই-কিরামের বর্ণিত হাদিসগুলোই যথেষ্ট। রসুল (স.) বিভিন্ন সময়ে সাহাবা-ই-কিরামের নিকট মিরাজের বর্ণনা দিয়েছেন। ঘটনাটি সুদীর্ঘ; সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন বর্ণনাকারীর বর্ণনায় ভিন্ন ভিন্ন অংশ বর্ণিত হয়েছে।

কেউ কেউ মিরাজ কয়েকবার হয়েছে বলেও বর্ণনা করেছেন। সাহাবিদের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর (রা.) মিরাজের সত্যতা স্বীকার করেন। অতঃপর অন্যান্য সাহাবাই-কিরাম এবং পরবর্তী সময়ে মুসলমানগণও এর সত্যতা মেনে নেন। শুধু মুসলমানই নন, তৎকালীন অনেক অমুসলিম[২৭৪] ও মিরাজের বাস্তব সত্যকে স্বীকার করে নিয়েছেন।

---

২৭০. 'ইসরা শব্দের আভিধানিক অর্থ রাত্রি-ভ্রমণ। আরবী পরিভাষায় রাত্রিকালের সফরকে 'ইসরা' বলে।
ইসরা শব্দটি আরবি 'সারা' ধাতু হতে উদ্ভূত।
আশরাফ আলি থানভি, বয়ানুল কুরআন, সুরা বনি ইসরাইল, দিল্লী, সন অনুল্লিখিত, পৃ. ২৫৯।

২৭১. সুরা বনী ইসরাঈল, আয়াত- ১।

২৭২. আরবি ভাষায় 'সিদ্‌রা' শব্দের অর্থ বদরিকা বৃক্ষ, মুন্‌তাহা শেষপ্রান্ত। সিদ্‌রাতুল মুনতাহা-এর আভিধানিক অর্থ হল সে বদরিকা বৃক্ষ যা শেষ প্রান্তে অবস্থিত। কারও কারও মতে, এর নাম কুলবৃক্ষ। সাধারণ ফেরেশ্‌তাগণের এটাই শেষ সীমা। হযরত জিবরাইল (আ.) এখানেই অবস্থান করেন। উর্ধ্ব জগতের বিধি-বিধান নিম্নে অবতরণ এবং পৃথিবীর আমল ও কাজকর্ম উর্ধ্ব জগতে প্রেরণ, সিদরাতুল মুনতাহা-এর মাধ্যমেই হয়ে থাকে। এটা সপ্তম আসমানে অবস্থিত। এখানেই সর্বজগতের জ্ঞান নিঃশেষ ও পরিসমাপ্ত। এর অপর পারে যা কিছু রয়েছে, সে বিষয়ে আল্লাহ ছাড়া আর অন্য কেউ কিছু জানে না।
আল্লামা আলূসী, রূহুল মাআনী, বৈরূত, ১৫শ' খণ্ড, পৃ. ১।
আবুল আলা মওদূদী, তরজুমায়ে কুরআনে মজীদ, (বাংলা) ফালাহ-ই-আম ট্রাস্ট, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৮৭৯।

২৭৩. ইমাম নাবুভী, মুসলিম শরিফ (২য়), সন অনুল্লিখিত, বৈরূত, পৃ. ১।

২৭৪. আবু সুফিয়ান মি'রাজের ঘটনা রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের দরবারে মিথ্যা প্রমাণ করতে চেয়েছিল। বায়তুল মাকদিস-এর খ্রিস্টান পাদ্রী 'ইলিয়াস' সেখানে ছিলেন। তিনি বললেন, মি'রাজের রাতে চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী আমি বায়তুল মাকদিস-এর সব দরজা বন্ধ করেছি। কিন্তু একটি দরজা

www.pathagar.com

তাফসির-ই-কুরতুবিতে আছে, মিরাজের হাদিসসমূহ মুতাওয়াতির। নাককাশ এ সম্পর্কে বিশ জন সাহাবির রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবন কাছীর স্বীয় তাফসির গ্রন্থে মিরাজ সম্পর্কে ২৫ জন সাহাবির নাম উল্লেখ করেছেন। অতঃপর বলেছেন, মিরাজ সম্পর্কিত হাদিস সম্পর্কে সব মুসলমানের ঐকমত্য রয়েছে। শুধু ধর্মদ্রোহী যিন্দিকগণ একে মেনে নেয়নি।[২৭৫]

কোনো কোনো বর্ণনায় মিরাজের ঘটনাটি ২২ জন সাহাবি ও ৪ জন সাহাবিয়্যা বর্ণনা করেছেন বলে দেখা যায়। বিভিন্ন গ্রন্থে মিরাজের বিবরণে ৩০ জনেরও অধিক সাহাবির বর্ণনা পাওয়া যায়। এর মধ্যে সাত জনের বর্ণনা সহিহ বুখারিতেই রয়েছে।

খুঁটিনাটি বিষয়ে তাঁদের বর্ণনায় কিছু গরমিল রয়েছে, কিন্তু মিরাজের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ে সবাই ঐকমত্য পোষণ করেছেন। কাজেই মিরাজের সত্যতার ঘটনা পবিত্র কুরআন ও হাদিসের দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে এবং মুসলিম চিন্তাবিদগণের ইজমা' দ্বারা এর যথার্থতা স্বীকৃত।[২৭৬]

কুরআন ও হাদিসের অকাট্য দলিল দ্বারা বায়তুল্লাহ হতে মসজিদ-ই-আকসা পর্যন্ত মিরাজ প্রমাণিত। বায়তুল মুকাদ্দস হতে আকাশের দিকে, হাদিসে মাশহুর এবং আকাশ হতে আরশের দিকে' খবরে ওয়াহিদ দ্বারা প্রমাণিত।[২৭৭]

মিরাজ যে সত্য ঘটনা, এ সম্পর্কে সাহাবা-ই-কিরামের যুগ হতে অদ্যাবধি সমগ্র বিশ্বের ইসলামি চিন্তাবিদগণ একমত। এ ব্যাপারে কারও দ্বিমত বা সন্দেহ নেই। কিন্তু মিরাজ দৈহিক, আত্মিক না স্বাপ্নিক- এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। মতভেদ সাহাবিদের সময় হতেই চলে আসছে। সাহাবা ও তাবেয়িন-এর অধিকাংশই দৈহিক মিরাজ হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কিছুসংখ্যক সাহাবা ও তাবেয়িন-এর মতে এ ঘটনা আত্মিক বা স্বপ্নের ব্যাপার।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলভী (র.)-এর মতে :

মিরাজের সমস্ত ঘটনাই রসূলুল্লাহ (স.)-এর জাগ্রত অবস্থায় ও সশরীরে সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু এটা রূপক ও বাস্তব জগতের সন্ধিস্থলে অবস্থিত অন্য এক জগতের কথা।[২৭৮]

এক জামাআত উলামার অভিমত এই যে, হযরত রসুলুল্লাহ (স.) সশরীরে মিরাজ গমন করেছিলেন, এ সম্পর্কে তাঁদের ইজমা' বা ঐকমত্য রয়েছে।

বন্ধ করতে পারিনি। অন্যান্য কর্মচারীসহ বহু চেষ্টার পরও ব্যর্থ হই। তবে সকলের চেষ্টাতে দরজাটি স্বাভাবিকভাবেই বন্ধ হয়ে যায়। আরও দেখি, মসজিদের কোণে ছিদ্র বিশিষ্ট একটি পাথর ছিল, পাথরের ছিদ্রটি বহুদিন যাবত বন্ধ ছিল, আজ সে ছিদ্রটি খোলা রয়েছে এবং তার সাথে যানবাহন বাঁধার নিদর্শনও রয়েছে। আমি আমার সঙ্গীদের বললাম, গত রাতে এ দরজাটি আখেরী নবির আগমন উপলক্ষে খোলা ছিল।

ইবন কাছীর, তাফসির, বৈরুত, ১৯৬৬, পৃ. ২৪।

মুহাম্মদ শফি, মাআরিফুল কুরআন, করাচী, ১৯৭২, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৪।

২৭৫. ইবন কাছীর, তাফসির, বৈরুত, ১৯৬৬, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩৯-২৭৯।

২৭৬. ইবন কাছীর, প্রাগুক্ত।

২৭৭. সা'দ উদ্দীন তাফতাযানী, শরহে আকায়িদে নসফী, সন অনুল্লিখিত, পৃ. ৩২৭।

২৭৮. শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ-এর মতে, জগতের তিনটি স্তর রয়েছে, ১. জড় জগৎ [আলমে জিস্‌ম] ২. আধ্যাত্মিক জগত [আলমে রূহ] ও ৩. অন্তর্বর্তী জগত [আরমে বরযখ]।
শাহ ওয়ালী উল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগ, সন অনুল্লিখিত, পৃ. ৩৮৭।

www.pathagar.com

ঐকমত্যের কারণসমূহ

ক. সুরা বনি ইসরাইল-এর প্রথম আয়াতের প্রথম শব্দ 'সুবহানা'। শব্দটি আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর বিষয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। মিরাজ যদি 'আত্মিক' বা 'স্বপ্নগত' ব্যাপার হতো, তবে আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকতো না। কেননা, স্বপ্নে বা আধ্যাত্মিক বিষয়ে সাধারণত বিস্ময়কর বহু ব্যাপারই ঘটে থাকে।

খ. আয়াতে উল্লেখিত আবদ' শব্দের অর্থ 'বান্দা' বা দাস। শুধু আত্মাকে বান্দা বলা যায় না; দেহ ও আত্মা উভয়ের সমষ্টিকে বান্দা বলা হয়। মিরাজ যদি স্বপ্নের ব্যাপারই হতো, তা হলে কুরআনে এখানে আবদ শব্দ ব্যবহার করা হতো না। বরং আসরা বি আবদিহী'-এর স্থলে আসরা' বিরূহিহী' অর্থাৎ আত্মিকভাবে ভ্রমণ করেছিলেন' বলা হতো। কোনো কোনো প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদের মতে, আ'বদ শব্দের দ্বারা আরও বুঝানো হয়েছে যে, অলৌকিক ঘটনাবলীতে পূর্ণ ঊর্ধ্বলোকের এ সফর থেকে কারও মনে হয়ত আল্লাহর ধারণার সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। যেমন 'ঈসা (আ.)-এর ঊর্ধ্বলোকে উত্থিত হওয়ার ঘটনা থেকে খ্রিষ্টানগণ ধোঁকায় পড়ে তাঁকে ত্রাণ-কর্তা সাব্যস্ত করেছিল। এমনি ধরনের সন্দেহ যেন মুহাম্মদ (স.) সম্পর্কে না আসতে পারে। তাই, এ আয়াতে আবদ' শব্দ বলে সম্বোধন করে এ কথাই বোঝানো হয়েছে যে, ঊর্ধ্বলোক ভ্রমণ সত্ত্বেও রসুলুল্লাহ (স.) আল্লাহর বান্দাই ছিলেন- আল্লাহ নন।[২৭৯]

গ. রসুলুল্লাহ (স.) মিরাজের ঘটনা উম্মেহানির নিকট বর্ণনা করলে তিনি উত্তরে বললেন : 'এ ঘটনা অন্য কারো নিকট প্রকাশ করা উচিত হবে না। কারণ, কাফিরগণ শুনলে আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করবে।' ঘটনাটি যদি নিছক স্বপ্নই হতো, তবে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত হওয়া- এ মন্তব্যের প্রশ্নই ওঠতো না।

ঘ. কোনো কোনো তাফসিরকার-এর মতে, সুরা বনি ইসরাইল-এর ৬০ নং আয়াতে উল্লিখিত 'রূইয়া' শব্দের অর্থ স্বপ্ন-দর্শন। তাই তাঁরা[২৮০] মিরাজ স্বপ্নে বা আত্মিকভাবে সংঘটিত হয়েছিল বলে মনে করেন। কিন্তু অন্যান্যের মতে, উক্ত আয়াত দ্বারা বদরের যুদ্ধ কিংবা হুদাইবিয়া সন্ধির স্বপ্নের কথাই বলা হয়েছে। অতএব উক্ত আয়াতকে মিরাজের দলিল হিসাবে গ্রহণ করা ঠিক নয়।[২৮১]

মিরাজ দৈহিক, আত্মিক না স্বপ্ন—এ সম্পর্কে মতভেদের মূল কারণ পবিত্র কুরআনের সুরা বনি ইসরাইলের ৬০ নং আয়াতে বর্ণিত 'রূ'ইয়া' শব্দের অর্থ নিয়ে বাংলা ভাষায় পবিত্র কুরআনের প্রথম সারির অনুবাদক মাওলানা আকরম খাঁ তাঁর 'তফসিরুল কুরআন-এ রূ'ইয়া শব্দের অর্থ 'স্বপ্ন'-এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদিসের দলিল দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন।

মিরাজ সম্পর্কে আকরম খাঁ বলেন : বনি ইসরাইল সুরাটি নাযিল হয়েছিল হিজরতের কয়েক বৎসর পূর্বে। সুতরাং অতীতের কোনো ঘটনা সম্বন্ধে আয়াতটি নাযিল

---

২৭৯. মুহাম্মদ শফি, মাআরিফুল কুরআন [বাংলা, ৫ম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৪৯০।

২৮০. হযরত আয়িশা (রা.), মুআবিয়া (রা.) ও হাসান বসরির মতে, মিরাজ আত্মিকভাবে হয়েছে। আত্মার সাথে তখন দেহের কোন সম্পর্কই ছিল না।
মুহাম্মদ সুলাইমান, রাহমাতাল্লিল আলামীন, ১ম খণ্ড, দিল্লী, ১৯৮০, পৃ. ৭০।

২৮১. মাওলানা আশরাফ আলি থানভি, তাফছিরে আশরাফী, ১৫শ পারা, ১৯৭২, পৃ. ৬।

www.pathagar.com

হয়ে থাকলে ধরে নিতে হবে যে, সে ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল হিজরি দ্বিতীয় সনের শেষ ভাগে। অথচ হুদাইবিয়ার সন্ধি হচ্ছে ষষ্ঠ হিজরির ব্যাপার। তাই অধিকাংশ তাফসির লেখকগণ উক্ত আয়াতটি রসুলুল্লাহ (স.) এর মিরাজ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন।[২৮২] তবে বিতর্ক হচ্ছে 'রূ'ইয়া' শব্দের অর্থ নিয়ে। মাওলানা সুলাইমান নদভী তাঁর সীরাত গ্রন্থে বলেছেন :

হযরত ইবন আব্বাস রূইয়া শব্দের অর্থ চাক্ষুষ দর্শন বলে বর্ণনা করেছেন।

এর উত্তরে মাওলানা আকরম খাঁ বলেন :

ইবন আব্বাস কর্তৃক প্রদত্ত পবিত্র কুরআন এর অনেক অনেক শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য আলিমদের এক জামাত গ্রহণ করেন নি।[২৮৩]

মাওলানা আকরম খাঁ আরও বলেন :

পবিত্র কুরআন শরিফের ব্যবহার অনুসারে আরবি ভাষার আভিধানিক অর্থ হিসেবে এবং স্বয়ং রসুলুল্লাহ (স.)-এর সুস্পষ্ট উক্তি অনুসারে 'রূ'ইয়া' শব্দের একমাত্র অর্থ হচ্ছে 'স্বপ্ন'।

এ দাবির সমর্থনে পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত এবং কিছু হাদিসের বর্ণনা তিনি পেশ করেছেন।

হুদাইবিয়ার সন্ধি সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

لقد صدق الله رسوله الرءيا بالحق.

অর্থাৎ : নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর রসুলের স্বপ্নকে সত্য করে দিলেন।[২৮৪]

হযরত ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে বলা হয়েছে :

قد صدقت الرءيا.

অর্থাৎ : 'তুমি নিজের 'স্বপ্নকে' বাস্তবে পরিণত করে দেখালে।[২৮৫]

মিসরের সম্রাটের বর্ণনা :

يا ايها الملاء افتونى فى رءياى ان كنتم للرءيا تعبرون.

'হে পারিষদবৃন্দ, স্বপ্নফল সম্বন্ধে তোমাদের যদি অভিজ্ঞতা থাকে, তবে আমার এ স্বপ্ন সম্পর্কে আমাকে উত্তর দাও।'[২৮৬]

ইয়াকুব (আ.) হযরত ইউসুফ (আ.)-কে বলেছেন :

يبنى لا تقصص رءياك على اخوتك.

---

২৮২. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, তাফসিরুল কুরআন, ১৭শ' সুরা, পৃ. ৪৭৩।

২৮৩. ইবন আব্বাস বর্ণনা করেছেন, পবিত্র কুরআনে যেখানে যাআম। زعم শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, প্রত্যেক স্থানেই এর অর্থ মিথ্যা كذب। আল্লামা আলুসি এর প্রতিবাদ করে বলেন যে, সত্য ও সুপ্রমাণিত বিষয়গুলো সম্বন্ধে যাআম শব্দ ব্যবহার হয়ে থাকে। সহিহ মুসলিম শরিফে এর যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে।
মোহাম্মদ আকরম খাঁ, তাফসিরুল কুরআন, ১৭শ' সুরা, পৃ. ৪৭৭।

২৮৪. সুরা আল-ফাতাহ, আয়াত ২৭।

২৮৫. সুরা আস্-সাফ্ফাত, আয়াত ১০৫।

২৮৬. সুরা ইউসুফ, আয়াত ৪৩।

www.pathagar.com

'হে আমার প্রিয় পুত্র, নিজের স্বপ্নের কথা তোমার ভাইদের নিকট ব্যক্ত করো না।'[২৮৭]

পবিত্র কুরআন শরিফের আলোচ্য আয়াতসমূহে প্রত্যেক স্থানেই 'রূইয়া' শব্দ 'স্বপ্ন' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং 'জাগ্রত অবস্থায় চাক্ষুস দর্শন বলে অর্থ গ্রহণ করলে পবিত্র কুরআনের রীতি-বিরুদ্ধ ও ব্যবহারের ব্যতিক্রম হবে বলেও মাওলানা আকরম খাঁ অভিমত প্রকাশ করেন।

অতঃপর তিনি 'রূ'ইয়া' শব্দের আভিধানিক অর্থ নিয়েও কিছুটা আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, আরবি ভাষার বেশির ভাগ আভিধানিক রূইয়া শব্দের অর্থ 'স্বপ্ন' গ্রহণ করেছেন।

নিচে তাঁর দেয়া কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হলো :

রূইয়া শব্দের আভিধানিক অর্থ :

ক. কুরআনের অভিধানকার ইমাম রাগিব বলেন : 'নিদ্রিত অবস্থায় যা দেখা যায়, তাই হচ্ছে রূইয়া।'

খ. হাদিসের বিখ্যাত অভিধানকার শায়খ মুহাম্মদ তাহির বলেন : 'নিদ্রিত অবস্থায় যা দেখা যায়, রূইয়া বলতে তাকেই বুঝায়।'[২৮৮]

গ. আরবি সাহিত্যবিশারদ ইমাম জাওহারি বলেন : 'রূইয়া বলতে বুঝায় যা নিদ্রিত অবস্থায় দেখলো।'

ঘ. ফারাইদুল লুগাতে আছে : 'যা নিদ্রিত অবস্থায় দেখে থাক, এটা 'রূয়ৎ' হতে ভিন্ন। কারণ 'রূয়ৎ' বলা হয় চাক্ষুষ দর্শনকে আর 'রূ'ইয়া' বলা হয় 'নিদ্রিত অবস্থার স্বপ্নকে'।'

এছাড়া মিসবাহুল মুনির, সোরাহ, আবদুল মাওয়ারিদ, কামুস প্রভৃতি গ্রন্থ-এমন কি আরবি ভাষার অধিকাংশ অভিধানগুলো রূইয়া শব্দের অর্থ 'স্বপ্ন' বর্ণনা করেছেন, চাক্ষুস দর্শনকে রূইয়া বলা যেতে পারে না-এটাই তাঁদের সিদ্ধান্ত।

হাদিসের সমর্থন

সবশেষে মাওলানা আকরম খাঁ হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, সহিহ হাদিসের বর্ণনানুযায়ী মিরাজের ঘটনা আরম্ভ হয়েছিল রসুলুল্লাহ (স.)-এর তন্দ্রা ও নিদ্রার মধ্যবর্তী অবস্থায় এবং তার অবসানও ঘটেছিল নিদ্রিত থাকার অবস্থায়।'

সহিহ বুখারি ও মুসলিম হতে তিনি এতদসংক্রান্ত কয়েকটি হাদিসের প্রাসঙ্গিক অংশগুলো সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন এভাবে :

ক. হযরত আনাস ইবন মালিক (রা.) মিরাজের ঘটনা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন :

উক্ত মিরাজের রাত্রে হযরত রসুলুল্লাহ (স.)- এর মিরাজ আরম্ভ হয়েছিল এমন অবস্থায় যখন তিনি মক্কায় মসজিদে নিদ্রিত ছিলেন।[২৮৯]

খ. হযরত মালিক ইবন ছা'ছার (রা.) বর্ণনা :

---

২৮৭. সুরা ইউসুফ, আয়াত ৪।
২৮৮. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, তাফসিরুল কুরআন, ১৭শ সুরা, পৃ. ৪৭৫।
২৮৯. ইমাম নবভি. মুসলিম শরিফ, ১ম খণ্ড, দিল্লী, পৃ. ১৩।

www.pathagar.com

'রসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, আমি যখন মক্কার ঘরের নিকট নিদ্রা ও জাগরণের মধ্যবর্তী অবস্থায় ছিলাম।'[২৯০]

সাহাবিগণের বর্ণনা এবং স্বয়ং রসুলুল্লাহ (স.)-এর স্পষ্ট উক্তি হতে জানা যায়, তাঁর 'ইসরা' বা মিরাজ আরম্ভ হয়েছিল নিদ্রা ও তন্দ্রার মধ্যবর্তী অবস্থায়।'

সহিহ বুখারিতে আরো বর্ণিত হয়েছে :

'অবশেষে জিবরাইল (আ.) রসুল (স.)-কে বললেন, এখন অবতরণ করুন। তখন রসুল (স.) জেগে উঠলেন এবং তিনি তখন উপস্থিত ছিলেন আল-মসজিদুল হারাম বা মক্কার মসজিদে।'

হাফিজ ইবন হাযার আসকালীন উক্ত বর্ণনার উপক্রম ভাগের টীকায় বলেছেন :

'মিরাজের আরম্ভ হয়েছিল স্বপ্নযোগে মসজিদ-ই-হারামে এবং এর অবসানও হয়েছিল স্বপ্নযোগে উক্ত মসজিদ-ই-হারামে'।[২৯১]

ইবন কাইয়ুম বর্ণনা করেন :

'রসুল (স.)-এর দেহের সাথে মিরাজের কোনো সম্পর্কই ছিল না।'

হযরত আয়িশা (রা.), মুআবিয়া (রা.) ও হাসান বসরি (রহ.) বলেন :

'রসুলুল্লাহ (স.)-এর রূহ উর্ধ্বে গমন করে ও নেমে আসে।'[২৯২] অর্থাৎ তাঁদের মতে মিরাজ দৈহিকভাবে সংঘটিত হয় নি বরং আধ্যাত্মিকভাবে সংঘটিত হয়েছে।

'হযরত আবূ যর গিফারি (রা.)-এর মতে, রসুল (স.) তাঁর রবকে দর্শন করেছিলেন নিজ অন্তরের দ্বারা, চর্মচক্ষু দ্বারা নয়।'

প্রশ্ন জাগে, মিরাজ যদি সশরীরেই হয়ে থাকে, রসুলুল্লাহ (স.) চর্মচোখে আল্লাহকে কেন দেখেন নি? হযরত ইবন আব্বাস হতেও এ সম্পর্কে দু' ধরনের হাদিস পাওয়া যায়। যেমন এ আলোচনার প্রথম ভাগে ইবন আব্বাস বর্ণিত সশরীরে মিরাজের পক্ষে একটি হাদিস পেশ করা হয়েছে। কিন্তু সহিহ মুসলিমের অন্য বর্ণনায় দেখা যায়, ইবন আব্বাস বলছেন, 'রসুলুল্লাহ (স.) আল্লাহকে দু'বার দর্শন করেছেন তাঁর অন্তরের চক্ষু দ্বারা।'[২৯৩] অন্তরের চক্ষু দ্বারা যদি আল্লাহর দর্শন হয়ে থাকে, তা হলে সশরীরে মিরাজ হওয়ার যুক্তি কোথায়? অতএব বলা যায়, ইবন আবাস্ হতে একই বিষয়ে দু'প্রকার অভিমত পাওয়া যায়, সেহেতু তাঁর এ বর্ণনা সমর্থনযোগ্য নয়।

মাওলানা আকরম খাঁ'র আলোচনায় দেখা যায়, তিনি পবিত্র কুরআনের 'রূইয়া' শব্দের অর্থ 'স্বপ্ন'–এ সম্পর্কে অনেক দলিল পেশ করেছেন। কিন্তু 'উলামাদের এক জামাআত মনে করেন, রূয়ৎ বলতে স্বচক্ষে দর্শন করাই উদ্দেশ্য। স্বপ্ন-দর্শন নহে। কেননা, রা'য়া ক্রিয়ার মাসদার বা ক্রিয়ামূল রূয়ৎ এবং রূ'ইয়া শব্দ বলা হয়েছে। এ ছাড়া বিস্ময়কর বস্তু দেখলে স্বপ্নবৎ মনে হয়, আর স্বপ্ন সাধারণত রাত্রিকালে দৃষ্ট হয় এবং মিরাজও রাত্রিকালে হয়েছিল-এ সাদৃশ্যের কারণে রূইয়া শব্দের ব্যবহার হয়েছে।

২৯০. ইমাম নবভি, মুসলি শরিফ, ১ম খণ্ড, বৈরুত, পৃ. ২১৩-২২২।
২৯১. আহমদ ইবন হাযার আসকালীন, ফাতহুল বারী, পৃ. ৮৬৩।
২৯২. মুহাম্মদ সুলাইমান, রাহমাতাল্লিল আলামীন, ১ম খণ্ড, দিল্লী, ১৯৮০, পৃ. ৭০।
২৯৩. আবুল আ'লা মওদূদী, তাফহীমুল কুরআন, ষষ্ঠদশ খণ্ড, ঢাকা, ১৯৮১, পৃ. ২২।

www.pathagar.com

কিন্তু শাব্দিক অর্থ এখানে উদ্দেশ্য নয়, সুতরাং এ অর্থেও প্রমাণিত হয়, মিরাজ সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় হয়েছিল।[২৯৪]

স্বপ্নে মিরাজ সংঘটিত হওয়ার পক্ষে যদিও মাওলানা আকরম খাঁ বিশ্লেষণাত্মক যুক্তি অবতারণা করেছেন, কিন্তু দৈহিক মিরাজের সম্ভাবনাকেও তিনি অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেননি। তাঁর তাফসিরুল কুরআনে মিরাজের আলোচনায় তিনি বলেছেন :

> 'ব্যক্তিগতভাবে আমি সম্ভব অসম্ভব প্রশ্নকে এ শ্রেণির বিষয়ে আদৌ কোনো গুরুত্ব প্রদান করি না। প্রাকৃতিক জগতের সকল বিধি-ব্যবস্থার মূল বিধায়ক যিনি, ইচ্ছা করলে তিনি তার পরিবর্তনও করতে পারেন। তারপর কুদরতের এ বিরাট বিপুল কারখানার সকল দিকের সকল উপকরণের নিয়ম ও ধর্মের আয়ত্ত করা আজও মানুষের পক্ষে আংশিকভাবে সম্ভব হয় নি। সুতরাং এ দিক দিয়ে কোনো বিষয়কে আমরা অসম্ভব বলে দাবী করতে পারি না।'

মাওলানার উপরোক্ত বক্তব্যের দ্বারা দৈহিক মিরাজের সমর্থন পাওয়া যায়। কারণ, তাঁর আলোচনায় দেখা যায়, তিনি শারীরিক মিরাজের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করেন নি। মানুষের পক্ষে যা অসম্ভব, মহান আল্লাহর পক্ষে তা সম্ভব ও স্বাভাবিক, একথাই তিনি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। অতএব বলা যায়, তাঁর এ বক্তব্য দৈহিক মিরাজের পক্ষে। তবে হাঁ তিনি মিরাজ সম্পর্কীয় আয়াতের বিশ্লেষণধর্মী ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। যা উল্লিখিত হয়েছে, নিজেদের বিবেচনানুযায়ী বিরূপ মন্তব্য করে যারা থাকেন।[২৯৫] তাঁদের বর্ণনা দ্বারা স্বপ্নে মিরাজ-এর দলিল দেয়া মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়।

সর্বোপরি আমাদের বক্তব্য হল, যেখানে পবিত্র কুরআনে পরিষ্কার ভাষায় মিরাজের ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে 'ফিতনাতাললিন্নাস' অর্থাৎ একমাত্র লোকদের পরীক্ষার কথাই বলা হয়েছে। মিরাজ যদি স্বপ্নেই হতো, তা হলো 'লোকদের পরীক্ষার' প্রশ্নই উঠতো না। স্বপ্নে তো অনেক কিছুই ঘটে থাকে। মানুষের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা আসে না। উপরন্তু রসুলুল্লাহ (স.) সকাল বেলা উক্ত ঘটনা সর্বসাধারণ্যে ব্যক্ত করলে লোকদের মধ্যে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টিহয়ে গেল এবং রসুলুল্লাহ (স.)-এর প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করার জন্য কাফিরগণ এ ঘটনাকে বিশেষ অবলম্বনরূপে গ্রহণ করলো। এমন কি, কোনো কোনো নও-মুসলিম ও দুর্বল ঈমানের মুসলমানগণ এ মিরাজের অলৌকিক ঘটনাকে বিশ্বাস করতে না পেরে কাফিরদের প্ররোচনার ফলে ইসলাম হতে সরে পড়লো।

দৈহিক মিরাজের বাস্তবতাই যদি রসুলুল্লাহ (স.)-এর দাবি না হতো, তবে ঐরূপ আলোড়ন সৃষ্টির হেতু কি থাকতে পারে? স্বপ্নে তো সাধারণ মানুষের পক্ষেও ঐরূপ ঘটনা অসম্ভব নয়। সুতরাং সব রকম আলোড়ন ও দ্বিধা-সংকোচের অবসান করার জন্য রসুল (স.)-এর পক্ষে শুধু এতটুকুই বলা যথেষ্ট ছিল যে, ঘটনা বাস্তব জাতীয় নয়, 'স্বপ্ন' জাতীয়। কিন্তু এরূপ না বলে বরং বাস্তব ঘটনারূপেই প্রমাণিত করার ব্যবস্থা হয়েছে।

সহিহ বুখারিতে হযরত জাবির (স.) বর্ণিত হাদিসে দেখা যায়, বায়তুল মাকদিস পরিদর্শন সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (স.) কাফিরদের পক্ষ হতে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন, যার জন্য রসুলুল্লাহ (স.) বিশেষভাবে বিব্রতও হয়েছিলেন। অবশেষে, আল্লাহর বিশেষ

---

২৯৪. আল্লামা আলূসী, রুহুল মাআনী, বৈরুত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১-৩।
২৯৫. আশরাফ আলি থানভি, তাফছিরে আশরাফী, ঢাকা, ১৯৭২, ১৫শ পারা, পৃ. ৮।

www.pathagar.com

ব্যবস্থার মাধ্যমে রসুলুল্লাহ (স.) উক্ত পরীক্ষায় স্বীয় দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হন। ঘটনা 'স্বপ্ন' হলে এ সমস্ত পরীক্ষার প্রশ্নই উঠতো না এবং রসুল (স.) এর বিব্রত হওয়ার কোনো কারণ ছিল না। ঘটনাকে স্বপ্ন বলার সাথে সাথে সব কিছুর অবসান হয়ে যেত।

অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতে, স্বপ্নে মিরাজের দাবি যুক্তিযুক্ত নয়। রসুলুল্লাহ (স.) বহু স্বপ্ন এবং তাঁর নিজস্ব আধ্যাত্মিক উপলব্ধির বিষয় সাহাবিদের কাছে বর্ণনা করেছেন। মিরাজ কোনো আধ্যাত্মিক উপলব্ধিজাত কিংবা স্বপ্নলব্ধ বিষয় হলে তিনি সে অর্থেই সাহাবিদের কাছে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতেন। তবে, এ ঘটনা শারীরিক হওয়া সত্ত্বেও পরম আধ্যাত্মিকও বটে। এ কুদরতি ঘটনা অলৌকিকভাবে সংঘটিত হয়েছে। এটা স্বপ্ন জগতের চরম বিস্ময়কর ঘটনা বলে প্রতীয়মান হওয়া বিচিত্র কিছুই নয়।[২৯৬] মূলত সসীম জ্ঞানের অধিকারী মানুষ অসীমত্তের কুদরতি নিদর্শন বুঝা সকল সময় সম্ভব নাও হতে পারে, সেহেতু কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলোর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয়া অসম্ভব, মহান আল্লাহই এর রহস্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল। উল্লেখ্য যে, জমহুরে উলামায়ে কিরাম শারীরিক মিরাজের উপরেই তাঁদের অভিমত প্রকাশ করেছেন।

---

২৯৬. আযীযুল হক, শায়খুল হাদীস, বুখারি শরিফ (বাংলা), ঢাকা, ১৩০৭ হিঃ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫০৯।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়
সাংস্কৃতিক ধ্যান-ধারণা

মাওলানা আকরম খাঁ অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় সংস্কৃতি নিয়েও বিশদ আলোচনা করেছেন। ইসলামি সংস্কৃতির ব্যাখ্যায় তিনি কুরআন, হাদিস, ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য উপস্থাপন করেন। এছাড়া উপমহাদেশের তদানীন্তন প্রেক্ষাপটে সাংস্কৃতিক জীবনধারা নিয়েও তিনি যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করেছেন। যুগ যুগ ধরে এতদঞ্চলে বিভিন্ন বর্ণ-কৃষ্টির মানুষ একত্রে বসবাস করেছে। একমাত্র মুসলমানেরাই উদার মানসিকতা নিয়ে অন্য ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছে। পর্যায়ক্রমে আমরা এ বিষয়ের উপর আলোকপাতের প্রয়াস পাবো।

সংস্কৃতি

সংস্কৃতি শব্দটি আরবি তাহযিব, তমদ্দুন বা ইংরেজি কালচার (Culture)-এর প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত।[১] ইংরেজি সাহিত্যে ষোল শতকের দিকে ফ্রান্সিস বেকন Culture শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে রবার্ট এযরা পার্ক, টেইলার টার্নার ও লাস্কির ন্যায় পণ্ডিতের লেখায় 'কালচার' শব্দটি ব্যাপক ও গভীর অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে। উল্লেখ্য যে, উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত একশ' বছরের ভেতর ইউরোপ ও আমেরিকার দু'জন পণ্ডিতও 'কালচার' শব্দের অর্থে একমত হতে পারেন নি। সাহিত্যিক আবুল মনসুর আহমদের মতে, সংস্কৃতিকে ইংরেজিতে বলা হয় 'রিফাইনমেন্ট'।[২] Culture শব্দটি জার্মান Cultur শব্দ থেকে উদ্ভূত– অর্থ Cultivation বা কর্ষণ। শব্দটি জার্মান ভাষায় সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন বেকন। তিনি কালচার বলতে মানুষের নিবিড় সত্তার সারভাগ বুঝিয়েছেন।

---

১. 'সংস্কৃতি' শব্দটি সংস্করণ বা সংস্কার বিশেষ্য পদ থেকে নিষ্পন্ন। 'সংস্করণ' অর্থ বিশোধন, সংশোধন। সংস্কার অর্থ শুদ্ধিকরণ, শাস্ত্রীয় নীতিমালা ও অনুষ্ঠানাদি দ্বারা পবিত্রকরণ, শোধনকরণ বা পতিত অবস্থা থেকে উদ্ধারকরণ, পরিষ্কার বা নির্মলকরণ, অলংকরণ, প্রসাধন, উৎকর্ষ সাধন, উন্নতি বিধান, মেরামতকরণ। অনুশীলন দ্বারা লব্ধ বিদ্যা-বুদ্ধি, রীতিনীতি ও মার্জিত আচার-আচরণ ইত্যাদির উৎকর্ষ হচ্ছে কৃষ্টি বা কালচারের বিশ্লেষণ।
সংস্কৃতির ইংরেজি প্রতিশব্দ কালচার। Culture অর্থ কর্ষণ করা, চাষ করা। অনুপযুক্ত জমিকে যেমন কর্ষণ ও চাষের দ্বারা মসৃণ ও ফসলোৎপাদনের উপযোগী করা হয়। যেমন্- চাষকৃত উপযুক্ত জমিকে Culture Land বলা হয়। তেমনি সুন্দর, মার্জিত ও পরিশীলিত আচার-আচরণকারী মানুষকে বলা হয়, Culture man.
আবুল মনসুর আহমদ, বাংলাদেশের কালচার, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৫, পৃ. ১-১১।
ড. হাসান জামান, সমাজ-সংস্কৃতি, সাহিত্য, ইসলামি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, সেপ্টেম্বর, ১৯৬৭, পৃ. ৩৯-৪০।

২. আবুল মনুসর আহমদ, বাংলাদেশের কালচার, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ১।

www.pathagar.com

বিখ্যাত পণ্ডিত টেইলার বলেন : Culture is the complex-whole which includes knowledge, belief, art, moral, law, custom and other capabilities and habits acquired by man as a member of society.

অর্থাৎ, সংস্কৃতি হলো সমাজের মানুষের অর্জিত জ্ঞান, বিশ্বাস, কথা, নীতি-নিয়ম, সংস্কার ও অন্যান্য বিষয়ে দক্ষতার জটিল সমাবেশ।[৩]

সংস্কৃতির আরবি প্রতিশব্দ তাহযিব (تَهْذِيب) ও তমদ্দুন (تَمدن)। তমদ্দুন শব্দের মূল হচ্ছে মুদন। অর্থ শহর, নগর। এ থেকে 'মাদানিয়াত' অর্থাৎ নাগরিকবোধ। ব্যাপক অর্থে নগর জীবনের যে পরিশীলিত ও পরিমার্জিত সভ্যতা গড়ে ওঠে তাকে তমদ্দুন বলে। তাই সভ্যতার প্রতিশব্দ হিসেবেও 'তমদ্দুন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। নগর জীবন এবং শহর জীবনের ধারা ও চিন্তা-চেতনা যেহেতু গ্রামীণ চিন্তা-চেতনার তুলনায় অনেক দিক থেকে পরিশীলিত ও মার্জিত, তাই নগর-সভ্যতা, নগর কৃষ্টি ও আচার-আচরণ আশ্রিত জীবনাচার 'তমদ্দুন'-রূপে খ্যাত।[৪]

'তাহযিব' শব্দটি এসেছে هذب 'হাযবুন' থেকে। (هَذَبَ - هَذَبَ – تَهْذِيبٌ) হাযাবা, হাযযবা, তাহযিব- মানে কেটে সমান করা। যেমন- বাগানের চারদিকে যে গাছের প্রাচীর দেয়া হয়, মালি কাঁচি দিয়ে কেটে তার মাথাগুলো তাহযিব (কেটে সমান করা) করে। অর্থাৎ মাথা ও দু'পাশ কাঁচি দিয়ে কেটে সমান করে। এভাবে পরিশীলিত ও পরিমার্জিত করাকে 'তাহযিব' বলে। তাই 'তাহযিব' অর্থ দাঁড়ায় মানুষের পরিশীলিত জীবনধারা।[৫] এক কথায়, তাহযিব অর্থ সজ্জিতকরণ। যে ব্যক্তি বা সমষ্টি স্বীয় চিন্তা-চেতনা ও জীবনধারার মধ্যদিয়ে নিজকে সজ্জিত, নন্দিত, পরিশীলিত ও সমাদৃত করে উপস্থাপন করতে পারে- তাকে বলা হয় সংস্কৃতিবান ও সভ্য। আরবি ভাষায় প্রচলিত 'সাকাফাত' বা 'সাকাফাহ' শব্দও সংস্কৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'সাকাফত' শব্দের অর্থ সফল হওয়া, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পাওয়া। শিক্ষার মাধ্যমে সফলতা আসে। কোনো ব্যক্তি মানুষের বাহ্যিক আচরণ ও কর্মানুষ্ঠান যখন অপরের দৃষ্টিতে আকর্ষণীয় ও সৌন্দর্যমণ্ডিত রূপে ধরা দেয়, ঐ মানুষটিকে তখন আরবীয় সমাজে বলা হয় মুসাক্কাফ অর্থাৎ, সংস্কৃতিবান, শিক্ষিত।[৬]

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সংস্কৃতি বলতে বুঝায় মানুষের সুসংস্কৃত, সুবিন্যস্ত ও পরিশীলিত জীবনধারা, জীবনাচরণ, জীবনবোধ ও জীবনপদ্ধতি। যে-সব সুসজ্জিত কর্মকাণ্ড ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের বহিঃপ্রকাশ, বৈশিষ্ট্য ও ভাবধারাকে চিহ্নিত করে তা-ই সংস্কৃতি। পশুপ্রায় মানুষ যেদিন ফুলের সৌন্দর্য ও সুরের মাধুর্যে আকৃষ্ট হলো, মুগ্ধ হলো, সেদিনই হলো মানুষের উন্মেষ, সে থেকে মনুষ্যত্বের ও সংস্কৃতি-সভ্যতার শুরু। কেননা, সেদিনই মানুষ অনুভব করে, তার মন বলে একটা আশ্চর্য বৃত্তি রয়েছে, যার শক্তি ও সম্ভাবনার সীমা নেই। অতএব, মনুষ্যত্বের পরিচয় সৌন্দর্য চেতনায় ও পিপাসায়। সংস্কৃতির অন্য নাম সৌন্দর্য চেতনা ও অন্বেষা। সংস্কৃতিবান ব্যক্তি সুন্দর ও কল্যাণের সাধক।

---

৩. ড. হাসান জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।
৪. মিসবাহুল লুগাত, (مصباح اللغات) প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১১।
৫. আবদুল মান্নান তালিব, সাহিত্য সংস্কৃতি ভাষা, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ৪৫।
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪।

www.pathagar.com

সংস্কৃতিবান ব্যক্তি জীবনের একজন দক্ষ শিল্পী। চিন্তায়, কর্মে ও আচরণে জীবনের সুন্দর ও শোভন অভিব্যক্তিই সংস্কৃতি।

বাংলায় সংস্কৃতি শব্দটির উৎপত্তি সংস্কৃত শব্দ 'সংস্কার' থেকে। সংস্কার অর্থ বিশুদ্ধিকরণ। অনুশীলনলব্ধ দেহের এ হৃদয় ও আত্মার উৎকর্ষ সাধনই কৃষ্টি-কালচার বা সংস্কৃতি। সোজা কথায়, চিত্তের উৎকর্ষ সাধনই সংস্কৃতি। অপর পক্ষে, অপকর্ম বা বিকৃতির নামই অপসংস্কৃতি। সংস্কৃতির মাধ্যমে সৃষ্টিহয়েছে সভ্যতা। তাই সভ্য লোক দেখলেই আমরা 'কালচারড' বলি। বিকৃত রুচির লোককে বলা হয় অসভ্য বা আনকালচারড। সুতরাং স্থূল রুচিকে উন্নত করে যা তা-ই সংস্কৃতি। আর উন্নত রুচিকে স্থূলত্বে নামিয়ে আনে যা তা-ই অপসংস্কৃতি বা বিকৃত সংস্কৃতি।[৭]

আধুনিক বিশ্বে শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, নাচ, গান, থিয়েটার ইত্যাকার বিষয়কে সাধারণত সংস্কৃতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এগুলো সঠিক সংস্কৃতি নয়; বরং এগুলো সংস্কৃতির বাহনমাত্র। মানব মনের অন্তর্নিহিত শক্তি, কৌতূহল ও প্রতিভা স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ লাভ করে সংস্কৃতির মাধ্যমে। সংস্কৃতিকে কিছু রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। কিংবা শুধু চিন্তা-চেতনা, কল্পনা ও ধ্যানের মধ্যেও আবদ্ধ রাখা যায় না। সংস্কৃতি সমাজদেহের প্রলেপমাত্রও নয়; বরং তার সমগ্র রূপ। এ জন্যেই সঠিক সংস্কৃতির মাধ্যমে মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটতে পারে।[৮]

সংস্কৃতি যেমন মানুষের জীবনকে পরিশীলিত ও পরিমার্জিত করে, তেমনি বিভ্রান্ত সংস্কৃতি থেকেই সাংস্কৃতিক বিভ্রান্তির সূচনা হয়। বিশ্বে যত দেশ ও জাতি রয়েছে, তাদের ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতিও রয়েছে। একটি দেশ ও জাতি এক একটি চিন্তা ও জীবন-দর্শনের সমন্বিত রূপ। এ চিন্তা ও জীবন-দর্শনের পার্থক্য হেতু সংস্কৃতির চেহারায় হেরফের দেখা যায়। জীবনচর্চাই সংস্কৃতি- এ কথা ঠিক। তবে এ জীবন-চর্চার পেছনে যে চিন্তা ও জীবনদর্শন কাজ করে-সেটিই হচ্ছে সংস্কৃতির আসল নিয়ন্ত্রক। দেখা যায়, মানুষের কেবলমাত্র সংস্কৃতিই জীবনচর্চা নয়; বরং পরিকল্পিত চিন্তা ও জীবন দর্শনের ভিত্তিতে গড়ে উঠা জীবনচর্চার নামই সংস্কৃতি।

সংস্কৃতি ও ধর্ম

সংস্কৃতির সঙ্গে ধর্মের সম্বন্ধ নিয়ে প্রায়শই প্রশ্ন ওঠে। কারও মতে, এ দু'টি বিষয় আসলে এক। এ মতের বিরোধিতা করে কেউ কেউ বলেন, এ ধারণা গ্রহণযোগ্য নয়। তাদের মতে, ধর্ম একটি বিশ্বাসের ব্যাপার। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান মাত্রই বিশ্বাসকেন্দ্রিক ও অনুভূতিপ্রবণ। ধর্মের অনুসারী ব্যক্তিকে তার ধর্মের কিছু দৈব, অতীন্দ্রিয়, আধ্যাত্মিক-পারলৌকিক বিষয় সরল বিশ্বাসে মেনে নিতে হয়। অন্যদিকে, সংস্কৃতি বলতে আমরা প্রত্যাদি বা পূর্বনির্দিষ্ট কিছুকে বুঝি না। তাদের মতে, সংস্কৃতি নিছক কোনো বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ব্যাপার নয়। সংস্কৃতির বিষয় আরো ব্যাপক ও বিস্তীর্ণ, তা ধর্ম থেকে প্রেরণা লাভ করতে পারে বটে, কিন্তু এর পরিপূর্ণ বিকাশ ধর্মের আইন-অনুশাসন ও যাগযজ্ঞকে ছাড়িয়ে যায়। সংস্কৃতির স্রোত প্রবাহিত হয় বিভিন্ন খাতে। এর

---

৭. সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, সাহিত্য সংসদ, কোলকাতা, মে, ১৯৮০, পৃ. ৬৫৪।
মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি, সাঈদুর রহমান, ড., আমিনুল ইসলাম সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৪, পৃ. ৬৯।

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৯-৭১।

www.pathagar.com

বিকাশ ঘটে জনগোষ্ঠীর দীর্ঘকালের বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক, নৈতিক, রাজনৈতিক, নান্দনিক প্রভৃতি বিচিত্র কর্মকাণ্ডে। একথা সত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি উভয়েরই আসল লক্ষ্য জীবন। পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, ধর্ম সংস্কৃতির উপর প্রাধান্য বিস্তার করে সুনিশ্চিত প্রভাব, গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা প্রদান করে সংস্কৃতির বিকাশের পথে। সংস্কৃতিও ধর্মকে সাহায্য করে নানাভাবে। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ব্যতিরেকে ধর্ম হারিয়ে ফেলে তার বৈচিত্র্য ও গুরুত্ব।

উপরোক্ত কথার সত্যতাই প্রমাণিত হয়, ইসলাম ও মুসলিম সংস্কৃতির বিকাশের মূলে ছিল ইসলাম ধর্ম। মূলত ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতিকে আলাদা করে না; একটি আরেকটির পরিপূরক।

ইসলামি সংস্কৃতির বুনিয়াদ

ইসলামই মানুষের আদিম ও শাশ্বত ধর্ম। এটা ইসলামের দাবি। দুনিয়ার অন্য কোনো ধর্ম এ দাবি করে না। দুনিয়ার প্রাচীন ও বড় বড় ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে চীন থেকে এশিয়ার পশ্চিম ভূখণ্ডের মধ্যে। চীনের কনফুসিয়াস ও তাউই ধর্ম, ভারতের বৈদিক, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম, ইরানের মাজুসি ও 'জরথুস্ত্র'[৯] ধর্ম, পশ্চিম এশিয়ার ইহুদি ও খ্রিষ্টান ধর্ম ইত্যাদি আঞ্চলিক ও গোষ্ঠীগত সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে। আসমানি কিতাব ও সহিফা সম্বলিত প্রতিটি ধর্মই মূলত ছিল ইসলাম।

যুগে যুগে অনুসারীরা ধর্মকে বিকৃত করেছে নিজেদের স্বার্থে। তারপরও দেখা যায়, কিছু মৌলিক বিষয়ে সমগ্র বিশ্বসমাজ একই ধ্যান-ধারণা পোষণ করে আসছে। যেমন- মিথ্যা বলা, গালি দেয়া, পরহিংসা, অত্যাচার করা, এমন কি মদ্যপান করা সারা দুনিয়ার সব দেশেই খারাপ অভ্যাস বলে স্বীকৃত। সাধারণত এগুলোকে ঘৃণা করা হয়। কুরআনের ভাষায়ও এগুলোকে 'মুনকার' বলা হয়েছে। আবার কল্যাণ ও ন্যায়নীতি সম্পর্কিত কাজকে কুরআন 'মারূফ' বলেছে। 'মারূফ ও মুনকারকে' বুঝতে হলে জানতে হবে এ জগতের শুরু ও শেষ কোথায়? এ জীবনের পরে আর কোনো জীবন আছে কি? যদি থাকে, তাহলে এ জীবনে কী কী করণীয় রয়েছে? এ ছাড়া সৃষ্টকুল সামগ্রিকভাবে কী? এর নিয়ন্ত্রণকারী এবং পরিচালনাকারী কে? তাঁর সাথে মানুষের সম্পর্ক কী? এবং কেমন সম্পর্ক হওয়া উচিত? যে প্রাকৃতিক নিয়ম এ জগতে কার্যকর রয়েছে, তা ব্যতীত কোনো নৈতিক বিধান আছে কী? যদি থাকে এর ব্যাখ্যা কী? সৃষ্টিকুলে মানুষের সঠিক মর্যাদা ও অবস্থান কী? সে কি স্বাধীন না কারো অধীন? দ্বিতীয় কোনো শক্তি ও বিচারকের সামনে তাকে জবাবদিহি করতে হবে কি-না? তার চূড়ান্ত লক্ষ্যই বা কী?

উপরোক্ত প্রশ্নগুলো মানব জীবনের প্রাথমিক ও মৌলিক প্রশ্ন। এর শেকড় মানুষের অন্তর ও মস্তিষ্কে গ্রথিত এবং তার শাখাসমূহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিস্তৃত। মানুষ এ সব প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে পারে না। ধর্ম এসব প্রশ্নের সন্দেহাতীত জবাব দেয়ার দাবি

---

৯. ইরানে 'জরথুস্ত্র' নামে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। ইংরেজিতে Zoroaster বলা হয়। বিশ্বকোষে 'জরসুস্রস্পিতম' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এই মহাপুরুষের প্রকৃত নাম হচ্ছে 'জরদুশতর' বা জরদউষ্ট্র, শাব্দিক অর্থ পীতবর্ণের উষ্ট্র।
সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৭।
মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

www.pathagar.com

করে, দর্শন এসব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করে। কৃষ্টি বা সংস্কৃতি এগুলোর উপরই প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ আল্লামা আবুল হাসান আলি নদভী উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর জবাব দিতে গিয়ে বিশ্বের তিনটি প্রধান কৃষ্টি বা সংস্কৃতির কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলো হচ্ছে ১. ইন্দ্রিয়নির্ভর কৃষ্টি, ২. বুদ্ধিবৃত্তিক কৃষ্টি, ৩. প্রত্যক্ষণবাদী কৃষ্টি।[১০]

ইন্দ্রিয়নির্ভর কৃষ্টি হলো– যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় এমন কোনো বিষয় স্বীকার করা যায় না। বাহ্যিক ইন্দ্রিয় দ্বারা যা স্বীকৃত হয় না তা বিশ্বাসযোগ্য নয়, এর দ্বারা অতীন্দ্রিয় সত্তা ও শক্তির প্রতি অবিশ্বাস সৃষ্টি হয় আর বিশ্বাসই সৃষ্টি না হলে তাকে মেনে চলা তাকে ভয় পাওয়া, তার নিকট প্রত্যাশা রাখার প্রশ্নই ওঠে না। এরই নিরিখে বলা যায়, এ জীবনের পর দ্বিতীয় কোনো জীবন ও জগতের কথা বিশ্বাস করা যাবে না। এমন কি পরকালে কোনো হিসাব নিকাশেরও ভয় নেই। এ অবস্থায় মানব প্রকৃতিতে স্বাধীনতা ও লাগামহীনতার উদ্ভব হয়। ইন্দ্রিয় পরকাল অস্বীকার করলেও জীবনের সমাপ্তির কথা বিশ্বাস না করে পারে না। কারণ জীবনের সমাপ্তি প্রতিদিনই প্রত্যক্ষ করা হয়। ইন্দ্রিয় নির্ভর কৃষ্টির আরও একটি বৈশিষ্ট্য হলো বাস্তব জীবনে বাকির পরিবর্তে নগদ এবং বিলম্বের পরিবর্তে তাৎক্ষণিকতাকে প্রাধান্য দেয়া। কেননা এটিই ইন্দ্রিয়ের অধিক নিকটবর্তী।

ইন্দ্রিয় নির্ভর ও বস্তুবাদী কৃষ্টিরই অপর নাম বুদ্ধিবৃত্তিক কৃষ্টি। এ কৃষ্টির প্রকৃত অর্থ– 'বুদ্ধিবৃত্তিক কষ্টিপাথরে যাচাই না করে এবং বুদ্ধিবৃত্তির সমর্থন ব্যতীত কোনো কিছুই এতে গ্রহণ করা হয় না।'

তবে একথাও স্থির সিদ্ধান্ত যে প্রচলিত চিন্তাধারা বিশ্বাস, অভ্যাস, জীবনধারা, চরিত্র, সভ্যতা কোনোটি সম্পর্কে এ দাবি করা সঠিক নয় যে, তা সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধিবৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বুদ্ধিবৃত্তিই তার মাপকাঠি। গ্রিক দর্শন মানবীয় বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার প্রকৃত ক্ষেত্র হিসেবে প্রসিদ্ধ। কিন্তু তাতে গ্রিকদের পুরাণ (Mythology) এবং তাদের ধ্যান-ধারণা ও কুসংস্কারের প্রভাব এতই প্রবল যে, প্লেটো ও এরিস্টটল সর্বজন স্বীকৃত মুক্ত চিন্তার অধিকারী হয়েও নিজেদের প্রচলিত বিশ্বাস থেকে তাঁরা স্বাধীন ও মুক্ত হতে পারে নি।

> পৃথিবীর যে সব কৃষ্টিকে প্রাথমিক ও স্থূল দৃষ্টিতে বুদ্ধিবৃত্তিক ও বৈজ্ঞানিক কৃষ্টি বলে মনে হয় গভীরভাবে চিন্তা করলে তা খাঁটি ইন্দ্রিয় নির্ভর ও বস্তুবাদী কৃষ্টিবলে প্রমাণিত হয়। সবচে বেশি প্রতারণা করে ইউরোপের বর্তমান কৃষ্টি। কিন্তু প্রচারণার ফলে এটাকে মানব ইতিহাসের সবচে বেশি বুদ্ধিবৃত্তিক ও বৈজ্ঞানিক কৃষ্টি বলে বিবেচনা করা হয়। অথচ খ্রিষ্টিয় সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ইউরোপের সমাজবিজ্ঞানী ও নীতি বিজ্ঞানীরা বুদ্ধিবৃত্তির বিরুদ্ধে মহাযুদ্ধ শুরু করেন।

প্রত্যক্ষণ হলো ইন্দ্রিয় নির্ভরতা ও বস্তুতন্ত্রের পুরোপুরি উল্টো। ইন্দ্রিয় নির্ভরতায় যেমন আত্মা ও এ সম্পর্কিত বিষয়সমূহ অস্বীকার করা হয় বা উপেক্ষা করা হয়, প্রত্যক্ষণে তেমনি শরীর ও বস্তুর বিরুদ্ধে লড়াই করা হয়। এর মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি হলো মানুষের শরীর একটি খাঁচাবিশেষ এতে আত্মা হলো বন্দি পাখি; এ খাঁচাটি তার সকল

---

১০. আবুল হাসান আলী নদভী, ধর্ম ও কৃষ্টি, মাওলানা লিয়াকত আলী অনূদিত, কাসেমিয়া লাইব্রেরি, ১৯৯৫, পৃ. ৩১।

www.pathagar.com

প্রকারের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য বাধা, আত্মা তার মূল কেন্দ্র ও স্বকীয় ধারার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে চাইলে তাকে এ খাঁচা থেকে মুক্ত হতে হবে। তাই এটিকে হয় ভেঙ্গে ফেলতে হবে অথবা তার বন্ধনকে দুর্বল করে দিতে হবে যাতে প্রাণপাখি ইচ্ছে করলেই উড়ে যেতে পারে। এ মতবাদপন্থীরা আরও বলেন–

মানুষের সবচে বড় বিপদ হলো আনন্দ ও ভোগলিপ্সা, কেননা এরই কারণে আত্মা ও শরীরের সম্পর্ক বহাল থাকে। এরই কারণে আত্মার ঐশী উপাদান নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় এবং তার স্বকীয় ধারা পরিহার করে শরীরের নির্দেশিত পথে চলতে থাকে। বহিরিন্দ্রিয়কে নির্জীব করে দেবার পর শুধুমাত্র খাঁটি ও নির্ভেজাল বুদ্ধিবৃত্তির ভিত্তিতেই দর্শন হাসিল হতে পারে। শরীর আত্মাকে পথভ্রষ্ট করতে থাকে। সুতরাং আত্মা যখন বস্তুগত বন্দিখানায় আবদ্ধ থাকবে, আমরা ততক্ষণ প্রকৃত সত্য লাভ করতে পারবো না।

ইন্দ্রিয়নির্ভরতা ও খাঁটি আধ্যাত্মিকতা দুই মেরুতে অবস্থিত, এ দুয়ের মধ্যে একটি বড় তফাত হলো, ইন্দ্রিয় নির্ভরতা পৃথিবীতে নিজ মূলনীতির উপর সহজেই একটি কৃষ্টি প্রতিষ্ঠা করতে পারে। কিন্তু অপর পক্ষে খাঁটি আধ্যাত্মিক দর্শনের উপর সীমিত আয়তনের ভূমিতে ও কোনো কৃষ্টির জীবন গড়ে উঠতে পারে না। এ কারণেই প্রত্যক্ষণবাদ গ্রহণকারীরা ব্যবহারিক জীবনে প্রত্যক্ষণবাদী ও আধ্যাত্মিক মূলনীতি থেকে সরে গিয়ে বস্তুতান্ত্রিক ও ইন্দ্রিয় নির্ভর মূলনীতি অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করে। এর ফল যে অবস্থায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে এর পরিণতি খুবই ভয়াবহ। ইউরোপীয় একজন নও মুসলিম ইউরোপের জীবনধারা ও বস্তুপূজা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা তিনি একটি উদাহরণের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন এভাবে– ইউরোপীয় পিতা নিজ সন্তানের উপর কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলেছেন এবং সন্তানের অন্তর থেকে পিতার প্রতি শ্রদ্ধা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মাতা-পিতার সাথে সন্তানের সম্পর্ক দ্রুত আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এক যান্ত্রিক সমাজের দ্বারা এসব সম্পর্ক নষ্ট হচ্ছে। এতে সামাজিক শৃঙ্খলা পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়েছে।

ইসলামি সংস্কৃতি ও মাওলানা আকরম খাঁ

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক বিপর্যয় দেখা দেয়, তার অনিবার্য পরিণতি থেকে জাতিকে রক্ষা করার জন্য মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ দৃঢ়তার পরিচয় দেন। এর পূর্বে অষ্টাদশ শতাব্দীতে পলাশীর যুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ফলে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ে উপমহাদেশের মুসলিম সমাজ চরম অধঃপতনের সম্মুখীন হয়। সেই বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে রক্ষা করার জন্য নওয়াব আবদুল লতিফ ১৮৬৫ সালে কোলকাতায় Mohamedan Literary Society নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে মুসলিম সমাজকে পুনরায় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার জন্য উদাত্ত আহবান জানান।

১৮৩৭ সালে ইংরেজরা অফিস-আদালতের ভাষা ফার্সির স্থলে ইংরেজি প্রবর্তন করে মুসলিম সাংস্কৃতিক জীবনকে সম্পূর্ণভাবে পঙ্গু করার চেষ্টা চালান। ১৮০০ সালে তাঁরা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এদেশীয় কিছু পণ্ডিতকে নিযুক্ত করে নির্দেশ প্রদান করেন যে, সদ্য নিযুক্ত ইংরেজ সিভিলিয়ানদের পাঠের জন্য যে-সব পুস্তিকা প্রণয়ন করা হবে তাতে আরবি, ফার্সি, তুর্কি প্রভৃতি মুসলিম শব্দ যেন ব্যবহৃত না

হয়। এর ফলে পণ্ডিতরা যে ভাষার প্রবর্তন করেন, তা অনুস্বার-বিসর্গবিজড়িত সংস্কৃত ভাষা নামে খ্যাত। তাই সদ্য রাজ্যহারা মুসলিম সমাজের উচ্চশ্রেণির লোকেরা এ ভাষা বর্জন করে উর্দু ভাষা গ্রহণ করে। গ্রামের দরিদ্র শ্রেণি পুঁথি-পুস্তকের মাধ্যমেই তাদের ঐতিহ্যের সন্ধান পায়।[১১] এ অবস্থায় মুসলিম সমাজ আর্থিক দিক দিয়ে নিঃস্ব, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে বিচ্ছিন্ন এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পঙ্গু হয়ে পড়ে।

এর থেকে মুক্তিলাভের জন্য যে-সব মুসলিম মনীষী এগিয়ে আসেন, তন্মধ্যে নওয়াব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমির আলি, মীর মুশাররফ হোসেন, মুনশী মোহাম্মদ মেহের উল্লাহ, মাওলানা আকরম খাঁ, কবি কায়কোবাদ, মাওলানা মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী, মোজাম্মেল হক, নজিবুর রহমান সাহিত্যরত্ন, ইসমাঈল হোসেন সিরাজী, এয়াকুব আলি চৌধুরী, ডাঃ লুৎফর রহমান, কবি গোলাম মোস্তফা, কাজী নজরুল ইসলাম ও কবি ফররুখ আহমদের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এসব মনীষীর প্রচেষ্টায় মুসলিম বাংলায় নবজাগরণ ত্বরান্বিত হয়। এখানে মুসলিম রেনেসাঁর ক্রমবিকাশ ঘটে। মুসলমানরা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় আত্মনিয়োগ করতে থাকে। শিক্ষা-সংস্কৃতিতে মুসলমানদের এ নবপ্রেরণা লাভের পেছনে নওয়াব আবদুল লতিফ ও আমির আলির পর সবচে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ।[১২]

এ প্রসঙ্গে বলতে হয় যে, নওয়াব আবদুল লতিফ উনিশ শতকের মধ্যভাগে মুসলিম জাগরণের যে বীজ বপন করেছিলেন, মাওলানা আকরম খাঁ বিশ শতকে সে বীজকে অঙ্কুরিত করে ফলে-ফুলে সুশোভিত করেছেন। মূলত মাওলানা আকরম খাঁ গুরুত্বপূর্ণ অর্ধডজন সাপ্তাহিক, মাসিক, পাক্ষিক, দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানরা যে আলাদা জাতি এবং তাদের সংস্কৃতিও যে সম্পূর্ণ ভিন্ন-তা তাঁর শাণিত লেখনীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ জন্য মাওলানাকে উপমহাদেশের বাঙালি মুসলমানের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের দিকপাল বলা যায়।[১৩]

তাঁর পরিচালিত দৈনিক আজাদ মুসলমানদের কণ্ঠস্বর হিসেবে বিবেচিত ছিল। তৎকালীন সময়ে মাওলানা প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাগুলো মুসলিম সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কিরূপ ভূমিকা পালন করেছে, সে সম্পর্কে আজাদ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন মন্তব্য করেন:

> মুসলমানদের সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার চেষ্টা করে 'আজাদ' এবং 'মাসিক মোহাম্মদী'। সে সময় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে সর্বত্র শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে যে হিন্দুয়ানী ভাব প্রচারের চেষ্টা চলছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে আজাদ' এবং 'মোহাম্মদী'। এ কারণে মাসিক মোহাম্মদী প্রকাশ করে একটি 'বিশ্ববিদ্যালয় সংখ্যা'। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামে লেখা থাকতো শ্রীপদ্ম। এটা মুসলমানের আবেগকে আঘাত করে তারা (হিন্দুরা) বলে এটা সরস্বতীর বাহন। তাই তারা (মুসলমানরা) মেনে নিতে পারে না। আজাদ ও মোহাম্মদীর আপোষহীন বলিষ্ঠ ভূমিকার কারণে কর্তৃপক্ষ এটা করতে বাধ্য হয়। পাঠ্যপুস্তকে কিংবা পরীক্ষার খাতায় কোনো মুসলমানী শব্দ ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল। মুসলমানরা এর বিরুদ্ধেও

---

১১. মাকছুদুর রহমান, মোহাম্মদ, মাওলানা মুস্তাফিজুর রহমান, জীবন ও সাহিত্য, ১৯৯৩, ঢাকা, পৃ. ২০৩-৪।

১২. মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক, প্রাগুক্ত, ভূমিকা দ্রঃ।

১৩. আখতার-উল-আলম, সাক্ষাৎকার, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, দৈনিক ইত্তেফাক, তারিখ ১২/৮/৯০।

www.pathagar.com

আন্দোলন করে শেষ পর্যন্ত পার্লামেন্ট আইন পাস করে এ সব শব্দের ব্যবহার অনুমোদন করা হয়। বলা যায়, আজাদের কারণেই মুসলমানের সংস্কৃতি রক্ষা পায়।[১৪]

সাহিত্যের প্রয়োজনে বিভিন্ন ভাষার সংমিশ্রণ থাকা অস্বাভাবিক নয়। এতে সাহিত্য ভাণ্ডার আরও সমৃদ্ধ হয়। কিন্তু, মাওলানা আকরম খাঁ অহেতুক আরবি, ফার্সি শব্দ ব্যবহারে ভাষাকে জটিল করার পক্ষে ছিলেন না। তাঁর অনেক রচনায়, এমন কি তাঁর পবিত্র কুরআনের অনুবাদ এবং তাফসিরেও তিনি অনেক সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি।[১৫] বাংলা ভাষায় আরবি-ফার্সি ও অসংখ্য বিদেশী শব্দ দৈনন্দিন কথাবার্তা ও আচার-ব্যবহারে মধ্যযুগ থেকেই চলে আসছে। বাংলা সাহিত্যেও তা ব্যবহৃত হয়ে আসছে, যা অস্বীকার করার প্রশ্নই আসে না। আজাদ পত্রিকার সম্পাদকের ভাষায় :

> মুসলমানরা সাহিত্যে দৈনন্দিন কথাবার্তার ভাষায় বেশ কিছু সংখ্যক আরবী-ফারসী ও উর্দু শব্দ ব্যবহার করেন। হিন্দু সাহিত্যিকরা ভাষায় জাতি নাশের আশংকায় চঞ্চল হয়ে ওঠেছেন। তারা ফতোয়া জারী করেছেন, যেহেতু এ ভাষা বাঙালির (অর্থাৎ হিন্দুদের) অবোধ্য; কাজেই এ অচল। এখানেও হিন্দু সাহিত্যিকদের সেই সংকীর্ণ মনোভাবই ক্রিয়া করেছে। বাঙালি হিন্দুদের কথাবার্তায় ভাষার স্থান যদি বাংলা সাহিত্যে থেকে থাকে, তবে বাঙালি মুসলমানদের দৈনন্দিন কথোপকথনের ভাষার স্থান কেন থাকবে না? অনেক সংস্কৃত শব্দ বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত হয়ে ওঠেছে, যা মুসলমানদের কাছে গ্রীক। এ দুর্বোধ্য সংস্কৃত শব্দের প্রচলনে যদি আপত্তি না ওঠে, তবে মুসলমানী Tradition, allusion ইত্যাদি প্রকাশের জন্য অত্যাবশ্যক আরবী, ফারসী, উর্দু শব্দ প্রচলনে হিন্দু সাহিত্যিকদের আপত্তির কারণ কি?[১৬]

ধর্ম ও স্বতন্ত্র সংস্কৃতিভিত্তিক জাতীয়তার ভিত্তিতে উপমহাদেশের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী তথা মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার লাভ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবি যে কোনোরূপ 'সাম্প্রদায়িকতা'-প্রসূত ছিল না তা স্বীকৃত, যদিও ইতিহাস-ঐতিহ্যের ধারা বংশ, ধর্ম, সংস্কৃতি ও ভাষাগত ঐক্য এবং ঐতিহাসিক বিকাশ জাতি গঠনে সহায়তা করে। গবেষকদের মতে, জাতি গঠনের আসল উপাদান হলো ক'টি সেন্টিমেন্ট এবং অনুপ্রেরণা। সে সেন্টিমেন্ট হচ্ছে সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা এবং অনুপ্রেরণা হচ্ছে স্বতন্ত্র জাতিসত্তার অধিকারী হওয়ার প্রবণতা। বার্ট্রান্ড রাসেলের মতে, 'এ ধরনের অনুভূতি থাকলে একটি জাতিকে একটি রাষ্ট্রে সংগঠিত করা সহজ'।[১৭]

অবশ্য, জাতি গঠনের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে কোনটি কখন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে তা বুঝা মুশকিল। বৃটিশের সেই পরাধীনতার যুগে সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠী ধর্ম ও

---

১৪. ত্রিশ দশকের বাঙালি মুসলিম সমাজ, বিচিত্রা, ঈদ সংখ্যা, ১৯৭৭।
সহ. দ্র. মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতা ও আবুল কালাম শামসুদ্দীন, ১৯৮৩, পৃ. ৭১।

১৫. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, কুরআন শরিফ (বাংলা অনুবাদ ও বিস্তারিত তাফছির), ১ম খণ্ড, ১৩৪৮ হি. পৃ-১।

১৬. সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা, সওগাত, ১৩৩৪।

১৭. মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ, মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতা ও আবুল কালাম শামসুদ্দীন, ১৯৮৩, পৃ. ৬৯।

www.pathagar.com

সংস্কৃতিভিত্তিক স্বতন্ত্র জাতীয়তার ভিত্তিতে যে ঐক্যবদ্ধ এবং স্বতন্ত্র রাষ্ট প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়েছিল, তার বাস্তব কারণ যা-ই থাকুক না কেন, মূলত স্বতন্ত্র ধর্মবিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক সত্তাই এর পেছনে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ধর্ম ও মুসলিম সংস্কৃতির অনুপ্রেরণা ও দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে।[১৮]

অতএব দেখা যায়, সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জাতীয় চেতনার বিকাশ রাজনৈতিক লক্ষ্যে পৌঁছার কাজকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করে। অপরপক্ষে, রাজনৈতিক আত্মপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশ চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব।

অবিভক্ত ভারতের সংখ্যাগুরু (হিন্দু) সম্প্রদায় নিজেদের সাংস্কৃতিক মতবাদকে 'জাতীয় মতবাদ' হিসেবে গ্রহণ করলেও সংখ্যালঘু মুসলমানদের ক্ষেত্রে তা ছিল হিন্দু সাম্প্রদায়িক। প্রবীণ রাজনীতিবিদ মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ তাঁর স্মৃতিচারণে উল্লেখ করেছেন :

> কংগ্রেস সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের কতিপয় সাংস্কৃতিক মতবাদকে 'জাতীয় মতবাদ' বলে নির্বিবাদে গ্রহণ করে। কিন্তু সংখালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের কোনো সাংস্কৃতিক মতবাদ কংগ্রেসকে গ্রহণের দাবী জানানো হলে তা 'সাম্প্রদায়িক মতবাদ' বলে অগ্রাহ্য করা হলো। মূলত এ থেকেই কংগ্রেসে হিন্দু ও মুসলমান নেতাদের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টিহয়। ধীরে ধীরে এ মতভেদই মতবিরোধে পরিণত হয়।[১৯]

মুসলমানদের যে-কোনো যৌক্তিক দাবিকে প্রতিবেশী সমাজ- এমন কি মুসলিম সমাজেরও অনেকে সাম্প্রদায়িক রূপ দিতে দ্বিধা করতেন না। তাদের এ মারাত্মক ভুল সংশোধনের জন্য এককালের জাতীয়তাবাদী ও কংগ্রেসী নেতা আবুল মনসুর আহমদ বলেন :

> পাকিস্তান শুধু ভারতীয় দশ কোটি মুসলমানের 'সাম্প্রদায়িক' দাবী নয়- এটা গোটা ধার্মিক, কৃষ্টিক ও ভৌগোলিক মাইনরিটি সমবায়ের ত্রিশ কোটি ভারতীয় 'জাতীয়' দাবী।[২০]

ধর্ম ও সংস্কৃতি তথা মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার' ও আত্মপ্রতিষ্ঠার' দাবিকে শুধু সাম্প্রদায়িকরূপেই চিহ্নিত করা হয় নি, এসবের বিরুদ্ধে নানা ধরনের জটিলতা ও প্রতিবন্ধকতাও সৃষ্টিকরা হয়েছিল।

প্রতিবেশী সমাজের হঠকারী প্রবণতার মাধ্যমে মুসলিম স্বাতন্ত্রবোধকে নিশ্চিহ্ন করার প্রচেষ্টার কারণে রাজনৈতিক আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ে মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা স্বকীয়তা জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে সাংস্কৃতিক আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করতে বাধ্য হন। বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনায় এবং মুসলিম স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠিত করারও সামগ্রিক মূল্যবোধ পুনর্জাগরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। ড. মুহম্মদ এনামুল হকের ভাষায়:

> পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব বাংলার হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তাহা মূলতঃ এক- একেবারেই এক, ইহাকে আত্মবিশ্লেষণের প্রতিক্রিয়া নামে

---

১৮. সৈয়দ আবদুল মান্নান, পাকিস্তানের ঐতিহাসিক পটভূমি, ইকবাল একাডেমী, ঢাকা-করাচী, ১৯৫৯, ভূমিকা দ্রঃ।

১৯. মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, শিরাজী স্মৃতি, সন অনুঃ, পৃ. ২৪।
সহঃ দ্রঃ মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।

২০. আবুল মনসুর আহমদ, মাসিক মুহাম্মদি, ফাল্গুন, ১৩৪৯।

www.pathagar.com

অভিহিত করা যায়। আত্মবিশ্লেষণের ফলেই আমাদের আত্মোপলব্ধি ও আত্মপরিচিতি ঘটে, এখানে আসিয়াই বাংলার হিন্দু ও মুসলমান ভিন্নপথ ধরিল। তাহারা বুঝিলেন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে জমিদার ও পেয়াদা হিন্দু হিন্দুই এবং মুসলমান মুসলমানই, তাহারা পরস্পরের সহিত মিশিয়া এক জাতি হইতে পারে নাই। বিশেষ করিয়া পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ সময়ের হিন্দু মুসলমান সংস্কৃতি সমন্বয়ের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।[২১]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অনেক আগেই আবুল মনসুর আহমদ লিখেছিলেন:

গাছ ও বীজের মধ্যে যা' সম্পর্ক ধর্ম ও সংস্কৃতির সম্পর্কও তাই। ধর্ম থেকেই সংস্কৃতির জন্ম, বীজ থেকেই গাছের জন্ম। গাছের মধ্যে বীজ রয়েছে। সংস্কৃতির মধ্যেও ধর্ম লুকিয়ে আছে। তবুও গাছ ও বীজ এক নয়, ধর্ম ও সংস্কৃতি এক জিনিস নয়। ধর্ম ভূগোলের সীমা ছাপিয়ে উঠতে পারে। কিন্তু তমদ্দুন ভূগোলের সীমা এড়াতে পারে না। বরঞ্চ সে সীমাকে আশ্রয় করে সংস্কৃতির পয়দায়েশ। এখানেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সরহদ্দ। এখানেই পূর্ব পাকিস্তান একটা ভৌগোলিক সত্তা। এ জন্যই পূর্ব পাকিস্তানের বাসিন্দারা ভারতের অন্যান্য জাত থেকে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ধর্মীয় ভ্রাতাদের থেকে একটা স্বতন্ত্র আলাহিদা জাতি।[২২]

একটা জাতির জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতার চেয়েও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। রাজনৈতিক স্বাধীনতা স্থায়িত্ব লাভের জন্য সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা অপরিহার্য। মুসলিম বাংলার মানুষ এ সত্যকে অনুধাবন করার লক্ষ্যে আজাদ' সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন লিখেন :

আমরা পূর্ব পাকিস্তানের (সাবেক) অধিবাসীর চিন্তার রাজ্যে এ বিশ্লেষণাত্মক পরিবর্তন চাই। তাই আমাদের সংঘের নাম 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি'। জাতির রাজনৈতিক মুক্তিই সর্বাঙ্গীণ আজাদী নয়। কাজেই, জাতির রাজনৈতিক মনের মুক্তির বিজ্ঞানসম্মত পন্থা নির্দেশই রেনেসাঁর একমাত্র কাজ নয়। তামুদ্দনিক, সাহিত্যিক, আর্থিক, শৈল্পিক মুক্তি না ঘটলে শুধু রাজনৈতিক আজাদী লাভ করে কোনো সাহিত্য, তমদ্দুন, শিক্ষা, অর্থনীতি, শিল্প প্রভৃতি সম্পর্কেও জাতি সত্যিকার আজাদী লাভের অধিকারী হয় না। রেনেসাঁ তাই জাতিকে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনে উদ্বুদ্ধ করে। তমদ্দুন, শিক্ষা, ইতিহাস, অর্থনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রেও পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীর স্বকীয় বৈশিষ্টকে খুঁজে বের করতে হবে, তাকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।[২৩]

পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি

আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও স্বাধিকার আন্দোলনের জন্য রাজনীতি প্রয়োজন। সেই রাজনীতিকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক আন্দোলনের বিকল্প নেই। এ জন্য মাওলানা তৈরি করেছিলেন একদল সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীবাহিনী। এঁদের বেশির ভাগই ছিলেন 'মাসিক মোহাম্মদী' ও আজাদ'-সহ তাঁর প্রতিষ্ঠিত অনান্য পত্রিকার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট। চিন্তার রাজ্যে তাঁরা

---

২১. ড. এনামুল হক, মুহম্মদ মুসলিম বাংলা সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৭।
২২. মাসিক মুহাম্মদি, শ্রাবণ ও ভাদ্র, ১৩৫১।
২৩. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

ছিলেন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মুজিবুর রহমান খাঁ, মোহাম্মদ মোদাব্বের, আকবর উদ্দীন, কাজী মোহাম্মদ ইদ্রিস, জহুর হুসেন চৌধুরী, আবদুল হাই প্রমুখ সে-কালেই দেশী-বিদেশী সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে উন্নতমানের প্রবন্ধ রচয়িতা হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। মাসিক মোহাম্মদী, দৈনিক আজাদ ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁদের প্রবন্ধে বিশেষত জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণা ও সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধাদি এ পরিচিতিরই স্বাক্ষর বহন করে। এসব রচনা থেকে সহজেই অনুভব করা যায়, তাঁরা স্বতন্ত্র জাতীয়তাবোধ এবং সংস্কৃতি-চেতনায় কতটা উদ্বুদ্ধ ছিলেন।

মাওলানা আকরম খাঁ ও তাঁর এ সাহিত্য-সংস্কৃতিসেবী দল একদা ভারতীয় জাতীয়তায় বিশ্বাসী এবং কংগ্রেস-অসহযোগ আন্দোলন, খিলাফত আন্দোলন, বেঙ্গল প্যাক্ট ইত্যাদির সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে প্রতিবেশী সমাজের কর্মকাণ্ডে নিরাশা ও হতাশা নিয়ে বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে তাঁরা স্বতন্ত্র জাতীয়তাবোধ এবং 'দ্বি-জাতিতত্ত্বের' ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। স্বাধীন দেশে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অবাধ আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রেরণাই তাঁদেরকে একটি ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলায় উদ্বুদ্ধ করে। তাই মাওলানা আকরম খাঁ'র অনুপ্রেরণায় কোলকাতায় ১৯৪২ সালের ৩০ আগস্ট প্রতিষ্ঠিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি।'[২৪]

'দৈনিক আজাদে' ১৯৪২ সালের ৩১ আগস্ট সংখ্যায় কোলকাতায় সোসাইটির প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে বলা হয় :

৩০ আগস্ট (রবিবার), আজাদ অফিসে এক ঘরোয়া সভায় 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি' গঠন সম্পর্কে সাহিত্যিক ও ছাত্র নেতাদের মধ্যে এক আলোচনা হয়। প্রখ্যাত এগারজন মুসলিম সদস্য নিয়ে 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। এ রিপোর্টে আবুল কালাম শামসুদ্দীনসহ ১১ জন সদস্যের নাম উল্লিখিত হয়েছে।[২৫]

আজাদ ও মোহাম্মদীর সাথে প্রথমে সংশ্লিষ্ট অধিকাংশকে দেখা গেলেও পরবর্তী পর্যায়ে এ সোসাইটির কাজ ব্যাপকভাবে জোরদার হওয়ায় বিপুলসংখ্যক সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও সংস্কৃতিকর্মী এর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হন। 'রেনেসাঁ সোসাইটি' শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ জনগণের মধ্যে বিরাট সাড়া জাগায়, যা পরবর্তী পর্যায়ে পাকিস্তান আন্দোলনের প্রেক্ষাপটকে সুদৃঢ় করে। রেনেসাঁ সোসাইটি গঠিত হওয়ার পর 'দৈনিক আজাদ' এ সম্পাদকীয় নিবন্ধে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে এভাবে :

পাকিস্তান মুসলিম ভারতে রাজনৈতিক রেনেসাঁ আনিয়াছে। দুইশত বৎসরের পরাধীনতার ফলে যে জাতির স্বাধীন সত্তা লোপ পাইতে বসিয়াছিল ... পাকিস্তান

---

২৪. মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮.

২৫. সোসাইটির অন্যান্য সদস্য ছিলেন- ১. মোহাম্মদ হবিবুল্লাহ বাহার, ২. মুজিবুর রহমান খাঁ, ৩. সৈয়দ সাদিকুর রহমান, ৪. মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ, ৫. মোহাম্মদ মোদাব্বের, ৬. আব্দুল হাই, ৭. জহুর হোসেন চৌধুরী, ৮. আনোয়ার হুসেন, ৯. ডা. ফজলুল করিম খাঁ, ১০. মোশাররফ হুসেন। আহবায়ক নির্বাচিত হন মুজিবুর রহমান খাঁ।
দৈনিক আজাদ, ৩১ আগস্ট, ১৯৪২।

www.pathagar.com

তাদের মগ্ন চেতনা সত্তার মূলে তীব্র আঘাত হানিয়া তাকে সচেতন করিয়া তুলিয়াছে। ... সম্প্রতি কলিকাতায় 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি' গঠিত হইয়াছে। ... মোছলেম লীগ কর্মক্ষেত্রে পাকিস্তানকে রূপ দিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু মুসলমানের চিন্তাক্ষেত্রে এর প্রতিষ্ঠার জন্য চাই উপরোক্ত ধরনের ক্লাব বা সোসাইটি গঠন। কারণ চিন্তা ক্ষেত্রে 'পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠিত না হইলে কর্মক্ষেত্রে উহার প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ হইতে পারে না। কাজেই বাংলার মুসলমান সাহিত্যিক ও ছাত্রদিগকে এদিকে সম্যক অবহিত হইতে আমরা আহবান জানাই।[২৬]

সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও সংস্কৃতিকসেবী ছাড়াও এ সোসাইটি বুদ্ধিজীবী এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মনোজগতেও বিরাট পরিবর্তন এনেছে। প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও লেখক আবুল মনসুর আহমদ উল্লেখ করেন :

> আমি রেনেসাঁ সোসাইটিতে যোগদান করিলাম, এঁরা আমার প্রাপ্যাধিক মর্যাদা দিলেন। আমাকে মূল সভাপতি নির্বাচন করিয়া পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সম্মিলনীর আয়োজন করিলেন। ১৯৪৪ সালের ৫ই মে তারিখে ইসলামিয়া কলেজের মিলনায়তনে বিপুল উৎসাহ-উদ্যোগের মধ্যে এ সম্মিলনী হইল। মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সম্মিলনী উদ্বোধন করলেন। আমি হইলাম মূল সভাপতি। শামসুদ্দীন হইলেন অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান। অধ্যাপক ডাঃ সুশোভন সরকার, ডাঃ সাদেক, ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, অধ্যাপক শামসুদ্দিন, মোঃ আবদুল মওদুদ, মোঃ হাবিবুল্লাহ বাহার, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য প্রভৃতি বহু মনীষী ছাড়াও মুসলিম বাংলার রাজনীতিক নেতাদের প্রায় সকলেই এ সম্মিলনীতে উপস্থিত ছিলেন। নেতাদের মধ্যে জনাব এ, কে ফজলুল হক ও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাযিমুদ্দিন মন্ত্রীসভার সকল মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। ছাত্র-তরুণরা বিশালাকার হলটি একেবারে জমজমাট করিয়াছিল। .... প্রথমতঃ আমি বলিয়াছিলাম পাকিস্তান দাবীটা প্রধানত : কালচারেল অটনমির দাবি। বলিয়াছিলাম, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার চেয়েও কালচারের অটনমি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এদিক হইতে পাকিস্তান দাবী শুধু মুসলমানের কালচারেল দাবী নয়, এটা গোটা ভারতের কালচারেল মাইনরিটির জাতীয় দাবী ...। ভারতীয় মুসলমানরা হিন্দু হইতে আলাদা জাতি।[২৭]

আবুল মনসুর আহমদ তাঁর বক্তৃতার এক জায়গায় ধর্মীয় জাতীয়তার চেয়েও ভৌগোলিক জাতীয়তার প্রাধান্য দিয়েছিলেন যা তৎকালীন মুসলিম লীগের মতবাদের সাথে সামঞ্জস্য ছিল না। অবশ্য, অকপটে তিনি তা স্বীকারও করেছেন।[২৮]

রেনেসাঁ সোসাইটির আন্দোলন ভারতীয় মুসলমানদের 'সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নববিপ্লব সাধন করে। এ সোসাইটির মূলনীতি ছিল :

১. জাতীয় রেনেসাঁর উদ্বোধক পাকিস্তানের সাহিত্য রূপায়ণ।

---

২৬. দৈনিক আজাদ, ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪২।
২৭. আবুল মনসুর আহমদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ১৯৯৫, পৃ. ১৮৬।
আবুল কালাম শামসুদ্দীন, অতীত দিনের স্মৃতি, ১৯৬৮, পৃ. ২৪৪।
২৮. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

২. পাকিস্তান সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক ও মননশীল বক্তৃতা (Talk) বিতর্কিকা (Debate), বৈঠকি রচনা পাঠ, তথ্যানুসন্ধান ও সংগ্রহ, গবেষণা ও আলোচনা, পুস্তক-পুস্তিকা প্রচার প্রভৃতি কাজের আয়োজন ও তাতে উৎসাহ দান।

৩. সাহিত্যিক, সাহিত্যামোদী, মহিলা ও ছাত্রদের মধ্যে বিশেষভাবে পাকিস্তান ভাবধারার সম্প্রসারণ।

৪. জাতীয় তমদ্দুনের উন্মেষ ও এর সহায়ক আন্দোলনের সাথে যোগ সংরক্ষণ।

৫. সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলমানের আন্তর্জাতিক সম্প্রীতিমূলক আবেদনের রূপায়ণ।

৬. সাহিত্যে পাকিস্তান-বিরোধী সব রকমের প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারা ও ফ্যাসিবাদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে মনোভাব সৃষ্টি।'[২৯]

পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল এ-ই। সোসাইটির কাজকর্ম ব্যাপক ছিল। প্রথম দু'বছরে সোসাইটি চল্লিশটি আলোচনা সভার আয়োজন করেছিল। সোসাইটি পরিকল্পিত পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) একটি মানচিত্র তৈরি করে কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলি জিন্নাহর কাছেও পাঠিয়েছিল। এতে ভাগীরথী নদীকে পূর্ব পাকিস্তানের সীমানা চিহ্নিত করায় সোহরাওয়ার্দী ও খাজা নাযিমুদ্দিন প্রত্যাখ্যান করেন।[৩০] এতেই প্রতীয়মান হয়, এ সোসাইটির কাজ কত সুদূরপ্রসারী ছিল।

রেনেসাঁ সোসাইটির অনুকরণে এ দেশীয় মুসলিম সংস্কৃতিকে অবহিত করার লক্ষ্যে আরও কয়েকটি 'সাংস্কৃতিক সংঘ'ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যেমন : (ক) পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ। সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন ও সৈয়দ আলি আহসান। ১৯৪৩ সালে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে সংসদের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

তিনটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে এ সংসদের কার্যক্রম পরিচালিত হয় :

ক. ইসলামের প্রবাহমান ঐতিহ্য থেকে উপাদান আহরণ করা;

খ. অধুনা অপাংক্তেয় মুসলমানী পুঁথিকে পরিমার্জিত করে শালীন সাহিত্যের অঙ্গীভূত করা;

গ. পূর্ব পাকিস্তানের অস্বীকৃত গ্রামীণ জীবনকে আরো বেশি করে সাহিত্যের মধ্যে নিয়ে আসা।[৩১]

এ প্রতিষ্ঠান মাত্র কয়েক বছর সক্রিয় ছিল। পরে এর কার্যক্রম আর তেমন দেখা যায় নি। অতঃপর ১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর 'তমদ্দুন মজলিস' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশ বিভাগের পূর্ববর্তী সময়ে মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলামি বিধি-বিধান অনুযায়ী পাকিস্তান পরিচালিত হবে-এমন ধারণাও দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীসময়ে বিভিন্ন মত ও পথের নেতৃবৃন্দের আগমনে তা আর হয়ে ওঠে নি। ইসলাম সম্পর্কে তাদের কারো কারো প্রয়োজনীয় জ্ঞানও ছিল না।[৩২] উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে। পাকিস্তান

---

২৯. মাসিক মুহাম্মদি, শ্রাবণ ও ভাদ্র, ১৩৫১।
৩০. সাঈদ-উর-রহমান, পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা, ১৯৮৩, পৃ. ২৫-২৬।
৩১. সাঈদ-উর-রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।
৩২. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম লীগের প্রথম সারির নেতা মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ-কে পীর দুদুমিয়া প্রশ্ন করেছিলেন : ইসলামি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সম্পর্কে নেতৃবৃন্দ কি ভাবছেন? উত্তরে আকরম খাঁ বলেছিলেন : 'এক ছটাক বিষ' তাদের শরীরে ঢুকিয়ে দিলে যে অবস্থার সৃষ্টিহয়, ইসলামের কথা বললেও তাদের অবস্থা তা-ই।[৩৩] এ পটভূমিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক আবুল কাসেম কয়েকজন উদ্যোগী উৎসাহী তরুণকে নিয়ে 'তমদ্দুন মজলিস' প্রতিষ্ঠা করেন। এর গঠনতন্ত্রে চারটি উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছিল :

ক. কুসংস্কার, গতানুগতিকতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতা দূর করে সুস্থ ও সুন্দর তমদ্দুন গড়ে তোলা;

খ. যুক্তিবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত সর্বাঙ্গসুন্দর ধর্মভিত্তিক সাম্যবাদের দিকে মানব সমাজকে এগিয়ে নেয়া;

গ. মানবীয় মূল্যবোধের ওপর সাহিত্য ও শিল্পের মারফত নতুন সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা;

ঘ. নিখুঁত চরিত্র গঠন করে গণজীবনের উন্নয়নে সহায়তা করা।[৩৪]

বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষায় মর্যাদা দেওয়ার জন্য ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত এ সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৫২ সালে মজলিসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ১৭-২০ অক্টোবর 'ইসলামি সাংস্কৃতি সম্মেলন' সেকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল। এ সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো বুকলেট, পুস্তিকা ও গ্রন্থও প্রকাশ করে। এর বেশির ভাগ গ্রন্থ ইসলামি সাহিত্য ও সাংস্কৃতি বিষয়ক। বাংলাকে রাষ্ট ভাষা করার ক্ষেত্রেও সংগঠনের অবদান উল্লেখযোগ্য।[৩৫]

মানুষের ভাষা এক হলেও সাহিত্য-সংস্কৃতি চিন্তা সর্বক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন নাও হতে পারে। এ সত্য তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে উপমহাদেশের বিভাগ-পূর্বকাল থেকেই। তবুও ১৯৫৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে এবং ১৯৫৭ সালে 'কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়।[৩৬] এর উদ্যোক্তারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অবিভাজ্যতা ও বাংলাদেশের অবিভাজ্যতার ব্যাপারে দৃঢ় মত ব্যক্ত করেন। তাঁরা মতামত ব্যক্ত করেন; দেশ ভাগ হলেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্য কখনও ভাগ হতে পারে না, হয়নিও- এক সংস্কৃতিতে আছে। বাঙালি জাতি কখনো বিভক্ত হতে পারে না

---

৩৩. সাক্ষাৎকার, ড. এ, বি, এম, হাবিবুর রহমান চৌধুরী, প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, তারিখ ১/৯/৯৬।

৩৪. সাঈদ-উর-রহমান, পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা, ১৯৮৩, পৃ. ২৭।

৩৫. মৌখিক সাক্ষাৎকার, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, জাতীয় অধ্যাপক, সভাপতি, তমদ্দুন মজলিস, তারিখ ১০/০১/৯৭।

৩৬. আবুল কালাম শামসুদ্দীনের ভাষায়, মোমেনশাহী জেলার (বর্তমান ময়মনসিং) কাগমারী সম্মেলনের উদ্যোক্তারা বাংলা দেশের অবিভাজ্যতা প্রতিপন্ন করার জন্য কিংবা অন্য কোন কারণে জানিনা সম্মেলনের স্থানের বহির্দেশে অসংখ্য গেট করেছিলেন এবং অনেকগুলোর নামকরণ হয়েছিল ভারতীয় নেতাদের নামে; যেমন গান্ধী গেট, জওহর গেট, সুভাষ গেট ইত্যাদি। সম্মেলনের কার্যবিবরণী সম্পর্কে যে খবর পাওয়া গিয়েছিল, তার মধ্যে পশ্চিম বঙ্গীয় সাহিত্যিকদের ভাষণগুলোই ছিল সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাতে না-কি দেশ ভাগের জন্য যথেষ্ট অশ্রুপাত করা হয়েছিল। এ সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।
আবুল কালাম শামসুদ্দীন, অতীত দিনের স্মৃতি, ১৯৬৮, পৃ. ৩৪৬।

www.pathagar.com

ইত্যাদি।[৩৭] এ সম্মেলনে পশ্চিম বঙ্গ থেকেও প্রবীণ সাহিত্যিকগণ এসেছিলেন। তন্মধ্যে ঔপন্যাসিক প্রবোধ কুমার সান্যাল মহাশয়ও ছিলেন।[৩৮] এঁরা সবাই বাংলা সাহিত্য এক ও অবিভাজ্য- এ জিগির তোলেন। পরের বছরই (১৯৫৮ সালে) আরেকটি সাহিত্য অনুষ্ঠান চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।[৩৯] এটি ছিল উপরোক্ত দু'টি সম্মেলনের সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। এ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ। এছাড়া আবুল মনসুর আহমদ, মুহম্মদ বরকত উল্লাহ ও আবুল কালাম শামসুদ্দীন বিভিন্ন সেশনে সভাপতিত্ব করেন। মাওলানা আকরম খাঁ মূল সভাপতি হিসেবে 'পাক-বাংলার সাহিত্যের রূপরেখা' সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করেন। আবুল মনসুর আহমদ 'পাক-বাংলার সাহিত্যের ভাষার স্বতন্ত্র রূপ কি হবে'-এ নিয়ে সুদীর্ঘ মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। মনন শাখার সভাপতি আবুল কালাম শামসুদ্দীন বলেন :

> মৌলিক কারণেই হিন্দু মুসলিম ঐক্য সম্ভব নয় এবং এ কারণেই তাদের সৃষ্ট সাহিত্যের স্বতন্ত্র রূপ অপরিহার্য।
>
> পাকিস্তান সাতচল্লিশ-পূর্ব যুগে এখানকার মুসলমানদের মনে জাতীয় রেনেসাঁর বাণী যে রূপ জোর বেঁধেছিল পাকিস্তান-উত্তর যুগে দেখা যাচ্ছে তা যেন ক্রমে ক্রমে স্তিমিত হয়ে আসছে। এটা নিশ্চিত দুঃসংবাদ, আবার বিদেশী বিজাতীয় সম্মোহন পাকিস্তানী তরুণ মুসলিম মানসে মায়াজাল বিস্তার করতে দেখতে পাচ্ছি। তার ফলে যে আত্মস্থতার স্ফূরণ হয়েছিল জাতীয় জীবনে তা মিলিয়ে যাচ্ছে। আবার অন্ধ গতানুগতিকতার সম্মোহন আমাদের জাতীয় জীবনকে কোনো অন্ধকারের অতল গর্ভে ঠেলে দেয়ার আয়োজন করছে। মনে হচ্ছে নেপথ্য থেকে গত যুগের একদল ছিটকেপড়া সম্মোহিত পাণ্ডিত্যাভিমানী এ অপচেষ্টার পেছনে ইন্ধন যোগাচ্ছে।[৪০]

মূলত, চট্টগ্রামের এ সম্মেলনকে পূর্ববর্তী কার্জন হল ও কাগমারী সম্মেলনের 'প্রতিবাদ সম্মেলন' হিসেবে আখ্যা দেয়া যেতে পারে। 'দৈনিক আজাদ' তৎকালীন সময় দীর্ঘ এক মাস যাবৎ উক্ত দু'টি সম্মেলন সম্পর্কে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে আসছিলো, অনেক সাহিত্যিক ও সাহিত্যপিপাসু ব্যক্তি পত্রাঘাতও করেছিলেন। উক্ত দু'টি সম্মেলনকে কটাক্ষ করে 'যুক্ত বঙ্গ' ও 'এক সংস্কৃতি'[৪১] ইত্যাকার শিরোনামে কয়েকটি ব্যঙ্গ কবিতাও বেরিয়েছিল। এসব প্রতিবাদের মূল ছিলো : ভাষা এক হলেই সংস্কৃতি এক হবে এ কথা ঠিক নয়, এ বিষয়টি বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। জাতীয়তা ও সংস্কৃতির সংজ্ঞার স্বরূপ তুলে ধরে আজাদ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন লিখেছেন :

> বাংলাভাষী মাত্রকেই অনেকে বাঙালি বলে থাকেন এবং তাদের একটা নিজস্ব সংস্কৃতি আছে, আর তাই হচ্ছে বাঙালি সংস্কৃতি- এ অভিমতও তারা পেশ করে থাকেন; কিন্তু ভাষা এক হলেই তাদের সংস্কৃতি এক হবে, সব ক্ষেত্রেই একথা ঠিক

---

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৬।
৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৫।
৩৯. এ অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিলেন, চট্টগ্রামের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ কুরআনের ভাষ্য লেখক জনাব আবদুর রহমান।
প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৬।
৪০. আবুল কালাম শামসুদ্দীন, অতীত দিনের স্মৃতি, ১৯৬৮, ঢাকা, পৃ. ৩৪৭।
৪১. প্রাগুক্ত, ৩৪৮।

www.pathagar.com

কি? তা'হলে ইংরেজ আর আইরিশদের সংস্কৃতি কি এক? ইংরেজ আর মার্কিনীদের সংস্কৃতি কি পৃথক নয়? সুতরাং ভাষা এক হলেই সব ক্ষেত্রেই এক সংস্কৃতির অধিকারী হওয়া যায় না। এটা না মেনে উপায় নাই। কারণ শুধু ভাষার ক্ষেত্রে নয়, সমাজ ক্ষেত্রেও তাদের এ ভাষা মানুষকে সর্বাঙ্গীণভাবে ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছে কি-না। সংস্কৃতি সম্পর্কে এটাই হচ্ছে সবচাইতে বড় কথা। ভাষা এক হলেও বাংলার হিন্দু-মুসলমান কি সমাজ ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছে? তাদের আহার বিহার, ধর্ম, ঐতিহ্য, শুধু যে এক নয়- তা নয়, অনেক ক্ষেত্রে একেবারে সম্পূর্ণ বিরোধীভাবাপন্ন- যার ফলে তাদের ঐক্যবদ্ধ সমাজ-জীবন অসম্ভব হয়ে রয়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সংস্কৃতি সাধারণত প্রতিফলিত মানুষের সামাজিক একাত্মতায়; আর জাতিত্ব নির্ভরশীল একটা দেশের মানুষের রাজনৈতিক ঐক্যবদ্ধতায়। বাঙলা দেশের মানুষের এ ঐক্যবদ্ধতার সত্যরূপ কখনো প্রত্যক্ষ করা গেছে এ কথা জোর দিয়ে বলা চলে কি? এ ঐক্যবদ্ধতার জন্য চেষ্টা চলছে সুপ্রচুর। কিন্তু সে চেষ্টায় গোঁজামিল ছিল যতটা আন্তরিকতা– তার শতাংশের এক অংশও ছিল না। বাংলাদেশের সর্বশ্রেণির, বিশেষ করে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত জাতীয়বোধ সৃষ্টির চেষ্টা দেখা গেছে বাঙলার সাহিত্য ক্ষেত্রে এবং রাজনৈতিক প্লাটফর্মে, কিন্তু তা সার্থক হয়ে উঠতে পারে নাই, সে চেষ্টায় আন্তরিকতার অভাবে। সাহিত্য ক্ষেত্রে একমাত্র নজরুল ইসলাম এবং রাজনীতি ক্ষেত্রে একমাত্র চিত্তরঞ্জন দাশ আন্তরিকতার সাথে এ চেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল এ কারণে যে, এর ভিত্তিমূলই ছিল নড়বড়ে এবং চোরাবালির উপর প্রতিষ্ঠিত। এর সত্যতা চূড়ান্তভাবে প্রতিপন্ন হল বাংলাদেশ বিভাগে এবং এ বিভাগের রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের ভিতর দিয়ে।[৪২]

'বাঙালি সংস্কৃতি' ও 'বাঙালি জাতীয়তার স্বরূপ' বর্ণনা করতে গিয়ে আবুল মনসুর আহমদ তাঁর গ্রন্থে 'বাঙালি জাতীয়তা বনাম ভারতীয় জাতীয়তা' শিরোনামে উল্লেখ করেন :

হিন্দু নেতৃত্বের অনেত্রীয় মনোভাবে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রদর্শিত পথ হইতে তাঁদের অদূরদর্শী বিচ্যুতিতে কিভাবে রাজনীতির মোড় ফিরিয়া ছিল তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আমি লাভ করিয়াছি বাংলার রাজনীতিতে। বাংলার রাজনীতি ভারতীয় রাজনীতি হইতে ছিল বেশ কিছু পৃথক ও স্বতন্ত্র। নিখিল ভারতীয় ভিত্তিতে হিন্দুরা যে নির্ভেজাল গণতান্ত্রিক শাসন চাহিতেন বাংলার বেলা তাহা চাহিতেন না। বাঙালি হিন্দুরা বাংলায় মেজরিটি শাসন ও পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন উভয়টারই বিরোধী ছিলেন। এটা ছিল অবশ্য হিন্দুদের সাম্প্রতিক মনোভাব। উনিশ শতকের শেষে, বিশ শতকের গোড়ার দিকে হিন্দু কবি-সাহিত্যিক ও রাষ্ট্র নেতারা 'বাঙালি জাতিত্ব', 'বাংলার বৈশিষ্ট্য', 'বাংলার কৃষ্টি' 'বাংলার স্বাতন্ত্র্য' ইত্যাদি প্রচার করিতেন, অনেকে বিশ্বাসও করিতেন কিন্তু গণতন্ত্রের প্রতীক্ষায় ভোটাধিকার প্রসারে রাষ্টীয় অধিকার মেজরিটি মুসলমানের হাতে চলিয়া যাইবে- এটা যেদিন পরিষ্কার হইয়া গেল, সেইদিন হইতেই হিন্দুর মুখে বাংগালী জাতিত্বের কথা, বাংলার কৃষ্টির কথা আর শোনা গেল না। তার বদলে 'ভারতীয়

৪২. মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬।

www.pathagar.com

> জাতি, 'ভারতীয় কৃষ্টি' 'মহাভারতীয় মহাজাতি' ও আর্য্য সভ্যতার' কথা শুনা যাইতে লাগিল। এর কারণও ছিল সুস্পষ্ট। ফজলুল হক একদা বলেছিলেন, পলিটিকস অব বেঙ্গল ইয ইন রিয়েলিটি ইকনমিক্স অব বেঙ্গল। বাংলার অর্থনীতিই বাংলার আসল রাজনীতি। খুব সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বিপর্যয়ে বাংলার গোটা মুসলমান সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে অধঃপতিত জাতিতে পরিণত হয়। ধর্ম ও কৃষ্টির ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম দুইটা স্বতন্ত্র সমাজ আগে হইতে ছিল।[৪৩]

এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন :

> অর্থনীতিতে মুসলমানদের এ অধঃপতনে জীবনের সকল স্তরে হিন্দু-মুসলমানদের সুস্পষ্ট দৃশ্যমান দুইটা পৃথক জাতি হইয়া গেল। পরিস্থিতিটা এমন হৃদয়বিদারক ছিল যে, কংগ্রেসের নিষ্ঠাবান কর্মী হইয়াও আমি কংগ্রেস সহকর্মীদের সামনে জনসভায় কঠোর ভাষায় এ পার্থক্যের কথা বলিয়া হিন্দু বন্ধুদের বিরক্তি ভাজন হইতাম। আমি বলিতাম : বাংলার জমিদার হিন্দু, প্রজা মুসলমান, বাংলার মহাজন হিন্দু, খাতক মুসলমান, উকিল হিন্দু, মক্কেল মুসলমান, ডাক্তার হিন্দু, রোগী মুসলমান, হাকীম হিন্দু, আসামী মুসলমান, খেলোয়াড় হিন্দু, দর্শক মুসলমান, জেইলার হিন্দু, কয়েদী মুসলমান ইত্যাদি ইত্যাদি।

তাঁর তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্যের মধ্যে নিম্নোক্ত বক্তব্যও দেখতে পাই :

> ১৯৩৩-৩৪ ব্রহ্মপুত্র নদীতে বন্যা হইয়া দুকূল ভাসিয়া গিয়াছিল। বন্যা-পীড়িত দুর্গতদের জন্য অন্যান্যদের মত এসোসিয়েশনের পক্ষেও একটি রিলিফ কমিটি করা হয়। বেশ টাকা উঠিয়াছিল। প্রায় সব টাকা হিন্দুরাই দিয়াছিলেন। মুসলমানদের দান খুবই নগণ্য। এ তহবিলের টাকা বন্টনে এক সভায় সমিতির প্রেসিডেন্ট রায় বাহাদুর শশধর ঘোষের সাথে আমার তর্ক বাধে। তিনি আমাকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, চাঁদা দাতারা প্রায় সবাই হিন্দু। আর যায় কোথায় ? আমি গর্জিয়া উঠিলাম। ... রায় বাহাদুর ও সমবেত মেম্বারদের আমি স্মরণ করাইয়া দিলাম বাংলার হিন্দুদের ঘরে যত টাকা আছে সব টাকা মুসলমানের-মুসলমান চাষী মজুরের মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া রোযগার করা টাকায় হিন্দুরা সিন্দুক ভরিয়াছে, দালান ইমারত গড়িয়াছে; গাড়ি-ঘোড়া দৌড়াইতেছে। রায় বাহাদুরের নিজের টাকা, ব্যাংক ও বাড়ীর কথাও উত্তেজনার মুখে বলিয়া ফেলিলাম। রায় বাহাদুরসহ উপস্থিত সকলে হতভম্ব হইয়া গেলেন। কিন্তু রায় বাহাদুর ছিলেন বিচক্ষণ সুচতুর জ্ঞানী লোক। তিনি রাগ গোপন করিলেন।[৪৪]

বৃটিশ শাসনের পূর্বে বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষ মুসলমান শাসনাধীন ছিল। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে মুসলমানদের ভাগ্যবিড়ম্বনা হয়ে গেলে বাংলার মুসলমানদের জাতীয় জীবনে শুরু হয় চরম দুর্গতি। তখনও ফার্সি ভাষা অফিস-আদালতে বেশ প্রচলিত ছিল। তার ফলে সরকারি চাকরিতে মোটামুটি সুযোগ ছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ফার্সি ভাষার স্থলে ইংরেজি সরকারি ভাষা হিসেবে প্রচলিত হওয়ায় সে সুযোগ থেকে তারা বিশেষভাবে বঞ্চিত হয়। মাওলানা আকরাম খাঁ'র এ সম্পর্কে একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

---

৪৩. আবুল মনসুর আহমদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, পৃ. ১২৬।
৪৪. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

এ বঞ্চনা শুধু অন্যের ঘাড়ে চাপালে হবে না, নিজেদের দোষেও যে হ'লো তা না বললে সত্যের অপলাপ করা হবে।[৪৫]

মুসলমানদের শাসনামলে হিন্দুরাও রাজ দরবারে সরকারি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার জন্য যথারীতি আরবি-ফার্সি, উর্দু ভাষার চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিল। আকরম খাঁ'র ভাষায় :

বহু শতাব্দীব্যাপী পরাধীনতার কল্যাণে তাঁদের মনোবৃত্তি সময়োচিত সুবিধাবাদের অধিকতর উপযোগী হইয়াছিল। তাই ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তারা লেগে গেলেন নতুন মনিবদের হালচাল, কায়দা-কানুন, শিক্ষা-সভ্যতার অনুসরণে।[৪৬]

হিন্দু সমাজ ইংরেজি ভাষার চর্চায় আত্মনিয়োগ করার ফলে যথেষ্ট লাভ হ'লো। মুসলমানগণ তখনও এ নতুন পরিস্থিতিকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। ফলে তাঁরা অনেক পিছিয়ে পড়েন। অবশ্য এর বিশেষ কারণ হিসেবে বলা যায় :

১. মুসলমানগণ মনে করলো, বিধর্মী ইংরেজরা তাদেরকে সব কিছু থেকে বঞ্চিত করেছে এবং তাদের ভাষা গ্রহণ করানো নীতিগতভাবে অপছন্দ করেন।
২. একই সময় কিছুসংখ্যক রক্ষণশীল মুসলমান ইংরেজিকে বিধর্মী ও নাসারাদের ভাষা মনে করে তা শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারেনি।
৩. ইংরেজি রাষ্ট্র ভাষা হওয়ার কারণে এর ব্যবহার ও চর্চায় ব্যাপকতা লাভ করে। এ প্রয়োজনের তাগিদেই প্রতিষ্ঠিত হয় কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। শাসনকার্যে প্রয়োজনে বিভিন্ন পর্যায়ের বেতনভোগী ইংরেজী শিক্ষিত কর্মচারীর খুবই দরকার ছিল। এ অবস্থায় হিন্দু সম্প্রদায় সবশেষে লাভবান হয়। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তাদের আরও সুযোগ হয়।[৪৭]

প্রতিষ্ঠালগ্নে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মোটামুটি অসাম্প্রদায়িকই ছিল। কিন্তু কালক্রমে পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে এসে শিক্ষিত হিন্দু সমাজ তথাকথিত জাতীয়তাবাদে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। আত্মবিস্মৃত মুসলিম সম্প্রদায় তখনও পূর্ব পুরুষদের শান-শওকতের খোশ খেয়ালেই মত্ত। প্রতিকারের প্রচেষ্টা মোটেই করা হলো না। তাই কলেজ স্কয়ারের এলাকা হতে মুসলিম সংস্কৃতির নির্বাসনের জন্য করা হলো আট-ঘাট বাঁধা বিধিগুলো। এভাবে মুসলমানগণ সর্বক্ষেত্রেই পিছিয়ে থাকে। তাদের গুরুত্বও তেমন থাকলো না।

এ একদেশদর্শী ব্যবস্থার কল্যাণে সমগ্র দেশে শোচনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। শিক্ষিত হিন্দু সমস্ত বঞ্চিত মুসলিম সংস্কৃতির সত্যিকার পরিচয় থেকে যতটুকু পরিচয় লাভের সুযোগ তারা পাচ্ছে, তাও অবিকৃত নয়। মুসলমান শিক্ষিতরাও ইসলাম-বিরুদ্ধ বিষয়বস্তুর প্রাচুর্যে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। কেনই-বা হবে না? নিজস্ব কৃতিবিহীন বা বঞ্চিত সমাজ জীবন্মৃত সমাজেরই নামান্তর। মুসলমানরা সে শোচনীয় অবস্থায় পর্যবসিত হতে নারাজ কেন, ইতিহাস তার উজ্জ্বল প্রমাণ।

উল্লেখ্য, যৌবনকালই জ্ঞানার্জনের প্রকৃষ্ট সময়, যৌবনের শিক্ষা বা কুশিক্ষার প্রভাব হ'তে মুক্তি লাভ সহজ নয়। যুবক-যুবতীরাই দেশের ভবিষ্যত। তাদের কর্মকাণ্ডে সুখ-

---

৪৫. মাসিক মুহাম্মদি, ইউনিভার্সিটি সংখ্যা, ১৩৪৩, জৈষ্ঠ সংখ্যা।
৪৬. প্রাগুক্ত।
৪৭. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

দুঃখ, উন্নতি-অবনতি নির্ভরশীল। বাংলাদেশ হিন্দু মুসলমানের স্থায়ী মাতৃভূমি। সুখে-দুঃখে, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় পরস্পর পাশাপাশি বসবাস করে আসছে শত শত বছর ধরে। একথা সত্য যে, মুসলমান-হিন্দু আজও পরস্পরকে তেমনভাবে চিনতে পারে নি এবং সত্যিকার পরিচয়ও সশ্রদ্ধ মনোভাবের অভাবেই দেশের সর্বত্র আজ সন্দেহ, অবিশ্বাস, কোন্দল-কোলাহলের তাণ্ডবলীলা বিরাজমান। দেশের এ শোচনীয় পরিস্থিতির জন্য আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাই দায়ী। দেশের সত্যিকার কল্যাণকামী নিরপেক্ষ ব্যক্তিত্বই তা স্বীকার করতে বাধ্য।

মাওলানা আকরম খাঁ উপরোক্ত সত্যকে উপলব্ধি করার জন্য কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে স্মরণ করিয়ে বলেন :

> কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের একথাটা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার ও বাঞ্ছনীয়। অতীতে এ সুন্দর নীতি রক্ষিত হয় নাই। ফলে আজ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের তথাকথিত আলোকপ্রাপ্ত অন্তর সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বিষে বিষিয়ে ওঠেছে। নূতনতর, সুন্দরতর বাংলার তোরণ-দ্বারে দাঁড়িয়ে অতীতের ভুল-ত্রুটি সংশোধনের জন্যই আজ উদ্বুদ্ধ মুসলিম সম্প্রদায় তাঁদের অগ্রগামী প্রতিবেশী হিন্দুদিগকে আহ্বান জানাচ্ছে। মুসলমান চায়, তাদের ন্যায্য প্রাপ্য–অন্যায়ের প্রতিকার; তার বেশী কিছু নয়। স্বার্থের সংঘাত সাংঘাতিক জিনিস হতে পারে, কিন্তু স্বার্থের খাতিরে একটা জীবন্ত জাতিকে কোনঠাসা করে রাখা যেমনি অন্যায়, তেমনি অসম্ভব। এ মোটা কথাটা মনে রেখে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনের প্রচেষ্টা হলেই সকল বিসম্বাদের অবসান হতে পারে। নতুবা এ কৃষ্টিগত কোন্দলের পরিণাম কোথায়, কে জানে?[৪৮]

মুসলমান নবাব-বাদশাহদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং হিন্দু কবি, সাহিত্যিক ও ধর্মীয় পুরোহিতদের প্রচেষ্টায় পৌত্তলিক পরিবেশ সৃষ্টিহয়েছিল। এর অনিবার্য পরিণতি হিসেবে বাংলার মুসলমানরা হিন্দুদের দেব-দেবীর প্রতি ক্রমান্বয়ে আকৃষ্ট ও বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। বৌদ্ধ সমাজের ক্ষতিকর সংস্কার, বিশ্বাস, রীতিনীতি এবং তাদের প্রেমলীলা ও অবাধ যৌন আচরণ তদানীন্তন হিন্দু বাংলায় ব্যাপক প্রসার লাভ করে। ফলে একদিকে নিত্য-নতুন দেব-দেবীর জন্ম, অপরদিকে প্রাচীন দেব-দেবীর অবতারের আবির্ভাব ঘটতে থাকে। ঠিক এ সময়েই আমাদের মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের প্রায় সকলেই হিন্দু কবিদেরকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে। হিন্দুদের দেব-দেবীর স্তুতিমূলক পদাবলী, হিন্দুদের কল্পিত স্রষ্টার প্রণয়লীলা ও যৌন আবেদনমূলক কীর্তন, ভাসান সঙ্গীত, দুর্গা ও গঙ্গার স্তোত্র এবং হিন্দুদের পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে অনেক পুঁথি-পুস্তক রচনা করেন। ইতিহাস সন্ধানে দেখা যায়, বাংলার নাথ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা গোরক্ষনাথ[৪৯] শৈব ধর্মের ছদ্মাবরণে বৌদ্ধ ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। তুর্কি বীর জাফর খান[৫০] প্রথমে

---

৪৮. প্রাগুক্ত।

৪৯. গোরক্ষনাথ ১১ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন, কোলকাতার কালী মন্দির এই গোরক্ষনাথই প্রতিষ্ঠা করেন।
মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, ১৯৬৫, পৃ. ৮১।

৫০. জাফর খাঁ, পরগনার শাসনকর্তা ছিলেন।
প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

ঘোর হিন্দু-বিদ্বেষী ছিলেন। কিন্তু ধর্মের প্রতি তিনি এতই আকৃষ্ট হয়ে পড়েন যে, সংস্কৃত ভাষায় 'গঙ্গা স্তোত্র' রচনা করে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন।

> বাংলায় সেন বংশীয় রাজাদের রাজত্বকালে কনৌজ দেশীয় ব্রাহ্মণেরা এদেশে আগমন করেন। এদের প্রভাব-প্রতিপত্তির ফলে বাংলার উচ্চবর্ণের হিন্দুরা এখানকার সাধারণ শ্রেণির লোক হতে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায়। যে অন্যায়-উৎপীড়নের ফলে ভারত হতে বৌদ্ধ ধর্মের নাম-নিশানা মুছে যায়। এ উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের প্রভাবে সেন রাজাদের যুগে তা মারাত্মক আকার ধারণ করে। এ সময়ের বৌদ্ধ মতাবলম্বীরা 'নাথ' মতবাদের ছদ্মাবরণে নিজেদের আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছিলেন। এ উদ্দেশ্যকে ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে বুদ্ধকে 'ধর্ম ঠাকুর' এ হিন্দুয়ানী নামে আখ্যায়িত করতে শুরু করেন। তাঁরা তাদের আসল নামও বিলীন করে ফেলে। নিজেদেরকে 'সদ্ধর্মী' নামে আখ্যায়িত করে এবং হিন্দুদের নামের উপাধি দেয় 'পাষণ্ডী'। এ ধরনের বক্তব্যকে সমর্থন করে 'শূন্য পুরাণে' লেখা হয়েছে : বৈদিক ব্রাহ্মণগণ সদ্ধর্মীদের নিকট তাদের সামর্থ্যের অধিক অর্থ দাবী করে, কিন্তু তাদের দাবী পূরণ না হলে তারা তাদের ঘর-বাড়ী ও সম্পদ জ্বালিয়ে দিয়ে অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে তাদের জীবন বিপন্ন করে তোলে। অসহায় অবস্থায় বৌদ্ধরা তাদের রক্ষা করার জন্য 'ধর্ম ঠাকুরের' নিকট প্রার্থনা জানায় :
>
> 'হিন্দুরা বলিষ্ঠ হইল বড়, দশ বিশ হৈয়া জড়
> সদ্ধর্মীরে করায় বিনাশ।
> বেদে করে উচ্চারণ, বেব্যা অগ্নি ঘনে ঘন
> দেখিআ সবাই কম্পমান।
> মনেতে পাইয়া মৰ্ম্ম, সভে বোলে রাখ ধর্ম্ম,
> তোমা বিনে কে করে পরিত্তান।'[৫১]

"Early History of India-এর মতে, ৬০০ খ্রি. থেকে ৬৪৭ খ্রি. পর্যন্ত মধ্য বাংলায় শিবভক্ত রাজা শশাঙ্ক বাংলা থেকে বৌদ্ধধর্মকে উৎখাত করার কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। বোধগয়ায় অবস্থিত যে পবিত্র বোধিবৃক্ষের উপর সম্রাট অশোক ঢেলে দিয়েছিলেন অপরিমেয় শ্রদ্ধা গোড়া পর্যন্ত খনন করে তা পুড়িয়ে দিয়েছিলেন রাজা শশাঙ্ক, পাটালিপুত্রে বুদ্ধের চরণচিহ্ন শোভিত সেই পবিত্র প্রস্তর ভেঙ্গে দিয়েছিলেন তিনি। বৌদ্ধদের মঠগুলি ধ্বংস করে দিয়ে মঠ-সন্ন্যাসীদের বিতাড়িত করে দিয়েছিলেন চারদিকে। গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান নেপালের পাদদেশ পর্যন্ত রাজা শশাঙ্ক চালিয়েছিলেন তাঁর বৌদ্ধ-নিধন কার্যক্রম। এ-তো ধর্মান্ধ হিন্দু রাজা শশাঙ্কের স্বরূপ।[৫২]

বাংলায় ইসলাম বিস্তার ও সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে মুসলমানদের উত্তরণের কারণ সম্পর্কে ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেন:

> প্রথম যুগে তুর্কী সেনাগণ ও ধর্মান্তরিত নিম্ন শ্রেণির হিন্দুদিগকে লইয়াই বাংলার মুসলমান সমাজ গঠিত হয়। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বাহির হইতে উচ্চ শ্রেণির মুসলমানও আসিয়া বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করে। ... বোখারা সমরকন্দ প্রভৃতি ইসলামি সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র হইতে পলাতকেরা দলে দলে ভারতে

৫১. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২।
৫২. এস, এ সিদ্দিকী, বার-এট-ল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩।

www.pathagar.com

> আশ্রয় গ্রহণ করে এবং পরে তাহাদের অনেকে বাংলাদেশে বসতি স্থাপন করে ... পরবর্তীকালে দিল্লীতে বিভিন্ন তুর্কী রাজবংশের উত্থান ও পতনের ফলে বিতাড়িত অনেক তুর্কী সম্ভ্রান্ত লোক বাংলায় আশ্রয় লইলেন। বাংলায় মুঘল রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলমান রাজকর্মচারী রূপেও বাংলায় আসিতেন ... এ রূপে কালক্রমে বহু পণ্ডিত ও উচ্চ শ্রেণির মুসলমান বাংলায় আসিলেন। সুফি ও দরবেশ নামে পরিচিত একটি মুসলমান পীর বা ফকীর সম্প্রদায়ের চেষ্টাই বাঙালি মুসলমানদের উন্নত ধর্মভাব ও সংখ্যাবৃদ্ধি সম্ভব হইয়াছিল। ... তাহাদের দৃষ্টান্তে ও উপদেশে অনেক হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিত। ... আবার পীর ও দরবেশ সুফীরা অনেক সময় হিন্দু রাজ্য জয় করিবার জন্যও যুদ্ধ করিতেন। ... ধর্ম প্রচার ও অস্ত্র চালনা-এ দুই উপায়ে বাংলার মুসলমান রাজ্যও ইসলাম ধর্মের বিস্তারে তাহারা সহায়তা করিতেন।[৫৩]

ড. আরনল্ড-এর ভাষায় :

> ইসলামে জাতিভেদের বালাই নেই, আর এ জন্যেই অগণিত হিন্দু স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণে আকৃষ্ট হয়েছিল। ভারতীয় বহু লক্ষ মুসলমানের ধর্মান্তর গ্রহণে বল প্রয়োগের কারণ ছিল না। শান্তিপ্রিয় প্রচারকদের শিক্ষায় তারা সহজে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি, ইসলাম প্রচারের সর্বাপেক্ষা স্থায়ী ও ফলপ্রসূ বিজয় হয়েছে সেই সময়েও সে-সব ক্ষেত্রে যখন মুসলিম রাষ্ট্রীয় শক্তি দুর্বল ছিল ও যেখানে রাজশক্তির প্রভাব অনুভূত হয়নি যেমন দক্ষিণ ভারতে ও পূর্ব বাংলায়। বাংলাদেশেই মুসলিম ধর্ম প্রচারকরা সর্বাপেক্ষা বেশী সফলকাম হয়েছিলেন ধর্মান্তরিত বিপুল সংখ্যার দিক দিয়ে। বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারক্ষেত্রে কোনো সুসংবদ্ধ শক্তিশালী অন্য ধর্মের মোকাবেলায় পড়েনি। উত্তর-পশ্চিম ভারতে সদ্য বৌদ্ধ ধর্মের উৎখাতকারী শক্তিশালী ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল ইসলামকে; কিন্তু বাংলাদেশে মুসলমান ধর্ম প্রচারককে দু'বাহু বাড়িয়ে অভিনন্দন জানিয়েছিল জাতিত্বের জাঁতাকলে নিষ্পেষিত হিন্দুরা। এভাবে ইসলাম বিনা বাধায় এমনকি সাদর আহবানে অভিনন্দিত হয়ে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভারতের সর্বাপেক্ষা উর্বর ও জনবহুল প্রদেশে। এখানের ব্রাহ্মণ ধর্মের ধারক ও বাহক উচ্চ বর্ণের হিন্দুর উৎপীড়ন, অবজ্ঞা অমানবিক ব্যবহারে উত্ত্যক্ত সাধারণ হিন্দুরা সাম্য ও মৈত্রীর একটা মহৎ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করলো ইসলাম অনুসারীদের মধ্যে; এতে একটা মহৎ ঐশীবাদেরও সন্ধান পেয়েছিল তারা। একটা জীবন্ত ও প্রাণবন্ত নয়া সমাজ ব্যবস্থারও সাক্ষাৎ লাভ করেছিল।[৫৪]

ব্রাহ্মণদের নির্যাতন, অত্যাচার ও উৎপীড়নের ফলে অতিষ্ঠ হয়ে নিস্কৃতি লাভের লক্ষ্যে সে সময় অনেক নিগৃহীত, নির্যাতিত হিন্দুও ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। এ ধর্মান্তরকরণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। দুর্ভাগ্যক্রমে এদেশে ইসলাম আগমনের 'মধ্য যুগ' বলে কথিত ইসলামবিরোধী কার্যকলাপ মুসলিম জনসাধারণকে এমন পর্যায়ে নিয়েছিল যে, হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায় হতে ধর্মান্তরিত নও-মুসলিমদের

---

৫৩. বাংলাদেশের ইতিহাস- মধ্য যুগ, পৃ. ২৪৫-৪৭।
সহঃ দ্রঃ এস, এ সিদ্দিকী, বার-এট-ল, ভুলে যাওয়া ইতিহাস, ঢাকা ১৯৭৫, পৃ. ৫।

৫৪. ড. আরনল্ড, Preaching of Islam, Chapter ix.
সহঃ দ্রঃ এস, এ সিদ্দিকী, বার-এট-ল, ভুলে যাওয়া ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।

www.pathagar.com

পক্ষে ইসলামের সঠিক আদর্শের সাথে পরিচিত হওয়ার কোনো সুযোগই ছিল না। অরবিন্দ পোদ্দারের ভাষায় :

> ধর্ম ও ভাবজগতে মুসলমানরা বৈপ্লবিক আদর্শ আনয়ন করলেও এ কথা এখানে পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত যে, মধ্য যুগেও ধর্মের কলহ-বিরোধ চলেছিল সমাজ জীবনে; আর প্রায়শই তা রূপ পরিগ্রহ করতো প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের, আমির ওমরাহের যুদ্ধ-বিগ্রহের চেয়ে ধর্ম বিরোধের প্রভাব তুলনায় নগণ্য বা অল্প ছিল না, ছিল অধিকতর ব্যাপক ও অর্থবহ।[৫৫]

এমতাবস্থায় কখনও সরাসরি, কখনও আরবি, ফার্সি নামের আবরণে তারা হিন্দু ও বৌদ্ধদের দেব-দেবী এবং কুসংস্কারাদিকে তাদের সম্মুখে উপস্থাপন করতে দেখতে পায়। পুনরায় তারা এগুলোকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। সবচে ক্ষতিকারক হয়েছে নবাব বাদশাহগণের প্রচারিত 'বাংলা-সাহিত্য'। তারা সাহিত্যের মাধ্যমে যে-সব মারাত্মক মত ও বিশ্বাস প্রচার করেন তা মুসলমানদের দ্বিধাহীনভাবে পুরাতন হিন্দু প্রতিমা পূজা, ক্ষতিকর ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং যৌন উচ্ছৃঙখলতাকে বরণ করে নেওয়ার জন্যই প্রস্তুত করে তোলে।[৫৬]

মুসলিম বঙ্গের ধর্মীয় ও তমদ্দুনিক অধঃপতনের ইতিহাস

মুসলিম বাংলার পতন যুগের ইতিহাস পাঠ করলে 'কালা ও গঙ্গা'র স্তোত্র এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা বিষয়ক গীত রচনা করেছেন এরূপ বহু সৈয়দ, মীর্জা ও পাঠান কবির সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। বাদশাহ আকবর কর্তৃক উত্তর-পশ্চিম ভারত হতে স্থানান্তরিত এক দল বিদ্রোহী পির ও ফকিরের আগমনের সময় অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে ওঠেছিল। মুসলিম জনসাধারণ কিভাবে প্রত্যক্ষভাবে হিন্দুদের দেব-দেবীকে গ্রহণ করেছিল, সে সম্পর্কে বিভিন্ন পুঁথি-পুস্তিকার বরাত দিয়ে দীনেশ চন্দ্র বলেন :

> হিন্দু দেবী গঙ্গাকে গাদীর মাসীরূপে উল্লেখ করা হয়েছে।[৫৭]

'জেবুল মুলক শামারুখ' কাব্যে দেখা যায় যে, মুসলিম কবি হিন্দুদের দেবীগণকে মুসলমানের পির রূপে অঙ্কিত করতে প্রয়াস পেয়েছে।

এ প্রসঙ্গে মাওলানা আকরম খাঁ তাঁর 'মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থে আমাদের কিছু সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীর উদাহরণ তুলে ধরে লিখেছেন :

> প্রখ্যাত সাহিত্যিক ড. মুহাম্মদ এনামুল হক ও মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য' নামক একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। ইহার ভূমিকায় ড. দীনেশচন্দ্র সেন সাহিত্যবিশারদকে দ্রোণাচার্য্য এবং ডক্টর ছাহেবকে অর্জুনের সমকক্ষ রূপে উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের তোষামোদ ও কৃতার্থ করিয়াছেন। জনৈক মোহাম্মদ আকবর (জন্ম ১৬৫৭) রচিত একখানা পুঁথিকাব্য সম্পর্কে এ সাহিত্যিক যুগল লিখিয়াছেন, কবি মোহাম্মদ আকবর তাহার কাব্যের প্রারম্ভে যে মঙ্গল চরণার্থ লিখিয়াছেন তাহা বড়ই চমৎকার ও উপভোগ্য। কবি

---

৫৫. অরবিন্দ পোদ্দার, মানব ধর্ম ও মঙ্গল কাজ, মধ্যযুগ, পৃ. ৬২।
সহঃ দ্রঃ এস, এ সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫-৬।

৫৬. মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩।

৫৭. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

তাহার বন্দনায় হিন্দু ও মুসলমান বিশ্বাসের মধ্যে কি কি সমান বস্তু আছে, তাহা নির্দেশ করিতে গিয়া একটি বেশ উপভোগ্য বর্ণনা দান করিয়াছেন :

বিনএ করিআ বন্দি ফিরিস্তার পদ,
ছুন্নি কুলে ফিরিস্তা যে হিন্দুতে নারদ।
তক্ত সিংহাসন বন্দি আল্লাহর দরবারে।
হিন্দু কুলে ঈশ্বর হেন জগতে প্রচারে।
পয়গাম্বর সকলে বন্দি করিয়া ভকতি।
হিন্দু কুলে দেবতা হেন হৈলা প্রকৃতি।
হজরত আদম বন্দি জগতের বাপ।
হিন্দু কুলে অনাদিনর প্রচার প্রতাপ।
মা হাওয়া বন্দম জগত জননী।
হিন্দু কুলে কালী নাম প্রচারে মোহিনী।
হজরত রছূল বন্দি প্রভু নিজ সখা।
হিন্দু কুলে অবতারি চৈতন্য রূপে দেখা।
খোয়াজ খিজির বন্দি জলেত বসতি।
হিন্দু কুলে বাসুদেব মুন্যে যে প্রকৃতি।
আছববা সকলে বন্দি নবির সভাএ।
হিন্দু কুলে দোয়াদশ গোপাল ধেয়াএ।
আওলিয়া আম্বিয়া বন্দি রব্বানি কোরান।
হিন্দু কুলে মুনিভাব আছএ পুরান।
পীর মুর্শিদ বন্দম ওস্তাদ চরণ।
হিন্দু কুলে গুরু যেন করএ পূজন।[৫৮]

এ বন্দনা গীতি এবং এ সম্পর্কে সাহিত্যিক যুগলের মন্তব্য থেকে আলোচ্য সময়ে মুসলিম বাংলা অধঃপতনের কোন চরম সীমায় পৌঁছেছিল এবং মুসলমানদের আকীদা ও ধর্মবিশ্বাসে কি ধরনের গভীর ক্ষতের সৃষ্টিহয়েছিল– তার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। এ বন্দনা গীতিতে মুসলমানের আল্লাহ ও হিন্দুর ঈশ্বর, হিন্দুর কালী ও মুসলমানের হাওয়া, হিন্দুর দ্বাদশ রাখাল ও রাসূলে করিম (স.)-এর আসহাব এবং হিন্দুর পুরাণ ও মুসলমানের কুরআনকে অভিন্ন অথবা সমকক্ষ বস্তুরূপে দেখান হয়েছে। হিন্দু দেবতাকে মুসলমানের নবি বলে অভিহিত করা হয়েছে। শ্রীচৈতন্যকে হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর অবতার বলে প্রচার করা হয়েছে এবং সকল হিন্দু দেব-দেবীর প্রতি পূজা নিবেদন করা হয়েছে।

আশ্চর্যের বিষয়, সময়ের অতি উচ্চ শিক্ষিত দু'জন মুসলমান উল্লিখিত গীতিকে উপভোগ্য বলে এর প্রশংসা করতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেননি। মুসলিম বঙ্গের ধর্মীয় ও তামদ্দুনিক অধঃপতনের এটা অপেক্ষা মারাত্মক পরিণতি আর কি হতে পারে?[৫৯]

৫৮. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।
৫৯. মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫।

www.pathagar.com

উচ্চশিক্ষিত মুসলমান কবি, সাহিত্যিকই শুধু নয়, বাংলার গ্রাম-গঞ্জের দিকে তাকালে দেখা যায়, পল্লী বাংলায় এমন অনেক মুসলিম কবিও রয়েছেন, যারা সর্পদেবী পদ্মা এবং পাতালের সপ্ত কোটি নাগ বা সর্পের রাজা নারায়ণের প্রতিও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন। জনৈক মুসলিম কবি সীতা দেবীকে প্রণাম, জগন্নাথের পূজা এবং হিমালয়ের পূজাও করেছেন।[৬০] এরা হযরত মোহাম্মদ (স.) এবং হযরত আলি (রা.)-সহ মুসলিম মহাপুরুষদের গুণকীর্তন অবশ্যই করেছেন। পির পূজা মক্কা-মদিনাসহ মুসলমানদের পবিত্র স্থানের প্রশংসা করতে গিয়ে তারা হিন্দুদের কাশী বৃন্দাবন ও হিন্দুদের পবিত্র স্থানের পূজা করতেও দ্বিধা করেননি। মুসলিম কবি মুহাম্মদ ইউনুছ রচিত বন্দনা গীতিই এর প্রকৃত প্রমাণ :

পশ্চিমের মূল স্থান মক্কাকে আমি বন্দনা করি।
হিন্দু মুসলমান সককে আমি ছালাম জানাই।
মক্কার পূর্বে ঠাকুর জগন্নাথকে বন্দনা করি।
যেখানে প্রভেদ নাই জাতি ধর্মের
আর বাজারে অন্ন বিক্রয় হয়-
(মক্কার) পূর্বে আমি পুণ্যধাম কাশীকে বন্দনা করি
যেখানে প্রতি ঘরে হরিনাম কীর্তন হয়
প্রতি ঘরের দুয়ারে যেখানে তুলসী-তরু রাখা হয়।
(কাশীর) স্বর্ণলঙ্কা পুলকে আমি বন্দনা করি
আর বন্দনা করি ইন্দ্রজিৎ জননী মন্দোদরীকে।[৬১]

পির-পয়গাম্বর, মুনি-ঋষি ও পবিত্র স্থানের প্রশস্তি করেই কবি-সাহিত্যিকরা ক্ষান্ত হননি। তারা আরও এক ধাপ এগিয়ে স্বয়ং আল্লাহ সম্পর্কেও মন্তব্য করেছেন। 'নূরুন্নেহার ও কবির কথা' নামক গীতি কাব্যের রচয়িতা লিখেছেন :

> বিছমিল্লাহ ও শ্রীবিষ্ণু একই কথা আল্লাহ দুই অংশে বিভক্ত হইয়া রাম ও রহিম হইয়াছেন।[৬২]

হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতিকে এভাবে আদর্শরূপে গ্রহণ করে নিজেদের জীবনও সেভাবে গড়ে তোলার প্রবণতা শুধুমাত্র শিক্ষিত সমাজ ও কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপের সর্বস্তরে সঞ্চারিত ও উত্তরোত্তর প্রসার লাভ করেছিল। এর পরিণতি হিসেবে জলদেবতা বরুণ-পীরবদর, গৌর চন্দ্র চৈতন্য-গোরা চান্দপীরে, ওলাই চন্দ্রী-ওলা বিবিতে, সত্যনারায়ণ সত্যপীরে, লক্ষ্মী দেবী- মা বরকতে রূপান্তরিত হন। এ রূপান্তরিত দেব-দেবী মুসলমানদের নিকট তাদের প্রাপ্য পূজা ও শ্রদ্ধা অব্যাহতভাবেই পেতে থাকে। অনেক খানকাহ ও দরগাহ এখানে মুসলমানদের সুখ-সমৃদ্ধি এবং বিপদ-আপদ হতে উদ্ধার লাভের উপলক্ষ রূপে দীর্ঘকাল তাদের আল্লাহর স্থান দখল করে থাকে। অদ্যাবধি সে স্থানই তারা দখল করে আছে।

---

৬০. প্রাগুক্ত।
৬১. প্রাগুক্ত।
৬২. মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬।

www.pathagar.com

বাংলার মুসলমানের পতন যুগে মুসলিম সমাজ নৈতিক অধঃপতন ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার শোচনীয় স্তরে নেমে যায়। যেমন- মারফতি, ফকির ও মরমিবাদী ভিক্ষুকদের কয়েকটি মত ও বিশ্বাস এ সমস্ত ফকিরের দল বিভিন্ন সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। আউল, বাউল, কর্তা, ভজা ও সহজিয়া ইত্যাদি হিন্দু বৈষ্ণব অথবা চৈতন্য সম্প্রদায়ের মুসলিম সংস্করণ ব্যতীত কিছুই ছিল না। তারা ইসলামের কিরূপ বিকৃতি সাধন করেছে- নিম্নোক্ত উদাহরণের মাধ্যমে তা পরিষ্কার হবে:

১. মদ্যপান ব্যতীত আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত করা সম্ভব নহে, সুতরাং আধ্যাত্মিক সাধনাও ইহা ব্যতীত সম্ভব হয় না। যে ব্যক্তি মদ্যপান ও গাঁজা ইত্যাদি সেবন করে সে অনতিকালের মধ্যেই মারেফতে এলাহী বা আল্লাহর জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয়। আল্লাহর সান্নিধ্য হতে দূরে রাখার জন্যই শয়তান মানুষকে মদ্যপান থেকে নিষেধ করে। এ শয়তানের প্ররোচনাই মুছলিম শাস্ত্রবিদরা শরিয়তী আলেমগণ মদ্যপান এবং অন্যান্য নেশা সেবনকে পাপ বলিয়া ফতোয়া দিতে শুরু করিয়াছেন।[৬৩]

২. বাউলগণ যৌন সঙ্গমকে যৌন পূজা বা প্রকৃতি পূজারূপে জ্ঞান করে। তথাকথিত এ প্রকৃতি পূজায় 'চারিচন্দ্র ভেদ' নামে তাহাদের একটি অনুষ্ঠান রহিয়াছে। বাউলগণ ইহাকে ভক্তি উপাসনার একটি অতি পবিত্র অনুষ্ঠান বলিয়া বিবেচনা করিলেও সাধারণ মানুষের নিকট্ ইহা অতি বীভৎস ও পৈশাচিক বলিয়া মনে হইবে। তাহারা বলে যে, মানুষ এ চারিচন্দ্র বা মনের দেহের নির্য্যাস যথা রক্ত, বীর্য, মল ও মূত্র পিতার অণ্ডকোষ ও মাতার গর্ভ হইতে লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং চারিচন্দ্র বাহিরে নিক্ষেপ না করিয়া পুনরায় দেহে গ্রহণ ও রক্ষা করা কর্তব্য।

   মুছলিম বাউল বা নেড়ার ফকীরগণ এ চারিচন্দ্র ভেদের ন্যায় 'পঞ্চরস সাধন' করিয়া থাকে। ইহাদের নিজস্ব উদ্ভট ও নোংরা ভাষায় এ পঞ্চরসের নাম হইতেছে কালো, সাদা, লাল, হলুদ ও মুর্শিদ বা গুরুর বাক্য। চারিটি বর্ণ মদ্য, শুক্র, রজঃ ও মলের অর্থ জ্ঞাপক। স্বীয় স্ত্রী অথবা পর স্ত্রীর সহিত যৌন সঙ্গম করিয়া এ রস সাধন' রতি সাধন', 'লাল সাধন' ও গুটি সাধন করিতে হইবে। ... এ সমস্ত সাধনের প্রকৃতি এত কদর্য্য ও অশ্লীল যে, আমরা এখানে তাহার কোনো একটির উদাহরণ পর্যন্ত উল্লেখ করিতে লজ্জাবোধ করিতেছি।[৬৪]

৩. কোরআন মজিদের বিভিন্ন শব্দ ও মূলতত্ত্বের যে ব্যাখ্যা এ সমস্ত শয়তান নেড়ার ফকিরের দল দিয়াছে তাহাও অদ্ভুত। তাহাদের মনের মদিনায় কোরানের বিশুদ্ধ ১০ পারা সদা জীবন্ত অবস্থায় বিদ্যমান। এ জন্যেই শরিয়তীদের কোরানের ৩০ পারা তাহারা অনুসরণ করে না। তাহাদের এ শয়তানী মতবাদের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে এছলামের নিষেধ বা

---

৬৩. মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭।
৬৪. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

হারামসমূহকে পুণ্য কর্মরূপে মানিয়া চলা এবং ফরজ বা আদেশসমূহকে পাপরূপে প্রত্যাখ্যান করা।[৬৫]

৪. এ মুছলিম ভিক্ষোপজীবী নেড়ার ফকির দলের পুরোহিত বা পীরেরা হিন্দুদের কল্পিত স্রষ্টা কর্তৃক গোপিনীদের বস্ত্র হরণের অনুরূপ এক অভিনয়ের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। যখন পীর তাহার মুরিদানের গ্রামে তশরিফ আনে তখন গ্রামের সকল যুবতী ও কুমারী উত্তম বসনে সজ্জিতা হইয়া বৃন্দাবনের গোপিনীদের অনুকরণে একটি গৃহকক্ষে পীরের সহিত মিলিত হয়। নাটকের প্রথম অঙ্কে এ সকল স্ত্রীলোক নৃত্য গীত শুরু করে। নিম্নে এ সখীসঙ্গীতের গদ্যরূপ প্রদত্ত হইল :

ও দিদি, যদি শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসিতে চাও
আর আত্মপ্রতারণা না করিয়া শীঘ্র আস
দেখ প্রেমের দেবতা আসিয়াছে
আঁখি তোল, তাহার প্রতি তাকাও
গুরু আসিয়াছে তোমাদের উদ্ধারের জন্য
এমন গুরু কোথাও আর পাইবে না,
হাঁ, গুরুর যাহাতে সুখ
তাহা করিতে লজ্জা করিও না।[৬৬]

গানটি পরিবেশন করার পর যুবতীরা তাদের পরিধেয় গাত্রাবরণ খুলে ফেলে দেয় এবং উলঙ্গ হয়ে ঘুরে ঘুরে আনন্দ নৃত্য করতে থাকে। পীর এখানে হিন্দুদের কল্পিত স্রষ্টার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন এবং হিন্দুদের কল্পিত স্রষ্টা যেমন গোপিনীদের বস্ত্র হরণ করে বৃক্ষে আরোহণ করেছিলেন, তিনি তদ্রূপভাবে ঐ সমস্ত উলঙ্গ নারীর পরিত্যক্ত বস্ত্র নিয়ে গৃহের উঁচু তাকে রক্ষা করেন। এ পীরের যেহেতু বাঁশী নেই, তাই তিনি বাঁশীর বদলে মুখে গান গেয়েই উলঙ্গ নারীদেরকে যৌন উন্মাদনায় উত্তেজিত করে বলেন :

হে যুবতীগণ, তোমাদের মোক্ষের পথ ও ভক্তকুলের পুরোহিতকে অর্ঘ্যস্বরূপ দেহদান কর।[৬৭]

বলা বাহুল্য, কোনোপ্রকার দ্বিধা-সংকোচ না করেই রমণীরা পীরের যৌনক্ষুধা নিবারণ করা ধর্মীয় কর্তব্য বলেই মনে করতো।

৫. এ নেড়ার ফকিরদের আউল, অথবা আওলে আওলিয়া সম্প্রদায় সম্পর্কে বলা হয় যে, তাহারা তাহাদের বিবাহিতা স্ত্রীদের সহিত সীমাবদ্ধ যৌন সঙ্গমকে নিগূঢ় আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধিলাভের পক্ষে যথেষ্ট মনে করে না। তাহাদের যৌন লালসার পূর্ণ পরিতৃপ্তির জন্য প্রকাশ্য ও গোপনে যত অধিক সংখ্যক বীরাঙ্গনা অথবা কুলনারীর সহিত তাহাদের ইচ্ছা ততজনের সহিত যৌন সঙ্গম তাহাদের এ নিগূঢ় সাধন পদ্ধতিতে প্রয়োজন হয়। অতএব তাহাদের স্ত্রীদের সহিত অন্য কোনো পুরুষকে যৌন মিলনে লিপ্ত হইতে দেখিলে তাহারা কোনোরূপ অসন্তোষ অথবা ঈর্ষাবোধ করে না। অন্যদিকে

---

৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮।
৬৬. প্রাগুক্ত।
৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯।

www.pathagar.com

নারী পুরুষ উভয় পক্ষ হইতে এ ধরনের যৌন মিলনে কোনোরূপ ঈর্ষার প্রশ্রয় না দেওয়াকে তাহারা আত্মশুদ্ধি ও আত্মিক উন্নতির জন্য অপরিহার্য্য বিবেচনা করে।[৬৮]

৬. এ ভিক্ষোপজীবী ফকিরগণের 'ইচ্ছা পূরণ ভজন' নামে এক বিশেষ প্রকারের গোপন সাধন রীতি রহিয়াছে। ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহাতে কোনো পুরুষ বা নারী তাহারা নিজেদের বা দলের অপর কাহারো যৌন আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিতে ইতস্ততঃ বা কোনোরূপ লজ্জাবোধ করিবে না। এ উদ্দেশ্যে হতভাগ্য এ ফকির দলের নারী পুরুষ সকল ভক্ত আখড়া নামে একটি বিচ্ছিন্ন স্থানে আসিয়া মিলিত হইয়া নানা দ্রব্য সেবন করে এবং যাহাকে যাহার ইচ্ছা তাহার সহিত যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হইয়া তাহাদের নিগূঢ় সাধনা চালাইয়া যায়। যদি দলের কোনো নারী বা পুরুষ অন্য কোনো পুরুষ বা নারীর যৌন কামনা চরিতার্থ করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে, তাহা হইলে তাহাকে মহাপাপী বলিয়া অভিযুক্ত করা হয়।[৬৯]

তান্ত্রিকদের মাতঙ্গী সম্প্রদায়ের 'মাতরমপি নষ্ট তাজেৎ' সূত্রের ন্যায় এ মুছলিম ফকিরের দলও নিম্নোক্ত সূত্র উদ্ভাবন করে :

> যখন তুমি তোমার পিতার মস্তিষ্কে ছিলে তখন যে নারীকে তুমি 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিতেছ সে নারীর স্বামী ছিলে।[৭০]
>
> একাধারে মাতা ও পত্নীর দৃষ্টান্ত হর-পার্বতীর মধ্যে প্রত্যক্ষ কর। যদিও হর পার্বতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, পার্বতীর স্বামী হন। আদম তাহার নিজ কন্যা বিশ্বজননী হাওয়াকে অপহরণ করেন (এবং তাঁহাকে তাঁহার পত্নীরূপে গ্রহণ করেন) যখন হিন্দুদের কল্পিত স্রষ্টা ষোল সহস্র গোপিনীর সহিত প্রেমলীলা করেন তখন নারী গঙ্গা স্বরূপিনী এবং পুরুষ তাহাতে স্নানার্থী তীর্থযাত্রী। যখন তাহারা সঙ্গমে মিলিত হয় তখন তাহারা এক ও অভিন্ন। গঙ্গা স্নানে কাহারো ইতস্তত করার কারণ নাই।[৭১]

দুঃখের বিষয়, মুসলিম বাংলার অধঃপতনের ইতিহাস বড়ই করুণ। সে ইতিহাস কারো চাপিয়ে দেয়া নয়। বরং স্বোপার্জিত। সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর মুসলিম বাংলা থেকে মুসলমানদের প্রায় শেষ চিহ্নটুকু মুছে ফেলে যে মীর জা'ফর, ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকেও তার লাম্পট্য ছিল অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। কথিত আছে–

> জীবনের অন্তিম মুহূর্তে যখন তাঁর শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয় তখন স্বজন-বান্ধবেরা তাহাকে হিন্দু দেবী কিরীটেশ্বরীর পদোদক (দেবী মূর্তির পদ ধৌত পানি) পান করিতে দেয়।[৭২]

উক্ত ঘটনায় সে সময়কার মুসলমানদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অধঃপতনের স্বরূপ উদঘাটিত হয়।

---

৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯।
৬৯. প্রাগুক্ত।
৭০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০।
৭১. প্রাগুক্ত।
৭২. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

যৌনক্রিয়া, যৌনসম্ভোগ নিঃসন্দেহে আনন্দদায়ক। তবে, এসব যথাস্থানে ও পাত্রে হতে হবে। অবৈধ যৌনসংগম লজ্জা ও ভয় সৃষ্টি করে পাপের ভয়ে ধর্মের কারণে। কিন্তু, ধর্ম যদি স্বয়ং এর অনুমতি দেয় যে, এ কাজ পুণ্যের, এতেই মুক্তি, এক শ্রেণির ভক্ত প্রতারক লোক ধর্মের নামে মানুষকে কূটকৌশলের মাধ্যমে বিপথগামী করছে। উপরোক্ত আলোচনায় তার প্রমাণ মেলে। অবশ্য একথাও সত্য, উপরোক্ত ধর্মীয় অন্ধত্ব যতটুকু ক্ষতি না করেছে, তার চেয়ে ঢের বেশি করেছে পৌত্তলিক মতবাদ।

তৎকালীন মুসলিম শাসকদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন ছিল পৌত্তলিক মতবাদের প্রতি। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এসবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ (রহঃ)-এর ইসলামি আন্দোলন।[৭৩] ইংরেজরা মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে কটাক্ষ করে নাম দিয়েছিল ওহাবি আন্দোলন।'[৭৪]

---

৭৩. সাইয়োদ আহমদ শহীদ (১৭৮৬-১৮৩১) ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম-চতুর্থাংশে ভারতীয় ইসলামি আন্দোলনের সংগ্রামী নেতা। বেরীলিতে তাঁর জন্ম। অতঃপর দিল্লীর শাহ্ আবদুল কাদেরের নিকট ফার্সি ও আরবি শিক্ষা লাভ করেন। আরবের ওহাবি মতের সাথে তাঁর মতের অনেকটা মিল ছিল। ওহাবিদের মত তিনিও কুসংস্কার ও পির-পয়গাম্বরের অতিভক্তি থেকে খাঁটি ইসলাম ধর্ম পালনের শিক্ষা দিতেন। শীঘ্র তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। অগণিত মুসলমান তাঁর মতাবলম্বী হন। পাঞ্জাবের মুসলমানদের প্রতি শিখদের অবিচার-অত্যাচার আরম্ভ হলে তিনি শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে মনস্থ করেন। ১৮২১ সালে প্রায় ১ হাজার সঙ্গী নিয়ে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হন। হজ্ব করে তিন বছর পর ১৮২৪-এ দেশে ফিরেন। তাঁর পত্রাবলী থেকে জানা যায়, তিনি বৃটিশ শক্তিকে বিতাড়িত করে হিন্দু মুসলিম শক্তির সমন্বয়ে ভারতে একটি ইসলামি ফেডারেশন গঠন করতে চেয়েছিলেন। তাঁর প্রাথমিক লক্ষ্য হয় পাঞ্জাব থেকে শিখদের বহিষ্কার করা। ১৮২৬-এ মুজাহিদদের বিরাট বাহিনী নিয়ে তিনি রাজপুতনা, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, কান্দাহার ও কাবুল হয়ে ইউসুফযাই-এর এলাকায় প্রবেশ করেন। আকোবার যুদ্ধে শিখরা মুজাহিদদের হাতে প্রথমবার পরাজিত হন। ১৮৩০-এ মুজাহিদরা পেশোয়ার দখল করেন। কিন্তু রণজিৎ সিং সৈন্য পাঠাতে থাকেন এবং গুপ্তচরের মাধ্যমে কোন কোন পাঠান সরদারকে ঘুষ দিয়ে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে দাঁড় করান। স্থানীয় খানদের বিশ্বাসঘাতকতায় নিরুৎসাহ হয়ে সৈয়দ আহমদ কাশ্মীরে জিহাদ-কেন্দ্র পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে মনস্থ করেন। কাশ্মীরের পথে তিনি শিখ বাহিনী কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হন এবং বালাকোটের যুদ্ধে তিনি এবং শাহ মুহাম্মদ ইসমাঈল অধিকাংশ মুজাহিদদের সাথে শহীদ হয়।
বাংলা বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৫৬-৫৭।
উর্দু ইনসাইক্লোপিডিয়া, পৃ. ৯৪২।
ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১।

৭৪. ওহাবি, ওয়াহহাবি নজদের মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাবের (১৭০৩-১৭৮৭) মতবাদের অনুসারী মুসলমানদের একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়। এই নাম তাঁদের মতবাদবিরোধী তুর্কী শাসক ও ইউরোপীয় লোকদেরই দেওয়া। ওয়াহহাবিরা 'মুওয়াহহিদীন' (তওহিদবাদি) বলে নিজেদের পরিচয় দেন, বিশ্বাসের দিক থেকে তারা পাক্কা সুন্নি এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও ইমাম ইবনে তাইমিয়ার অনুসারী। তাঁরা বিদআতের কঠোর বিরোধী। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো সম্মান করা শির্ক। তাই কারও মাযারের সম্মান করাও তাদের মতে শির্ক। এই মতবাদে আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানাদি পালন, বিলাসী জীবন যাপন ইত্যাদি অনাবশ্যক বিষয় বর্জনের তাকিদ রয়েছে। দোয়া করতে গিয়ে কোন পয়গাম্বর বা বুযুর্গের নামকে ওসিলা (মধ্যসূত্র) রূপে গ্রহণ করাও তাঁদের মতে এক ধরনের শিরক। কুরআন ও হাদিসের পরোক্ষ অর্থ গ্রহণ করাকে তাঁরা গুনাহ মনে করেন। ওয়াহহাবি মত মূলত আরব দেশীয় হলেও ওয়াহহাবি আন্দোলনের প্রভাব ভারতেও প্রবেশ করে। সৈয়দ আহমদ শহীদের মতবাদ এবং আরবের ওয়াহহাবিদের মধ্যে অনেক সামঞ্জস্য ছিল। তাই, সৈয়দ আহমদ শহীদের কোন কোন ভক্তও আরবের ওয়াহহাবি মতে

www.pathagar.com

শহীদ তিতুমীর, হাজী শরীয়তুল্লাহ, শাহ্ ইসমাইল- এঁরা এসব গোমরাহীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন; তথাপি ওসব অন্ধত্ব ও পথভ্রষ্টতার বিষক্রিয়া বিংশ শতাব্দীর কয়েক দশক পর্যন্ত মুসলিম সমাজের একটা অংশকে জর্জরিত করে রেখেছিল। ১৯১১ সালের আদমশুমারির রিপোর্ট তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ রিপোর্টে বলা হয় :

লোক গণনার সময় এমন কিছু সম্প্রদার পাওয়া গেছে, যারা নিজেরা স্বীকারোক্তি করেছে যে, তারা হিন্দুও নয় এবং মুসলমানও নয়; বরঞ্চ উভয়ের সংমিশ্রণ।[৭৫]

আত্মবিস্মৃতির ও হীন মানসিকতার এ ধরনের আইয়ামে জাহেলিয়াত' নেমে এসেছিল সে সময় এমনকি, মুসলিম পরিবারে জলগ্রহণ করাকেও আমাদের কোনো কোনো কবি প্রকাশ্যভাবে নিন্দা করে অনুশোচনা করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি। ভক্ত কবি লাল মামুদ তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি বৈষ্ণব বাদের প্রতি এতটা বিশ্বাসী হয়ে পড়েন যে, একটি বটবৃক্ষ মূলে তুলসী বৃক্ষ রেখে রীতিমত পূজা-অর্চনা করতে থাকেন। গোস্বামী প্রভু লালুর আশ্রমে উপস্থিতির দিন নিম্নোক্ত গান গেয়ে প্রভুকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন :

দয়াল হরি কৈ আমার–
আমি পড়েছি তার কারাগারে, আমার কে করে উদ্ধার।
ষড় রিপুর জ্বালা প্রাণে, সহ্য হয় না আর
শত দোষের দোষী বলে জন্ম দিলে যবন কুলে
বিফলে গেল দিন আমার;
আমি কুলধর্মে পরম ধর্ম বলে, যত করলাম কদাচার।
যদিও তুমি আল্লা খোদা, তুমি লক্ষ্মী, তুমি সারোদা,
স্বত্ব রজঃ ত্রিগুণের আধার-
তবু হবে কৃষ্ঞ বলে ডাকতে প্রাণ কাঁদে আমার
মনের খেদে বলতেছি এবার
হরি বলে প্রাণ যায় যেন আমার।[৭৬]

লালন শাহের কয়েকটি গান নিম্নে প্রদত্ত হলো :

প্রভাবান্বিত হন। বৃটিশ শাসকগণ সৈয়দ আহমদ শহীদের অনুবর্তীদের দুরভিসন্ধিমূলকভাবে ওয়াহহাবিরূপে আখ্যায়িত করেন। সক্রিয় ওয়াহহাবি আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটলে (১৮৬৮) এবং তা সরকারের দৃষ্টিতে গর্হিত বলে বিবেচিত হলে ভারতের তথাকথিত ওয়াহহাবিগণ নিজেদের আহলে হাদিস' নামে আখ্যায়িত করতে আরম্ভ করেন। আহলে হাদিসদের মধ্যেই ওয়াহহাবি মত ভারতীয় উপমহাদেশে এখনো বিক্ষিপ্তভাবে পরিলক্ষিত হয়। দেওবন্দের উলামাকেও সাধারণত ওয়াহহাবি মনে করা হয়।
বাংলা বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, ঢাকা. ১৯৭১, পৃ. ৪৮৪।
দায়েরায়ে মাআরেফে ইসলামিয়া, উর্দু ইনসাইক্লোপিডিয়া, লাহোর, ১৯৬২, পৃ. ১৫৬১-৬২।
মঈনুদ্দীন আহমদ খান, মুসলিম ধর্ম সংস্কার আন্দোলন, পৃ. ২৪০-৪১ দ্রঃ।
বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), ৩য় খণ্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা।
আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ, ড. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

৭৫. Census of India Report- 1911 A.D.
আব্বাস আলী খান, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, ঢাক-১৯৯৪, পৃ. ৬৮।

৭৬. মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২।

www.pathagar.com

পার কর চাঁদ গৌর আমায়–বেলা ডুবিল,
আমার হেলায় হেলায় অবহেলায় দিন তো বয়ে গেল।
আছে ভব-নদীর পাড়ি
নিতাই চাঁদ কাণ্ডারী
কূলে বই সে বোধন করি
....
ও চাঁদ গৌর যদি পাই, ও চাঁদ গউর হে,
কূলে দিয়ে ছাই-
ফকির লালন বলে-শ্রী চরণের দাসী হইব।[৭৭]

কবি লাল মামুদ আক্ষেপ করে বলেন, মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করে তাঁর জীবন ধ্বংস হয়েছে। লালন শাহ আকাঙ্ক্ষার সুরে বলেন, গৌর নিতাইকে পেলে মুসলমানী ত্যাগ করে তার শ্রীচরণের সেবায় রত হতেন।

লালন শাহের কৃষ্ঞপ্রেম সম্পর্কীয় গান দেখা যাক :

কৃষ্ঞপ্রেম করব বলে ঘুরে বেড়াই জনম ভরে
সে প্রেম করবো বলে ষোলখানা
এক রতির সাধ মিটল নারে,
রাধা রাণীর ঋণের দায়,
গৌর এসেছে নদীয়ায়,
বৃন্দাবনের কানাই আর বলাই-
নৈদে এসে নাম ধরেছে গৌর আর নিতাই।[৭৮]

মুসলিম সমাজের এক শ্রেণির লোক এ লালন শাহের মতবাদকেই মুসলিম সঞ্জীবিত রাখার চেষ্টায় আছেন।

মুসলিম সমাজের অধঃপতনের কারণ বর্ণনা করে ঐতিহাসিকগণ বলেন :

> পৃথিবীর অন্যান্য বিজয়ী জাতিসমূহ যেমন বিজিত জাতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে তেমন ভারতীয় মুসলমানগণ বিজিত হিন্দু জাতি দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। আচার-আচরণ জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি এমনকি বিশ্বাসের দিক দিয়েও এ প্রভাব এখনো সুস্পষ্ট। ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া গোটা মুসলিম শাসন আমলে চলছে। বিভিন্ন সময়ে এ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার বেগ মুসলিম শাসকদের উদারনীতির ফলে বর্ধিত হয়েছে, তার ফলস্বরূপ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতে ইসলাম এমন এক রূপ ধারণ করে–যার জন্য ইসলামি আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেছে। ভারতীয় মুসলমানগণ বিশেষ করে বাংলা ও বিহারের মুসলমান তাঁদের ধর্মবিশ্বাসের সাথে এমন সব কুফুরী আচার-আচরণ অবলম্বন করেছে, যা ছিল অন্যান্য দেশের মুসলমানদের মধ্যে বিরল। বাংলা-বিহারে

---

৭৭. মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪।
৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫।

www.pathagar.com

মুসলমানদের সংখ্যা ছিল যেমন বিরাট, তাদের রীতিনীতি ও আচার-আচরণও ছিল তেমনি ধর্মহীন ও নীতি-বিগর্হিত।[৭৯]

ষোড়শ শতাব্দী থেকে আদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার চিত্র উপরে বর্ণনা করা হলো। বাংলার মুসলমানরা যখন এমনি কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ তখন ভেতর ও বাইরে থেকে যে অপশক্তি তাদেরকে পরাভূত ও নিশ্চিহ্ন করার জন্য সাঁড়াশি আক্রমণ চালায়, সে আক্রমণকে প্রতিহত করার মত তাঁদের সেই ঈমানী শক্তি ছিল না। কারণ, এতদঞ্চলের মুসলমানদের বিপর্যয়ের জন্য ভারতে মোগলদের প্রতিষ্ঠা, বিশেষত আকবরের অভ্যুদয়ই দায়ী।

> নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ও বাংলার পতন কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। প্রকৃতপক্ষে, মোগল সাম্রাজ্যের পতন গোটা উপমহাদেশের মুসলিম শাসনের পতন ডেকে আনে।
>
> ১৭০৭ সালে বাদশাহ আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর থেকে ১৭৫৭ সালে সংঘটিত পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত পঞ্চাশ বছরে দিল্লীর সিংহাসনে কমপক্ষে সাতজন আরোহণ করেন। তাঁদের মধ্যে পতনোন্মুখ সাম্রাজ্যকে রক্ষা করার মতো তেমন যোগ্যতাসম্পন্ন কেউ ছিলেন না। অবশ্য, কোনো কোনো ঐতিহাসিক আওরঙ্গজেবকে মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের জন্য দায়ী করেন। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ইতিহাস পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যে ধ্বংসের বীজ বহু পূর্বেই স্বয়ং বাদশাহ আকবর কর্তৃক বপন করা হয়েছিল। তা-ই ধীরে ধীরে একটি বিরাট-বিশাল মহীরূহের আকার ধারণ করেছিল। আওরঙ্গজেব জীবনব্যাপী তাঁর সর্বশক্তি দিয়ে সে ধ্বংসকে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারীরা যদি তাঁর মতো শক্তিশালী ও বিচক্ষণ হতেন- তাহলে সম্ভবত ভারতের ইতিহাস অন্যভাবে রচিত হতো।

সম্রাট আকবরই মুসলমানদের অধঃপতন ও ধ্বংসের শ্রেষ্ঠতম প্রতীক

মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ তাঁর 'মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস'-এ মুসলমানদের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার জন্য সম্রাট আকবরের[৮০] কীর্তিকলাপকেই প্রধানত দায়ী করে বলেন :

---

৭৯. এ, আর মল্লিক, বৃটিশ পলিসি ও বাংলার মুসলমান,
উদ্ধৃতি, আব্বাস আলী খান, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।

৮০. জালালুদ্দিন শাহ আকবর ছিলেন নিরক্ষর, অল্পশিক্ষিত। পনেরো-ষোল বছর বয়সে তিনি সিংহাসন লাভ করেন। বিচক্ষণ ও পারদর্শী বাহরাম খান প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিলেন। সৎ সংসর্গ লাভের অভাবে আকবর বিরাট সাম্রাজ্য লাভের পর স্বভাবতঃই ভোগ-বিলাস, উচ্ছৃঙ্খলতা ও নৈতিক অধঃপতনের মধ্যে নিমজ্জিত হন। মদ্যপান ও তার স্বাভাবিক আনুষঙ্গিক পাপাচার এবং আশাতীত রাজনৈতিক সাফল্য তাঁর চরিত্র গঠন বা সংশোধনের কোন সুযোগই দেয়নি। 'দ্বীনে ইলাহী' নামে একটি উদ্ভট ধর্মীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলমানদের ধর্ম ও তমদ্দুনকে ধ্বংস করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। আকবরনামায় এর বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।
মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯।

www.pathagar.com

> মুসলমানদের নিকট আকবর হইতেছেন তাহাদের অধঃপতনের ও ধ্বংসের শ্রেষ্ঠতম প্রতীক এবং মোছলেম ভারতে বর্তমান শোচনীয় অবস্থার প্রকৃত কারণ। অন্যদিকে মুসলমানদের এ অধঃপতিত অবস্থার মধ্যেই শুরু হয় অপরপক্ষের অগ্রযাত্রা, আকবরের সক্রিয় সমর্থন ও সাহায্য ব্যতীত তাহা কখনো সম্ভব হইত না।[৮১]

সম্রাট আকবরের অপকর্মের ফিরিস্তি বর্ণনা প্রসঙ্গে আরও বলা হয় :

> সহস্র বৎসর যাবৎ যে সমস্ত বিরুদ্ধ-শক্তি প্রকাশ্য অথবা গোপনে এছলাম ও মুসলমানদের সমাজ জীবনের ধ্বংস সাধনে লিপ্ত ছিল। সম্রাট আকবরের নিকট তাহা সমর্থন ও উৎসাহ পাইল। তিনি এ সমস্ত বিরুদ্ধবাদের ব্যাখ্যাদাতাদের প্রচুর সম্মান ও সমাদরের সহিত তাঁহার দরবারে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ইহাতেও তিনি সন্তুষ্ট হইলেন না। মুছলমানের তামাদ্দুনিক ও রাজনৈতিক জীবনের সকল সম্পদ ও শক্তি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিয়া দেওয়ার জন্য ভারতে যে হিন্দু মানসিকতা নীরবে অথচ অব্যাহতভাবে শক্তি সঞ্চয় করিয়া চলিয়াছিল- ইতিহাসের লিখিত ও সর্ব্বসম্মত রায় অনুসারে সেই হিন্দু মানসিকতাকে জীবন ধারায় প্রাধান্য দেওয়ার জন্য কোনোরূপ চেষ্টাই তিনি ক্রটি করেন নাই। বলা বাহুল্য, একদিকে মুসলমান চিন্তানায়কগণ যে তীব্র ভাষায় আকবরের শাসননীতির নিন্দা করিয়াছেন এবং অপরদিকে মোছলেমবিরোধী ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক যে তাহাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও মহান সম্রাটরূপে প্রশংসাবাদ দিয়াছেন- ইহাই তাঁহার যথার্থ কারণ।[৮২]

ইসলাম মুসলমানকে দেববাদী, প্রকৃতিপূজক এবং পৌত্তলিকদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে কঠোরভাবে নিষেধ করে দিয়েছে। আকবর ইসলামের এ নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে নিজের বিবাহিত মুসলিম পত্নীর প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করে জয়পুরের রাজা বিহারী মলের কন্যাকে মহিষীরূপে গ্রহণ করেন।[৮৩] এর পর এক খ্রিষ্টান রমণীকেও স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন।[৮৪] আকবর তাঁর হিন্দু পত্নীদেরকে মূর্তিপূজার এবং অন্যান্য ধর্মকর্ম ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধাই করে দিয়েছিলেন। তারা যেন কোনো বাধার সম্মুখীন না হয়- এজন্য তিনি সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন।

> সম্রাট আকবর ভারতের পাঠান শক্তি তথা ভারতের তদানীন্তন দুর্ধর্ষ সামরিক শক্তির ধ্বংস সাধন করেছিলেন। তাঁর এ ধ্বংসাত্মক নীতির কারণে বাহরাম খান, আহছান, মোয়াজ্জেম খানের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। আকবরের আত্মঘাতী নীতির এখানেই শেষ নয়, ইউরোপীয় লেখক 'টার্কস-ইন-ইন্ডিয়া' গ্রন্থে লিখেছেন :

---

৮১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮।

৮২. প্রাগুক্ত।

৮৩. আকবরের খ্রিষ্টান পত্নীর সমাধির উপর বর্তমানে ক্রস (×) চিহ্ন খচিত রয়েছে। খ্রিষ্টানদের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী এ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।
সাক্ষাৎকার, এ, বি, এম হাবিবুর রহমান চৌধুরী, ড. প্রাগুক্ত।
মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, পৃ. ১২৯।

৮৪. আকবরের খ্রিষ্টান পত্নীর সমাধির উপর বর্তমানে ক্রস (×) চিহ্ন খচিত রয়েছে। খ্রিষ্টানদের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী এ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।
মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, পৃ. ১২৯।

www.pathagar.com

> বহিরাগত বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধেও নানা দমনমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হইল। সম্রাট জন্মসূত্রের সকল বন্ধন মুক্ত হইয়া মাত্র ২২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে আপন নিয়তি ও তাঁহার বুকের দানবটির সহিত নিজকে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় দেখিতে পাইলেন।[৮৫]

সম্রাট আকবরের জীবনে একটি সময় আসে। তা-ই তাঁকে শঙ্কিত করে তোলে তা হচ্ছে, উদীয়মান খ্রিষ্টান শক্তির অপতৎপরতা। একে রুখে দাঁড়াবার মত তাঁর নৈতিক ও সামরিক শক্তি ছিল না। কারণ, পূর্বেই তিনি ভারতের সামরিক শক্তিকে খর্ব করে ফেলেছিলেন। বাধ্য হয়ে তিনি খ্রিষ্ট ধর্মের প্রতি সশ্রদ্ধ আনুগত্য প্রকাশ করেন। সাথে সাথেই দেশের বাইরে এবং ভেতরে গুজব রটে যায়, তিনি খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছেন। এদিকে খ্রিষ্টান শক্তির মতই দেশের অভ্যন্তরে হিন্দু শক্তি আকবরের গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুযোগ পেলেই যে এ হিন্দু শক্তি মোগল বংশের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে- এতটুকু বোঝার মত বিচক্ষণতা আকবরের ছিল। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, তাঁর ভ্রান্তনীতির অনিবার্য পরিণামে এ শক্তির উপরই তিনি নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। হিন্দু শক্তির ভবিষ্যৎ অভ্যুত্থানকে সূচনাতেই নির্মূল করার সাহস তিনি দেখাতে পারেন নি। এ অসহায় অবস্থায় তথাকথিত ধর্মীয় উদারতা ও সহনশীলতার ছদ্মাবরণে হিন্দুদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের এক অভিনব অসাধু নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। হিন্দুদের কাছে বিশ্বস্ত হওয়ার জন্য ইসলামের অনেক বিধি-নিষেধ অমান্য করতে থাকেন। ভারতীয় মুসলমানরা বহু ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অধিকার, সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। অপরদিকে, হিন্দুরা দেশে মূর্তি পূজার অবাধ অধিকার লাভ করে। শাহি মহলে মূর্তিপূজা ও অগ্নিপূজা নিয়মিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয় :

> জালালুদ্দিন আকবর শাহ স্বয়ং কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ মালা পরে চন্দন চর্চিত দেহে হিন্দু সন্ন্যাসীর বেশে শাহি দরবারে উপস্থিতও হতে লাগলেন।[৮৬]

দরবারে হিন্দু পণ্ডিত ও সভাসদবৃন্দ শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ নীতি গ্রহণ করেন। তাঁরা সম্রাটকে আল্লাহর আসনে বসিয়ে দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো এ ধ্বনিতে ভারতের একপ্রান্ত হতে অপরপ্রান্ত প্রতিধ্বনিত করে সম্রাটের প্রতি কৃত্রিম আনুগত্য প্রকাশ করতে লাগলেন :

> হেথা এক দেশ আছে নামে পঞ্চগৌর।
> সেখানে রাজত্ব করে বাদশাহ আকবর।
> অর্জুনের অবতার তিনি মহামতি,
> বীরত্বে তুলনাহীন জ্ঞানে বৃহস্পতি।
> ত্রেতা যুগে বাস হেন অতি সযতনে।
> এ কলি যুগে ভূপ পালে প্রজাগণে।[৮৭]

এ ধরনের চাটুকারী কার্যকলাপের ফলে আকবরের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে এবং তাঁকে আত্মপ্রতারণার পথে ঠেলে দেয়। হিন্দু জনসাধারণ, পণ্ডিত ও ধর্মপুরোহিতরা তাঁকে ঈশ্বরের অবতার এমনকি স্বয়ং ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করতে শুরু করে। উচ্চ ধর্ম সচেতন

---

৮৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০।
৮৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১।
৮৭. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

জপুত সামন্তরা শাহি হেরেমে তাদের ভগ্নী ও কন্যাদের প্রেরণ করেও সম্মানের সাথে দের সামাজিক মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে সচেষ্ট হয়। এসব পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা ভ্রান্ত হয়ে আকবর এবং তাঁর উপদেষ্টামণ্ডলী এ সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহারের সিদ্ধান্ত ন। তিনি তার তথাকথিত 'দ্বীন-ই-এলাহী' প্রচারের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ঠিক এ ময় এক আকস্মিক রাজনৈতিক অভ্যুত্থানে পারস্যের তৎকালীন শাহ বিদ্রোহীদের তে (১৫৭৫ খ্রি.) নিহত হন। একজন সুন্নি মতাবলম্বী[৮৮] শাহ তাঁর সিংহাসন দখল রেন। এ সময় ইসলামি শিক্ষা ও আদর্শের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন 'মোলহেদ'[৮৯] নামে কটি ধর্মদ্রোহী সম্প্রদায় পারস্যে বিশেষ করে কাস্পিয়ান সাগর উপকূলবর্তী অঞ্চলে ভাবশালী হয়ে ওঠেছিল। পারস্যের রাজনৈতিক বিপ্লব ও শাসক পরিবর্তনের এ শান্ত অবস্থায় 'মোলহেদ' সম্প্রদায়ের প্রচারকরা দলে দলে পারস্য ত্যাগ করে ভারতে সে আশ্রয় গ্রহণ করে। এ সম্প্রদায়ের ইসলামবিরোধী শিক্ষা আকবরের প্রচারিত তবাদের অনুরূপ হওয়ায় তিনি এদেরকে বিনা দ্বিধায় সাদরে গ্রহণ করেন এবং এদের তৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে তাঁর গোপন উপদেষ্টার পদে বরিত করেন। আকবরের বন্ধু বং ধর্মীয় উপদেষ্টা ছিলেন আবুল ফজল[৯০]। এখানে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন আলোচনা সভায় কেহ আলিমদের তর্ক-বিতর্কের ধরন এবং তাদের ঘৃণ্য আচরণ দেখে আকবর ক্রমশ লাম ধর্ম থেকে দূরে সরে যান।[৯১]

এদিকে, শিয়া সম্প্রদায়ের প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে তাঁদের দ্বাদশ ইমাম আল হাসান আল-আসকারীর পুত্র মোহাম্মদ বা ইমামুল মেহেদীকে হিজরি ২০৬ সনে শেষবারের মত দেখা যায়। প্রচলিত বিশ্বাস মতে, সহস্র বছর পূর্ণ হলে তাঁর পুনরাবির্ভাবের কথা ছিল। আকবরের নবাগত এ উপদেষ্টাবৃন্দ তাঁকে বোঝান যে, হিজরি অব্দের এক হাজার পূর্ণ হতে চলেছে। এ শুভ মুহূর্তে তিনি নিজেকে সে লুকানো ইমাম বা প্রতীক্ষিত 'মেহেদী' ঘোষণা করলে একই সঙ্গে তাঁর সকল উদ্দেশ্যই চরিতার্থ হবে।

সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক প্রয়োজনে আকবর সে সময় এমন কিছু করার চিন্তা-ভাবনা াছিলেন। ঠিক সে মুহূর্তে এমন একটি লোভনীয় সুযোগ তিনি হাতছাড়া হতে দিলেন । তাঁর দীর্ঘদিনের ফসল 'দ্বীন-ই-এলাহী' নামে এক অভিনব ধর্ম তাঁর সভাসদবৃন্দের ধ্য প্রচার শুরু করলেন। তাঁর এ ধর্ম প্রচারের ফলস্বরূপ প্রাথমিকভাবে ইসলামের

. সুন্নি। রাসূলুল্লাহর (সা.) সুন্নতের অনুসারী। ধর্মীয় আইন-কানুন ও রীতি-নীতির তারতম্য ভেদে মুসলমানদের বৃহত্তম উপদল।
বাংলা বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৪।
. শব্দটি এক বচন। অর্থ ফকির, ধর্মহীন। বহু বচন 'মালাহিদা'ও 'মুলহিদূন'।
মিছবাহুল লুগাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬৯।
. মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১।
কো আন্তোনভা, গ্রি, বোনগাই-লেভিন, গ্রি, কতোভস্কি, ভারতবর্ষের ইতিহাস, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮২,পৃ. ৩২৯।
আবুল ফজলের পিতা শেখ মুবারক তাঁর 'মাহদী' মতবাদ প্রচারের জন্য নিগৃহীত হয়েছিলেন। বালক বয়সে আবুল ফজলকে পিতার সঙ্গে দেশান্তরী হয়ে বিভিন্ন জায়গায় পালিয়ে বেড়াতে হয়েছিল। আবুল ফজল নিজে 'সূফি'বাদের অত্যন্ত উদারনৈতিক প্রবক্তা ছিলেন। তাঁর মত ছিল, সকল ধর্মের পথই হলো ঈশ্বর সন্ধান এবং প্রত্যেক ধর্মের মধ্যেই আছে সত্যের কিছু না কিছু উপাদান।
গ্রি, কতোভস্কি, ভারতবর্ষের ইতিহাস, মস্কো, ১৯৮২, পৃ. ৩২৯।

www.pathagar.com

সকল রীতিনীতি, রেওয়াজ ও মুসলিম তমদ্দুনের সর্বশেষ চিহ্নসমূহ তাঁর শাহি দরবার হতে প্রায় নির্বাসিত হয়। ইসলামি সালাম বা শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের রীতি সরকারিভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। তার স্থলে সম্রাটের সম্মুখে নতজানু হয়ে সিজদা করার রেওয়াজ প্রবর্তিত হয়। সভাসদবৃন্দ নবধর্মের বিধানানুযায়ী আল্লাহু আকবর' ধ্বনি উচ্চারণ করে তাদের প্রথম আনুগত্য প্রকাশ করতেন। কিন্তু এ ধ্বনি আল্লাহ মহান অর্থে নয়, 'সম্রাট আকবর মহান'-এ অর্থে তারা উচ্চারণ করতেন। প্রত্যুত্তরে অন্যেরা বলতেন, 'জাল্লাজালালুহূ' অর্থাৎ সর্বোচ্চ তাঁর জালাল (জালাল আকবরের প্রকৃত নাম) বা মহিমা-যে বিশেষণ একমাত্র আল্লাহ সম্পর্কেই প্রযোজ্য। জালালুদ্দিন আকবর শাহ স্বয়ং আল্লাহর অবতার, এ সমস্ত ধ্বনি দ্বারা এটাই বোঝাবার চেষ্টা করা হতো। দরবারে সন্ধ্যা প্রদীপ প্রজ্বলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্রাট অগ্নিদেবতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে পারিষদবর্গসহ ওঠে দাঁড়াতেন। আকবর প্রতিদিন প্রত্যুষে সমগ্র বিশ্ব উজ্জীবনকারী পরমাত্মার প্রতীকরূপী সূর্যের পূজা করতেন। অপরদিকে, তিনি স্বয়ং অগণিত মূঢ় নর-নারী কর্তৃক পূজিত হতেন।[৯২]

বাদাউনী ও সমসাময়িক ইতিহাস থেকে জানা যায় :

> আকবর প্রবর্তিত ধর্মের বিধান অনুযায়ী সর্বপ্রকার খাদ্যই হালাল ছিল। 'হিজরী' বর্ষ গণনারীতি বাতিল করা হয়েছিল। বেশ্যাবৃত্তি আইনগত অনুমোদন ও এর উপর কর ধার্য্য করা হয়েছিল।[৯৩]

অবশ্য, হিন্দু ধর্মেরও কিছু কিছু পরিবর্তন সাধন করেছিল। তবে, নিতান্তই কম। মোটকথা, ইসলাম ও মুসলিম তমদ্দুনের মূল শেকড়ে আঘাত হানা হয়। ইন্দো-ইরানীয় চিন্তাধারার সমন্বয়ে একটি নতুন প্রকৃতির পূজাভিত্তিক ধর্ম প্রতিষ্ঠাই ছিল আকবরের ধর্মনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য।[৯৪] আকবর আরও একটি কাজ করলেন- 'বাইয়া'ত নামা'[৯৫] স্বাক্ষরদান। এর শর্ত অনুসারে ইসলামের আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে চূড়ান্ত মতামত ও রায়দানের সর্বোচ্চ ক্ষমতা দেয়া হলো সম্রাট আকবরকে। এ ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি কোনো ইমাম বা মুসলিম আইনজ্ঞের মতামত নিতে বাধ্য ছিলেন না।[৯৬]

উপরোক্ত বাইয়াতনামায় আরও বলা হয়েছে :

> মহামহিম সম্রাট বিবেচনাসম্মত জ্ঞান করে তাঁর প্রজাদের কল্যাণে কোনো আদেশ (কোরান বিরোধী নহে) জারী করেন তাহা হইলে তাহা প্রত্যেকের উপর বাধ্যতামূলক ও অবশ্য পালনীয় হবে। এ বিরোধিতা পরকালে লা'নত ও ইহজীবনে সমাজচ্যুতি ও ধ্বংস দ্বারা দণ্ডনীয় হবে।[৯৭]

---

৯২. মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩।

৯৩. প্রাগুক্ত।

৯৪. আকবর তাঁর রাজ ক্ষমতার সামাজিক ভিত্তি প্রসারিত করার জন্য এবং হিন্দুদের মনোরঞ্জনের জন্য ১৫৬৩ সালে হিন্দু তীর্থ যাত্রীদের দেয় কর ব্যবস্থা বাতিল করেন এবং পরের বছর জিযিয়া বাতিল করেন।
গ্রি, কতোভস্কি, ভারতবর্ষের ইতিহাস, মস্কো, ১৯৮২, পৃ. ৩২১।

৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪।

৯৬. প্রাগুক্ত।

৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪।

www.pathagar.com

বিস্ময়ের ব্যাপার এ যে, শপথনামায় স্বাক্ষরকৃত তাঁর পারিষদবর্গের ১৮ জন সদস্যের মধ্যে একমাত্র বীরবল ছাড়া বাকি ১৭ জনই মুসলমান। এদের মধে মাখদুমুল মুলক, আবদুন নবি প্রমুখ ছিলেন তৎকালীন মুসলিম ভারতের নামকরা ফকীহ্ ও নেতৃস্থানীয় ইসলামি শাস্ত্রবিশারদ।

ইসলাম ধর্মের প্রতি আকবরের ধৃষ্টতা এখানেই শেষ হয় নি। তিনি আল্লাহর ঘর মসজিদ ও রাসূল (স.)-এর মিম্বরের সাথেও বেয়াদবি করতে থাকেন। একদিন জুমুয়ার নামাজ উপলক্ষ্যে ফতেহপুর জামে মসজিদকে সুন্দরভাবে সজ্জিত করা হয়। নির্দিষ্ট সময়ে শাহি মিছিল মসজিদের তোরণে এসে পৌঁছলে মসজিদের ভেতর থেকে একদল এসে বাদশাহ ও তাঁর সঙ্গীদেরকে সম্মানের সাথে অভ্যর্থনা দিয়ে মসজিদের ভেতরে নিয়ে যান। মসজিদে জামাআতের অধিকাংশ লোকই হয় আকবরের সভাসদ, না হয় তাঁর ভৃত্য কিংবা আশ্রিতজন। অতএব কোনো প্রতিবাদ করার মত কেউ সেখানে ছিল না। ফৈজী বাদশাহ কর্তৃক খুতবার জন্য একটি উদ্বোধনী শ্লোক বাদশার নির্দেশে আগেই রচনা করে রেখে ছিলেন। শ্লোকের বাংলা নিম্নরূপ :

প্রভু মোরে করেছেন রাজ্য অধিপতি,
দিয়েছেন জ্ঞান আর সাহস শকতি।
সত্য আর ভালবাসা দিয়েছেন বুকে,
তিনি দিশারী মোর ন্যায়ে ভুলে চুকে।
হেন ভাষা নাই করি তাঁর গুণগান,
আল্লাহু আকবর সেই আল্লাহ মহান।[৯৮]

শ্লোকের প্রথম তিন লাইন আবৃত্তি শেষ করা মাত্রই মহাপরাক্রমশালী এ ধর্মদ্রোহীর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়। হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে যায়। দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে, অসহায় অবস্থায় মিম্বর থেকে সম্রাটকে নেমে আসতে হয়। অথচ সে সময় এমন অবস্থা বিরাজ করছিল যে, সম্রাটের বিরুদ্ধে ক্ষীণতম প্রতিবাদ করার মতো কোনো সাহসী মুসলমানও ছিল না। তাই জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করলে সম্রাট আকবরের ভয় বা বিচলিত হওয়ার কোনো কারণ ছিল না। তথাপি কেন এ মহা-পরাক্রমশালী বাদশাহর এ পরিণতি। শ্লোকের শেষ তিন ছত্রে আকবর আল্লাহর একজন 'অবতার'-এ দাবির পরিষ্কার ঘোষণা রয়েছে। এ ঘোষণা উচ্চারণে তাঁর অসামর্থ্যই প্রমাণিত হয়েছে। তিনি এক ধর্মদ্রোহী জালিম ব্যতীত কিছুই নন। তাঁর কণ্ঠরোধের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর ঘর মসজিদ এবং তাঁর প্রিয় নবি (স.)-এর মিম্বরের পবিত্রতা রক্ষা করলেন। সম্রাট আকবরের এক সময়ের হিতাকাঙ্ক্ষী জনৈক ইংরেজ ঐতিহাসিক উপরোক্ত ঘটনা সম্পর্কে বলেন :

এ ঘটনায় যে ভাবাবেগের সঞ্চার হলো, তাহা যে দৃঢ়চিত্ত প্রবল শত্রুর মোকাবেলায়ও কখনও বিচলিত হয় নাই তাহাকে অভিভূত করিয়াছিল। যে হৃদয় সকল বিপদে শান্ত থাকত এখন তাহা দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল। যে কণ্ঠস্বর যুদ্ধের তুমল হট্টনিনাদ ছাপাইয়াও উর্ধ্বে শ্রুত হইত, এক্ষণে বালিকার কণ্ঠের

---

৯৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫।

www.pathagar.com

ন্যায়ই তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িল। প্রথম তিন ছত্রের উচ্চারণ সমাপ্ত করার পূর্বেই এ সম্রাট নবিকে সেই উচ্চ মঞ্চ হইতে নামিয়া আসিতে হইল।[৯৯]

আকবর নিজকে অজ্ঞাত 'ইমাম মেহেদী অথবা দীর্ঘ প্রতীক্ষিত মসিহরূপে ঘোষণা করে ধর্ম বিপ্লব শুরু করবেন বলে এতকাল গোপনে যে প্রচারণা চালিয়ে আসছিলেন, হিজরি এক হাজার বছর পূর্ণ হলে তা সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন ও অলীকরূপে প্রমাণিত হয়। ঐতিহাসিক কীসির ভাষায়:

> পরবর্তী বছর ছিল মুছলিম অব্দের ৯৯৯তম বৎসর এবং ইহার পর যে বৎসর আসিল তাহা সেই সময়ে এক সহস্রাব্দের যে আশা ব্যাপকভাবে পোষণ করা হইতেছিলে তাহার সমাধি রচনা করিল।[১০০]

আকবরের বিরুদ্ধে পুত্র জাহাঙ্গীরের বিদ্রোহ ঘোষণা, তাঁর আবাল্য বন্ধু ও ধর্মীয় দার্শনিক উপদেষ্টা আবুল ফজলকে জনৈক হিন্দু আততায়ী কর্তৃক নির্মম হত্যা, তাঁর নব্য উদ্ভাবিত দ্বীন-ই-এলাহী ধর্মে দীক্ষিত একমাত্র হিন্দু রাজা মহেশ দাস বীরবলের আফগানদের হাতে শোচনীয় পরাজয় ও মৃত্যুবরণ এবং বাদাউনি টোডরমলসহ অন্যান্য নিকটতম লোকদের মৃত্যুজনিত শোকাবহ ঘটনা তাঁর জীবনকে অস্বস্তি ও দুঃখময় করে তোলে। চরম আঘাত ও বিপর্যয়ের দরুন তাঁর জীবনের সমাপ্তি ঘনিয়ে আসে। দীর্ঘ ৪৭ বছর রাজত্ব করার পর ১৬০৫ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে প্রায় ৬০ বছর বয়সে আকবরের মৃত্যু হয়। তাঁর জীবনের শেষ দশ বছরের বিস্তারিত কোনো প্রামাণ্য ইতিহাস পাওয়া যায় না।

মাওলানা আকরম খাঁ তাঁর গ্রন্থে সম্ভবত আক্ষেপ করেই বলেন :

> আকবরের রাজত্বকালের সকল অপকর্মের পরিণাম ভোগ তাঁর মৃত্যুর সাথেই শেষ হয়ে যায় নাই। মোগল সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর সকল উত্তরাধিকারীকে জীবনের যথাসর্বস্ব দিয়া এ অপকর্মের ফল ভোগ করিতে হইয়াছিল। ভারতের দশ কোটি মুসলমান আজ পর্যন্ত আকবরের অপকর্মের দরুন ক্ষতিপূরণের অবশিষ্ট উত্তরাধিকার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পায় নাই। মুসলমান পাঠকদের নিকট এ উত্তরাধিকারের প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো আলোচনার প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করিনা।[১০১]

মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংস করার জন্য আকবর যে বীজ বপন করেন, তাঁর সুযোগ্য পুত্র সে ধ্বংসকে আরও ত্বরান্বিত করার কাজে হাত দেন। মুসলমানদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনের সকল স্তরে আঘাত হানেন। ১৬০৯ খ্রিষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন হকিন্স আগ্রায় এলে তাঁকে রাজকীয় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাকে ঘনিষ্ঠ সহচর হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁকে খেতাব এবং বৃত্তিও প্রদান করেন। এমনকি শাহি মহলের একজন শ্বেতাঙ্গী তরুণীর সাথে বিবাহের প্রস্তাব দেন।

শাহি মহলে খ্রিষ্টধর্মের এতদূর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে, কয়েকজন শাহজাদা খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। হকিন্সের নেতৃত্বে অন্যান্য খ্রিষ্টান প্রবাসীদের সাথে পঞ্চাশজন

৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬।
১০০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭।
১০১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮।
আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

www.pathagar.com

অশ্বারোহী পরিবেষ্টিত মিছিল সহকারে গীর্জায় যেতেন। জাহাঙ্গীর তাঁর ইউরোপীয় বন্ধু-বান্ধবসহ সারারাত শাহি মহলে মদ্যপানে বিভোর থাকতেন। আকবরের মদ্যপায়ী পুত্র জাহাঙ্গীর তাঁর উপদেষ্টা স্যার টমাস রো ও গুরু সুচতুর কূটনীতিবিদ রেভারেণ্ডই ফেরী মিলে মোগল সাম্রাজ্যের সমাধির কাজ ত্বরান্বিত করেন। টমাস রো তাদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া অতি সহজেই মঞ্জুর করে নিতে জাহাঙ্গীরকে সম্মত করতেন। সুরাটে প্রতিষ্ঠিত কারখানার দ্বারা ইংরেজরা শুধু বাণিজ্যিক সুবিধা লাভেরই সুযোগ পান নি, এ কারখানা তাদের একটি শক্তিশালী সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত হয়। শাহি মসনদের শর্তানুযায়ী শুধু সুরাটেই নয়, মোগল সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থানেও যথা আগ্রা, আহমদাবাদ ও ব্রুচে ইংরেজদের কারখানা তথা সামরিক ঘাঁটি গড়ে ওঠে। এভাবেই ভারতের বুকে ইংরেজদের আস্তানা পাকাপোক্ত হয়।

অমুসলিম ঐতিহাসিকবৃন্দ মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনের জন্য একমাত্র আওরঙ্গজেবকেই দায়ী করেন। অথচ আকবর যে মুসলিম সামরিক শক্তিকে ধ্বংস করে মোগল সাম্রাজ্যকে শত্রুর মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন, আওরঙ্গজেব সে মুসলিম সামরিক শক্তি পুনর্গঠনে আজীবন চেষ্টা করেন। খ্রিষ্টান ও হিন্দুদের কাছে উপরোক্ত কারণে আওরঙ্গজেব ছিলেন দোষী। অমুসলিম ঐতিহাসিকরা স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে আওরঙ্গজেবের চরিত্রে যে-সব কলংক লেপন করেছেন তার সবই ভিত্তিহীন।[১০২]

মূলত তৎকালীন ভারতের ইতিহাস লেখকদের প্রায় সবাই ছিলেন মুসলমান। তাই, সময়ের প্রকৃত ইতিহাস জানতে হলে, তথ্য সংগ্রহ করতে হবে বাদাউনি, আকবরনামা, কাফিখান, তারিখে ফিরিস্তা, মা'য়াসিরে আলমগিরি ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে। কিন্তু, ইউরোপীয় খ্রিষ্টান ঐতিহাসিকগণ ইতিহাসের বহু ঘটনাকে বিকৃত করে পেশ করেছেন। পরবর্তীকালে অর্ধ-পৃথিবী জুড়ে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল। সর্বত্র তাঁদের সাম্রাজ্য জুড়ে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে প্রচলিত ছিল ইংরেজি ভাষা। এ ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় মুসলমানদের ইতিহাসের এক বিকৃত ও কল্পিতরূপ তাঁরা তুলে ধরেছেন ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে :

> মুসলমান শাসনকে হিন্দুর দৃষ্টিতে মসীলিপ্ত করার মানসে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী নিজেদের প্রয়োজনে কিছুসংখ্যক মেধাবী বৃটিশ সামরিক অফিসারকে ভারতের মুসলমান আমলের ইতিহাস লেখার কাজে নিয়োগ করা হয়। ফরমায়েশ অনুযায়ী লিখিত সে ইতিহাস মুসলিম বিদ্বেষে পূর্ণ। এ ইতিহাসে মুসলিম বিজয়ীদেরকে চিত্রায়িত করা হয় শুধু ধ্বংসকারী হিসেবে। সাথে স্যাথে ইংরেজদের নির্দেশিত রূপরেখায় ইতিহাস চর্চার জন্য তারা কিছুসংখ্যক ভারতীয়কে উদ্বুদ্ধ করে। এভাবে বৃটিশ নীলনকশানুযায়ী বিভেদনীতির অংশ হিসেবে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেওয়া হয়।[১০৩]

পলাশীর যুদ্ধে এ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে চলে যাওয়ার পর থেকে একশ' বছরের সঠিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এ সময়কালের ইতিহাস বাংলার মুসলমানদের শোষণ, লুণ্ঠন, নির্যাতন, নিষ্পেষণ,

---

১০২. শিবলী নু'মানী, আল্লামা, আওরঙ্গজের আলমগীর পর এক নজর'।
আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬।

১০৩. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১৪ (উপক্রমণিক)।

www.pathagar.com

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা ও হত্যাযজ্ঞের ইতিহাস। এ কাজে ইন্ধন যুগিয়েছে ইংরেজ সরকারের অনুগ্রহপুষ্ট এদেশীয় জগৎ শেঠের দল। দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার মূল্যও তারা লাভ করে পূর্ণমাত্রায়। দেশের সমুদয় জমিদারী, জোতদারী প্রকৃত মালিক থেকে কেড়ে নিয়ে এসব 'বাবুদের' দেয়া হয়েছে চিরকালের জন্য পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ভোগের জন্য। এরা অগাধ ধন-ঐশ্বর্যের মালিক বনে যায় উৎকোচ ও দুর্নীতির মাধ্যমে।[১০৪]

তাজমহল বিক্রির প্রস্তাব

মুসলমান ধর্ম ও সংস্কৃতি, শিল্প, চিত্র ও স্থাপত্য ধ্বংসের এক করুণ চিত্র আবদুল মওদুদ তাঁর গ্রন্থে তুলে ধরেছেন:

> যে তাজমহলকে স্থপতিরা পৃথিবীর বুকে স্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করেন, যার নির্মাণকর্মে ২৩ কোটি ডলার ব্যয়িত হয়েছিল এবং যার পরিকল্পনা মানস সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিজয়ীর মানসকেও ম্লান করে লজ্জা দেয়, সেই তাজমহলটিকে ভেঙে তার মাল-মসল্লা আত্মসাৎ করার জন্য ভারতে অন্যতম পরম দয়ালু ও কল্যাণসাধক বড়লাট হিসেবে নন্দিত লর্ড বেন্টিংক একবার একজন হিন্দু কন্ট্রাক্টরকে মাত্র দেড় লক্ষ ডলারে বিক্রয় করারও চুক্তি করেছিলেন।[১০৫]

ওয়ারেন হেস্টিংস দেওয়ান-ই-খাসের হাম্মামখানাটি উপড়ে নিয়ে বিলাতে চতুর্থ জর্জকে উপহার পাঠিয়েছিলেন এবং লর্ড বেন্টিংক প্রাসাদটির অন্যান্য অংশ বিক্রয় করে ভারতের রাজস্ব বৃদ্ধি করেছেন।[১০৬]

মহামূল্য লুণ্ঠন কর্মের দ্বারা শিক্ষা-দীক্ষা ও সভ্যতা-ভব্যতায় গঠিত ইংরেজদের চরম হীন প্রবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এডমন্ড বার্ক বলেছেন :

> আমাদের আজ যদি ভারত ছাড়তে হয়, তাহলে ওরাংওটাং বা বাঘের চেয়ে কোনো ভাল জানোয়ারের অধিকারে যে এদেশ ছিল তার প্রমাণ করার কিছু থাকবে না।[১০৭]

সাংস্কৃতিক বিপর্যয় একটি জাতির অস্তিত্বের বিপর্যয়

পৃথিবীতে এক জাতি অন্য জাতির উপর প্রাধান্য বিস্তার করার আকাঙ্ক্ষা আবহমানকাল থেকে চলে আসছে। অনুরূপভাবে এক সংস্কৃতি অন্য সংস্কৃতিকে গ্রাস করার রেওয়াজ বিভিন্ন জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে পাওয়া যায়। যুদ্ধে জয়-পরাজয় এবং সাংস্কৃতিক সংঘাত-সংঘর্ষের পরিণাম ফলের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। যুদ্ধের ময়দানে ভিন্ন জাতির নিকট পরাজয়বরণ করার পর, বিশ্বের অনেক জাতিই জাতি হিসেবে বেঁচে থাকে। সময়ের বিবর্তনে নিজের হারানো স্বাধীনতাকে উদ্ধার করতেও সমর্থ হয়। কিন্তু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। কোনো জাতির সংস্কৃতি অন্য জাতির সংস্কৃতি কর্তৃক গ্রাসিত বা বিধ্বস্ত হলে দুনিয়ার কোনো রাহুগ্রস্ত সংস্কৃতি আর পুনরুদ্ধার করা কখনও সম্ভব হয় না। সংস্কৃতি মানুষের সমাজ তথা জাতীয় জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। তাই সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ই জীবনের চরম বিপর্যয় বিন্যাসের

---

১০৪. E. The Life of Charles Lord Metcalf.
A. R Mallick, British Policy & The Muslims of Bengal.

১০৫. The Round the World Traveller. Loreng, P. 379
আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১।

১০৬. The Story of Civilization Our Oriental Heritage by Will Durante. P.P 609-10.

১০৭. আবদুল মওদূদ, মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪।

www.pathagar.com

প্রধানতম বা একমাত্র কারণ। যে জাতির সংস্কৃতির বিপর্যয় ঘটেছে, সঙ্গে সঙ্গে সে জাতির অস্তিত্বেরও চির অবসান ঘটেছে। এটা প্রমাণ করার জন্য খুব বেশি দূরে যেতে হবে না। উপমহাদেশের ভারতবর্ষই এর স্পষ্ট নিদর্শন।

ভারতবর্ষে আর্য জাতির আবির্ভাব এবং অভ্যুত্থানের পূর্বে এখানে যত জাতির আগমন হয়েছে, তারা কেউ নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকতে পারেনি। আর্য ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি তাদেরকে গ্রাস করে ফেলে। তবে, দ্রাবিড় ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতির উপরে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। এর ফলে আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতি পরিপূর্ণ পৌত্তলিক ধর্ম ও সংস্কৃতির রূপ লাভ করে।[১০৮]

অপরদিকে, আর্য জাতি আবার বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন জাতি কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘ এক হাজার বছর অন্য জাতির অধীনে আবদ্ধ ছিলো।[১০৯] দীর্ঘকালের পরাধীনতা সত্ত্বেও আর্য জাতি জাতি হিসেবে বেঁচে থাকে। তারা আদিম অধিবাসীদের দেশ জয় করেই ক্ষান্ত হয়নি, পরাজিতদের সংস্কৃতিকেও সে সঙ্গে ধ্বংস করেছিল। আদিম অধিবাসীরূপে নিজেদের সংস্কৃতি হারিয়ে ফেলার এবং বিজাতীয় সংস্কৃতির দাসত্বেও আত্মসমর্পণ করার ফলে অবস্থা এ দাঁড়িয়েছে যে, বর্তমান ঘৃণিত জীবনের জঘন্যতর অনুভূতি হতেও আজ তারা বঞ্চিত। তাই তাদের নিজ জাতির বীরপুরুষদেরকে 'দাস' 'দস্যু', 'দৈত্য', 'অসুর' ও রাক্ষস' বলে নিন্দিত হতে শুনলেও তাদের অন্তরে একবিন্দু জ্বালা হয় না; বরং সে নিন্দাকে সানন্দচিত্তে বরণ করে নিয়েই আজ তারা আনন্দ উপভোগ করে। অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস ! সে মনুসংহিতাকেই এ হতভাগ্যের দল আজও ভগবৎ বিধান বলে বরণ করে চলছে। এ আত্মবিস্মৃত মানবসমাজ আর্য পণ্ডিতদের সে সব স্মৃতিকে আজও নিজেদের ধর্মশাস্ত্র বলে বহন করে চলছে। সংস্কৃত দাসত্বের অভিশাপে এ সর্বহারা মানুষগুলো আজ অন্তরের অন্তস্থলে এ বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে পোষণ করতে বাধ্য হয়েছে যে, নিজেদের বর্তমান পরিণতির জন্য দায়ী এবং দোষী তারা নিজেরাই।

আদিম ভারতীয়দের জাতীয় জীবনের চরম সর্বনাশের এ শোচনীয় চিত্রের সঙ্গে এখানকার আর্য জাতির বা বর্ণ হিন্দু সমাজের বর্তমান অবস্থার আলোচনা করলে আমাদের সামনে ফুটে উঠবে সম্পূর্ণ বিপরিত চিত্র।

যাহোক, ভারতবর্ষে মুসলিম সংস্কৃতির বিরুদ্ধে যে বিপুল ও ব্যাপক অভিযান গত অর্ধ-শতাব্দী হতে বিশেষভাবে আরম্ভ হয়েছে আকরম খাঁ তার স্বরূপ উদঘাটন করে বলেন :

> স্কুল পাঠশালার জন্য নির্দ্ধারিত বহি-পুস্তকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকায় এবং সাহিত্যে সাধারণভাবে তার অসংখ্য নিদর্শন বিদ্যমান আছে।[১১০]

হিন্দু সংস্কৃতির আঘাতে মুসলিম সংস্কৃতিকে বিধ্বস্ত করে দেয়া এবং তার স্থলে হিন্দু সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়াই এ সংকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য। এক কথায়, ভারতের আদিম অধিবাসীদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দিয়ে তাদেরকে চিরপদানত দাস সমাজে পরিণত করা আর্য সংস্কৃতির পক্ষে পূর্বে সম্ভবপর হয়েছিল। তারা মুসলমানদের সম্বন্ধে আজ আবার তাকে বাস্তবে পরিণত করতে চাচ্ছেন। এটাই হচ্ছে

---

১০৮. আবদুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮০, পৃ. ২১০।

১০৯. আবু জাফর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮২।

১১০. দৈনিক আজাদ, ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯।

www.pathagar.com

তাদের পূর্ব সংকল্পকৃত দুরভিসন্ধিপ্রসূত অভিযান, এ অভিযানের তীব্রতা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

মুসলমানের ভাব, চিন্তা ও সংস্কারকে এবং জাতীয় অস্তিত্বের প্রাণ-বস্তুটিকে সমূলে বিধ্বস্ত করে দেয়াই ষড়যন্ত্রের প্রধান লক্ষ্য। কোনো চিন্তাধারা তাদের এ কাজে ইন্ধন যোগাচ্ছে- মাওলানা আকরম খাঁ তাঁর 'মুসলিম জাতিত্ব ও সংস্কৃতি' প্রবন্ধে সুন্দর একটি উদাহরণ তুলে ধরেছেন এভাবে :

> ঢাকা ১০ই অক্টোবর : শেবালয় থানার অন্তর্গত ভাবলা গ্রামের মঙ্গল ফকির নামে জনৈক 'মুসলমান ভদ্রলোক' এবার মহাসমারোহে দুর্গা পূজা সম্পন্ন করিয়াছেন। পূজায় হিন্দু মুসলমান জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলেই যোগদান করেছিলেন।[১১১]

'মঙ্গল ফকির' নামক এক মুসলমান দুর্গা পূজার অনুষ্ঠান করার ফলে তথাকথিত 'বাংলার জাতীয়তাবাদী' কেন্দ্রগুলোতে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। তাঁরা সকলেই সমবেতভাবে মঙ্গল ফকিরের এ উদার, মহান, অসাম্প্রদায়িক মানসিকতার 'মঙ্গল কীর্তন' করতে থাকেন। সাধারণভাবে উক্ত ঘটনাটির হয়তো সামান্যই মূল্য আছে। ব্যাপারটি হয়তো স্বাভাবিক। উদারতাগুণে আর্য-সংস্কৃতির উপর আক্রমণশীল মানসিকতা মুসলমানদের কোনো দিনই ছিল না। পক্ষান্তরে আর্য হিন্দুরা সহজাত রক্ষণশীলতা এবং নিজ সংস্কৃতির প্রতি তাদের স্বাভাবিক আসক্তি দ্বারা সমস্ত বিপরীত সংস্কৃতির প্রভাব হতে নিজেদেরকে এবং নিজেদের সংস্কৃতিকে সগৌরবে রক্ষা করে এসেছে। নিজ সংস্কৃতির প্রতি তাদের এ আসক্তি দিন দিন বেড়েই চলছে। উচ্চ শিক্ষিত ও প্রগতির তথাকথিত দাবিদার বর্ণ হিন্দুরাই দেশব্যাপী সার্বজনীন দুর্গোৎসবের প্রধান উদ্যোক্তা। এ প্রসঙ্গে মাওলানা আকরম খাঁ'র নিম্নোক্ত আলোচনা উপস্থাপন করা যায় :

> উচ্চ শিক্ষার পীঠস্থানগুলোই আজ সরস্বতী পূজার স্তোত্র মুখরিত। ইউনিভার্সিটিগুলো আজ 'বাণী'র পূজার মন্দিরে পর্যবসিত। এ মন্দিরের পূজারীরাই আজ 'শ্রী' 'পদ্মে'র জয় পতাকা এবং হিন্দু সংস্কৃতির জয়গান গেয়ে ভারতের অহিন্দু সংস্কৃতিকে 'জাতীয় হুজুগে' বিনা শর্তে আত্মসমর্পণের সদর্প আহবান জানাচ্ছে।[১১২]

তৎকালীন ইতিহাসের দিকে তাকালেই দেখা যায়, রাজনীতি ক্ষেত্রে 'বন্দে মাতরম'কে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে কংগ্রেস ও অন্যান্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এতদিন চালিয়ে আসছিল। মুসলিম বিদ্বেষী বঙ্কিমচন্দ্র, এ 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীতের রচয়িতা। এটি আনন্দ মঠে' স্থান পেয়েছে। মুসলিম আকিদা ও বিশ্বাসবিরোধী এ সঙ্গীত মুসলমান 'সন্তান'দের মুখ দিয়েই গাওয়ানো হয়েছে। কাজেই মুসলিম-বিরোধিতার পটভূমিকায় রচিত এ সঙ্গীতকে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ করায় মুসলমানদের আপত্তি থাকাই ছিল স্বাভাবিক। এছাড়া, সঙ্গীতটি হিন্দু দেবী দুর্গার স্তব হিসেবেই রচিত হয়েছে। এর প্রমাণ নিম্নরূপঃ

---

১১১. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মুসলমানদের জাতিত্ব ও সংস্কৃতি, দৈনিক আজাদ, ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯।

১১২. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

ত্বংহি দুর্গা দশ প্রহরণ ধারিণী
নমানি তাং-
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারি প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।

এ আন্দোলন শুধু বাংলায় সীমাবদ্ধ থাকে নি, ভারতের সর্বত্র এ সঙ্গীতের প্রতিবাদে কংগ্রেসী, অকংগ্রেসী মুসলমানরা প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠেন।[১১৩] কিন্তু নিজেদের গোঁ ছাড়লেন না। জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে 'বন্দে মাতরমে'র মাহাত্ম্য কীর্তনে তাঁরা অতিমাত্রায় তৎপর হয়ে উঠলেন। এতে মুসলমানদের প্রতিবাদ তীব্র এবং ব্যাপকতর হয়ে উঠলো। সম্ভবত কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের অনুরোধে কবি রবীন্দ্রনাথ এ সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসেন।[১১৪] তিনি এ সঙ্গীতের প্রথম চার লাইন রেখে বাকি অংশ বর্জন করতে পরামর্শ দেন। তিনি যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন, প্রথম চার লাইনকে 'দুর্গার' বন্দনা হিসেবে গ্রহণ না করে দেশ মাতৃকার বন্দনা হিসেবে গ্রহণ করা চলে। ওটুকু জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা পেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের এ পরামর্শ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ মেনে নিলেও মুসলমানরা মানতে রাজি হলেন না। মুসলমানদের মতে, বন্দনা বা পূজা (প্রশংসা ও ইবাদত) একমাত্র বিধাতা (আল্লাহ) ছাড়া আর কাউকে মুসলমানরা করতে পারেন না। এ ছাড়া, যে পটভূমিতে এ সঙ্গীত রচিত হয়েছে এবং এ সঙ্গীতের সাথে মুসলিম বিরোধিতার যে যোগ মুসলমানরা তা ভুলে যেতে পারেনা। হিন্দুর জাতীয় সঙ্গীত হয়তো এটা হতে পারে। কিন্তু মুসলমানদের জাতীয় সঙ্গীত এটা কিছুতেই হতে পারে না।[১১৫]

শুধু 'বন্দে মাতরম' নয়, আরো একটি ব্যাপারেও মুসলিম তরুণদের মনে তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টিহয়েছিল। তা ছিলো, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'শ্রী-পদ্ম' মনোগ্রাম। 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী'তে এ 'শ্রী-পদ্ম' মনোগ্রামের বিরুদ্ধে মাওলানার তীব্র প্রতিবাদসম্বলিত একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই মুসলিম তরুণ মহলে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। 'শ্রী-পদ্ম' মনোগ্রামের বিরোধিতার মূলে মুসলমানদের যুক্তি ছিল যে, 'শ্রী' হচ্ছে সরস্বতীর অপর নাম, পদ্ম তাঁর আসন। শিক্ষা ক্ষেত্রে এ হিন্দু-প্রতীকী মনোগ্রাম মুসলমানদের গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। শুধু এ কারণে নয় যে, এটা হিন্দুয়ানি প্রভাবিত, এ কারণেও যে, এর ধারণাটি পৌত্তলিক, এটা তৌহিদবাদি মুসলমানদের কাছে অত্যন্ত আপত্তিকর। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রথমত 'শ্রী-পদ্ম' মনোগ্রাম সম্পর্কে মুসলমানদের এ আপত্তিও মেনে নিতে চাননি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ মনোগ্রাম থেকে 'শ্রী' বর্জিত হয় এবং 'পদ্ম'-ও রূপান্তর গ্রহণ করে। এ ব্যাপারে মাওলানা আকরম খাঁ-ই মুখ্য ভূমিকা পালন করেন 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী' ও 'মাসিক মোহাম্মদী'র মাধ্যমে। 'শ্রী-পদ্ম' ও 'বন্দে মাতরমের' বিরুদ্ধে এ দুই কাগজে বহু লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। সে সব লেখা ছাত্র ও তরুণ মুসলিমদেরকে এতটা অনুপ্রাণিত করেছিল যে,

---

১১৩. আবুল কালাম শামসুদ্দীন, অতীত দিনের স্মৃতি, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. ১৭২।
১১৪. প্রাগুক্ত।
১১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩।

www.pathagar.com

বিক্ষোভে সমগ্র দেশে তুমুল আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রদেশের বিভিন্ন স্কুল-কলেজেও ছাত্র বিক্ষোভ প্রচণ্ডভাবে দানা বেঁধে উঠেছিল।

স্বয়ং মাওলানা মাসিক মোহাম্মদীতে সম্পাদকীয় নিবন্ধে লেখেন :

বিশ্ববিদ্যালয়ের 'শ্রী-পদ্ম' যে সম্পূর্ণ নির্দোষ ব্যাপার এবং নিছক সাম্প্রদায়িকতাগ্রস্ত হইয়াই যে বাংলার মুসলমান সমাজ তাহার বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন, প্রবাসীর প্রধান সম্পাদক মহাশয় ইহা সপ্রমাণ করার জন্য গত কয়েক মাস হইতে বিশেষ শ্রম স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। 'শ্রী'র মানে যে 'হিন্দু দেবী বিশেষও বটে' এবং সেই দেবী যে, পৌরাণিক মতে 'কমলাসনা' সম্পাদক মহাশয় নিজেও তাহা স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু যেহেতু 'শ্রী'র অর্থ সম্পদ, সৌভাগ্য, সৌন্দর্য ইত্যাদি হইতে পারে। অতএব মুছলমানের আপত্তিটা অযৌক্তিক সম্পাদক মহাশয়ের প্রথম যুক্তির সারকথা ইহাই। এ সঙ্গে তিনি আরও বলিয়াছেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও পত্রের চিত্রের মধ্যস্থিত 'শ্রী' শব্দটির পূজা করেন না, ধ্যান করেন না।[১১৬]

সম্পাদকীয়তে আরও বলা হয় :

কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে কমলাসনা হিন্দু দেবীর পূজা অনুষ্ঠান আজও সরকারীভাবে করেন নাই। কিন্তু বাংলার সমগ্র হিন্দু সমাজ এ কমলাসনা 'শ্রী' দেবীকে বাণীবিদ্যা দায়িনী বলিয়া প্রতি বৎসর পূজা করিয়া আসিতেছেন। ইহার জন্য অফিস-আদালতে ও স্কুল-কলেজে ছবি দেওয়া হইয়া থাকে এবং হিন্দু শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা প্রায় সকলেই ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত এ পূজায় যোগ দিয়া থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজ ও হোস্টেলগুলিতে এ পূজার আগ্রহ আজ সর্বব্যাপীরূপে দেখা দিয়াছে। হিন্দু সমাজের পঞ্জিকাকারকরা প্রতি বৎসর সাথে সাথে পঞ্জিকা প্রকাশ করিয়া থাকেন। এবং তাহার প্রত্যেক খানিতে পদ্মাসনা সরস্বতী দেবীর ছবি ছাপাইয়া শ্রী পঞ্চমীর পূজা-পদ্ধতি, তাহার মন্ত্র ও উপচারাদির ব্যবস্থা জানাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। এ অবস্থায় নিছক ওকালতি প্রবৃত্তির বশবর্তী না হইয়া বিচার করিয়া দেখিলে সহজে বোঝা যাইবে যে, 'পদ্মাসনা শ্রী' বলিতে বাংলাদেশে ও বাংলা সাহিত্যে প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ বুঝাইয়া থাকে হিন্দু শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পূজনীয় সরস্বতী দেবীকে ও তাহার পুরাণ বর্ণিত আসন পদ্মকে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ হিন্দু সংস্কারের বশবর্তী হইয়াই যে পদ্মের বুকে 'শ্রী'কে বসাইয়া নিজেদের বাণী মন্দিরের প্রতীক স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা ধ্রুব সত্য। রামানন্দ বাবু ও তাহার সমভাবের ভাবুক অন্যান্য কয়েকজন ভদ্রলোক কিছুদিন হইতে আর একটা অদ্ভুত রকমের যুক্তির অবতারণা করিতেছেন। তাহার সারমর্ম (রামানন্দ বাবুর ভাষায়) এ যে, 'পদ্ম ফুল' মুসলমানরাও ব্যবহার করিয়া থাকেন।[১১৭]

সম্পাদকীয়ের শেষে বলা হয় :

অনেক মুসলমান মসজিদের গায়ে 'পদ্ম' খচিত আছে। ঠিক কথা, মুসলমান পাড়ার দীঘি-পুষ্করিণীতে শত শত 'পদ্মফুল' ফুটিয়া থাকে। স্থানে স্থানে পদ্মের পাতায়

১১৬. মাসিক মুহাম্মদি, ১০ম বর্ষ, ১২ আশ্বিন, ১৩৪৪।
১১৭. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

> মুসলমানরা ভাত পর্যন্ত খায়, দরকার মতে ঔষধার্থে 'পদ্ম-মধু' ব্যবহারও করিয়া থাকে। রামানন্দ বাবু ইহাও নিশ্চয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, মসজিদের 'পদ্ম' পত্রগুলি খোদিত হইয়া আছে বড় বড় প্রস্তর খণ্ডের উপর। মুসলমানরা আবার মাটি দিয়াও মসজিদ নির্মাণ করে। বাঁশ ও খড় দিয়া তাহার উপরিভাগও ছাইয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া এ রূপ যুক্তিবাদের অবতারণা করা কি সঙ্গত হইবে যে, পাথরের বা বাঁশ খড়ের নির্মিত কালী দুর্গার মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে কোনোপ্রকার প্রতিবাদ করার অধিকার হইতে মুসলমান সমাজ ন্যায়তঃ বঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছে। জড় পদার্থের ব্যবহার আর জড় পূজা কি একই কথা?[১১৮]

মাওলানার উপরোক্ত সম্পাদকীয় প্রকাশিত হওয়ার পর মুসলিম তরুণদের মনে আন্দোলনের তীব্রতা আরও বেড়ে যায়। কোলকাতার সিনেমা হলে বঙ্কিমচন্দ্রের রাজ সিংহের' ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। প্রথম 'শো'তেই হলে প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও গোলমাল হয়। হল-কর্তৃপক্ষ সে ছবি বন্ধ করতে বাধ্য হন। সে সময়ে শিবাজীর কাহিনী নিয়ে লেখা 'গৈরী পতাকা' শীর্ষক একটি নাটকও মনোমোহন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হচ্ছিল। এর লেখক ছিলেন শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। এটি ছিল সুলিখিত ও সু-অভিনীত নাটক। এতেও শিবাজীর যে দেশপ্রেম দেখানো হয়েছিল, তাতে মুসলমানদের আপত্তির কারণ ছিল। সে সম্পর্কে 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদীতে' এবং সম্ভবত 'মাসিক মোহাম্মদীতে'ও প্রতিবাদ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আজাদ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন তাঁর 'অতীত দিনের স্মৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন :

> বুদ্ধদেব বসুও না-কি এর প্রতিবাদ করেছিলেন, অবশ্য তাতে বসু 'গৈরিক পতাকা'র সমর্থনে বহু যুক্তিও প্রদর্শন করেছিলেন বটে। কিন্তু মুসলমানদের আপত্তির কারণ তিনি বিশেষ কিছু বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর প্রতিবাদ পড়ে আমাদের তা মনে হয়নি। বস্তুতঃ শুধু বুদ্ধদেব বসু কেন, তখনকার হিন্দু মানসিকতা মুসলমানদের আপত্তির কারণ বুঝতে পারার অনুকূল ছিল না। এখনো কি তা হয়েছে ? তা যদি হত, তা হলে আমাদের দেশের চেহারাটিও অন্য রকম হত।[১১৯]

অতঃপর দেখা যায় আনন্দ মঠ'কে কোলকাতার রঙ্গমঞ্চে নামানোর চেষ্টা চলে। কিন্তু পুলিশ আপত্তি তোলে। এ সম্পর্কে জনমত অনুকূল কি-না, তা জানতে চায়। হিন্দুদের নাটক আনন্দ মঠ' এবং এর নাট্যরূপ 'সন্তান' নিয়েও মুসলমানদের প্রতিবাদ করতে হয়েছে। আবুল কালাম শামসুদ্দীনের স্মৃতিচারণ নিম্নরূপ :

> হঠাৎ একদিন খ্যাতনামা অহীন্দ্র চৌধুরীর এক চিঠি এসে হাজির আমার নামে। তাতে লেখা ছিল, আনন্দ মঠে'র নাট্যরূপ 'সন্তান' তাঁরা মঞ্চস্থ করতে চান। কিন্তু তা করার আগে 'সন্তান' নিয়ে আমাদের সাথে তিনি কিছু আলাপ-আলোচনা করার দরকার বোধ করেছেন। তিনি এক চায়ের মজলিসে আমাদের আমন্ত্রণ জানালেন। আমরা কয়েকজন যথাসময়ে 'নাট্য নিকেতন' হলে হাজির হয়ে অহীন্দ্র চৌধুরীর সাথে দেখা করলাম। ... আমি বললাম আনন্দ মঠ' সম্পর্কে মুসলমানদের আপত্তি খুবই গুরুতর। এ সম্বন্ধে মুসলমানদের সেন্টিমেন্ট গ্রো করেছে। কাজেই এটাকে মঞ্চস্থ করতে আপনাদের খুবই সতর্ক হতে হবে। নয়তো রাজসিংহের দশা

---

১১৮. মাসিক মুহাম্মদি, 'প্রবাসীতে শ্রীপদ্ম' শীর্ষক সম্পাদকীয়, ১২ই আশ্বিন, ১০ম বর্ষ, ১৩৪৪ সন।
১১৯. আবুল কালাম শামসুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪-৭৫।

www.pathagar.com

এটারও হতে পারে। অহীন্দ্র চৌধুরী হেসে বললেন : না, 'সন্তান' সম্পর্কে তেমন হওয়ার আশঙ্কা নেই। মুসলমানদের আপত্তির অংশ সতর্কতার সাথে বাদ দিয়ে এটাকে খাড়া করেছি। তিনি পুরো 'সন্তান' আমাদেরকে পড়ে শুনালেন। দেখা গেল আপত্তিকর অন্য সবকিছু বাদ দিলেও 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীতটি বাদ দেওয়া হয়নি। আমি বললাম : দেখুন অহীন্দ্র বাবু, আনন্দ মঠকে 'সন্তানে' রূপায়িত করতে আপনারা যথেষ্ট মাজাঘষা করেছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু 'বন্দে মাতরম' সম্পর্কে মুসলমানদের আপত্তির কথা নিশ্চয়ই আপনাদের অজানা নয়। আপনি সম্ভবত বলবেন উক্ত সঙ্গীতে মুসলমানদের আপত্তিকর অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শুধু এর অংশ তো নয়। গোটা 'বন্দে মাতরম'ই মুসলমানদের আপত্তিকর। অহীন্দ্র বাবু বললেন : না, না ! গোটা 'বন্দে মাতরম' কি করে আপত্তিকর হতে পারে ? যেটুক রাখা হয়েছে তাতো বাঙলার প্রকৃতির বন্দনা মাত্র। এতে মুসলমানদের আপত্তি কেন হবে ?

আপত্তি এ জন্য যে, এতে বাঙলার প্রকৃতিকে মাতৃরূপে কল্পনা করে তার বন্দনা করা হয়েছে। মুসলমান শুধু লা-শরীক আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকে বন্দনা (পূজা) করতে পারে না। অন্য কাউকে বন্দনা করলে তা হবে তাদের পৌত্তলিকতা। এ আমাদের অনুরোধ, এ নাটক থেকে এ গানটাও বাদ দিন।[১২০]

আনন্দ মঠ' সম্পর্কে মুসলিমদের একটা বিদ্বেষ ভাব ছিল। কেন ছিল, তার বিবরণও উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে তৎকালীন স্বনামখ্যাত আই,সি,এস রমেশচন্দ্র দত্তের একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য। তিনি এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকায় 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখেন :

"But through Ananda Math is in form an apology for the loyal acceptance of British Rule, it is none the less inspired by the ideal of the restoration sooner or later of a Hindu Kingdom in India. This is specially evident in the occassional verses in the Book of which the Bande Mataram is the most famous."[১২১]

আন্দোলন যখন তুঙ্গে, ঠিক এ সময়ে মাওলানা আকরম খাঁ 'মাসিক মোহাম্মদী'র একটি 'বিশ্ববিদ্যালয় সংখ্যা' প্রকাশ করেন। বাংলার খ্যাতনামা মুসলিম সাহিত্যিকগণ শতাধিক পৃষ্ঠার এ সংখ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিমবিরোধী বিভিন্ন কার্যক্রমের তীব্র সমালোচনা করে বহু প্রবন্ধ লেখেন। কাজেই, প্রবন্ধগুলো ছিল সুলিখিত, সারগর্ভ ও যুক্তিভিত্তিক। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক, আই-এ, বি-এ ও এম, এ ক্লাসের সাহিত্য ও ইতিহাসের পাঠ্য বইগুলোয় মুসলিমবিরোধী ভাবধারা যেভাবে কৌশলে পরিবেশন করে মুসলমান ছাত্রদেরকে সে-সব আত্মস্থ করতে বাধ্য করা হচ্ছিল।

কোলকাতার মুসলিম তরুণ ও ছাত্র মহলে এ-ব্যাপারে এতটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল যে, কয়েকদিন পর দেখা গেল, অতি উৎসাহী একদল তরুণ মুসলিম গড়ের মাঠে মনুমেন্টের নীচে আনন্দ মঠে'র বহ্ন্যুৎসব করছে। এতে স্বাভাবিকভাবেই

১২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫-৭৬।
১২১. আবু জাফর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

www.pathagar.com

কংগ্রেসপন্থী হিন্দু মহলে ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। হিন্দু সংবাদপত্রগুলোতে তীব্র মন্তব্যও করা হয়েছিল। সে সময়ও মুসলমান নামধারী কিছু মুসলিম বিদ্বেষী শিক্ষিত লোকেরও অভাব ছিল না। মিঃ রেজাউল করিম নামে এক ভদ্রলোক[১২২] আনন্দ বাজার' পত্রিকায় আনন্দ মঠে'র গুণকীর্তন করে মুসলমানদেরকে গালি দিতেও কুণ্ঠিত হননি। এবং প্রবন্ধগুলোতে যুক্তি ও তথ্য দিয়ে কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিভ্রান্ত করা হয়। বাঙলা ও ভারতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয়তার নামে কিভাবে হিন্দু সংস্কৃতি ও জাতীয়তাকে সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করে পাঠ্য বইয়ের মাধ্যমে মুসলমান ছেলে-মেয়েদের কচি মনে গেঁথে দেওয়ার অপচেষ্টা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চালিয়ে যাচ্ছিল মাসিক মোহাম্মদীর বিশেষ সংখ্যায় যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে এর বিরোধিতা করা হয়। বস্তুত কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গোটা শিক্ষা কারিকুলামে মুসলমানদের ধর্মবিরোধী তথা হিন্দুত্বের পরিপোষক বিষয়াদি চালু করে এ কথা বুঝাবার অপচেষ্টা চালিয়েছিল যে, এ-সবই হলো বাঙালি ও ভারতীয় সাংস্কৃতিক ও জাতীয় বৈশিষ্ট্য। হিন্দু-মুসলমান সবই যখন ভারতীয়, কাজেই হিন্দুদের ন্যায় মুসলমানদেরও এসব ব্যাপারে কোনোপ্রকার আপত্তি না করে মেনে নেওয়াই উচিত।[১২৩]

আশ্চর্যের বিষয় এ যে, রবীন্দ্রনাথের মতো মনীষীও উক্তি করতে একটুও সংকোচ করেন নি। তিনি বললেন :

> মুসলমানেরা ধর্মে ইসলামানুসারী হলেও জাতিতে তারা হিন্দু। কাজেই তারা হিন্দু মুসলমান।[১২৪]

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির বাস্তবায়নই ছিল বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে। এবং এ 'হিন্দু-মুসলমান' সৃষ্টির চেষ্টাই শুরু করেছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক ও গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে।

মুসলমান সমাজের বিরুদ্ধে Cultural Conquest বা সংস্কৃতির অভিযান নানাদিক দিয়ে আরম্ভ হয়েছিল। মাওলানা সাহেব সে সময় মুসলিম সংস্কৃতি ধ্বংসে কংগ্রেসের ভূমিকা বর্ণনা করে বলেন :

> রাষ্ট্রশক্তি হস্তগত করার পর হইতে কংগ্রেসী সরকারগুলি মোছলেম সংস্কৃতির বিনাশ সাধনের জন্য যে ব্যাপক ও প্রচণ্ড অভিযান আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন, তাহাকে সংগ্রামে 'চ্যালেঞ্জ' ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।[১২৫]

প্রসঙ্গত মাওলানা একটি স্কুলের ঘটনাও উল্লেখ করে বলেন :

> এখানে স্কুলের কাজ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে প্রত্যহই সরস্বতী মূর্তি টেবিলের উপর স্থাপন করা হয়। হিন্দু মুসলমান ছাত্রগণ সেই মূর্তিকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হয় এবং করজোড়ে অবনত মস্তকে সরস্বতী পূজার স্তোত্র পাঠ করিয়া মূর্তিকে নমস্কার করে।[১২৬]

---

১২২. মিঃ রেজাউল করিম সাহিত্যিক মঈনুদ্দীন হুসাইনের ভাই ছিলেন। আনন্দ মঠের গুণ-কীর্তনের জন্য তিনি না-কি কোনো মহল থেকে প্রচুর অর্থ লাভ করে নিজের বেকারত্ব ঘুচিয়ে ছিলেন। আবুল কালাম শামসুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮।

১২৩. অতীত দিনের স্মৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯।

১২৪. প্রাগুক্ত।

১২৫. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মুছলমানের জাতিত্ব ও সংস্কৃতি, দৈনিক আজাদ, ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯।

১২৬. দৈনিক আজাদ, প্রাগুক্ত, ৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯।

www.pathagar.com

তৎকালীন দিল্লীর একজন বিশিষ্ট আলিম মাওলানা আকরম খাঁকে জানান :

> এ অঞ্চলের মফস্বল স্কুল পাঠশালাগুলিতে স্কুল আরম্ভ হওয়ার পূর্বে আমাদের অবোধ্য কতকগুলি ছড়া ছাত্রদের দ্বারা আবৃত্তি করানো হইতেছে। পাঠ্য পুস্তকের বাহিরে বলিয়া এগুলির তাৎপর্য কাহারও নিকট হইতে জানিয়া লওয়ার সম্ভাবনাও নাই। যাহা হউক, কয়েকদিন বিভিন্ন মুসলমান ছাত্রের মুখে শুনিয়া তাহার একটা বয়েৎ উর্দুতে লিখিয়া পাঠাইতেছি। আপনারা খোদার ওয়াস্তে কংগ্রেসী প্রদেশের মজলুম মুসলমানদিগের মুখ চাহিয়া ঐ ছড়াটার পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করিলে বিশেষ বাধিত হইব। পাঠোদ্ধার সম্ভব হইলে মূল শ্লোকটা দেবনাগরী অক্ষরে লিখিয়া ও তাহার বিস্তারিত উর্দু অনুবাদ করিয়া পাঠাইবেন। আল্লাহ ইহার আজর আপনাকে প্রদান করিবেন।[১২৭]

মাওলানা বলেন :

> এ শ্লোকের পাঠোদ্ধার করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। কারণ শ্লোকটি আমাদের সকলের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী ছাত্রগণের সুবিদিত সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য দিবার মন্ত্র।
>
> জবা কুসুম সঙ্কাশং কাশপিয়ং মহাদ্যুতিম;
> ধান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরম।[১২৮]

যে মুসলমানদের মর্মে মর্মে দীর্ঘ চৌদ্দশ' বছর যাবৎ উদাত্ত সুরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে কুরআনের এ শাশ্বত নির্দেশ-[১২৯] তোমরা সূর্য্যের নিকট প্রণত হবে না, চন্দ্রের নিকটও নহে, বরং প্রণত হবে একমাত্র আল্লাহর হুজুরে এ সমস্তকে সৃজন করেছেন যিনি।

অতঃপর আকরম খাঁ ভারতের অবস্থার বর্ণনা দিয়ে বলেন:

> ভারতের দিকে দিকে তাহারাই ভাবী বংশধরদিগের কণ্ঠে আজ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে 'জবাকুসুমসংকাশং প্রণেতোহস্মি দিবাকরম প্রণেতা হস্মিদিবাকরম' রূপ মোশরেকী স্বরস্তোত্রে, কালচারের লড়াইয়ের এ পরিণতি মোছলেম ভারতের জাতীয় জীবনের পক্ষে কি চরম আশঙ্কাজনক নহে? ওয়ার্দ্ধা স্কীম বিদ্যামন্দির পরিকল্পনা, হিন্দী ভাষা এবং তাহার মধ্যদিয়া হিন্দু সংস্কৃতির বিজয় অভিযান, উর্দু প্রাথমিক স্কুল উঠাইয়া দেওয়া, আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলাম কর্তৃক প্রকাশিত দীনিয়াত পুস্তকগুলির অধ্যয়ন বন্ধ করা, সরকারী স্কুল পাঠশালায়, স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানে ও ব্যবস্থা পরিষদাদিতে বন্দে মাতরম গান চালাইবার জন্য কংগ্রেসী কর্তৃপক্ষের অসাধারণ জেদ, পাঠ্য পুস্তকাদির মধ্যবর্তিতায় মোছলেমবিরোধী ভাব ও সংস্কারের ব্যাপক প্রবর্তন, সরকারী চাকুরী প্রভৃতিতে স্বধর্ম ও স্বজাতিদ্রোহী মুসলমানদিগের সমর্থন ও নিষ্ঠাবান মুসলমান প্রার্থীদিগকে সাম্প্রদায়িকতার অজুহাতে তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করা এবং এ শ্রেণির বিভিন্ন প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া কংগ্রেস প্রদেশগুলিতে যে ভাষণ অভিযান চলিয়াছে মুসলমানকে পরমুখী ও আত্মবিমুখ একটা হীনতর ও জঘন্যতম পঞ্চম জাতিতে পরিণত করিয়া দেওয়াই তাহার একমাত্র উদ্দেশ।[১৩০]

---

১২৭. প্রাগুক্ত।
১২৮. লাতাসজুদু লিশশামচি ওয়ালা লিলকামারি ওয়াসজুদু লিল্লাহিল্লাজি খালাকাহুন্না, প্রাগুক্ত।
১২৯. প্রাগুক্ত।
১৩০. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

মাওলানা আরও বলেন :

হিন্দু সংস্কৃতির এ বিজয় অভিযান রাজনীতি ক্ষেত্রে ও শিক্ষা কেন্দ্রকে অতিক্রম করিয়া এখন সংক্রমিত হইয়াছে কংগ্রেস প্রদেশগুলির পল্লীতে পল্লীতে অজ্ঞ, অশিক্ষিত মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে। গ্রাম উন্নয়ন ও পল্লী সংগঠনের নামে ও সরকারী তহবিলের সাহায্যে এছলামবিরোধী ও মুছলিম বৈরী কংগ্রেস কর্মী ও প্রচারকগণের মধ্যবর্তিতায় হিন্দু সংস্কৃতির প্রচার ও মোছলেম সংস্কৃতির বিনাশ সাধনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কংগ্রেস প্রদেশে আজ যে প্রচেষ্টা কারও নজরে পড়ছে। আবার অনেকেরই নজর এড়িয়ে গেছে। কিন্তু সাধারণের নিকট সংবাদটির মূল্য এখানে যে, বহুদিন বাদে বাংলার এক সুদূর পল্লীর একজন হৃদয়বান খাঁটি ধার্মিক মুছলমানের পরিচয় পাওয়া গেল- অথচ কিছুদিন আগেও এ রকম উদাহরণের অভাব বাংলাদেশে মোটেই ছিল না। সাম্প্রদায়িক কলহ ও ঈর্ষার ধূম্রজালে যখন বাংলার আকাশ-বাতাস কালো হয়ে ওঠেছে, তখন এ ধরনের সংবাদে আশাবাদীরা হয়তো ক্ষীণ আশার আলোক খুঁজে পাবেন। হয়তো ভাববেন, অদূরভবিষ্যতে এ দুইটি জাতির মিলনের স্বপ্ন দিবা স্বপ্ন নয়।[১৩১]

মাওলানা বিষয়টি পরিষ্কার করার লক্ষ্যে বলেন :

খুব বেশী দিনের কথা নয়। বাংলার সোনালী যুগ ছিল বলা যেতে পারে। দুর্গা পূজা, কালী পূজা বিসর্জনের উৎসবে সমস্ত সম্প্রদায়ই আনন্দে মেতে ওঠেছে। দুর্গা পূজায় হিন্দু মুসলমানের ধর্মগত বন্ধন কখন যে খসে যেত, কেউ জানতে পারতো না। তখন হিন্দুর দুর্গা পূজাই হয়ে উঠতো সত্যিকারের সার্বজনীন মিলনক্ষেত্র। কিন্তু আজ ভয় হয়, এ সাম্প্রদায়িক ভেদ না বুঝি সত্যিকারের মুসলমানদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। তা না হলে কি করে বন্দে মাতরম সঙ্গীতের অঙ্গছেদন সম্ভবপর হয়। বিশ্ববিদ্যালয় আজ শ্রীহীন, দশ প্রহরা ধারিণী দুর্গার মূর্তি ধুলায় অবলুণ্ঠিত, আমরা জানি মুছলমানের জাতির এ সত্য পরিচয় নয়। বিদ্বেষের কালো মেঘ আজ ভারতের আকাশ-বাতাসকে ভারী করে রেখেছে সত্য, কিন্তু এ অবস্থা আর বেশী দিন নয়।[১৩২]

বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদের ও মহাত্মা গান্ধীর চেষ্টায় মাওলানা আজাদের তাফসীরের যথাক্রমে হিন্দি ও গুজরাটি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ফলত এ কৌশলের বাস্তব সূচনা হয় প্রথমে এ তাফসির হতে, এরই সূত্র ধরে আর একটি প্রচারধর্মী পুস্তিকা- 'হিন্দু-মুসলমান- খ্রিষ্টান ধর্মাদির মূলতত্ত্বের ইতিহাস'[১৩৩] এ পুস্তিকায় হিন্দু ধর্ম ও এছলাম ধর্মের সমন্বয় সপ্রমাণ করার জন্য যে যুক্তিবাদের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে অজ্ঞতায় ও অপদার্থতায় তা সম্পূর্ণভাবে অভিনব। উক্ত গ্রন্থের মূল কথা ছিলো নিম্নরূপ :

কুরআনের পূর্বে ইসলামের মূলতত্ত্ব প্রচার করেছে পারসিক তন্ত্রগাথা।

এ গাথা আবার অর্থব বেদের ভার্গব উপস্থার সারস্বরূপ।

---

১৩১. প্রাগুক্ত।
১৩২. প্রাগুক্ত।
১৩৩. পুস্তকের রচয়িতা ইন্দ্রভূষণ রায় নামক জনৈক ভদ্রলোক। পুস্তিকার কভার মুদ্রিত হয়েছে ১৬/২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের "বিদ্যোদয়" প্রেসে, কিন্তু মূল পুস্তকখানি কোন প্রেসে ছাপা অথবা কার দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে তার কোন উল্লেখ ছিল না।
প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

বেদোক্তা পশুগণই অগ্নোপাসক পূর্ব পুরুষ।

সুতরাং বৈদিক কৃষ্টিই পারসিক কৃষ্টির জনক।[১৩৪]

উপরোক্ত যুক্তির অবতারণা করে গ্রন্থের লেখক বলছেন :

হযরত মুহাম্মদের জন্মের পূর্বে আরব জাতির জন্ম হয়নি।

আরবিক সভ্যতা পারসিক সভ্যতার চৌদ্দ আনা আত্মস্থ করে উদয় হয়েছিল।

বিজ্ঞান, দর্শন ও শিল্প প্রভৃতি সে পারস্য ও ভারতের দ্বারাই প্রধানতঃ শিক্ষা লাভ করেছে।

মুছলমানের কলেমা 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ' উপনিষদের 'ইল্লল্লে' প্রভৃতি মন্ত্র হতেই রূপান্তর গ্রহণ করে কালের যবনিকায় প্রকাশিত হয়েছে।[১৩৫]

গ্রন্থকারের ঔদ্ধত্যের এখানেই শেষ নয়, ইসলাম ও মুসলিম ধর্ম, সংস্কৃতি' সম্পর্কে তিনি আরও বলেন :

ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম সংস্কৃতি, পারসিকদের মধ্যবর্তিতায় হিন্দুদের নিকট ভিক্ষালব্ধ।

একে প্রমাণ করার জন্য তিনি বলেন :

চারিজন ধর্মবীর ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা- তাঁরা হলেন, ১. হযরত মুহাম্মদ, (কোরআন); ২. আল্ বুখারি (হাদিস), ৩. গাজ্জালি (তফসির) এবং ৪. আবু হানিফা (কিয়াস)। এদের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ ভিন্ন অপর তিনজনই পারসিক।[১৩৬]

অতএব ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম সংস্কৃতি মূলত হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতি হতে সমদ্ভূত একটা ভিক্ষালব্ধ থার্ডহ্যান্ড বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং হিন্দু ধর্ম হিন্দু সংস্কৃতির নিকট আত্মসমর্পণ করতে তাদের ন্যায়ত কোনো প্রকার বাধাই থাকতে পারে না। উক্ত গ্রন্থের লেখকের বক্তব্য :

ইসলাম যদি পারসিক কৃষ্টিকে আপন বলে মনে করতে পারে, তবে হিন্দু কৃষ্টিকে আপন বলে মনে করতে পারবে না কেন ?[১৩৭]

মুসলমান হিন্দু সম্পর্ক

অন্যান্য ধর্মের ন্যায় ইসলামের বিধান শুধুমাত্র মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়; অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক, ব্যবহারিক তথা মানুষের জীবনের সমগ্র বিভাগে এ বিধান সুস্পভাবে পথ-নির্দেশ করে। এ পথ-নির্দেশ মানুষের অন্তর্নিহিত প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল বলেই ইসলামকে বলা হয় স্বভাবধর্ম। ইসলাম বিশেষ করে শুধুমাত্র মুসলমানের জন্য মনোনীত হয়নি। সারা দুনিয়ার মানুষের কল্যাণের জন্য আল্লাহ তাআলা বিধান প্রেরণ করেছেন। ইসলামি সমাজের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে সকল প্রকার দাসত্বমুক্ত করে একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহর দাসে পরিণত করে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে তৈরি করা।

---

১৩৪. প্রাগুক্ত।
১৩৫. প্রাগুক্ত।
১৩৬. প্রাগুক্ত।
১৩৭. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

মুসলমানরা আরব, তুরস্ক, ইরান, তুরান, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশ থেকে ভারত উপমহাদেশে আগমন করেন। এরপর তারা এদেশকে ভালবেসেছে মনেপ্রাণে এবং গ্রহণ করে নিয়েছেন নিজস্ব আবাসভূমি হিসেবে। তাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এতদঞ্চলের মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী থেকে এ দেশের হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সাথে একত্রে পাশাপাশি বসবাস করার পরও কোনো জাতি কোনো জাতির মধ্যে বিলীন হয়ে যায়নি। ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার এ সম্পর্কে বলেছেন :

> এ দুই সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস ও সমাজ বিধান সম্পূর্ণ বিপরীত ...। হিন্দুরা বাংলা সাহিত্যের প্রেরণা পায় সংস্কৃত থেকে আর মুসলমানরা পায় আরবি-ফারসী থেকে। মুসলমানদের ধর্মের গোঁড়ামী যেমন হিন্দুদেরকে তাদের প্রতি বিমুখ করেছিল, হিন্দুদের সামাজিক গোঁড়ামীও মুসলমানদেরকে তাদের প্রতি সেরূপ বিরূপ করেছিল ...। হিন্দুরা যাতে মুসলমান সমাজের দিকে বিন্দুমাত্র সহানুভূতি দেখাতে না পারে, তার জন্য হিন্দু সমাজের নেতাগণ কঠোর বিধানের ব্যবস্থা করেছিলেন।[১৩৮]

ভারতের মুসলমান ও হিন্দু যে দু'টি আলাদা জাতি- এ সম্পর্কে ভারতের তৎকালীন শাসনতান্ত্রিক উপদেষ্টা H. V. Hodson বলেন :

> ... এখানে বিরাট দু'টি সম্প্রদায় আছে যারা বসবাস করে একই দেশে- বলতে গেলে একই গ্রামে, একই সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে এবং একই সরকারের অধীনে। মূল জাতির দিক দিয়ে আলাদাও নয়। কারণ অধিকাংশ ভারতীয় মুসলমান তাদের প্রতিবেশী হিন্দুর ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষদেরই বংশোদ্ভূত। তথাপি পৃথক ও স্বতন্ত্র। শুধুমাত্র ধর্মীয় বিশ্বাস ও রীতি-পদ্ধতির দিক দিয়েই স্বতন্ত্র নয়; বরঞ্চ জীবনের সামগ্রিক বিধান ও মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়েও স্বতন্ত্র। প্রত্যেক দল বা সম্প্রদায় স্থায়ী বংশভিত্তিক। না তাদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাহের প্রচলন আছে, আর না মিলেমিশে একাকার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।[১৩৯]

মুসলমানদের সংস্কৃতিক চেতনাই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা

পলাশীর যুদ্ধে মুসলমানরা রাষ্টীয় স্বাধীনতা হারালেও কেবলমাত্র ফার্সি ভাষার জোরে কোনো প্রকারে কালচারাল প্রাধান্য বজায় রেখেছিলেন। কিন্তু ১৮৩৭ সালের একটি আইন, মুসলিম সমাজের মেরুদণ্ড এমনভাবে ভেঙ্গে দেয় যে, মুসলিম সমাজ আর একবার ওঠে দাঁড়াতে পারল না। সাহিত্য-শিক্ষা ক্ষেত্রে হিন্দুদের পেছনেই পড়ে ছিল। ভাষা পরিবর্তনই মুসলমানদের অধঃপতনের অন্যতম প্রধান কারণ। ভাষা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণ সংকেত পরিবর্তন সর্বপ্রধান প্রতিবন্ধক।

এ প্রসঙ্গে মাওলানা বলেন :

পূর্ব্বে বাঙ্গলা ভাষা আরবি বর্ণ সঙ্কেত দ্বারা লিখিত হইল। সুপ্রসিদ্ধ কবি আলাওলের পদ্মিনী নামক কাব্যখানিও আরবি বর্ণ সংকেতে লিখিত ছিল। .... কিন্তু পলাশীর যুগের পর গভর্নমেন্ট ভেদনীতি গ্রহণ করিয়া মুসলিমকে খর্ব্ব করিয়া হিন্দু সমাজকে বাড়াইয়া

---

১৩৮. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, পৃ. ২৪১-৪৩ ও ৩৩৪-৫০।
আব্বাস আলী খান, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, ঢাকা- ১৯৯৪, পৃ. ১১২।

১৩৯. H. V. Hodson, The Great Divide. p. 101.

www.pathagar.com

দিতে চাহিলেন। ... পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এ সুযোগে আরবির বদলে দেবনাগরী বর্ণ সঙ্কেতের প্রচলন করিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যে হিন্দুয়ানী বর্ণ সঙ্কেতের প্রচলন করিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যে হিন্দুয়ানী পৌত্তলিক আদর্শ স্থাপন করিলেন। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা একবার হারাইলে দেশবাসী আবার স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারেন। কোনো জাতি একবার কালচারাল স্বাতন্ত্র্য হারাইলে তাহার আর বাঁচিয়া উঠিবার কোনো আশা নাই। মুসলিম বঙ্গকে বাঁচাইতে হইলে ইসলামি কালচার ও আরবি বর্ণ সঙ্কেতের পুনরুদ্ধারের ভিতর দিয়াই বাঁচিতে হইবে। আইরিশ জাতি নিজের গেলিক ভাষা ও গেলিক কালচারের উদ্ধার সাধন করিয়াই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জন করেন। বাঙ্গলার মুসলিমরা দেবনাগরী বর্ণ সংকেত গ্রহণ করায় সমগ্র বিশ্বমুসলিম কালচার হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছেন- ইহাকে Cultural isolation বলা যাইতে পারে।[১৪০]

অবশ্য এ কথা সত্য, যুগ যুগ ধরে শিরকীয়[১৪১] সংস্কৃতি গড়ে উঠা সমাজে ইসলাম আসার পরও কোনো কোনো জায়গায় শিরকীয় সংস্কৃতির প্রভাব ও ছাপ এখনো লক্ষণীয়। ভারতীয় উপমহাদেশই এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ। হাজার-বারশ' বছর আগেও এদেশে নির্ভেজাল শিরকীয় সংস্কৃতি চর্চা ছিল। ইসলামি সংস্কৃতির অভ্যুদয়ে তার প্রতাপে ভাটা পড়ে। ইসলামি সংস্কৃতি আগমনের পূর্ব পর্যন্ত বৃহত্তর ভারতীয় তথা আর্য সংস্কৃতির সাথে বিরোধ চলে আসছিল। কিন্তু ইসলামি সংস্কৃতির সকল অভিযাত্রা এবং তাদের দুর্বার স্রোতধারা থেকে আত্মরক্ষার জন্য সে নিজেকে ভারতীয় আর্য সংস্কৃতির কোলে ঠেলে দেয়। এরপর চলে বাংলার ইসলামি সংস্কৃতির বিরুদ্ধে স্থানীয় ও আর্য সংস্কৃতির মিলিত চক্রান্ত। এ চক্রান্ত কয়েকটি কারণে হয়েছে।

প্রথমত, হিন্দু জাতি ও হিন্দু ধর্মের প্রকৃতি,

দ্বিতীয়ত, সূফিবাদের গঠনাকৃতি এবং

তৃতীয়ত, তুর্কি, ইরান ও মোগল শাসক তথা ভারতীয় মুসলিম শাসকদের কার্যকলাপ ও ইসলামি চারিত্রিক অপূর্ণতা এবং দুর্বলতা।

এগুলো 'শিরকীয়' সংস্কৃতির পথকে উম্মুক্ত করে দেয়। মুসলিম শাসনের গোড়া থেকে না হলেও অন্তত কিছুকাল পর থেকে এ ট্রাজেডি চলতে থাকে। ইংরেজদের গোলামি তো মাত্র সোয়া দুইশ' বছর আগের ঘটনা। তারও কয়েকশ' বছর আগ থেকেই বাংলায় ইসলামি সংস্কৃতি ও 'শিরকীয়' সংস্কৃতি অর্থাৎ মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাব শুরু হয়। ইংরেজের গোলামি যুগে এ প্রভাব ষোলকলায় পূর্ণ হয়। বৃটিশ যুগে মুসলমানরা এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল, যখন তারা তাদের নামের আগে শ্রী যুক্ত করতো। হিন্দু দেব-দেবীর নামে নিজেদের সন্তানদের নামকরণ করতেও কুণ্ঠাবোধ করতো না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীত শিখানো হতো।

---

১৪০. মোহাম্মদ আহবাব চৌধুরী বিদ্যাবিনোদ, কালচারের লড়াই, 'মাসিক মুহাম্মদি', ৩য় বর্ষ ১২শ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৩৭।
মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৯-৫০।

১৪১. 'শিরক' শব্দের অর্থ অংশিদারিত্ব, আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করাকে ইসলামের পরিভাষায় 'শিরক' বলা হয়। যেমন, পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, লোকেরা যে সব বস্তুকে তাঁর শরীক সাব্যস্ত করে, তিনি সেগুলো থেকে পবিত্র।
সুরা হাশর, আয়াত ২৩।
মিসবাহুল লুগাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৯।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে ইসলামের আগমনকালে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ছাড়া অন্যান্য ধর্মের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ব্রাহ্মণ ধর্মও ব্যাপক পৌত্তলিক ধর্মের রূপ লাভ করেছিল। ভারতবর্ষের সমস্ত ধর্মও পৌত্তলিক ধর্মের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যায়। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও ব্রাহ্মণ সমাজ কলুষিত পরিবেশকে নির্মল করার জন্য ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্মের মাধ্যমে বৃহত্তর ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল। কিন্তু তাও একদিন ব্রাহ্মণ্যবাদী পৌত্তলিক ধর্ম মূলত প্রচণ্ড রক্ষণশীল শক্তির অধিকারী। হিন্দুস্থানে প্রবেশের পর আর্য জাতি একদিকে উন্নততর সভ্যতা সংস্কৃতির অধিকারী দ্রাবিড়দের নগর ও সভ্যতার বিলোপ সাধন করে। অন্যদিকে, তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে কোণঠাসা করে রাখে। আর্য ও দ্রাবিড়দের এ সংঘাত হাজার হাজার বছর ধরে চলতে থাকে। আর্যদের ধর্মীয় গ্রন্থাদিতে এ সংঘাতের সুস্পষ্ট ছাপ রয়েছে। আর্যদের আগমনের পর এ উপমহাদেশে যতগুলো জাতির আগমন হয়েছে, তারা কেউ নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারেনি। আর্য ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করে ফেলে। দ্রাবিড় ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতির উপরর যথেষ্ট ক্রিয়া করেছে। এর ফলে আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতি পরিপূর্ণ পৌত্তলিক ধর্ম ও সংস্কৃতির রূপ লাভ করে।

ইসলামের আগমনকালে পৌত্তলিক ধর্ম ও সংস্কৃতিই ছিল ভারতবর্ষের 'ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক' পরিচয়। এর কারণে ইসলামি সংস্কৃতির সাথে হিন্দু সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ বাধে। কিন্তু ইসলাম এ উপমহাদেশে তার সংগ্রামী ও যথার্থ ভূমিকা পালনের সঠিক সুযোগ ও সময় খুব কম পেয়েছে। এর ফলে পুরাতন আগ্রাসননীতি অবলম্বন করার সুযোগ পেয়েছে পৌত্তলিকতাবাদী দর্শন ও সংস্কৃতি।

সংগীত প্রশ্নে মাওলানা আকরম খাঁ

আল্লাহ মানবজাতিকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠরূপে সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে লাগামহীন জীবন যাপনের অনুমতি দেননি। নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত গণ্ডির মধ্যেই মানুষের বিচরণের সীমানা। ইসলাম মানুষের জন্য বৈধ এবং অবৈধ বিষয়াবলি নির্ণয় করে দিয়েছে।

মুসলিম সমাজে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় সংগীত বা গান-বাদ্য নিয়েও মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। ইসলমি চিন্তাবিদগণ কুরআন-হাদিসের নিরিখে কোনো ধরনের গানকে বৈধ বলেছেন, আবার কোনোটিকে অবৈধ বলেছেন। মাওলানা আকরম খাঁ-ও সংগীত নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন :

আল্লাহ তাআলা মানব হৃদয়ে একটি গূঢ়ভাব এমনভাবে গুপ্ত রেখেছেন, যেমন লৌহ ও প্রস্তরের মধ্যে অগ্নি লুক্কায়িত রয়েছে। লৌহ দ্বারা প্রস্তরের ওপর আঘাত করলে যেমন সে গুপ্ত অগ্নি বের হয়ে সব কিছু ভস্মীভূত করে দেয়, তেমনি ছন্দযুক্ত সুললিত মধুর সুর শ্রবণেও মানব হৃদয় আলোড়িত উদ্বেলিত হয়। আপনা-আপনি হৃদয়ের সে গুপ্ত ভাব জাগরিত হয়ে ওঠে, এ ভাব বিবর্তনের ওপর মানুষের কোনো ক্ষমতা নেই, আধ্যাত্মিক জগতের সাথে মানবাত্মার যে এক অনির্বচনীয় নৈকট্য রয়েছে তা-ই এ আলোড়নের এবং ভাব বিবর্তনের কারণ। আধ্যাত্মিক জগৎ সমস্ত শোভা ও সৌন্দর্যের জগৎ, আত্মার সাথে এর ঘনিষ্ঠতাই সকল শোভা এবং সৌন্দর্যের মূল। ইহজগতের যে বস্তু মানবাত্মার অনুকূল, তা সেই আধ্যাত্মিক সকল শোভা এবং সৌন্দর্যের ফল। ইহজগতের ছন্দযুক্ত সুমধুর এবং মনোমুগ্ধকর সুরগুলো সেই আত্মিক জগতের সাথে সংগীত, সামা বা মুরশেদী গযলের সুমধুর তানের এ সাদৃশ্য থাকার কারণেই এর সুললিত ও মনোমুগ্ধকর ঝংকার মানব হৃদয়ে এক অনির্বচনীয় অনুভূতি ও ভাবতরঙ্গের

www.pathagar.com

সৃষ্টি করে এমন এক অস্বাভাবিক আলোড়ন ও কামনা জাগিয়ে তোলে, যার ফলে সম্ভবত মানুষ তখন নিজেকে কোনো অজানায় হারিয়ে ফেলে। মানুষ উপলব্ধি করতে পারে না যে, এ আন্দোলন এবং কামনা কিসের? যে হৃদয় সব ধরনের বন্ধনমুক্ত তাতেই এ আন্দোলন এবং কামনার উৎপত্তি হয়ে থাকে। কিন্তু যে অন্তর ভাবাসিক্ত কিংবা খোদার প্রতি প্রেম, অথবা তার প্রিয় বন্ধুর প্রতি প্রেম, সংসারের মোহ প্রভৃতি কোনো না কোনো পদার্থের প্রতি আসক্ত ও আকৃষ্ট রয়েছে, সে অন্তর সুললিত কণ্ঠের সুর শ্রবণ করা মাত্রই ভাবে আপ্লুত ও আন্দোলিত হয়ে ওঠে।

সুন্দর স্বর সুললিত কণ্ঠের সুর পরম করুণাময়ের এক বিরাট নিয়ামত- যা মানুষকে নির্মল আনন্দ দেয়। আনন্দদায়ক বস্তু মাত্রই ইসলামে হারাম- এ কথা ঠিক নয়। আনন্দদায়ক বস্তুগুলোর মধ্যে যেগুলো হারামনির্দিষ্ট করা হয়েছে সেগুলো আনন্দদায়ক এবং ভাল লাগার কারণেই হারাম হয় নি। এ কারণে হারাম হয়েছে যে, তাতে মানুষের সদগুণাবলী নষ্ট হয়, অশ্লীলতা বেড়ে যায়, চরিত্র ধ্বংস হয়। অতএব, এ স্থলে এরূপ উক্তি করা সঠিক হবে না যে, যেহেতু সংগীত বা সামা আনন্দদায়ক এবং শুনতে ভাল লাগে, মন প্রফুল্ল হয়- এ জন্য তা হারাম। আনন্দ এবং সৌন্দর্য দিয়ে মহান সৃষ্টিকর্তা পৃথিবীকে সুশোভিত করেছেন। তাই আমরা দেখি রং-বেরঙের সুদর্শন পাখির মন মাতানো সুমিষ্ট গান, সবুজ বর্ণের বিচিত্র বৃক্ষলতা পরিশোভিত প্রান্তরে কলকল রবে প্রবাহিত স্রোতস্বতীর তীরে প্রস্ফুটিত চিত্তহারী পুষ্প এবং প্রাতঃকালীন ও সান্ধ্যভ্রমণ একে আনন্দ দেয়। শ্রুতির পক্ষে সুমধুর তান তেমনি আনন্দদায়ক- যেমন চক্ষুর জন্য মনোরম সবুজ প্রান্তর ও চিত্তাকর্ষক দৃশ্য। এ রূপে বিভিন্ন ইন্দ্রিয় মনোরম দৃশ্য, সুগন্ধ দ্রব্য প্রভৃতি তৃপ্তিকর আস্বাদন থেকে এক প্রকারের স্বাদ পেয়ে থাকে। এগুলো কিছুই হারাম নয় এবং তা অন্যায়ও নয়। তবে সামা বা সংগীতের সুমধুর শ্রবণের স্বাদ উপভোগ করা শ্রবণেন্দ্রিয়ের জন্য হারাম হবে কেন?

আমাদের আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সংগীত। এ সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে একটু পেছনে যেতে হবে। আরবে ইসলামের আবির্ভাবকালে সংগীতের কঠোর নিন্দা করা হয়েছে। আরবের গায়িকারা তখন প্রকাশ্যে সরাইখানায় বা জলসায় আপত্তিকরভাবে সংগীত পরিবেশন করতো। তারা নৈতিকতাহীন ছিল। এ জন্য মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগত কারণেই এ অশ্লীল আনন্দ লাভকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল।[১৪২] বিনোদনের নামে পৌত্তলিক আরবরা যে কোনো ধরনের পাপাচারে লিপ্ত থাকতো। শিল্প সংগীতের নামে নির্লজ্জ ইন্দ্রিয়সুখ লাভে প্রবৃত্ত তখনকার মানুষকে সুপথে আনার লক্ষ্যে ইসলাম এ ক্ষেত্রে আপোষহীন মনোভাব গ্রহণ করেছিল। এ-ভাবে সর্বপ্রথম 'মালাহী'কে[১৪৩] অবদমন এবং দ্বিতীয়ত ভাবনায়, ব্যবহারে এবং আনন্দ লাভের প্রক্রিয়ায় সংযত মূল্যবোধ লালনের অভিপ্রায় ইসলামে শিল্প সংগীতের প্রতি এ বিরূপ মনোভাব পোষণ করা হতো।

ইসলামের প্রথম তিন খলীফার আমলে এ বিধি-নিষেধ অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে মানা হতো। কিন্তু ইসলাম কখনো মানুষের নির্দোষ আনন্দ উপভোগে বাধ সাধেনি। চতুর্থ

---

১৪২. হযরত আবু হুরায়রাহ বর্ণিত হাদিস- রাসুল (স.) বলেছেন-
"ইসতিমাউল মালাহী মাসিয়াতুন"
ম. ন. মুস্তফা, আমাদের সংগীত, ইতিহাসের আলোকে, ১৯৮১ পৃ. ৯৬।

১৪৩. ইমাম গায্যালি, কিমিয়ায়ে সাআদাত, ১৯৭৯, পৃ. ২২৬।

www.pathagar.com

খলীফা হযরত আলি নির্দোষ সংগীত শিল্পের উৎকর্ষতার জন্য উৎসাহ প্রদান করেছেন বলে বর্ণিত আছে।[১৪৪] তিনি নিষ্পাপ ও কলুষহীন সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে নির্দোষ আনন্দ লাভ থেকে জনগণকে নিরুৎসাহিত করেননি। আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসা বাক্য উচ্চারণ বা নবি (স.)-এর যশগাঁথা বর্ণনায় উপাসনার স্থানে সর্বত্রই যে সংগীতের উপস্থিতি আছে, তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত, আযানের ধ্বনি, সূফি-দরবেশদের আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শপূর্ণ গান এবং সাধারণ ধর্মবিষয়ক সংগীত- এ সব কিছু শুদ্ধ সংগীত না হলেও এর মধ্যে সাংগীতিক অনেক উপাদান সম্পৃক্ত রয়েছে। খন্দকের যুদ্ধে হযরত মুহাম্মদ (স.) নিজেও গানের কলি রচনা করেছেন বলে জানা যায় :

আখিরের শুভ ছাড়া শুভ নাহি আর
আনসারে মুহাজিরে আল্লাহ্ মদদগার।[১৪৫]

এ গানটি খন্দকের যুদ্ধের প্রস্তুতি লগ্নে পরিখা খননের কাজে নিয়োজিত আনসার ও মুহাজিররা কোরাসে গাইতেন।[১৪৬] মাধ্যম হিসেবে সংগীত যদি কাউকে ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করে কিংবা নির্দোষ আনন্দ দানের মাধ্যমে কাউকে বিপথগামী না করে তা হলে সেই সংগীতকে অমঙ্গলজনক বা নিষিদ্ধ বলা ঠিক হবে না।

কোনো কাজের সিদ্ধতা ও অসিদ্ধতা সম্পর্কে তর্ক উপস্থিত হলে যারা সে কাজকে অসিদ্ধ বলে দাবি করেন, সেটা প্রমাণের ভার তাদের উপর। অর্থাৎ, তাদেরকেই প্রমাণ করতে হবে যে, আলোচ্য কাজটি অমুক আইনের অমুক ধারামতে অপরাধজনক বলে নির্ধারিত হয়েছে। অসিদ্ধতার প্রমাণ না থাকলেই তা সিদ্ধ বা জায়েয বলে পরিগণিত হবে। এ ক্ষেত্রে সিদ্ধতার প্রমাণ উপস্থিত করার জন্য অন্য পক্ষকে বাধ্য করা যাবে না। ফলত, সংগীত সর্বক্ষেত্রে নিষিদ্ধ বা হারাম হওয়ার সন্তোষজনক প্রমাণ যদি বিদ্যমান না থাকে, তা হলেই বুঝতে হবে যে, এটাই তার জায়েয হওয়ার জন্য যথেষ্ট প্রমাণ।

ইসলাম ধর্মে অমুক কাজ নিষিদ্ধ-এরূপ দাবি যারা করবেন, তাদের দেখাতে হবে যে, কুরআনের অমুক আয়াতে বা হযরতের অমুক হাদিসে সে কাজকে হারাম বলে স্পষ্টভাবে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। ইসলামে সকল প্রকারের সংগীত সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ- এ দাবি যারা করবেন তাদের ঐ প্রকারের কুরআনের আয়াত বা হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর হাদিস উদ্ধৃত করে স্পষ্টভাবে নিজেদের দাবি প্রমাণ করতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি ইসলাম আল্লাহর সত্য ধর্ম, পূর্ণ ধর্ম, শাশ্বত ধর্ম। সকল দেশে, সকল যুগে তা সমানভাবে প্রযোজ্য। সুতরাং ইসলাম কখনও অচল হবে না। ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলি সংস্কারের আবশ্যক কখনও হবে না। নিজেদের অজ্ঞতার, অন্ধবিশ্বাসের ফলে আল্লাহর সে সত্য, সনাতন, পূর্ণ ও শাশ্বত ব্যবস্থাকে নানা আবর্জনা কূপের মধ্যে আচ্ছাদিত করে কার্যত অচল করে ফেলেছি আমরাই।

প্রকৃতপক্ষে সূক্ষ্ম চিন্তা করলে বোঝা যায়, খোদার সৃষ্ট দুনিয়ার সকল বস্তুই মূলত উত্তম ও কল্যাণকর; অকল্যাণ ও অপকৃতা শুধু তার ভ্রান্ত ব্যবহারের কারণে। যাবতীয় বস্তু অত্যন্ত সুন্দর সুনিপুণভাবে আল্লাহ্ সৃষ্টিকরেছেন। কারণ, এ বিশ্বজগৎ যিনি সৃষ্টি

---

১৪৪. গোলাম মোস্তফা, বিশ্বনবি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪।
মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোস্তফা চরিত, ১৯৭৫, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯৭।
১৪৫. ম. ন. মুস্তফা, ইতিহাসের আলোকে, ১৯৮১, পৃ. ১০৭।
১৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭।

www.pathagar.com

করেছেন তা এ জগতের কল্যাণ ও মঙ্গলোপযোগী করেই সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং প্রতিটি বস্তুই মূলত বিশেষ সৌন্দর্যের অধিকারী। বাহ্যিক দৃষ্টিতে কুকুর, শূকর, সাপ, বিচ্ছু, সিংহ, বাঘ প্রভৃতি বিষধর ও হিংস্র জন্তু – অকল্যাণকরই মনে হয়। কিন্তু গোটা বিশ্বের মঙ্গলামঙ্গল বিবেচনায় এগুলো কোনোটাই অমঙ্গলজনক নয়।

হাকিমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলি থানভী (রহ.) বলেছেন :

যাবতীয় মৌলিক এবং আনুষঙ্গিক বস্তু এর অন্তর্গত, যে সব বস্তু মৌলিক সত্তার অধিকারী ও দৃশ্যমান যথা-প্রাণি জগৎ, উদ্ভিদ জগৎ, জড়জগৎ প্রভৃতি এবং আনুষঙ্গিক অদৃশ্য বস্তু যথা স্বভাব, চরিত্র ও আমলসমূহই এর অন্তর্ভুক্ত।

এমনকি, যেগুলো কুচরিত্র ও কু-স্বভাব বলে কথিত, যথা- ক্রোধ, লোভ, যৌন কামনা প্রভৃতি প্রকৃতিগতভাবে খারাপ নয়, যথাস্থানে ও যথাসময়ে ব্যবহৃত না হওয়ার দরুন এগুলো অপকৃ ও অকল্যাণকর বলে প্রতিপন্ন হয়। যথাস্থলে ব্যবহৃত হলে এগুলোর কোনোটাই খারাপ ও অমঙ্গলজনক নয়। অতএব স্থান-কাল-অবস্থাভেদে সব সংগীতকেও হারাম বলা সমীচীন নয়। কারণ এমন কিছু সংগীত আছে যা মানুষকে স্রষ্টার প্রতি আনুগত্যের প্রেরণা যোগায়। অবশ্য, সংগীত সম্পর্কে ধর্মতত্ত্ববিদগণের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কারো মতে তা হারাম, কারো মতে জায়েয বা বৈধ। যাঁরা হারাম মনে করেন তাঁরা কুরআনের নিম্নোক্ত তিনটি দলিলকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন। মাওলানা আকরম খাঁ উক্ত তিনটি দলিলের উত্তরে তাঁর প্রামাণিক যুক্তি তুলে ধরেন।

প্রথম দলিল

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে–

> 'মানুষের মধ্যে কোনো কোনো লোক এমন আছে যারা অজ্ঞ লোকদের আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করার উদ্দেশ্যে বিনা জ্ঞানে কথার মধ্যকার যা বেহুদা বা অসার তাকে ক্রয় করে থাকে, এবং আল্লাহর প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা করে তাদের জন্যই রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি, এবং যখন আমার আয়াতগুলো তাদের নিকট আবৃত্তি করা হয়, তখন তারা দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন তারা তা শ্রবণ করেনি, তাদের কর্ণদ্বয় যেন বধির। অতএব, তাদের ক্লেশদায়ক শাস্তির সংবাদ শুনিয়ে দাও।'[১৪৭]

আলোচ্য আয়াত 'হাদিস' শব্দের অর্থ কথা, কিসসা কাহিনী 'লাহও' শব্দের অর্থ গাফেল হওয়া, যে সব বিষয় মানুষকে প্রয়োজনীয় কাজ থেকে গাফেল করে দেয়, সেগুলোকে 'লাহও' বলা হয়, মাঝে মাঝে এমন কাজকে লাহও বলা হয়, যার কোনো উল্লেখযোগ্য উপকারিতা নেই, কেবল সময় ক্ষেপণ অথবা মনোরঞ্জনের জন্য করা হয়, ক্রীড়া-কৌতুকের উপকরণ ক্রয় করাও এর অন্তর্ভুক্ত।

হযরত ইবন মাসউদ, ইবন আব্বাস ও জাবির (রা.) 'লাহওয়াল হাদিস'-এর অর্থ ও তাফসির করেছেন গান-বাদ্য করা। অধিকাংশ সাহাবি ও তাবেয়ির মতে গান, বাদ্যযন্ত্র ও অনর্থক কিসসা-কাহিনীসহ যে সব বস্তু মানুষকে আল্লাহর ইবাদত ও স্মরণ

---

১৪৭. সুরা লুকমান, আয়াত ৬।

www.pathagar.com

থেকে গাফিল করে, সেগুলোর সবই 'লাহওয়াল হাদিস'।[১৪৮] 'লাহওয়াল হাদিস' (বেহুদা কথা) ক্রয় করার অর্থ, গায়ক পুরুষ অথবা গায়িকা নারী ক্রয় করা, কিংবা অনুরূপ এমন অনর্থক বস্তু ক্রয় করা– যা মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল করে দেয়। ইবন জারীরও এ ব্যাপক অর্থ অবলম্বন করেছেন। তিরমিযির এক রেওয়ায়াতে রাসূল (স.) বলেছেন- 'গায়িকা বাঁদীদের ব্যবসা করো না।' অতঃপর তিনি বলেন, এ ধরনের ব্যবসা সম্পর্কেই উপরোল্লিখিত কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে। ইমাম জাওযিও 'বেহুদা কথা' অর্থে সংগীত নিয়েছেন। এ আয়াতের তাৎপর্য সম্পর্কে সূক্ষ্ম বিচারে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে পাঠকদের সম্পূর্ণ আয়াতের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। তা হলে একথা পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, 'লাহওয়াল হাদিস' কে সংগীত অর্থে গ্রহণ করলেও এর দ্বারা সকল সংগীত সকল অবস্থায় কখনই নিষিদ্ধ বলে প্রমাণিত হয় না। তাফসিরকারগণ এ প্রসঙ্গে বলেছেন–

আয়াতে উল্লিখিত 'লিয়ুদিল্লা' শব্দের লাম' তা'লিল বা কারণব্যঞ্জক। অতএব এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, মানুষকে আল্লাহর পথ হতে ভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে যে সব 'বেহুদা কথা' গ্রহণ করা হয় আয়াতে কেবল তাকেই নিন্দা করা হয়েছে।

এরূপ অবস্থায় গদ্য-পদ্য সংগীত-অসংগীতের কোনো পার্থক্যই থাকে না। অর্থাৎ, তা নিষিদ্ধ হয় গদ্য বা পদ্য অথবা সংগীত বলে নয়, বরং আল্লাহর পথ হতে মানুষকে ভ্রষ্ট করার জন্য তাকে উপলক্ষরূপে ব্যবহার করা হয় বলে।

এরপর আয়াতের শানে নুযুলের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, মক্কার ধর্মদ্রোহী মুশরিক ব্যক্তিরা বিশেষ করে নযর ইবন হারিস, ইবন আশরাফ, ইবন লুহাই এবং তার সহযোগীরা জনসাধারণকে ইসলাম থেকে বিমুখ ও বিচ্যুত করার জন্য নানা ধরনের বেহুদা গাল-গল্প ও চটকদার কবিতা আবৃত্তিতে অভ্যস্ত ছিল এবং যারা কুরআনের মধুর বাণী শ্রবণ করে অহংকার ও গর্ব করে একে উপেক্ষা করতো, আয়াতে তাদের নিন্দা করা হয়েছে মাত্র, সরাসরি সংগীত-অসংগীত নিয়ে কোনো কথাই এখানে বলা হয়নি।

এখানে মতভেদের মূল কারণ 'লাহওয়া' শব্দের তাৎপর্য নিয়ে। ইবন আব্বাস, ইবন মাসউদ, ইমাম জাওযি 'লাহওয়া' শব্দের অর্থ সংগীত নিয়েছেন। এর উত্তরে প্রখ্যাত মুফাসসির মাওলানা আকরম খাঁ তাঁর 'সংগীত সমস্যা' প্রবন্ধে বলেছেন :

> আমরা আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস এবং হযরত মাসউদকে বুজর্গ বলে মান্য করলেও নবি ও মাসুম বলে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করতে কখনও প্রস্তুত নহি।[১৪৯]

সুতরাং তাঁদের উক্তি বিনা বিচারে গ্রহণ করা আমরা অসংগত বলেই মনে করি। কারণ তাঁরা যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাকেই একমাত্র যথার্থ বিশ্লেষণ বা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণ করতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। তাঁদের সব যুক্তিই ত্রুটিহীন নয়।

'লাহু' শব্দের অর্থ সকল প্রকারের খেল-তামাশা, অনর্থক কাজ, কথা বা আনন্দদায়ক ব্যাপার, যা মানুষকে গুরুতর বিষয় হতে বিরত রাখে। 'হাদিস' শব্দের অর্থ কথা, 'লাহওয়াল-হাদিস'-এর অর্থ দাঁড়ায় আল-লাহুও মিনাল হাদিস'। অতএব, ঐ

---

১৪৮. মুফতি মুহাম্মদ শফি, মাআরিফুল কুরআন, ১৯৮২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৫।
১৪৯. আবু জাফর, মাওলানা আকরম খাঁ, প্রাগুক্ত, ১৯৮২, পৃ. ৬০৬।
ম. ন. মুস্তফা, আমাদের সংগীত, ইতিহাসের আলোকে, ১৯৮১, পৃ. ১০৯।

www.pathagar.com

শ্রেণির সমস্ত কথাই এর অন্তর্ভুক্ত, তা সংগীত হোক বা না হোক। অর্থাৎ, যে অবস্থায় যে শ্রেণির কথা বলা বা শোনা নিষিদ্ধ, যে অবস্থায় যে শ্রেণির গদ্য বা পদ্য শোনা নিষিদ্ধ, সে অবস্থায় সেই শ্রেণির গান করা ও শোনাও নিষিদ্ধ হবে। এমনকি অসৎ উদ্দেশ্যে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করাও এর অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম গাযযালি (র.) এ প্রসঙ্গে সুন্দর একটি উদাহরণ পেশ করেছেন। একজন কপট ইমাম কুরআনের সুরা আবাসার প্রথম থেকে কয়েকটি আয়াত প্রায়ই সব নামাযে তিলাওযাত করতেন। সুরা আবাসার এ অংশে আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবিকে একজন অন্ধ লোককে অবজ্ঞা করার জন্য কিছুটা শক্ত ভাষা ব্যক্ত করেছেন, এ কপট ইমামের এ অংশটুকু পুনঃ পুনঃ তিলাওয়াতের উদ্দেশ্য ছিল মুসলানদের মনে যেন ধীরে ধীরে হযরত মুহাম্মদ (স.) সম্পর্কে একটি বিরূপ ভাবের সৃষ্টি করে। হযরত ওমর (রা.) এ ঘটনা শুনে এমন রাগান্বিত হয়েছিলেন যে, তিনি ঐ কপট ও ভণ্ড ইমামকে হত্যা করতে হুমকি পর্যন্ত দিয়েছিলেন।[১৫০] এতে বোঝা যায়, মানুষকে ধর্ম থেকে বিপথগামী করার উদ্দেশ্যে কুরআন তিলাওয়াতও নিষিদ্ধ।

অতএব, যে অবস্থায় যে শ্রেণির কথাবার্তা সিদ্ধ- সে অবস্থায়, সে শ্রেণির সংগীতও সিদ্ধ। বস্তুত ইবন আব্বাসের নামকরণের বর্ণিত সমস্ত রিওয়ায়াত একত্র করে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেও এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না। এখানে আব্বাস (রা.) স্পষ্ট বলছেন : 'হুয়াল-গিনা ওয়া আশবাহিহি' অর্থাৎ, গান ও তার অনুরূপ বিষয়সমূহ হচ্ছে 'লাহও'। সুতরাং একমাত্র সংগীতকেই 'লাহও' বলা হচ্ছে না। অনুরূপ সমস্ত বিষয়ই এর অন্তর্ভুক্ত। সংগীতকে সংগীত বলে হারাম করলে তার জন্য এমন ব্যাপক শব্দ কখনই ব্যবহার করা হতো না। ফলে, 'লাহওয়ালা হাদিস'-এর অন্তর্ভুক্ত হবে সে সকল সংগীত, যা মুসলমানদের ইসলাম হতে বিচ্যুত করার উদ্দেশ্যে রচিত। সুতরাং, এ আয়াত হবে গৌণভাবে কেবল সে শ্রেণির সংগীতের নিষিদ্ধতার প্রমাণ- সকল সংগীতের নয়।

ইমাম জাওযি এ আয়াতকে প্রমাণ স্বরূপ উপস্থাপিত করে নিজেদের মতের সমর্থনে কয়েকটি হাদিসেরও উল্লেখ করেছেন। হাদিসগুলোর সারমর্ম এ যে, গায়িকা-দাসীর ক্রয়-বিক্রয় এবং তাদের সংগীত প্রশিক্ষণ দেয়া হারাম। এ আদেশ প্রচারের সাথে সাথে আলোচ্য আয়াতেরও বরাত দিয়েছেন।

অতএব, এ আয়াত যে গায়িকা-দাসীদের ক্রয়-বিক্রয় হারাম করে দিচ্ছে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এর পর এটাও দেখা যাচ্ছে যে, গায়িকা-দাসীর ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ করে দেয়ার হেতু হচ্ছে তার 'সংগীত'। অন্যথায়, সাধারণ দাস-দাসীর বিক্রয় তখন অসিদ্ধ ছিল না। মাওলানা আকরম খাঁ বলেন যে, উল্লিখিত রিওয়ায়াতগুলো এত দুর্বল ও অবিশ্বস্ত যে, হযরতের হাদিস বলে বর্ণনা করা কখনও সঙ্গত হবে না।[১৫১] ইমাম তিরমিযি (রহঃ) এ হাদিসের উল্লেখ করে একে 'হাদিসে গরীব' এবং এর রাবী আলি ইবন্ যায়েদকে দুর্বল বলে মত প্রকাশ করেছেন।[১৫২] এ সম্বন্ধে একটি হাদিসও নির্দোষ

১৫০. ম. ন. মুস্তফা, আমাদের সংগীত, ইতিহাসের আলোকে, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, পৃ. ১০৮, প্রকাশকাল-১৯৮১ ইং।

১৫১. আবু জাফর, আকরম খাঁ, ১৯৮৬ ইং, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৮।

১৫২. হাফেজ ইবনে কাছির বলেন এ হাদিসের রাবি-আলি তার গুরু এবং শিষ্য সকলেই দুর্বল।

www.pathagar.com

নয়।[১৫৩] অতএব, প্রথমত, কুরআনের এ আয়াত হতে সংগীত মাত্রই নিষিদ্ধ হওয়া কখনই প্রমাণিত হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, এ আয়াতের সমর্থনে যে-সব হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে তা নিতান্ত দুর্বল ও অবিশ্বাস্য। এগুলো নবি করিম (সা.)- এর হাদিস বলে মনে করা সঙ্গত হবে না।

দ্বিতীয় দলিল

সুরা নাজমের শেষ রুকূতে বর্ণিত হয়েছে–

> তবে কি তোমরা এ (কিয়ামতের) কথায় আশ্চর্যান্বিত হয়ে যাচ্ছ এবং হাসছ, কাঁদছ না, আর তোমরা গাফিল হয়েছ।

আয়াতে উল্লিখিত 'সামেদুন' শব্দের একবচন 'সামেদ' অর্থ 'গাফিল'।[১৫৪] ইবন জাওযি এবং তাঁর মতাবলম্বীরা বলছেন, 'সামেদ' শব্দের অর্থ সংগীত, বাণী। কারণ, ইবন আব্বাস বলছেন এটা আরবি ভাষার শব্দ নয়। 'হেময়রি' ভাষায় এর অর্থ সংগীত। ঐ সম্পর্কে মাওলানা আকরম খাঁ বলেন- হযরত ইবন আব্বাস ঐরূপ কথা বলেননি, আর বললেও তা গ্রাহ্য হতে পারে না। নাফে ইবনুল আযরফের প্রশ্নের উত্তরে স্বয়ং ইবন আব্বাস হোজায়লার কবিতা উদ্ধৃত করে তার আরবি ভাষার শব্দ হওয়া দৃঢ়তার সাথে প্রমাণ করেছেন, এ অবস্থায় তিনি কি করে বলতে পারে যে, এটি বিদেশী শব্দ। এরপর কুরআনে বিদেশী শব্দ স্থান লাভ করেছে বলে অধিকাংশ ব্যাখ্যা-বিশারদগণ স্বীকার করেন না। পক্ষান্তরে আরবি ভাষায় এর বহুল প্রচলন আছে। একদা হযরত আলি (রা.) মসজিদে প্রবেশ করে দেখলেন- মুসল্লিরা তাঁর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। এ'তে হযরত আলি তাঁদের সম্বোধন করে বললেন- 'মা'লী আরা-কুম সামেদিন'। অর্থাৎ আমি তোমাদের 'সামেদিন' অবস্থায় দেখছি, এর কারণ কি? অর্থাৎ বসে জিকির-ফিকির ও ধ্যান-ধারণায় মশগুল থাকবে, তার প্রতি গাফলত করে তোমরা দাঁড়িয়ে আছ- এর কারণ কি?

ইমাম জাওযিসহ যাঁরা 'সামেদিন' অর্থ সংগীত বলেছেন, তাদের অর্থ গ্রহণ করলে এখানে এ হাদিসের অর্থ এরূপ দাঁড়াবে- মুসল্লিরা হযরত আলির অপেক্ষায় মসজিদে দাঁড়িয়েছিলেন, এমন সময় তিনি সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'তোমাদের সকলকে গান গাইতে দেখছি এর কারণ কি?'[১৫৫] পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, 'সমদ' শব্দের অর্থ যে 'সংগীত'- হযরত ইবন আব্বাস এ রূপ কথা বলেছেন বলে বিশ্বস্ত সূত্রে প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ বর্ণনাটি নির্ভর করছে 'ইকরামার' বর্ণনার ওপর। ইকরামার মত অবিশ্বস্ত রাবী খুব কমই খুঁজে পাওয়া যায়। ইবন আব্বাসের নামে বহু মিথ্যা হাদিস বর্ণনা করার ফলে স্বয়ং তাঁর পুত্র আলি অবশেষে ইকরামাকে খামের গায়ে বেঁধে রাখেন, ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করা হলে আলি বলেন- 'এ খবিসটা আমার পিতার নামে মিথ্যা বর্ণনা করে থাকে।'[১৫৬] এ হেন ইকরামা ইবন আব্বাসের নাম করে যে রিওয়ায়াত

ইবনে কাছির, তাফসির, বৈরুত, ১৯৬৬, পৃ. ৮-৩।

১৫৩. ফতহুল বয়ান, পৃ. ৭।

১৫৪. সুরা আন-নাজ্‌ম, ৫৯-৬১।

১৫৫. আবু জাফর, আকরম খাঁ, প্রাগুক্ত, ১৯৮৬, পৃ. ৬১৫।
কানজুল ওম্মাল, পৃ. ৪-২৫০।

১৫৬. আবু জাফর, মাওলানা আকরম খাঁ, পৃ. ৬১০।

www.pathagar.com

বর্ণনা করেছেন, বিশেষত যা তাঁর অনান্য রিওয়ায়াতের বিপরীত, তা কোনো মতেই গৃহীত হতে পারে না।

তৃতীয় দলিল

কুরআনের অন্য একটি আয়াতকে সংগীত নিষিদ্ধকরণ বক্তব্যের পক্ষে উপস্থাপন করা হয়। সুরা বনী ইসরাইলে ইবলিসের কথার উত্তরে বর্ণিত হয়েছে- এবং তাদের মধ্যকার যাকে পার নিজের 'শব্দের' দ্বারা বিচলিত করার চেষ্টা করতে থাক।[১৫৭] শয়তানের কণ্ঠস্বর খুবই মিষ্টি ও সুললিত। শয়তান তার এ সুললিত কণ্ঠস্বর দিয়ে মানুষকে বিপথে পরিচালিত করে। ইমাম ইবন জাওযি ও তার মতাবলম্বীরা বলছেন, শয়তানের শব্দ হচ্ছে সংগীত। কারণ মুজাহিদও ঐ রূপ বলেছেন। হযরত ইবন আব্বাস 'সামেদুন' শব্দকে গান হিসেবে ব্যাখ্যা দিয়ে থাকলেও 'সাওত' শব্দটিতে সংগীত অর্থ জ্ঞাপক হিসেবে উল্লেখ করেননি। এখানে তারা ইব্‌ন আব্বাসের তাফসিরকে উপেক্ষা করতে একটুও দ্বিধাবোধ করেননি। মুজাহিদ বলছেন : 'সাওত' শব্দের অর্থ সংগীত, আরবি সাহিত্যের চিরাচরিত সিদ্ধান্তের এমন কি কুরআনের ব্যবহারের বিপরীত সংগীত হয়ে গেল। এটা মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়। সুরা হুজুরাতে মু'মিনদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে–

> তোমরা নিজেদের 'সাওতকে' নবির 'সাওত' এর উপর উচ্চ করো না।[১৫৮] এখানে 'সাওত' শব্দের অর্থ আওয়াজ, স্বর– সংগীত অর্থ কখনো হতে পারে না।

সুরা লুকমানে বর্ণিত হয়েছে- ওয়াগদুদ সাওতিকা'- 'এবং কণ্ঠস্বর নীচু কর'। এখানে 'সাওত' অর্থ কখনো সংগীত হতে পারে কি? এর পরেই বলা হয়েছে ইন্না আনকারাল আসওয়াতা লাসাওতুল হামীর[১৫৯] অর্থাৎ, 'নিঃসন্দেহে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।' এখান 'সাওত' শব্দের অর্থ 'সংগীত' হলে আয়াতের অনুবাদ হবে, 'নিশ্চয়ই সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত সংগীত হচ্ছে গর্দভের গান'। তারা আরো বলেন, সাওত শব্দের অর্থ যে স্বর, শব্দ, আওয়াজ, তা আমরাও মানি, কিন্তু এখানে শয়তানের সাথে সম্বন্ধ হয়েছে। ভাবার্থে এর তাৎপর্য গ্রহণের এবং শয়তান সংক্রান্ত এ অনুমানের কোনো উপযুক্ত প্রমাণ তারা পেশ করতে পারেননি। অতঃপর আরবি ভাষায় গান বা 'সংগীত' অর্থ জ্ঞাপক প্রচুর শব্দ থাকা সত্ত্বেও কুরআন শরিফের কোথাও 'লাহওয়া'; কোথাও 'সামেদুন' আবার কোথাও 'সাওত' শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে গান বা সঙ্গীত বোঝানো হবে- এ কথা সহজে গ্রহণ করা যায় না। এ পর্যন্ত আলোচনায় সংগীত নিষিদ্ধ হওয়ার প্রমাণ স্বরূপ কুরআনের যে আয়াতগুলো উপস্থাপিত হয়েছে, তাতে প্রতীয়মান হয় যে, সংগীত সিদ্ধ ও অসিদ্ধ হওয়ার সাথে ঐ আয়াতগুলোর প্রত্যক্ষ কোনো সম্বন্ধ নেই এবং হাদিসগুলোর সনদও দুর্বল।

হযরত মুহাম্মদদের (স.) কতিপয় হাদিস অনুযায়ী সংগীতকে নিষিদ্ধ বলা হয়ে থাকে। যে সব হাদিস অনুযায়ী সংগীতকে নিষিদ্ধ বলা হয়, ইমাম গায্যালি (রহঃ) তাঁর

মিজানুল ই'তিদাল, পৃ. ২-১৮৭।
১৫৭. সুরা বনি ইস্‌রাইল, ৬৪।
১৫৮. সুরা হুজুরাত, আয়াত ২।
১৫৯. সুরা লুকমান, আয়াত ১৯।

www.pathagar.com

'ইহ-ইয়া-উল' উলুমুদ্দীন' ও 'কিমিয়ায়ে সাআদাত' গ্রন্থে তা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[১৬০] সংগীত বা সংগীত পরিবেশনকে অনুজ্ঞেয় বা অনুমোদন দানকারী এমন অকৃত্রিম ও প্রমাণিত হাদিসেরও দুস্প্রাপ্যতা নেই। নিম্নে এরূপ ক'টি হাদিসের উল্লেখ করা হলো। এতে স্পষ্টই বোঝা যাবে যে, স্থান-কাল-অবস্থা পরিবেশ হিসেবে নির্দোষ নিষ্কলুষ সংগীতকে অনুমোদন করা হয়েছে।

ক. হযরত আয়িশা (রা.) বলছেন: আনসার গোত্রের একটি বালিকা আমার প্রতিপালনে ছিল। তার বিয়ের পর হযরত (স.) সোহাগ করে বললেন, আয়িশা এ কি রকম? গানের ব্যবস্থা করনি কেন? নব বধূর সঙ্গে একজন গায়িকা তার শ্বশুর বাড়ী পাঠিয়ে দাও। আনসার বংশ খুবই সংগীতপ্রিয়।[১৬১]

খ. হযরত আনাস (রা.) বলছেন: হযরতের একজন ইহুদি গায়ক ছিলেন তার নাম আনজাশা।[১৬২]

গ. হযরত আয়িশা (রা.) বলছেন: একদা ঈদের সময় হযরত সর্বাঙ্গ কাপড় মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন, আর দু'জন ক্রীতদাসী সেখানে বসে দফ বাজিয়ে বু'আছের সংগীত পরিবেশন করছে। এমন সময় আমার পিতা (আবু বকর রা.) সেখানে উপস্থিত হয়ে আমাকে ভর্ৎসনা করে বললেন, 'এ কি! হযরতের সম্মুখে শয়তানের ঝঙ্কার'। হযরত তখন মুখের কাপড় ফেলে বললেন, আবু বকর! ক্ষান্ত হও, সকল জাতির একটা উৎসব আছে, এদেরও আজ উৎসবের দিন।[১৬৩]

ঘ. খালেদ নামক একজন তাবেয়ি বলছেন, আশুরার দিন আমরা মদিনায় ছিলাম, সেখানে জাওয়াযী স্ত্রী লোকেরা দফ বাজাচ্ছিল আর গান পরিবেশন করছিল। আমরা এ সম্বন্ধে মু'আযের কন্যা রবিকে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বললেন, আমার বাসরকালে হুযুর (স.) আমার নিকট উপস্থিত হলেন, এবং তুমি যেমনভাবে বসেছ ঠিক তেমনিভাবে আমার বিছানার উপর উপবেশন করলেন। আমাদের দাসীরা তখন দফ বাজিয়ে গান আরম্ভ করলো।'[১৬৪]

(ঙ) হযরত রাসূলে করিম (স.) কোনো এক অভিযান হতে ফিরে এলে জনৈক স্ত্রীলোক তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আল্লাহ আপনাকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনলে আমি আপনার সম্মুখে দফ বাজাবো, আর গান পরিবেশন করবো। হযরত (স.) বললেন, বেশ কথা নিজের নযর পুরা কর। তখন সে স্ত্রীলোকটি গান করতে লাগলেন।'[১৬৫]

---

১৬০. ইমাম গায্যালি, কিমিয়ায়ে সাআদাত, ১৯৭৯, পৃ. ২১২-২৪৭।
১৬১. ম. ন. মুস্তফা, ১৯৮১, পৃ. ১১২।
১৬২. স্বর ও সঙ্গীতের দ্বারা উট পরিচালনা করাকে হুদী বলা হয়। সংগীতের মধ্যে হুদী গান মুবাহ বা জায়েয, এতে কারও মতভেদ নেই।
লুমআয়াত, মিশকাত, পৃ. ৪১০।
১৬৩. আবু বকর (রা.) মনে করেছিলেন, হযরত (স.) নিদ্রিত অধিকন্তু আল্লাহর নবির সম্মুখে গান করাকে তিনি বেআদবি মনে করেছিলেন। কিন্তু প্রিয় নবি ইরশাদ করলেন, উৎসবের দিনে সবাইকে প্রাণ খুলে আনন্দ করতে দাও। উৎসবের দিন কনিষ্ঠদের আনন্দ-উচ্ছ্বাস প্রকাশে বেআদবি হয় না।
আবু জাফর, মাওলানা আকরম খাঁ, ১৯৮৬, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৫।
১৬৪. প্রাগুক্ত।
১৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৬।

www.pathagar.com

এখানে উল্লেখ্য যে, হারাম কাজে নযর মানলে তা পূর্ণ করা শরিয়তে জায়েয বলে পরিগণিত হয় না। সুতরাং গান-বাজনা একদম হারাম হলে হযরত (স.) বলে দিতেন, তোমার নযরই সঠিক নয়। অতএব তা আর তোমাকে পুরা করতে হবে না। লা-ওফায়া লি নযরিন ফি মাছিয়াতিন অর্থাৎ কোনো পাপ কার্যের নযর পুরা করা অসংগত। এটা হযরতের স্পষ্ট হাদিস। নির্দোষ গান-বাজনা যে অবৈধ নয়, এ হাদিস তার অকাট্য প্রমাণ।

(চ) হযরত মুহাম্মদ (স.) মক্কা হতে মদীনায় হিজরত কালে যে কাছওয়া– এ মহামানবকে বহন করে যখন মদীনার নগরে প্রবেশ করলেন তখন মদীনার পুর-মহিমাগণ উন্মুক্ত ছাদের উপর অভ্যর্থনা সংগীত পরিবেশন করেছিলেন। নাজ্জার গোত্রের বালকরা দফ বাজিয়ে তাদের সে শিশু কণ্ঠের মধুর ঝঙ্কারে গান গেয়ে হযরত (স.)-এর খিদমতে স্বাগত সম্ভাষণ নিবেদন করলেন।

উপরোক্ত হাদিসগুলো দ্বারা বুঝা যাচ্ছে সকল অবস্থায় সব সংগীতকে সংগীত বলে হারাম হওয়ার ফতওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। পরহেজগারীর অতি আগ্রহের ফলে তারা শরী'য়তের স্পষ্ট বিধানকে অতি নির্মমভাবে উপেক্ষা করেছেন। প্রতিপক্ষ বলতে পারেন, এসব হাদিস হচ্ছে নির্দোষ ও সদ্ভাবপূর্ণ সংগীত সম্বন্ধে। যে সব গান মানুষকে পাপ, কুরুচি অশ্লীলতা এবং কুৎসিত কাজ বা ভাবের প্রতি আকর্ষণ করে সে সংগীত এ পর্যায়ভুক্ত নয়। আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করছি। যে সংগীত মানুষকে পাপের পথে প্রলুব্ধ করে, সে শ্রেণির সংগীত নিশ্চয়ই হারাম, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কথা শুধু এইটুকু যে হারাম হচ্ছে সংগীত বলে নয় বরং অশ্লীলতা ও পাপ বলে, কুপ্রবৃত্তির সহায়ক ও উত্তেজক বলে। যেমন– এ শ্রেণীর পাপ ও মন্দভাবপূর্ণ কুপ্রবৃত্তির উত্তেজক অসংগীত ও নিঃসন্দেহে হারাম। এ সম্পর্কে মাওলানা শাহ আব্দুল হক একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উক্তি করেছেন।

> অজ্ঞ জাহিল সে, যে সকল অবস্থায় সকল প্রকারের সংগীতকে হারাম বলে বিশ্বাস করে আর ব্যভিচারী ফাসিক সে, যে সকল প্রকারের সংগীতকে সকল অবস্থায় জায়েয বলে মনে করে।[১৬৬]

বিভিন্ন বর্ণনার সূত্রে জানা যায়, আরবের সংগীত, 'যাতে ছন্দ ও সুর থাকতো'- মুসলমানরা তা জায়েয জানতেন এবং হযরত (স.)-এর সম্মুখেও তাঁরা ঐরূপ সংগীত পরিবেশন করতেন। ইমাম আবুল ফজল ইস্পাহানির জগদ্বিখ্যাত আগানি' এবং ইমাম আহমদ ইবন আব্দ রাব্বেহী তাঁর গ্রন্থে মুসলমানদের সংগীতপ্রীতি, সংগীত চর্চা ও সংগীতে উৎসাহ দানের কথা বর্ণনা করেছেন।[১৬৭]

(ক) ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রা.) নাবেগাকে বললেন, তোমার গান আমাকে কিছু শুনাও। নাবেগা হযরত ওমর (রা.)- কে গান শুনালেন।[১৬৮]

---

১৬৬. নেকাতুল-হক মানকুল-আয তুহফায় ফকলি, পৃ. ৩৩।
১৬৭. আবদুল্লাহ ইবন জাফর সঙ্গীতে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। বিখ্যাত গায়ক তায়স এবং গায়িকা 'ইযয়াতুল-মায়লা'র সংগীত তিনি প্রায়ই শ্রবণ করতেন, বুখারির টীকাকার হাফেজ ইবনে হাজার আছকালানী একে প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার করেছেন।
তারিখুল আগানী, পৃ. ৩-১৬১।
১৬৮. আবু জাফর, মাওলানা আকরম খাঁ, সঙ্গীত সমস্যা, ১৯৮৬, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৮।

www.pathagar.com

(খ) আমের ইবনে সাদ বলছেন, আমি এক বিবাহে যোগদান করে কারাজা ইবন কা'ব ও আবু মাসউদ নামক দু'জন আনসারির নিকট উপস্থিত হয়ে দেখি জারিয়াগণ সেখানে গান গাইছে।

(গ) আবদুল্লাহ ইবন জুবায়ের নু'মান ইবনুল বশীর, ওমর ইবনে আবদুল আযীয, আমির মুআবিয়া, আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস সংগীত শ্রবণ করতেন বলে জানা যায়।[১৬৯] ইমাম আবু হানিফা নিজের এক প্রতিবেশীর নিকট সংগীত শ্রবণ করছেন সম্পর্কে উল্লেখ আছে।[১৭০] আল্লামা আবদুল গনি নাবলসি হানাফি এ কথার উল্লেখ করে বলছেন: একদিন সেই প্রতিবেশীকে খুঁজে না পাওয়ায় অনুসন্ধানে জানা গেল আমির আইনী তাকে গ্রেফতার করে কারারুদ্ধ করেছেন। ইমাম তাকে মুক্তির জন্য আমিরের নিকট অনুরোধ করলে আমির ঐ গায়ককে মুক্তি দেন। ইমাম আবূ ইউসুফ খলিফা হারুনুর রশিদের মজলিসে সংগীত শ্রবণ করে অনেক সময় ভাবে বিভোর হয়ে অশ্রুপাত করতেন, তাঁকে সংগীতের মাসআলা জিজ্ঞাসা করলে তিনি ইমাম আবু হানিফার ঐ ঘটনার কথা উল্লেখ করে বললেন, সংগীত না জায়েয হলে ইমাম আবূ হানিফা কখনও নিজের সময় নষ্ট করতেন না।

ইমাম আহমদ তাঁর পুত্রের মজলিসে উপস্থিত হয়ে জনৈক গায়কের সংগীত শ্রবণ করলে পুত্র জিজ্ঞাসা করলে, 'বাবা ! আপনি তো সংগীত জায়েয মনে করেন না।' ইমাম উত্তরে বললেন, যে সংগীত পাপ প্রবৃত্তির উত্তেজক, শুধুমাত্র সেটিই নিষিদ্ধ।[১৭১]

ইমাম মালেককে সংগীত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তরে বলেন, নিতান্ত অজ্ঞ মূর্খ ও হৃদয়হীন লোক ব্যতীত সংগীতকে অন্য কেউ হারাম বলতে পারে না। ইমাম শাফে'য়ীরও সংগীত শ্রবণের্র যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।[১৭২]

এ ছাড়াও স্বনামধন্য ইমাম ইবন হাজম, হযরত শেখ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী, আল্লামা কাজী ঈসা রচিত 'ইবাহাতুল-গিনা', শেখ কামাল উদ্দীন ইবন জাফর রচিত 'ইত্তেবা'য়ে-ফি আহকামিসসিমায়ে', ইমাম শাওকানির গ্রন্থ ইবতালু দাওয়াল ইজমায়ে আলা তাহরীমে মাতলাকুস-সিমায়ে', ইবনুল-আরাবির কিতাবুল আহকাম, আবদুল হক মুহাদ্দেছ দেহলভির নেকাতুল-হক, মাদারিজুন নবুওয়াত, আল্লামা আইনির হিদায়ার টীকা, শাহ মুহাম্মদ কাদের চিশতি হানাফি জৈনপুরীর তুহফাতুল-ফি-ইবাহাতিস, সিমায়ে ওয়াল মাযামীর' ইতাদি গ্রন্থে নির্দোষ সংগীত জায়েয সম্পর্কে অকাট্য প্রমাণ রয়েছে।[১৭৩] ইমাম গাযযালি তাঁর রচিত গ্রন্থে[১৭৪] দেখিয়েছেন যে, নির্দোষ সংগীতকে নিষিদ্ধ বলে ফতওয়া দিলে শরিয়তের এনকার হয়, এরূপ মুনকির কাফির হয়ে যায়। ইমাম তাঁর রচিত কিমিয়ায়ে সাআদাত ও এহইয়াউল উলুম আদদ্বীন গ্রন্থে[১৭৫] এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

---

১৬৯. তারিখুল আগানি, পৃ. ১-১০১।
১৭০. তাযকিরাতুল হামদাদিয়া।
আবু জাফর, আকরম খাঁ, ১৯৮৬, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২১।
১৭১. তাবলিছ, পৃ. ২৫৯।
১৭২. আবু জাফর, আকরম খাঁ, ১৯৮৬, পৃ. ৬২১।
১৭৩. প্রাগুক্ত.
১৭৪. ইমাম গায্যালির গ্রন্থের নাম বাওয়ারিকুস সিমায়ে ফি তাকফিরে মাঁই ইয়াহরিমুস সিমায়ে।
১৭৫. ইমাম গায্যালি, এহয়াউল- উলুম আদদ্বীন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৮-২১০।

www.pathagar.com

আমরা দেখি, ধর্মীয় নীতিমালার কতকগুলো বস্তু বা বিষয়ে মূলত তার হারাম হওয়ার কারণ বিদ্যমান থাকে। কতকগুলো বস্তুতে মূলত অবৈধ হওয়ার মতো এরূপ কোনো কারণ বিদ্যমান থাকে না, কেবল বাইরের ও সমসাময়িক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কখনও তা দোষযুক্ত এবং কখনও নির্দোষ বলে প্রতিপন্ন হয়ে থাকে। যেমন- কুরআনে মদ ও মদ্য পান সম্পর্কে প্রথমত হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।[১৭৬] দ্বিতীয়বার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জায়েয বা বৈধ বলা হয়েছে।[১৭৭] এ দৃষ্টান্ত সামনে রাখলে সংগীত সম্পর্কে একটা সঙ্গত অথচ শাস্ত্রসম্মত সমাধানে উপনীত হওয়া সহজ হবে। যদি দেখা যায়, সমাজের অধিকাংশ লোক অধিকাংশ সময় সংগীতের চর্চায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে, যার ফলে তাদের ইষ্টের অপেক্ষা অনিষ্টের আশংকা অধিক প্রবল হয়ে ওঠেছে, এবং এমন সংগীতের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে, যাতে ধর্মীয় ও নৈতিক দিক থেকে তাদের পতন অবশ্যম্ভাবী। এমনি অবস্থায় উল্লিখিত শ্রেণির সংগীতের ওপর নিষেধাজ্ঞা অত্যাবশ্যক।

একজন লোক নাট্যমঞ্চে থিয়েটারে সংগীত শ্রবণ করে আনন্দ উপভোগ করছে। অন্যজন খোদাদ্রোহী পৌত্তলিকতা ও সংশ্লিষ্ট অশ্লীল অনৈসলামিক শিক্ষাপূর্ণ যাত্রাগান শ্রবণ করে খুবই খুশী হচ্ছে- সংগীত জায়েয অতএব আমি তা শ্রবণ করেছি- এরূপ কথা উচ্চারণ করার অধিকার তাদের মোটেও নেই। সঙ্গীতকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হারাম বলা যেমন অন্যায়, তেমনি জায়েয বলে সকল প্রকার নিষিদ্ধ সংগীতকে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা তদপেক্ষা অধিক অন্যায়। যারা নিজেদের সংস্কার বা প্রবৃত্তিকে অনুসরণ-অনুকরণ করে সব সংগীত হারাম বা সব সঙ্গীত হালাল করে নিতে ব্যস্ত, উভয় দিককার সকল গোঁড়াপন্থীদের কথা বাদ দিয়ে যারা কেবল ইসলামের সত্যিকার ব্যবস্থার অনুসরণ করতে চান, সঙ্গত ও অসঙ্গত সংগীতের মধ্যস্থ শরিয়তের সীমান্ত রেখাকে তারা কখনই অতিক্রম করতে পারবেন না। এ সম্পর্কে মাওলানা আকরম খাঁ একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন, 'খাসী-ছাগলের গোশত খাওয়া ইসলামে জায়েয অতএব হাবিবুল্লাহ গাজীর বড় খাসী চুরি করে এনে তার গোশত খাওয়াও জায়েয হবে।'[১৭৮] এ ধরনের কথা যারা বলতে পারেন তারা মানুষ হিসেবে গণনার গণ্ডীর মধ্যে আসতে পারে না।

প্রখ্যাত আলিমে দ্বীন মাওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন সংগীত বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করে বলেন :

নবিজি (স.), খলিফা ও সাহাবার সময় কোনো প্রকার গীতবাদ্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলে কোনো প্রমাণ মেলে না।

> খোদাতায়ালা হতভাগ্যদলের বর্ণনায় বলিয়াছেন যে- তাহারা কোরান শ্রবণ হইতে বিমুখ হইয়া গীত বাদ্য শ্রবণে তৎপর হয়।...
>
> এরূপ কোনো হাদিছে প্রমাণ নাই যে, হজরত নবিয়ে করিম (দঃ)-এর সময় বা খলিফা এবং ছাহাবাগণের সময়ে কোনো প্রকার গীত বাদ্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে।...

---

১৭৬. সুরা বাকারাহ, ২৭৫।

১৭৭. প্রথমটি শরিয়ত, দ্বিতীয়টি কাযা, শরিয়ত হচ্ছে অপরিবর্তনীয় চিরস্থায়ী ধর্মব্যবস্থা আর কাযা অবস্থাভেদে পরিবর্তন হতে পারে।
আবু জাফর, মাওলানা আকরম খাঁ, ১৯৮৬, পৃ. ৬২৫, মুফতি মুহাম্মদ শফি, তাফছিরে মাআরিফুল কুরআন, ১৯৮২, ইস. ফাউন্ডেশন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭০।

১৭৮. আবু জাফর, মাওলানা আকরম খাঁ, ১৯৮৬, পৃ. ৬২৬।

www.pathagar.com

> কোনো কোনো মারফতপন্থী সেতার, বেহালা, একতারা, বেণু, বীণা, বাঁশী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রসমূহ হালাল করার মানসে কতকগুলি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছে এবং তাহারা উক্ত গ্রন্থসমূহে খোদাতালা, রসূল, সাহাবাগণ ও ধর্মপ্রাণ বিদ্বানগণের প্রতি আশ্চর্যজনক মিথ্যারোপ করিয়াছে- ঐ লোকগুলি তাহাদের অনুসরণ করিয়াছে, যাহাদের সহিত শয়তান ক্রীড়া করিয়াছে এবং তাহাদিগকে দুষ্ট রিপুর কামনা দূরদৃষ্টের নিম্নস্তরে নিক্ষেপ করিয়াছে, এরূপ মতাবলম্বী ব্যক্তিরা সত্য পথ ভ্রষ্ট হইয়াছে, কারণ উহার মধ্যে ও তসাওয়াফের মধ্যে সহস্র সহস্র ব্যবধান রহিয়াছে। যদি কোনো মহৎপ্রাণ ব্যক্তি বিষয়গুলির মধ্যে কোনোটি হালাল বলিয়াছেন বলিয়া তুমি প্রমাণ দাও, তবে তুমি ইহার দ্বারা প্রতারিত হইও না, কেন না উহা চারি এমাম বা অন্যান্য মহাত্মাদের মতের বিপরীত।[১৭৯]

উপরোক্ত আলোচনার নিরিখে বলা যায়, মানুষ কতকগুলো রিপু ও ইন্দ্রিয়কে সঙ্গে নিয়ে দুনিয়ায় আত্মপ্রকাশ করছে। রিপু ও ইন্দ্রিয়গুলো আল্লাহর সৃষ্টি, সুতরাং সেগুলোকে সংগত ও অসঙ্গতভাবে ব্যবহার করার অনুমতি এবং নিষেধাজ্ঞা তিনি আমাদের প্রদান করেছেন। যেহেতু মানব সমাজ এ সংগত-অসঙ্গতের সীমা নির্ধারণ সম্পর্কে অনেক সময়েই বিচার বিভ্রমের পরিচয় দিয়ে থাকে, সে জন্য করুণাময় আল্লাহ তায়ালা শরিয়ত দ্বারা প্রত্যেক বস্তু ও বিষয়ের সঙ্গত ও সংযত সদ্ব্যবহার এবং অসঙ্গত অপব্যবহারের মধ্যে একটা স্পষ্ট সীমান্ত রেখা টেনে দিয়েছেন। সে রেখাকে অতিক্রম করলেই মানুষ হিসেবে আমাদের পতন ঘটে থাকে। অতএব, উক্ত সীমান্তরেখা অতিক্রম করার অধিকার কারো নেই।

---

১৭৯. গীত বাদ্য হারাম প্রমাণ।
ইসলাম নূর, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফালগুন ১৩৩২ (১৯২৫), পৃ. ৮৫।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

সমসাময়িক আলিমদের সাথে মাওলানার চিন্তাধারার মিল ও অমিল

তফছির সাহিত্য নিয়ে ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে বহু শতাব্দী যাবৎ আলোচনা-সমালোচনা চলে আসছে। বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্নভাবে তফছির করতে দেখা গেলেও সনাতন পদ্ধতি এবং বুদ্ধিবৃত্তিক তফছিরই রচিত হয়েছে বেশি। এ ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের লেখক বিভিন্নভাবে তফছির রচনা করেন। এর মধ্যে 'ইসরাইলিয়াত' রিওয়ায়াতগুলো উল্লেখযোগ্য। তফছির গ্রন্থসমূহে ইসরাইলি কিংবদন্তির অনুপ্রবেশ সম্পর্কে মাওলানা আকরম খাঁ বলেন :

> ইহুদির মধ্যে প্রচলিত প্রবাদ ও কিংবদন্তিগুলিকে সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনায় অথবা কোরআনের তফছিরে ঢুকাইয়া দিতে তফছিরের একদল রাবী কখনো কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। আমাদের তফছিরকারগণের অনেকেই এই শ্রেণীর রেওয়ায়েতগুলিকে নিজেদের তফছিরে বিনাবিচারে উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। এই রেওয়ায়েতগুলিই আজ সাধারণ তফছিরের প্রধান উপকরণে পরিণত হইয়াছে। ইহা আমাদের আবিস্কৃত কোনো অভিনব তত্ত্ব নহে। মুসলমান সমাজের বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ আলেমগণ দীর্ঘকাল হইতে এই অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া আসিয়াছেন।[১]

মাওলানা আকরম খাঁ একাই নন, অনেকেই প্রচলিত তফছিরকারদের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন। তাঁর পূর্বসূরি স্যার সৈয়দ প্রচলিত তফছির সম্পর্কে বলেন:

> সমস্ত হাদিস গ্রন্থ, বিশেষ করে তফছির ও সীরাতুন্নবী গ্রন্থসমূহ এ ধরনের অতিপ্রাকৃতিক বর্ণনায় ভরা।

অন্যত্র তিনি আরও বলেন:

> তফছির ও সীরাত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'তফছিরে ইবনে-জরীর', 'তফছিরে কবীর', 'সীরতে ইবনে ইসহাক', 'সীরতে ইবনে হিশাম', 'রাওযাতুল আহবাব', 'মাদারিজুন নবুওয়াত', যা-ই বলুন, এগুলোর মধ্যে এমন অনেক অগ্রহণীয় বর্ণনা বা কিস্‌সা-কাহিনী রয়েছে, যেগুলোর উল্লেখ না করাই ভাল।[২]

ইবনে খলদুন বলেন:

> পূর্ববর্তী তফছিরকারগণ তাঁদের রচনাবলীতে শুদ্ধ-অশুদ্ধ, গ্রহণীয়-বর্জনীয় সব ধরনের বর্ণনাই রয়েছে। এই রেওয়ায়েতসমূহ শরীয়তের বিধি-বিধানের সাথে সম্পৃক্ত ছিল না বলে তফছিরকারগণ সেগুলোর বর্জনে সাবধানতা অবলম্বন করেন নি ...। তাঁদের রেওয়ায়েতগুলো জনপ্রিয়তা লাভ করে।[৩]

---

১. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, তফছিরুল কুরআন, ২য় খণ্ড, ঢাকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪-৪৫।

২. ড. মুহম্মদ আবদুল্লাহ, স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ'র ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮২।

৩. মুকাদ্দামা-এ ইবনে খলদুন, সা'দ হাসান খাঁ অনুদিত, করাচী, পৃ., ৪৬১-৬২।

www.pathagar.com

তফছির গ্রন্থসমূহে ইস্রাইলি উপকথা ও মনগড়া রিওয়ায়েতের অনুপ্রবেশ সম্পর্কে শাহ ওয়ালি উল্লাহ (র.) বলেন :

> কুরআনের তফসির আলোচনা করিবার আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে বনি ইসরাইলদের এমন রিওয়ায়েতসমূহ উদ্ধৃত করা, যাহা আমাদের দ্বীনের ভিতরে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। অথচ আমাদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, বনি ইসরাইলদের রিওয়ায়েতের ব্যাপারে আমরা যেন 'না বিশ্বাস করি, না অবিশ্বাস করি এই নীতি মানিয়া চলি।[8]

ইহুদিদের কল্পনাপ্রসূত বর্ণনা তফছিরসমূহে প্রবেশ সম্পর্কে মাওলানা শিবলী নু'মানী (র.) বলেন :

> ইহুদিরা ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের মাধ্যমে এ সব কিস্সা-কাহিনী কুরআন মজিদের তফছিরে প্রবেশ লাভ করে। এ সবকে কুরআনের ব্যাখ্যার সাথে খাপ খাইয়েও নেয়া হয়। এই কিস্সাগুলো ছিল মনোজ্ঞ ও হৃদয়গ্রাহী। এগুলোতে ওয়াজ-নসীহতকারী বা ধর্মপ্রচারকদের মাহফিলও খুব জমতো। তাই এগুলো চরম জনপ্রিয়তা লাভ করে। এমন কি সমস্ত তফছির গ্রন্থ এ সব কিস্সা-কাহিনীতে ভরে যায়। মুহাদ্দিস আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জরীর তাবারী এত বড় হাদিসবেত্তা ও তফছিরকার ছিলেন যে, তাঁর তফছির সম্পর্কে সমস্ত হাদিসবিদ ও ফিকাহ প্রণেতাদের মন্তব্য হলো: ইসলামে এর চাইতে ভাল তফছির আর রচিত হয়নি। তা সত্ত্বেও এই তফছির গ্রন্থটি এ ধরনের কিস্সা-কাহিনী থেকে মুক্ত নয়।[৫]

মাওলানা আকরম খাঁ ভাবলেন, ইসলামের প্রচারকদের দ্বারাই বিজাতীয় কল্প-কাহিনী মুসলমানদের ধর্মীয় গ্রন্থে অনুপ্রবেশ করলে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও রূপ মানুষ কিভাবে জানবে। তাই তিনি তফছির, হাদিস ও সিরাত গ্রন্থসমূহের বিচার-বিশ্লেষণ করে সত্যিকার ইসলামকে তুলে ধরার মনস্থ করেন। বিধর্মীদের নানা সন্দেহ ও অভিযোগ অপনোদনের জন্য তিনি ধর্মীয় চর্চায় অবতীর্ণ হন। পূর্ববর্তী তফছিরকারদের অবহেলা ও গতানুগতিকতার প্রতি কটাক্ষ করে তিনি বলেছেন যে, পূর্বে অধিকাংশ তফছিরকারের রীতি ছিল তাঁরা অনুমানের পাখায় ভর করে বহু ভিত্তিহীন অমূলক কথা স্বীয় তফছিরে জুড়ে দিতেন। কালের আবর্তে সেগুলো ইসলামের আকাইদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। এখন শুধুমাত্র উর্দু ভাষায় *রিওয়ায়েত হায়*–এ কথাটুকু ছাপার অক্ষরে দেখলেই ভক্ত মুসলমানগণ তা স্বীকার করে নিতে দ্বিধাবোধ করেন না। তাই, মাওলানা তাঁর তফছিরের ভূমিকায় বলেন:

> "কাহারও অন্ধ অনুকরণ আমি কুত্রাপি করি নাই।"[৬]

মাওলানার সময় চতুর্মুখী সমস্যার আবর্তে ছিল মুসলিম সমাজ ও ইসলাম ধর্ম। খ্রিষ্টান মিশনারিদের ধর্মীয় প্রচারণা, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতাবশত বিরূপ সমালোচনা এবং তরুণ শিক্ষিত মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর আধুনিক শিক্ষার প্রভাব, সর্বোপরি একদল আলিমের গোঁড়ামি ও খ্রিষ্টান

শিবলী নু'মানী, ইলমুল কালাম, পৃ. ১৩৮।

৪. শাহ ওয়ালি উল্লাহ, আল ফওযুল কবীর, (মুহাম্মদ হাসান 'আলী অনূদিত), ঢাকা-১৯৬৯, পৃ. ১৫০-১৫১।

৫. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পৃ. ৪৩০।

৬. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, কুরআন শরিফ, কোলকাতা, ১৩৪৮ হিজরি, শিরোনাম 'নিবেদন'।

www.pathagar.com

মিশনারিদের অপতৎপরতা সমাজে ছেয়ে গিয়েছিল। এর বিরুদ্ধে মাওলানা কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সমস্যা ছিল পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবী ও তরুণ সমাজ, ইসলামের বিরুদ্ধে আনীত নানা অভিযোগ এবং শিক্ষিত মুসলমানদের দিক থেকে তাদের নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর আধুনিক শিক্ষার অনভিপ্রেত প্রতিক্রিয়া। সর্বশেষ প্রাচীনপন্থী আলিমগণ তাঁদের গোঁড়ামির কারণে আধুনিক যুগ-জিজ্ঞাসার আলোকে ইসলামের শাশ্বত বাণীকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার তেমন কোনো চেষ্টাই করেনি; বরং তুচ্ছ ব্যাপারগুলো নিয়ে নিজেরা মতানৈক্যে লিপ্ত ছিলেন।

এমনি অবস্থায় আকরম খাঁ স্বাধীন ও মুক্ত মনে ইসলামের খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করেন। এর বিরোধিতা আরম্ভ হয় প্রচণ্ডভাবে। মাওলানার তরজমা ও তফছিরে স্যার সৈয়দ আহমদ[৭] প্রমুখের প্রভাব দেখা যায়। তিনি কুরআনের যে-সব অভিনব ব্যাখ্যা দিয়েছেন, শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী ও আধুনিকপন্থী প্রগতিবাদী আলিম সমাজ স্বীকার করে নিলেও উলামাদের এক বিরাট অংশ তাঁর ব্যাখার স্বীকৃতি ও সমর্থন আজও দেননি। অবশ্য, প্রথম পক্ষের প্রশংসা পেলেও তিনি মুক্তবুদ্ধি ও যুক্তিবাদী মনোভাবের কারণে মাঝে-মধ্যে সীমা অতিক্রম করে ফেলেছেন। এ-জন্য অনেকের কাছেই তিনি সমালোচনার পাত্র। বলা দরকার, তাঁর বিরোচিত তফছিরুল কুরআন ও মোস্তফা চরিত বাংলা ভাষায় অমূল্য গ্রন্থ। মোস্তফা চরিত সিরাত সাহিত্য জগতের অনবদ্য গ্রন্থ। তেমনি তফছিররুল কুরআনের প্রত্যেক আরবি শব্দের সঠিক অনুবাদ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত 'কুরআনের' অন্যান্য অনুবাদের সাথে তুলনা করলে দেখা যাবে, মাওলানা সাহেবের অনুবাদ অতুলনীয়। মনে হয়, উলামায়ে কিরামের বিরোধিতার কারণে এ মূল্যবান গ্রন্থগুলো সাধারণ জনগণের নিকট তেমন প্রসার লাভ করে নি। অনেকেই মাওলানা আকরম খাঁকে স্যার সৈয়দের অনুসারী মনে করেন। কিন্তু তাঁকে অনুসারী না বলে ভক্ত বলাই শ্রেয়। কারণ, মাওলানা অনেক ক্ষেত্রে স্যার সৈয়দের মতের সাথে দ্বিমতও পোষণ করেছেন। মাওলানা এ প্রসঙ্গে বলেন:

> আমরা স্যার ছৈয়দের সাধনার চরম ভক্ত হলেও, এখানে ন্যায়ের অনুরোধে ইহাও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, দোষটি হইতেছে পাশ্চাত্য আদর্শের অন্ধ অনুকরণ প্রবৃত্তি। বিচারে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে তিনি যেন ধরিয়া লন যে, ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে ইউরোপের গৃহীত বিচার আদর্শ সমস্তই নিখুঁত এবং বৈজ্ঞানিক, পাশ্চাত্যের প্রচারিত মতবাদ মাত্রই বৈজ্ঞানিক সত্য। এইরূপ একটা ধারণা পোষণ করিয়া তিনি এছলামকে লইয়া ঐসব আদর্শ ও মতবাদের সহিত সামঞ্জস্য করার চেষ্টা করিতে থাকেন। ইহাতে স্থানে স্থানে হিতে বিপরীত ফল হইতেও দেখা যায়।[৮]

স্যার সৈয়দ প্রচলিত ইসলামের যে-সব ধ্যান-ধারণা বস্তুবাদীদের দৃষ্টিতে আপত্তিকর, বুদ্ধি ও আধুনিক সভ্যতার আলোকে তিনি সে-সবের যুক্তিযুক্ত ব্যাখা প্রদানের প্রয়াস পান। পরিষ্কারভাবে বলতে গেলে, তিনি কুরআনের আলোকে প্রকৃতির রহস্য উদঘাটনে ব্রতী হন নি; বরং বৈজ্ঞানিক সত্যকে প্রকৃত সত্য ধরে নিয়ে তারই সাথে কুরআনের

---

৭. স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ, ১৮১৭ খ্রি, ১৭ অক্টোবর দিল্লীর প্রখ্যাত সৈয়দ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষগণ 'আরব দেশীয় ছিলেন।
মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, স্যার সৈয়দ, প্রাগুক্ত, অবতরণিকা দ্র.।

৮. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোস্তফা চরিত, ঢাকা-১৯৭৫, পৃ. ১২৪।

www.pathagar.com

সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেন। তাঁর পাশ্চাত্য আদর্শের এই অনুকরণ প্রবৃত্তির প্রতি লক্ষ্য করেই মাওলানা উপরোক্ত মন্তব্য করেন। স্যার সৈয়দের সাথে আকরম খাঁ'র এখানেই বৈপরীত্য যে, স্যার সৈয়দ বৈজ্ঞানিক সত্যকে মানদণ্ড সাব্যস্ত করে কুরআনের সাথে সামঞ্জস্য করতে চেয়েছেন, অপরপক্ষে আকরম খাঁ কুরআন ও হাদিসকে প্রথমে মানদণ্ড ধরে পরে বৈজ্ঞানিক সত্যকে যুক্তির মাধ্যমে কুরআনের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছেন।

আকরম খাঁ'র তফছিরের সমালোচনা যাঁরা করেছেন

মাওলানা আকরম খাঁ'র 'তফছিরুল কুরআন' প্রকাশিত হওয়ার কিছুদিন পরই এর বিরুদ্ধে বাংলার এক শ্রেণির আলিম তীব্র প্রতিবাদ ও সমালোচনা করতে থাকেন। তাঁদের প্রতিবাদের ভাষা অনেক সময় শালীনতাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। প্রতীয়মান হয় যে, যুক্তি-প্রমাণের চেয়ে ব্যক্তিগত আক্রোশ ও ভাবাবেগই তাঁদের মধ্যে কাজ করেছিল বেশি। তাঁরা প্রামাণ্য দলিলের তোয়াক্কা না করে প্রচলিত ধ্যান-ধারণার উপরই জোর দিয়েছেন অত্যধিক।

মনে হয়, তাঁরা বিরোধিতার খাতিরেই বিরোধিতা করেছেন। এ জন্য তাঁরা এতই তৎপর ছিলেন যে, শুধু 'তফছিরুল কুরআন'-এর প্রতিবাদকল্পেই বহু প্রবন্ধ ও একাধিক পুস্তক রচনা করেন। কোনো কোনো পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রবন্ধও প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিবাদকারীদের নাম এবং প্রতিবাদের শিরোনামসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

(ক) **মাওলানা মুহাম্মদ ময়েজ উদ্দীন হামিদী**[৯]

শরিয়ত পত্রিকায় 'মোহাম্মদ আকরম খাঁ প্রণীত তফছিরের সমালোচনা' শিরোনামে মাওঃ ময়েজউদ্দীন হামিদী ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন। ১৯২৪ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হতে থাকে।[১০]

(খ) **মাওলানা মীর আবদুস সালাম (১৮৯৫)**[১১]

আকরম খাঁ'র তফছিরের বিরুদ্ধে মাওলানা মীর আবদুস সালাম সাহেব 'মাসিক শরিয়তে এসলাম পত্রিকায় কুরআন শরীফের মনগড়া অর্থ' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।[১২]

(গ) **মুহাম্মদ ফয়েজ উল্লাহ খাঁ**

'খাঁ সাহেবের বাজে কথা' শিরোনামে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ'র 'তফছিরুল কোরআনে'র বিরুদ্ধে মুহাম্মদ ফয়েজ উল্লাহ খাঁ একটি পুস্তিকা

---

৯. মাওলানা মুহাম্মদ ময়েজ উদ্দীন হামিদি ছিলেন খুলনা জেলার কলারোয়া ডাকঘরের অধীন পরানপুর নিবাসী।
মাসিক 'শরিয়াত', ১ম বর্ষ, ১৩৩১ সন, ২য় বর্ষ, ১৩৩২ বৈশাখ সংখ্যায়, পৃ. ৬-৯ এবং পরবর্তী অন্যান্য সংখ্যা দ্র.।
ড.মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা, ইফাবা, ১৯৮৬, পৃ. ১২১।

১০. প্রাগুক্ত।

১১. বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ থানা, নিবাসস্থল সৈয়দপুর। 'মাসিক শরিয়তে এসলাম', ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৩৮/১৯৩১ খ্রিঃ পৃ. ২৩৩-৩৮।

১২. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

রচনা করেন। বইটি আকারে খুবই ছোট ছিল। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল মাত্র ৪৬। মূল্য রাখা হয়েছিল তিন আনা।[১৩]

(ঘ) মাওলানা আবদুস সাত্তার[১৪]

'তফছিরের নামে সত্যের অপলাপ' শিরোনামে মাওলানা আবদুস সাত্তার মাওলানা আকরম খাঁ'র তাফছিরের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনামূলক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থে মাওলানার বিরুদ্ধে শালীনতাবিবর্জিত ভাষা ও অশালীন উক্তি রয়েছে। একজন আলিমের জন্য এটা মোটেই শোভনীয় নয়।[১৫]

(ঙ) মাওলানা আযীযুল হক[১৬]

'পবিত্র কুরআনের অপব্যাখা বা খাঁ সাহেবের কল্পিত তফছিরের প্রতিবাদ' শিরোনামে শায়খুল হাদিস মাওলানা আযীযুল হক আকরম খাঁ'র তফছিরের বিরুদ্ধে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অবশ্য, তাঁর গ্রন্থটি পূর্বে রচিত মাওলানা আবদুস সাত্তার সাহেবের গ্রন্থের সাথে অনেকটা মিল ছিল। বলতে গেলে, তাঁর অনুকরণেই লেখা হয়েছে। গ্রন্থের শুরুতেই মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরীর (১৮৯৫-১৯৬৮) লিখিত পাঁচ পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকাও সংযোজিত হয়েছে।[১৭]

(চ) মাওলানা মুহাম্মদ রুহুল আমীন (১৮৮২-১৯৪৫)[১৮]

'খাঁ সাহেবের তফছিরের প্রতিবাদ' শিরোনামে মাওলানা মুহাম্মদ রুহুল আমীন তাঁর সম্পাদিত ছুন্নাত-আল-জামায়াত' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। মাওলানা আকরম খাঁ সাধারণ উলামার বিরুদ্ধে যে-সব মতামত তাঁর তফছিরে আলোচনা করেছেন, মাওলানা রুহুল আমীন সাহেব

---

১৩. বে. লা. ক্যা, ১৯৩৩ খ্রি, ১ম ত্রৈমাসিক গ্র, বি. দ্রষ্টব্য।

১৪. মাওলানা আবদুস সাত্তার ফরিদপুরের গওহর ডাঙ্গা খাদিমুল উলুম মাদ্রাসার শিক্ষক ছিলেন। তিনি খুলনা জেলার নূর নগরের অন্তর্গত হাজিরপুর গ্রামের বাসিন্দা। তাঁর পিতার নাম মুহঃ জসিম উদ্দীন।
মুজিবুর রহমান, বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা, ইফাবা, ১৯৮৬, পৃ. ১২০।

১৫. প্রাগুক্ত

১৬. তাঁর পিতার নাম মরহুম হাজি ইরশাদ আলী। তিনি ঢাকা জেলার বিক্রমপুর নিবাসী। কর্মজীবনে তিনি একই সময়ে ঢাকাস্থ লালবাগ জমিয়াতুল কুরআনিয়ার মুহাদ্দিস এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের খণ্ডকালীন প্রভাষক ছিলেন। বর্তমানে তিনি ঢাকাস্থ মোহাম্মদপুর জামেয়া রাহমানিয়া 'আরাবিয়ার পরিচালক। তাঁর প্রতিবাদমূলক ৬১ পৃষ্টার বইটির নামমাত্র মূল্য ছয় আনা রাখা হলেও বিনামূল্যেই বিতরণ করা হতো। উল্লেখ্য যে, মাওলানা আযীযুল হক সাহেব যেমনি আকরম খাঁ'র তফছিরের কঠোর সমালোচনা করেছেন, তেমনি মাওলানা আবদুর রউফ সাহেবও আযীযুল হক সাহেবের অনুবাদকৃত বুখারির অনুবাদকে নির্জলা মিথ্যা বলে অভিহিত করেন। এছাড়া 'তাহযিব' পত্রিকার তদানীন্তন সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন শামী ও সুফি গোলাম মহীউদ্দীন এ অনুবাদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন।
মাসিক আহযীব, সিরাতুন্নবি সংখ্যা, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা, ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৮৩।

১৭. প্রাগুক্ত।

১৮. ২৪ পরগনা জেলার টাকি নারায়ণপুরে তাঁর জন্ম। পবিত্র কুরআন হাদিস সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তৎকালীন সময়ে তিনি একজন সুবক্তা হিসেবেও পরিচিত ছিলেন।
মাসিক শরিয়ত, ১৩৩২, বৈশাখ, ২য় বর্ষ, বিজ্ঞাপন, পৃ. ২।

www.pathagar.com

প্রায় সবগুলো সম্পর্কে বিভিন্ন দলিল দিয়ে মাওলানার তফছিরের বিরোধিতা করেন। তাঁর প্রতিবাদগুলো প্রথমে পত্রিকায়, পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।[১৯]

এখানে সংক্ষিপ্তভাবে মাওলানা রুহুল আমীন কৃত 'তফছিরুল কুরআনের' সমালোচনাগুলো উপস্থাপন করা হলোঃ

(১) আল্লাহ উর্ধ্ব দেশের প্রতি মনোযোগী হইয়া তাহাকে সাত গ্রহপথে সুবিন্যস্ত করিলেন। (তফছির, ৭৫ পৃ.)

(২) আছমানকে গুম্বজ করিয়াছেন' এ স্থলে ছামা' শব্দের অর্থ উর্ধ্বদেশ বলিয়া লিখিয়াছেন।"[২০] (সুরা বাকারা, ৩য় রুকু, ৬২ পৃ.)

উপরোক্ত দুটো বিষয় উপস্থাপন করে মাওলানা রুহুল আমীন বলেন :

ইহাতে বুঝা যায় যে, খাঁ সাহেব নেচারি ও কাদিয়ানিদের ন্যায় সাত আসমানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।[২১]

তিনি আরও উল্লেখ করেন :

যদি سبع سموة এর অর্থ সাতটা গ্রহপথ হয়, তবে উহা'ত শূন্যমার্গ, এই শূন্যমার্গ প্রস্তুত করিতে দুই দিবস লাগিবে কেন?

মাওলানা রুহুল আমীন সাহেব মাওলানা আকরম খাঁ'র তফছিরের অসারতা প্রমাণের জন্য দীর্ঘ আলোচনা করেন। কুরআন, হাদিস, ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য থেকে রুহুল আমীন সাহেব যে-সব উদ্ধৃতি দিয়েছেন, হুবহু তা সংযুক্ত করা হলোঃ

সুরা হা-মিম-আছছেজদাতে আছে–আল্লাহ চারি দিবসে জমি, উহার পর্ব্বতমালা, উদ্ভিদ, সকল প্রকার প্রাণী ও তাহাদের খাদ্য প্রস্তুত করিলেন, তৎপরে; আল্লাহ ধুমায়িত আছমানের দিকে মনোযোগী হইলেন। ثم استوى الى السماء فهى دخان তৎপর উক্ত আছমানকে দুই দিবসে সাত আছমান বানাইলেন এবং প্রত্যেক আছমানে উহার কার্য্যের অহি করিলেন।

যদি আছমানের অর্থ কক্ষপথ কিম্বা শূন্যমার্গ হয়, তবে উহা পয়দা করিতে দুই দিবস লাগিবে কিরূপে? শূন্যমার্গে আবার ফিরিশতা পাঠাইয়া অহি নাজেল করার কারণ কি?

সুরা জারিয়াতঃ

والسماء بنينها الخ

'আর আমি নিজ শক্তিতে আছমান নির্মাণ করিয়াছি'। উহার অর্থ কক্ষপথ বা শূন্যমার্গ হইলে, আল্লাহ কি নির্মাণ করিলেন?[২২]

افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف..

بنينها وزينها وما لها من فروج.

---

১৯. গ্রন্থ, খাঁ সাহেবের তফছিরের প্রতিবাদ, প্রাগুক্ত।

২০. মাওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমীন, ছুন্নত আল-জামায়াত, ৭ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, পৃ. ৪৫৩, ১৩৪৬/৪৭।

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৩।

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৪।

www.pathagar.com

তোমরা কি তোমাদের উপরিস্থ আছমানের দিকে দৃষ্টিপাত কর না? আমি কিরূপে উহা নির্মাণ করিয়াছি এবং উহা বিভূষিত করিয়াছি, আর উহাতে কোনো ছিদ্র নাই।[২৩]

মুসলমানগণ আছমানকে যেরূপ স্বচ্ছ ও কঠিন পদার্থ ধারণা করিয়া থাকেন, সুতরাং উহার সম্বন্ধে ছিদ্রবিহীন শব্দ প্রয়োগ করা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে। বিশাল শূন্যমার্গকে ছিদ্রবিহীন বলা যুক্তির বিপরীত।

সুরা মুল্‌ক:

الذی خلق سبع سموت طباقا. ماتری فی خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل تری من فطور.

যিনি সাত আছমান স্তরে স্তরে সৃষ্টি করিয়াছেন, তুমি কি রহমানের সৃষ্টিতে তারতম্য দেখিতেছ? পুনরায় দেখ, তুমি কি কোনো ছিদ্র দেখিতেছ?

সুরা মরিয়ম, ৬ রুক:

تکاد السموت یتفطرن منه.

এই অপবাদে আছমান ফাটিয়া যাওয়ার উপক্রম হয়। আছমান বায়ুবীয় পদার্থ হইলে, উহা কিরূপে ফাটিয়া যাইবে?[২৪]

সুরা আম্বিয়া, ৭ রুক:

یوم نطوی السماء کطیّ السجلّ الکتب. کما بدأنا اوّل خلق الخ.

যে দিবস আমি আছমানকে জড়াইয়া ফেলিব, যেরূপ লিখিত মর্মের কাগজকে জড়ান হইয়া থাকে।

আছমান যদি বায়ুবীয় পদার্থ হইত, তবে কি উহা কাগজের ন্যায় জড়ান সম্ভব?[২৫]

সুরা ফাতির, ৫ রুক:

ان الله یمسك السموت والارض الخ.

নিশ্চয় আল্লাহ আছমান সকল ও জমিকে স্থানচ্যুত হওয়া হইতে থামিয়া রাখিয়াছেন। যদি উভয় স্থানচ্যুত হইত, খোদা ব্যতীত কেহই উভয়কে থামিয়া রাখিতে পারিত না।[২৬]

যদি আসমান শূন্যমার্গ হয়, তবে উহা স্থানচ্যুত হইতে না দেওয়ার অর্থ কি?

সুরা সাবা, রুকু ১:

ان نشاء نخسف بهم الارض او نسقط علیهم کسفا من السماء.

যদি আমি ইচ্ছা করি তবে তাহাদিগকে জমিতে ধসাইয়া দিতে পারি, কিম্বা তাহাদের উপর আছমানের এক টুকরা নিক্ষেপ করিতে পারি।

আছমান কোনো জেছম না হইয়া কেবল কক্ষপথ হইলে, উহার এক টুকরা নিক্ষেপ করার অর্থ কি?

---

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৪।
২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৪।
২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৪।
২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৪।

www.pathagar.com

সুরা ইনশিকাক: (اذا السماء انشقت)

যখন আছমান ফাটিয়া যাইবে।[২৭]

যদি আছমান অর্থ গ্রহগুলির গতিপথ হয়, তবে এখানে 'ফাটিয়া যাইবে' শব্দ প্রয়োগের সার্থকতা কি?

ইহাতে বুঝা যায় যে, ছাহাবা, তাবেয়ি ও তাবে-তাবেয়িগণ সাত আছমানকে যে জমির ন্যায় শক্ত বস্তু বুঝিয়াছেন, তাহাই সত্য, উহা কক্ষপথ নহে। এক্ষণে আসুন, সাতটা গ্রহকে সাত আছমান বলা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে কি না, তাহার আলোচনা করা হউক।

সুরা ফুরকান, ৬ রুক:

تبرك الذى جعل فى السماء بُروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا.

মাওলানা আশরাফ আলী থানবি ইহার অনুবাদে লিখেছেন:

وہ ذات بہت عالیشان جس نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے بنائے۔ اور اس

میں ایک چراغ اور نورانی چاند بنایا۔

উক্ত জাত মহিমান্বিত যিনি, আছমানের মধ্যে বড় বড় নক্ষত্র বানাইয়াছেন এবং উহার মধ্যে প্রদীপ (সূর্য্য) ও জ্যোতিষ্মান চন্দ্র বানাইয়াছেন।[২৮]

বাবু গিরিশচন্দ্র সেন উহার অনুবাদে লিখিয়াছেন, "যিনি গগনে গ্রহমণ্ডল সকল সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তন্মধ্যে দপী (সূর্য্য) ও উজ্জ্বল চন্দ্রিমা সৃষ্টি করিয়াছেন।

আছমান হইল আধার, উহার মধ্যে গ্রহমণ্ডল স্থাপিত হইয়াছে, কাজেই আছমান ও গ্রহমণ্ডল এক হইতে পারে না।

পুষ্করিণীতে মৎস্য আছে, পুষ্করিণী ও মৎস্য কি এক হইতে পারে?

বৃক্ষে পক্ষী বাসা করিয়াছে, বৃক্ষ ও পক্ষী কি এক হইতে পারে?

বাক্সে টাকা পয়সা আছে, বাক্স ও টাকা পয়সা কি এক হইতে পারে?

সুরা আন্নাবা

وبنينا فوقكم سبعا شدادا وسراجا وهاجا.

আর আমি তোমাদের উপর সাতটা শক্ত আছমান ও উজ্জ্বল দীপ নির্মাণ করিয়াছি।[২৯]

এ-স্থলে দুইটা কথা বুঝা যায় যে, সাত আছমান শক্ত জাতীয় বস্তু, আর সাত আছমান পৃথক বস্তু ও সূর্য্য (গ্রহপতি) পৃথক বস্তু।[৩০]

'সামা' বা আকাশ সম্পর্কে মতামত

আসমান শব্দটি নিয়ে প্রাচীন গ্রিক বিজ্ঞানসহ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়। মাওলানা আকরম খাঁ'র মতে ঃ

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৪।
২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৬।
২৯. প্রাগুক্ত।
৩০. মাওলানা রুহুল আমীন, ছুন্নত আল-জামাত, ৭ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, পৃঃ ৪৫৩-৫৬।

www.pathagar.com

> আমাদের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত কুদরতের যে-সব কারখানা আমাদের ঊর্ধ্বদেশে বিদ্যমান ও বিরাজমান আছে। সে সমস্তই 'সামা' শব্দের ব্যাপক অর্থের অন্ত র্গত।[৩১]

একই বিষয়ে স্যার সৈয়দ মতামত ব্যক্ত করেন এভাবে:

> অনেক তফছির গ্রন্থে 'সামা' অর্থাৎ আকাশের যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, তা প্রাচীন গ্রিক জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে গৃহীত। এ ব্যাখা কুরআনসম্মত নয়।

তিনি তাঁর 'তফছিরুল কুরআনে বলেন :

> 'সামা' শব্দের ধাতুগত অর্থ 'ঊর্ধ্ব'। গ্রিক জ্যোতির্বিদ্যার জন্মের পূর্বেও এ শব্দটি ইহুদি ও আরবদের ভাষায় প্রচলিত ছিল এবং তা 'ঊর্ধ্ব জগৎ'-এর অর্থেই ব্যবহৃত ছিল। অন্য কথায়, বর্তমান বিজ্ঞানে আকাশ বলতে যা বুঝায়, মোটামুটি তা-ই বুঝাতো। কিন্তু পরবর্তীকালে গ্রিক বিজ্ঞানে আকাশ সম্পর্কে নতুন ধারণা সৃষ্টি হয়। তাতে আকাশ বলতে বুঝাতো: পৃথিবীবেষ্টিত একটি স্বচ্ছ ও কঠিন গোলাকার বস্তু, যার গায়ে বিজড়িত রয়েছে নক্ষত্ররাজি।[৩২]

মুসলমানদের মধ্যে গ্রিক বিজ্ঞান আব্বাসী যুগে প্রসার লাভ করে। যে-সব গ্রিক ধ্যান-ধারণা ইসলামের প্রকাশ্য বিরোধী ছিল, সেগুলো ছাড়া তাদের অপরাপর ভাবধারার মধ্যে কতগুলোকে ইলমে কালামের আলিমগণ সংশোধনপূর্বক গ্রহণ করেন এবং অবশিষ্ট ধ্যান-ধারণাকে হুবহু সত্য বলে স্বীকার করে নেন। তাঁরা কুরআনের বিষয়াদিকেও সেই ছাঁচে ঢেলে নেয়ার প্রয়াস পান। বলা বাহুল্য, এই প্রক্রিয়ার ফলে গ্রিকদের আকাশ সংক্রান্ত বিশেষ ধারণাটিও কিছুটা রদবদল সহকারে কুরআনের তফছির ও ইসলামি গ্রন্থসমূহে স্থান লাভ করে এবং পরবর্তীকালে মুসলমানদের নিকট তা একটি ইসলামি ও কুরআন নির্দিষ্ট বিষয় বলে পরিগণিত হয়। তারা বিশ্বাস করতে লাগলো যে, আকাশ একটি গোলাকার বস্তু; তা পৃথিবীকে বেষ্টন করে রেখেছে; এর গায়ে জড়ানো রয়েছে অনেক নক্ষত্র এবং তা পৃথিবীর চারদিকে প্রদক্ষিণ করছে; অথচ এটা ছিল একটি ভ্রান্ত ধারণা এবং এর মূলে ছিল গ্রিকদের আকাশ সংক্রান্ত প্রাচীন ভিত্তিহীন চিন্তাধারা।[৩৩]

স্যার সৈয়দ বলেন, কুরআনের ভাষায় 'সামা' শব্দটি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কোথাও এর অর্থ করা হয়েছে মানুষের মাথার শূন্য অর্থাৎ জগৎ; কোথাও মাথার উপর অবস্থিত গম্বুজাকৃতি বিশিষ্ট নীলাকার বস্তু, কোথাও এই শব্দে গ্রহ-নক্ষত্র, আবার কোথাও মেঘ বুঝানো হয়েছে। কিন্তু কোথাও প্রাচীন গ্রিকদের মধ্যে প্রচলিত কায়া বিশিষ্ট আকাশের অর্থে তা ব্যবহৃত হয় নি।[৩৪]

স্যার সৈয়দের পূর্বেও কোনো কোনো তফছিরকার যেমন ইমাম রাযি, বায়যাবি, সুয়ুতি, রাগিব ইস্পাহানি প্রমুখ গ্রিক ধারণার ঊর্ধ্বে ওঠে আকাশের নতুন ব্যাখ্যা

---

৩১. তফছিরুল কুরআন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩।
৩২. তফছিরে বায়যাবী (১), পৃ. ৫৭।
৩৩. মাকালাত (১১৩), পৃ. ২১১-১৩।
৩৪. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

দিয়েছেন। তাঁরাও আকাশের কায়া স্বীকার করেন নি। ইমাম বায়যাবি বলেন, আকাশ মানে ঊর্ধ্ব জগতে অবস্থিত বস্তু বা দিকসমূহ।[৩৫] ইমাম সুয়ুতি বলেন, আকাশ মানে শূন্য জগৎ।[৩৬]

বক্ষবিদারণ: স্যার সৈয়দ, সোলায়মান নদভী ও খাঁ সাহেবের মতৈক্য

উপমহাদেশের দুই দিকপাল স্যার সৈয়দ ও মাওলানা আকরম খাঁ। যুক্তির কষ্টিপাথরে তাঁরা প্রতিষ্ঠিত করেছেন শরিয়তের বিভিন্ন দিক। প্রগতিপন্থী এতদুভয়ের বেশির ভাগ মতের সামঞ্জস্য থাকলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৈসাদৃশ্যও পরিলক্ষিত হয়। তাঁদের মতের মিল ও গরমিল নিম্নরূপ:

মিরাজের ঘটনাসম্বলিত ক'টি হাদিসেই নবি করিম (স.)-এর বক্ষ বিদারণের বর্ণনা রয়েছে। এ ব্যাপারে স্যার সৈয়দ আহমদ বলেন:

> রেওয়ায়েতগুলো অবশ্যই গ্রহণীয়। কারণ মি'রাজের ঘটনাটি ছিল স্বাপ্নিক। বক্ষবিদারণ ছিল এর সাথেই সম্পৃক্ত। যে স্বপ্নে নবি করিম (স.)- এর মি'রাজ হয়েছিল, তাতেই তিনি দেখে থাকবেন, জিব্রাইল যেন তাঁর বক্ষবিদারণ করেছেন এবং যমযমের পানি দ্বারা বিধৌত করে দিয়েছেন। তাও যদি বলা হয়, রসুল (স.)-এর বক্ষ বিদারণও স্বপ্নযোগে হয়েছিল, তা অস্বীকার করার উপায় নেই।[৩৭]

মাওলানা আকরম খাঁ'র মতে :

> বিবি হালিমার গৃহে অবস্থানকালে ফিরিশতাগণ হযরতের বক্ষ বিদারণ করিয়াছিল বলিয়া আমাদের কথকগণ যে গল্পটি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার সহিত সত্যের কোনো সম্বন্ধ নাই। অসতর্ক রাবীদের কল্যাণে মি'রাজ সংক্রান্ত হযরতের বর্ণিত স্বপ্নের বিবরণটি নানা অত্যাচারের পর বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে মাত্র।[৩৮]

এ ব্যাপারে সৈয়দ সোলায়মান নদভী মতামত ব্যক্ত করে বলেন :

> তত্ত্ববিদ সূফী ও সূক্ষ্মদর্শীদের মতে, প্রকৃত অর্থে রসুল করীমের বক্ষ বিদারণ করা হয় নি, বরং বক্ষ বিদারণের মানে হলো আল্লাহ তাঁর বক্ষ বা মস্তিষ্ককে দিব্যজ্ঞানে উদ্ভাসিত করেছিলেন।[৩৯]

মিরাজের ব্যাপারে স্যার সৈয়দ ও খাঁ সাহেবের মতামত

স্যার সৈয়দ তাঁর তফছিরে বিভিন্ন হাদিস উপস্থাপন করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে নবি করিমের মিরাজ ছিলো স্বাপ্নিক। মাওলানা আকরম খাঁ অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করে বলেন :

> আমাদের মতে, এবং অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক ছাহাবী ও তাবেয়ীর মতে, হযরত রাছুলে করীমের (সঃ) মেরাজ হইতেছে স্বপ্নের ব্যাপার। তফছিরের লেখক ও রাবীদের প্রায় সকলেই ইহার বিপরীত মত প্রকাশ করিয়াছেন। রাবীরা ও তফছিরকারগণ কোরআনের আয়াতে 'রুয়াত' শব্দের সম্মুখীন হইয়া বেশ

---

৩৫. তফছিরে বায়যাবি (১), পৃ. ৫৭।
৩৬. তফছিরে জালালাইন, সূরা বাকারা, রুকূ ২।
৩৭. তফছিরুল কুরআন (৬) ১৩০, মাকালাত (১৩) ৮০৩।
৩৮. মোস্তফা চরিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯।
৩৯. সীরাতুন নবি (৩), সৈয়দ সোলায়মান নদবী, ১৯৬৬, পৃ. ৪৯৮-৫১২।

www.pathagar.com

> অসুবিধায় পড়িয়াছেন। কারণ, কোরআনে বর্ণিত 'রুয়াত' অর্থ 'স্বপ্ন' ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। এই সংকটে পড়িয়া এক দল রাবী বলিয়াছেন-মিরাজের সঙ্গে এই আয়াতের কোনো সম্বন্ধ নাই।... অধিকাংশ তফছির লেখক স্বীকার করিয়াছেন যে, আলোচ্য আয়াতটি মি'রাজ সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছিল।[৪০]

একাধিক বিয়ে সম্পর্কে স্যার সৈয়দ, সৈয়দ আমীর আলী ও খাঁ সাহেবের মতামত

একাধিক বিয়ে শরিয়ত কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনুমোদন দিয়েছে। প্রকৃতিগত ও পারিবারিক প্রয়োজনে এর ব্যতিক্রম করা এবং চার পত্নী পর্যন্ত একই সাথে গ্রহণ করার অনুমতিও শরিয়ত দিয়েছে। এ ব্যাপারে স্যার সৈয়দ, আমীর আলী এবং খাঁ সাহেবের চিন্তার সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। মাওলানা আকরম খাঁ বলেন:

> এক বিবাহ এছলামের আদর্শ, আর একাধিক বিবাহ হইতেছে এই আদর্শের ব্যতিক্রম। ... রাজনৈতিক কারণে হউক, সামাজিক অবস্থার তাকিদে হউক, জাতির মঙ্গলের জন্য আবশ্যক হইলে এবং সকলের প্রতি যথাযথ ব্যবহারের সম্ভাবনা থাকিলে মুসলমান পুরুষ একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে।[৪১]

জিন সম্পর্কে স্যার সৈয়দ ও খাঁ সাহেবের মতনৈক্য

জিন সম্পর্কে আমাদের সমাজে বিভিন্ন ধরনের কিংবদন্তি রয়েছে। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতেও এ সম্পর্কে ইঙ্গিত রয়েছে। একটি সুরার নাম 'জিন'-ও আমরা দেখতে পাই। জিন সম্পর্কে স্যার সৈয়দ এবং খাঁ সাহেবের মতনৈক্য রয়েছে। তাঁরা দু'জনই প্রায় কাছাকাছি মতামত ব্যক্ত করেছেন। এখানে স্যার সৈয়দের মতামত উপস্থাপন করা হলো :

> কুরআনে 'জিন' শব্দটি 'ইনস' (মানুষ) শব্দের পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়েছে। আবার কোথাও তা স্বতন্ত্রভাবেও স্থান লাভ করেছে। কোথাও কোথাও 'জান' শব্দটিকেও জিন-এর অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। জিন শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো গুপ্ত, অদৃশ্য ও অপ্রকাশ। তাই আরবি ভাষায় গোপন বস্তুকে জিন বলা হয়। এই অর্থেই উদরস্থ বাচ্চাকে 'জানীন' বলা হয়ে থাকে। কিন্তু কুরআনে জিন শব্দটি কোথাও শয়তান বা ইবলীসের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, আবার কোথাও জাহিলী যুগের আরবদের ধারণার উদ্ধৃতি বা তাদের প্রতিবাদস্বরূপ এ শব্দটিকে সে যুগের জনগণের মধ্যে প্রচলিত বিশেষ একটি স্বতন্ত্র সত্তার অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আবার কোথাও এ শব্দটি দিয়ে অপরিচিত, অসভ্য, যাযাবর, বেদুঈন বা বন্য মানুষকে বুঝানো হয়েছে।[৪২]

স্যার সৈয়দের মতে, কুরআনে শুধু তিনটি আয়াতে 'জিন' বা 'জান' শব্দটি শয়তানের অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে;

১. কানা মিনাল্ জিন্নি; ফা-ফাসাকা আন আমরি রব্বিহী (সুরা-কাহফ);

---

৪০. এই সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ অত্র সন্দর্ভের ধর্মীয় অধ্যায় মিরাজ অংশ দ্রঃ।
মোহাম্মদ আকরম খাঁ, তফছিরুল কুরআন (৩), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭২-৭৩।

৪১. প্রাগুক্ত, (১) পৃ. ৬১৬-১৭।

৪২. মাকালাত (২), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০।

www.pathagar.com

২. ওয়াল্ জান্না খালাকনাহু মিন্ কাবলু মিন্ নারিস্ সামূম্ (সুরা-হিজর); ও
৩. ওমা খালাকাল্ জান্না মিম্ মারিজিম্ মিন্ নার (সুরা রহমান)।[৪৩]

অন্ধযুগের আরবরা মানুষ থেকে স্বতন্ত্র একটি কল্পিত ও অদৃশ্য 'জিন জাতি'তে বিশ্বাস করতো। তাদের এ বিশ্বাসের উদ্ধৃতিস্বরূপ, আবার কখনো এ বিশ্বাসের অসারতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে কুরআনের পাঁচটি জায়গায় তদানীন্তন সমাজে প্রচলিত স্বতন্ত্র সত্তার অর্থে জিন শব্দের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে :

১. ওআ-জাআলূ লিল্লাহি শুরাকাআল্ জিন্নি (সুরা আনআম),
২. বাল কানূ-ইয়া'বুদুনাল্ জিন্না' (সুরা সাবা)
৩. রাব্বানা আরিনাল্লাযীনা আদাল্লানা মিনাল্ জিন্নি ওআল্ ইনস (সুরা ফুসসিলাত)
৪. ওয়া জাআলু বাইনাহু ওয়া বাইনাল জিন্নাতি নাসাবান্ ও-লাকাদ্ আলিমাতিল্ জিন্নাতু আন্নাহুম্ লা-মুহদারুন (সুরা সাফ্ফাত) ও
৫. ও-আন্না যানান্না আল-লান-তাকুলাল্ ইনসু ওআল্ জিন্নু আলাল্লাহি কাযিবান- আননাহু কানা রিজালুম মিনাল্ ইনসি ইয়াউয়ুনা বি-রিজালি মিনাল জিন্নি (সুরা জিন)।

এছাড়া যত জায়গায় কুরআনে 'জিন' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে, সবখানেই অসভ্য, বন্য, পাহাড়ি ও মরু অঞ্চলীয় অপরিচিতি মানুষকে বুঝানো হয়েছে। 'সুরা জিন'-এর মধ্যেও এ শব্দটি এক স্থানে (নাফারুম্ মিনাল্ জিন্নি) বা অপরিচিতি লোকের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

স্যার সৈয়দ বলেন: আরবদের ভাষায় জিন শব্দটি এই অর্থেই প্রচলিত ছিল। তাদের সাহিত্যে বহু জায়গায় শব্দটির এই প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু চিরাচরিত বিশ্বাসবশত অনেক আরবি ভাষাভাষীও ভুল করে কোরআনের জিন শব্দটিকে নিজ মাতৃভাষার অর্থে ব্যবহার না করে কল্পিত জিনের প্রচলিত অর্থে ব্যবহার করেছে। অথচ এরূপ জিনের প্রমাণ কোথাও মেলে না।[৪৪]

স্যার সৈয়দ সুরা জিন সম্পর্কে বলেন:

> মক্কার কাফেরদের অভ্যাস ছিল তারা চুপিচাপি রসুল করীমের বাণী শুনতো। এমন কতক লোকের কথাই 'জিন' নামক সুরায় বর্ণিত হয়েছে। কিছুসংখ্যক লোক রসুল করিমের কণ্ঠে কুরআনের তিলাওয়াত শুনে প্রভাবান্বিত হয় এবং ঈমান গ্রহণ করে। তারা চুপিসারে রসুল করীমের তিলাওয়াত শুনেছিল বলেই তাদেরকে আরবের প্রচলিত অর্থে 'নাফারুম্ মিনাল্ জিন্নি' অর্থাৎ 'এক দল অপরিচিত লোক' (নফর) রূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[৪৫]

মাওলানা আকরম খাঁ এ সম্পর্কে বলেন :

> আমার মতে, মানুষেরই দুই বিভাগ–এনছ ও জ্বেন। পরিচিত ও অপরিচিত মানুষ, সভ্য নাগরিক ও অসভ্য (পার্ব্বত্য, বন্য, প্রান্তরবাসী) প্রভৃতি হিসাবে মানুষের দুই বিভাগ মাত্র। ভারতীয়রা যেভাবে দেশের বহু আদিম অধিবাসীদিগকে দৈত্য,

---

৪৩. প্রাগুক্ত।
৪৪. প্রাগুক্ত।
৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭-৩৮।

www.pathagar.com

দানব, রাক্ষস, অসুর, ভূতপ্রেত প্রভৃতি বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছিল, অথচ তাহারা ছিল মানুষই।

আমার ব্যক্তিগত মত কেহ গ্রহণ করুন বা না করুন, একটা কথা এখানে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া রাখিতেছি যে, মুসলমান সমাজ আজকাল নিজেদের উপর যে শ্রেণীর 'জেনের দখল' সাধারণভাবে স্বীকার করিয়া নিয়াছে, তাহা নিছক অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নহে।[৪৬]

ফিরিশতার পাপ-পুণ্য লিখন এবং দাঁড়িপাল্লায় ওজনের বিষয়টিকে দুই মনীষী-ই রূপক বলেছেন

আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে যে, দু'জন ফিরিশতা মানুষের যাবতীয় পুণ্য ও পাপ অবিরত লিখে যাচ্ছে। কিয়ামতের দিন এর নিরিখেই দাঁড়িপাল্লার নিক্তির মাপ হবে। নেকি-বদির হিসাব-নিকাশ হবে। এ ধারণাটি প্রচলিত এবং বদ্ধমূল। কিন্তু স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ মতামত ব্যক্ত করেছেন যে, ফিরিশতার পাপ-পুণ্য লিখন ও দাঁড়িপাল্লায় সেগুলো ওজনকরণের কথাটি রূপক, প্রকৃত নয়। এর স্বপক্ষে তিনি কুরআন-হাদিসের বিভিন্ন উপমা-উৎপ্রেক্ষার অবতারণা করেছেন। অনুরূপ মত পোষণ করে মাওলানা আকরম খাঁ বলেন :

ওজনের স্বরূপ সম্বন্ধে তাফছীরকারগণের মধ্যে ঘোরতর মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। তাফছীরের রাবীগণের মধ্যে অধিকাংশই বলিতেছেন যে, আমরা চালডালও ওজন করিয়া থাকি; ঠিক সেইরূপে মানুষের পাপ-পুণ্যগুলিও দাঁড়িপাল্লায় ওজন করা হইবে। কিন্তু সমস্যা উপস্থিত হইতেছে যে, পাপ ও পুণ্য এমন কোনো জড় পদার্থ নহে, যাহাকে দাঁড়িপাল্লায় তুলিয়া ওজন করা যাইতে পারে। এমাম রাজী বলিতেছেন : দ্বিতীয় মত এই যে, ওজন শব্দ এখানে ন্যায়বিচার ও ফায়ছালাকে বুঝাইতেছে। ইহাই মোজাহেদ, জেহাক ও আমাশের মত। পরবর্তী সময় বহু আলেম এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। ... ওজন শব্দের এই ব্যবহার প্রমাণিত হওয়ার পর আমরা বলিতেছি যে, আয়াতের এই একমাত্র তাৎপর্য গ্রহণ করা ওয়াজেব বা অপরিহার্য।[৪৭]

'কিরামান-কাতিবীন্' কর্তৃক মানুষের আমলনামা লিখন সংক্রান্ত বিষয়টির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে স্যার সৈয়দ মূলত মুসলিম হুকামাদের অভিমতেরই পুনরাবৃত্তি করেছেন। হুকামাদের মতে, মানুষের প্রতিদান ও শাস্তির ব্যাপারটি আত্মিক, কায়িক নয়। প্রতিদানের শাস্তি ভোগ করে আত্মাই এবং পাপ কর্মের ফলে মানুষের যে লজ্জা ও অনুতাপ হয়, সেই যন্ত্রণা অনুভূত হয় আত্মাতেই। স্যার সৈয়দের আমল নামা' সংক্রান্ত অভিমত বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায় যে, এ ব্যাপারে তিনি হুকামাদের সাথে একমত। ইমাম রাযীও অনুরূপ মত পোষণ করতেন বলে মনে হয়। তিনি 'তফছিরে কবীরে' সুরা আদ-এর অধ্যায়ে "লাহু মুআক্কিবাতুম্ মিম বাইনি ইয়াদাইহি"-এই আয়াতের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে 'কিরামান কাতিবীন'-এর লিখন সম্পর্কে যে বিশ্লেষণ প্রদান করেন, তাতে মুসলিম হুকামাদের সাথে তাঁর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই সম্পর্কে মাওলানা আকরম খাঁ তাঁর 'তফছিরে' বিস্তারিত বর্ণনার শেষে বলেন:

---

৪৬. তফছিরুল কুর'আন, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত,, পৃ. ৯২।
৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৮-৬০।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ সকল সময়ে সকল স্থানে হাজের নাজের আছেন- সুতরাং বান্দার কোনো ভালমন্দ সকল কাজই আল্লার অজানা থাকিতে পারে না।

মোটের উপর কথা এই যে, আল্লাহ ভালমন্দ আমলের বিচার করিবেন এমনভাবে, যাহাতে বান্দাও বুঝিতে পারে যে, তাহার উপর অবিচার করা হয় নাই। বিচারের সেই প্রকারটা কি হইবে, তাহার কোনোও খবর আমাদিগকে দেওয়া হয় নাই। সুতরাং সে সম্বন্ধে মাথা ঘামাইবার কোনো দরকারও আমাদের নাই।[৪৮]

চুরির শাস্তি সম্পর্কে উভয়ের মতামত

কুরআনে সুস্পষ্টভাবে চুরির শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। চোরের হাত বা পা কেটে ফেলার নির্দেশ ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু স্যার সৈয়দ এতদসংক্রান্ত দুটো আয়াতের নিরিখে ডাকাতি, রাহাজানি ও চুরির শাস্তি বিধানে বলেন যে, এ জন্য বিপরীত দিক থেকে হাত-পা কাটা এবং চুরির জন্য শুধু হাত কাটার যে নির্দেশ রয়েছে তা অবশ্য পালনীয় নয়। তিনি তাঁর মতের স্বপক্ষে কুরআন-হাদিসও পেশ করেছেন। এ ব্যাপারে মতামত ব্যক্ত করে আকরম খাঁ বলেন :

১। "আন্ আবী হুরায়রাতা কালা : ইদফাউল্ হুদ্দামা-ওয়াজাদতুম্ মাদফাআন।"

২। "আন হাফিয-ইবনে-আদিইন আন ইবনে কালা: ইদরাউল্ হুদ্দা বিশ-শুবুহাতি।"

মাওলানা বলেন :

এই হাদিছদ্বয় হইতে নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দণ্ডের হাত হইতে মুক্তি দেওয়ার কোনো সুযোগ থাকিলে সেই সুযোগের যথাসাধ্য সদ্ব্যবহার করাই হইবে বিচারকের কর্তব্য' দণ্ড দেওয়া হইবে অগত্যার পক্ষে।

মাওলানা আকরম খাঁ শাস্তি প্রদানের জন্য চোরাই মালের পরিমাণ ও মূল্যমান ব্যাখ্যা করে বলেন:

এই সম্পর্কে মাত্র দুইটি মতবাদ আলোচনাযোগ্য : প্রথমত এই যে, স্বর্ণমানের হিসাবে মেকদারের মূল্য হইবে সিকি দীনার বা স্বর্ণ-মুদ্রা এবং রৌপ্যমানের হিসাবে উহার মূল্য হইবে তিন দেরহাম বা রৌপ্যমুদ্রা। হেজাজের ফকীহগণ, এমাম শাফেয়ী প্রভৃতি এই মতের সমর্থক। ইঁহারা বোখারী ও মোছলেম বর্ণিত কয়েকটি হাদিছকে নিজেদের প্রমাণরূপে উপস্থিত করিয়াছেন। হাদিছগুলির মর্ম এই যে, রাছুলুল্লাহ বলিয়াছেন, দীনারের এক-চতুর্থাংশের বা তাহার অধিক মূল্যের জিনিস চুরি করিলে চোরের হাত কাটিতে হইবে। পক্ষান্তরে এরাকের ফকীহর প্রায় সকলে বলিয়াছেন যে, মেকদারের মূল্যমান ধরা হইবে দশ দেরহাম বা রৌপ্যমুদ্রা। এমাম আবু হানিফা ও তাঁহার অনুসারীরা এই মতের সমর্থন করিয়াছেন।[৪৯]

মাওলানা সাহেব ইসলামি শাস্ত্রের উদারতা ও মহত্ত্বের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন :

ইসলাম চোরের প্রতি কঠোর দণ্ড বিধান করিয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহাতে সহজে এই দণ্ডের প্রয়োগ না হইতে পারে, তাহার সুসঙ্গত ব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে

৪৮. প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ৪৬০।
৪৯. প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ২৩৬।

www.pathagar.com

> করিয়া দিয়াছে। ফলে নিতান্ত চরম পরিস্থিতি উপস্থিত না হইলে এবং চরিত্রের দিক দিয়া চোর নিতান্ত অসাধু প্রকৃতির মানুষ না হইলে কাহারও প্রতি আয়াতের নির্ধারিত দণ্ড প্রয়োগের কোনো সম্ভাবনা নাই; থাকিবে না। এই প্রকার চরম 'কোনো' কঠোর দণ্ড দেওয়াই নীতি ও আদর্শের দিক দিয়া সঙ্গত হইবে।[৫০]

কুরআনের আয়াত মনসুখ সম্পর্কে মতামত

আমাদের বদ্ধমূল বিশ্বাস যে, কুরআনের কোনো কোনো আয়াতের হুকুম আল্লাহর পক্ষে থেকে রহিত হয়ে গেছে। নবি করিম (সা.) উম্মতদের এ খবর দিয়ে গেছেন। এ নিয়ে তফছিরকারগণ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন তফছিরে বিশদ ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। এ বিষয়ে আধুনিক তফছিরকারদের মধ্যে স্যার সৈয়দ আহমদ ও মাওলানা আকরম খাঁ দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন সাপেক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন যে, কুরআনের কোনো আয়াতের কার্যকারিতা মনসুখ হয় নি। যেমন- স্যার সৈয়দ বলেন :

> ইসলামের কোনো বিধান একদা অবতীর্ণ হয়েছে এবং পরবর্তী সময় তা 'মনসূখ' অর্থাৎ রহিত হয়েছে, এ মর্মে কোনো নির্দেশ কুরআনে নেই। কুরআনের কোনো কোনো আয়াতের শুধু হুকুম বা শুধু আবৃত্তি বা হুকুম ও আবৃত্তি উভয়ই রহিত হয়েছে- এমন কথা বলে সাধারণ তফছিরকার ও ফকীহগণ ঐশী বাণীর মর্যাদা এবং আল্লাহর মহত্ত্বের পরিপন্থী কাজ করেছেন। এতে তাঁরা কেবল ইসলামেরই নয়, আল্লাহরও অবমাননা করেছেন। দুনিয়ার আদ্যোপান্ত ভাল-মন্দ সবই আল্লাহর জানা আছে। সুতরাং তিনি একবার কিছু একটি ভেবে কোনো বিধান অবতীর্ণ করবেন, আবার সেই মত পাল্টে দোসরা বিধান প্রবর্তন করবেন- এটা তাঁর শানবিরোধী ও কলঙ্কজনক।

আসল ব্যাপার হলো, বনি-ইসমাঈল বংশ থেকে কোনো নবি আবির্ভূত হোক বা নবিজির উপর কুরআন তথা নতুন শরিয়ত অবতীর্ণ হোক, আহলে কিতাব তথা ইহুদি সম্প্রদায় এটা পছন্দ করতো না। নবিজি ছিলেন বনি ইসমাইল বংশীয় এবং নতুন শরিয়তের আলমবরদার। তাই স্বভাবতই তারা তাঁর প্রতি ও তাঁর শরিয়তের প্রতি অবজ্ঞা পোষণ করতো। দ্বিতীয়ত, ইহুদিদের ধারণা ছিল যে, হযরত মুসা (আ.)-এর ধর্ম অপরিবর্তনীয়। তাই আর কোনো নতুন শরিয়ত প্রবর্তিত হতে পারে না। আহলে কিতাবদের এ মনোভাবকে ভুল প্রতিপন্ন করার জন্যই আল্লাহ তাআলা কুরআনে এই মর্মে আয়াত অবতীর্ণ করেন:

> আমি যে আয়াত রহিত করি বা ভুলিয়ে দেই, তার স্থলে তার মত বা তার চাইতেও অধিকতর উত্তম আয়াত দিয়ে থাকি।

এতে আল্লাহ ইহুদিদের এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, মুসা (আ.)-এর শরিয়তের কোনো বিধানে যদি কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়ে থাকে, তবে শরিয়তে মুহম্মদিতে তার মত বা তার চাইতেও উৎকৃষ্ট বিধির ব্যবস্থা করা হবে। এ আয়াতের অর্থ এ নয় যে, কুরআনের আয়াত তথা এর বিধানের পরিবর্তে অন্য আয়াত তথা অন্য বিধান নাযিল করা হবে না নবিজি কুরআনের কোনো কোনো আয়াত ভুলে যাবেন; অথচ জমহুর উলামা তা-ই মনে করে থাকেন।[৫১]

---

৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬।
৫১. তফছিরুল কুরআন (১), পৃ. ১৩৭-৪৪।

www.pathagar.com

কারও কারও মতে, স্যার সৈয়দ ছিলেন মুতাযিলাভাবাপন্ন। তিনি আবু মুসলিম মুতাযিলীর অভিমত সমর্থন করে বলেন, কুরআনের একটি আয়াতের হুকুমও রহিত হয় নি। রসুল করীমের সময় যতটুকু কুরআন লিপিবদ্ধ হয়েছিল, বর্তমানে অবিকল তা-ই রয়েছে।[৫২]

মাওলানা আকরম খাঁ বলেন :

> কোরআন মাজীদে রহিত, abrogated বা মানছুখ আয়াত একটিও নাই। পূর্বে কুরআনের পাঁচশত আয়াতকে মানছুখ বলিয়া গণ্য করা হইত। আমাদের বিশিষ্ট আলেমগণ এ সম্বন্ধে বরাবরই বিচার আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন। ফলে ইমাম ছুয়ূতী প্রমুখ আলেমরা স্বীকার করেন যে, যে-সব আয়াতকে মানছুখ বলিয়া গণ্য করা হয়, তাহার অধিকাংশই বস্তুতঃ মানছুখ নহে। তিনি উহার সংখ্যা ২০টি বলিয়া সাব্যস্ত করেন (এৎকান)। পরবর্তী যুগে মোজতাহেদ শাহ অলীউল্লাহ ছাহেব উহার মধ্য হইতে ১৫টি বাদ দিয়া ৫টি মাত্র আয়াতকে মানছুখ বলিয়া ধার্য করেন। আল্লামা ছিদ্দীকুল হাছান খাঁ, শাহ ছাহেবের উক্তি উদ্ধৃত করার পর বলিতেছেন : "কিন্তু এই পাঁচটা সম্বন্ধেও আলোচনার বিষয় আছে।" (তারজুমান)। এই মহামান্য আলেমগণের উপর আল্লাহর রহমত সহস্রাধারে বর্ষিত হউক, তাঁহাদের প্রদর্শিত বিচার পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া, আজ আমরা বলিতে সমর্থ হইয়াছি যে, আল্লাহর কালামে মানছুখ আয়াত একটিও নাই।[৫৩]

বিশ্ব সৃষ্টির সময়কাল নিয়ে উভয়ের মতামত

এ মনোহর পৃথিবী একদিনে সৃষ্টি হয় নি। এ ব্যাপারে বিশদ ব্যাখা-বিশ্লেষণ রয়েছে। বিভিন্ন মনীষী পৃথক পৃথক মতামতও ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু স্যার সৈয়দ বলেন যে, আল্লাহ ছয়টি কাল বা ছয়টি ধাপে বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। মাওলানা তাঁর মতামত সমর্থন করে বলেন:

> আল্লাহ তা'য়ালা পয়দা করিয়াছেন আকাশ-মণ্ডলকে ও পৃথিবীকে ছয় 'আইয়ামে'। আরবি ভাষায়, সময়ের যে কোনো ক্ষুদ্র-বৃহৎ অংশের প্রতিও 'ইয়াওম'-এর ব্যবহার হইয়া থাকে। আল্লামা আবদুছ ছউদ ও কাজী বায়জাভী ছয় আইয়ামে পদের অর্থ করিয়াছেন 'ফি ছিত্তাতি আইয়াম' বা ছয় কালে। এই তাৎপর্য অনুসারে আমি অনুবাদ করিয়াছি আল্লাহ আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে পয়দা করিয়াছেন ছয় কালে। সমস্ত Universe বা মাখলুকাতের সৃষ্টি মাত্র ছয় দিনে বা ছয় যুগে পরিসমাপ্ত হইয়া গিয়াছিল, কুরআন হইতে ইহা প্রমাণিত হয় না।[৫৪]

শয়তান সম্পর্কে উভয়ের একই ব্যাখ্যা

কুরআন ও হাদিসের আলোকে স্যার সৈয়দ প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, শয়তান বলে স্বতন্ত্র কোনো সত্তা বা সৃষ্টি নেই। মানুষের মধ্যে যে কুপ্রবৃত্তি বস্তু পাশব শক্তি রয়েছে, তাই 'শয়তান' বা 'ইবলিস' নামে অভিহিত। তিনি তাঁর মতের স্বপক্ষে মহিউদ্দীন

মাকালাত (১৩), পৃ. ১৩৯-৪০।
৫২. তফছিরুল কুরআন (১), পৃ. ১৩৮।
৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২।
৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৫-৬।

www.pathagar.com

ইবনুল আরাবিসহ বিভিন্ন মনীষীর উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেছেন। মাওলানা আকরম খাঁও স্যার সৈয়দের মতের সাথে একমত পোষণ করে বলেন:

> যেসব কাজ-কথায় অশ্লীলতা আছে অথবা যাহা স্বভাবত: ঘৃণিত ও কদর্য্য সেগুলি হইতেছে শয়তানী কাজ। ... যাহারা মানুষকে এইসব অন্যায় কাজ-কথায় লিপ্ত হইতে উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকে তাহাদের প্রত্যেকটিই শয়তান পদ-বাচ্য, তা সে স্বার্থপর পণ্ডিত পুরোহিত হউক, গোমরাহ পীর-ফকির হউক, তাহার নিজস্ব কুপ্রবৃত্তি বা নাফছে আমমারাই হউক, দুষ্ট সহচর হউক অথবা মালউন ইবলীছ খান্নাছই হউক।[৫৫]

মাওলানা সাহেব আরো পরিষ্কার ভাষায় বলেন :

এই শয়তান হইতেছে মানুষের 'নফসে আমমারা' বা অন্তরের হীন প্রবৃত্তি। এই অর্থে, অপব্যয়কারীদিগকেও কোরআনে 'ইখওয়ানুশ-শাইআতীন'[৫৬] বলিয়া বিশেষিত করা হইয়াছে।[৫৭]

ঈসা (আ.) সম্পর্কে উভয়ের মতামত

ঈসা (আ.) সম্পর্কে মাওলানার মতামত হচ্ছে :

> "হযরত ঈসা (আ.) যে বিনা বাপে পয়দা হইয়াছিলেন, কুরআন মজিদের কোনো আয়াত বা কোনো ছহীহ হাদিছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। পুরুষ ও নারীর সংশ্রব ব্যতীত কোনোও জীবের এমনকি উদ্ভিদেরও জন্ম হইতে পারে না, ইহা আল্লাহর চিরন্তন নিয়ম।"[৫৮]

বিরুদ্ধবাদী আলিম বলেন: কুরআনের আল-ইমরান, মারইয়াম, আম্বিয়া, তাহরীম প্রভৃতি সুরায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষিত হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ.) পিতার ঔরস ছাড়াই খোদার কুদরতের বিশেষ নির্দশনস্বরূপ সৃষ্ট হয়েছেন।[৫৯] সত্যিই যদি তাঁর পিতা থাকতো, তাহলে তাঁর মাতা হযরত মারইয়াম তাঁকে প্রসবার্থে লোকলজ্জার ভয়ে জনসমাজ ও লোকালয় ছেড়ে সেই নির্জন বনে খেজুর বৃক্ষের কাণ্ডে আশ্রয় নিতেন না। আক্ষেপের সুরে একথাও তিনি বলতেন না যে, হায় ! যদি আমি ইতোপূর্বেই মৃত্যুবরণ করতাম, তাহলে ভালো হতো ! পিতা ছিল না বলেই সমাজের লোক তাঁকে বলতে সাহস করেছিল আর বলেছিল: 'হে মারইয়াম ! তোমার পিতা-মাতা তো কোনোদিন অসৎ-অসতী ছিলেন না।'

'এত বড় অপবাদ সত্ত্বেও মারইয়াম স্বামীর নাম বলতে পারেন নি। পিতা ছিল না বলেই সদ্যপ্রসূত শিশু ঈসা (আ.)-কে মুজিযাস্বরূপ তাঁর মাতার সতীত্বের সাক্ষ্য দিতে হয়েছিল। সাক্ষ্য দানকালে তিনি বলেন :

> আমি আল্লাহর বান্দা' অর্থাৎ, কোনো স্বাভাবিক নিয়মে বা পিতার ঔরসে নয়, বরং আল্লাহর অলৌকিক শক্তিতেই আমার সৃষ্টি, আল্লাহ আমাকে মাতার সঙ্গে আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন। পিতা থাকলে অবশ্যই তাঁর প্রতি অনুরূপ

---

৫৫. তফছিরুল কুরআন (১), পৃ. ৬২-৮৩।
৫৬. অর্থাৎ, শয়তানের ভাই।
৫৭. তফছিরুল কুরআন (১), পৃ. ৩৬৩।
৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৫-৪৬।
৫৯. সুরা আল-ই-ইমরান, আয়াত ৪৫-৪৬।

www.pathagar.com

সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দেয়া হতো। যেমন আল্লাহ সমসাময়িক নবি ইয়াহইয়া (আ.)-কে পিতা-মাতা উভয়ের সংগেই সদ্ব্যবহারের আদেশ দেন। কারণ, তাঁর পিতা যাকারিয়া (আ.) জীবিত ছিলেন।

উল্লেখ্য যে, ইয়াহইয়া ও ঈসা (আ.)-এর জন্মবৃত্তান্ত প্রায় একইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তফাৎ শুধু এই যে, ইয়াহইয়া (আ.)-কে বলা হয়েছে যাকারিয়া (আ.)-এর পুত্র আর ঈসা (আ.)-কে বলা হয়েছে মারইয়ামের পুত্র। কুরআন ও হাদিসের যেখানেই তাঁর পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে, সেখানেই তাঁকে পুরুষের স্থলে মারইয়ামেরই পুত্র বলে ঘোষণা করা হয়েছে। পিতার ঔরস ছাড়াও তাঁর সৃষ্টির কথা ইসলামের সকল মনীষী অকুণ্ঠচিত্তে একবাক্যে স্বীকার করেছেন।[৬০]

পিতার ঔরসে ঈসা (আ.)-এর জন্মের কথা অস্বীকার করার পর মাওলানা তাঁর জীবদ্দশায় আসমানে উত্থিত হওয়ার কথাকেও অস্বীকার করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি স্বাভাবিক নিয়মেই ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুবরণের মত পোষণ করেন।[৬১] মাওলানা তাঁর দাবির সমর্থনে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পেশ করেন :

হে ঈসা, আমি অবশ্যই তোমাকে توفى (ওফাৎ বা মৃত্যু) দান করবো।[৬২] কর্মপদ ও صله-এর বিভিন্নতার কারণে এবং সরাসরিও এই শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন :

কোনো বস্তুকে পুরোপুরি গ্রহণ করা।[৬৩]

'ঊর্ধ্বে উত্তোলনের জন্যে আকর্ষণ করা।'[৬৪]

'সময় পূর্ণ করা।'[৬৫]

'নিজের কাছে ফিরিয়ে নেয়া।'[৬৬]

'গগন শিখরে সমুন্নত করা।'[৬৭]

'ঊর্ধ্বগগনে উত্তোলিত করা' এবং

'পূর্ণরূপে ধারণ করা।'[৬৮]

মাওলানার মতে, উল্লিখিত আয়াতে (توفى) শব্দের একমাত্র অর্থ 'মৃত্যু দান করে।' কারণ, হিসেবে তিনি বলেন : "যে-সব স্থানে এই (توفى) ক্রিয়ার একটি মাত্র কর্মপদ থাকে, সেখানে এর একমাত্র অর্থ হচ্ছে মৃত্যু।"[৬৯]

---

৬০. তফছির ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড (ঈসা আল-বাবী আল-হালাবী প্রেস, মিসর তাঃ বিঃ) পৃ. ৩৬৪।
৬১. তফছিরুল কুরআন, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৬।
৬২. সূরা আল-ই-ইমরান, আয়াত ৫৫।
৬৩. ওয়ালীউল্লাহ শাহ, 'ফাতহুর রহমান' (দিল্লী, ১৯৩৭ খ্রি.) পৃ. ১২৮।
নওয়াব সিদ্দীক খান, তর্জুমানুল কুরআন', ৩য় খণ্ড, মুফীদে আম প্রেস, আগ্রা, ১৮৮৯ খ্রিঃ, পৃ. ১০১৯।
৬৪. জালাল উদ্দীন সুয়ুতী ওয়াল মাহাল্লী, তফছিরে জালালাঈন, ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, (মিসর, ১৯৩৯), পৃ. ১৪০।
৬৫. মওলানা আবুল কালাম আজাদ, 'তরজুমানুল কুরআন, ১ম সংস্করণ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৪।
৬৬. মাওঃ সৈয়দ আহমদ হাসান, আহসানুর-তফছির, ২য় মনযিল, (লাহোর, ১৩২৫ হিঃ), পৃ. ১০৫।
৬৭. আল্লামা শাইফ ফয়েজুল্লাহ, ফয়েজী, সাওয়াতিউল ইলহাম, (লক্ষ্মৌ, ১৮৮৯ খ্রি.), পৃ. ১২৯।
৬৮. ইমাম রাযী, 'তফছিরে কাবীর', ১ম সংস্করণ, ৭ম খণ্ড, (বাহিয়া প্রেস, মিসর, ১৯৩৮), পৃ. ৭২।

www.pathagar.com

জমহুর আলিমদের মতে, ঈসা (আ.) স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন নি, তিনি জীবন্ত অবস্থায় আসমানে উত্তোলিত হয়েছেন। মাওলানা সাহেবের উল্লিখিত যুক্তি-প্রমাণের উত্তরে তাঁরা বলেন توفى ক্রিয়ার একটি মাত্র কর্মপদ থাকা সত্ত্বেও মৃত্যু ছাড়া অন্য অর্থে যে ব্যবহৃত হয় তার অসংখ্য প্রমাণ কুরআনে মজিদেই রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ সুরা আনআমের আয়াতাংশ উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন, (هو الذى يتوفاكم بالليل) (তিনি তোমাদেরকে রাত্রি বেলা (توفى) দিয়ে থাকেন বা নিদ্রাভিভূত করেন)[৭০] এ আয়াতে ব্যবহৃত توفى ক্রিয়াটির একটি মাত্র কর্মপদ থাকা সত্ত্বেও জমহুর তফছিরকারদের সর্বগ্রাহ্য অভিমত এই যে, এর অর্থ 'নিদ্রাভিভূত করা'- মৃত্যুদান নয়।[৭১]

এছাড়া (توفى الشئ. توفى المدة. توفى حقه. توفى عدد القوم) প্রভৃতি বাক্যাংশের প্রতি ক্ষেত্রেই একটিমাত্র কর্মপদ রয়েছে। কিন্তু এ সত্ত্বেও ক্রিয়াটি মৃত্যু অর্থে ব্যবহৃত হয় নি। এতে করে মাওলানা সাহেবের দাবির সারবত্তা বা অসারতা অনুধাবন করা যায়।

সুরা নিসার ১৫৭-৫৮ আয়াতে ঘোষিত হয়েছে :

وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم.

তারা (ইহুদিরা) তাঁকে হত্যা করতে পারে নি আর শূলবিদ্ধও করতে পারে নি, বরং সন্দেহের মাঝে নিপতিত হয়েছিল, তাদের সামনে ঈসা-সদৃশ এক আকৃতি উপস্থাপিত করা হয়েছিল। বরং আল্লাহ পাক তাঁকে নিজের পানে উঠিয়ে নিয়েছেন।[৭২]

এই আয়াতে এবং সুরা আল-ইমরানের ৫৪ নং আয়াত (انى متوفيك ورافعك الى) থেকে স্পষ্টত জানা যায় যে, ঈসা (আ.) নভোমণ্ডলে 'জীবন্ত' উত্থিত হয়েছেন।[৭৩]

এ ব্যাপারে স্যার সৈয়দও একই মত পোষণ করেন। তাঁর ব্যাখ্যা নিম্নরূপ :

খ্রিষ্টান ও মুসলমান–উভয় জাতি মনে করে যে, হযরত ঈসা আল্লাহর অপার মহিমায় অতিপ্রাকৃতভাবে বিনা পিতায় জন্মগ্রহণ করেন। এ ধারণাটি মোটেই মেনে নেয়া যায় না। কারণ এ অস্বাভাবিক জন্মের পেছনে আল্লাহর কি হেকমত থাকতে পারে, তা বোঝা দুরূহ। অতিপ্রাকৃত ঘটনার পেছনে আল্লাহর দু'টি উদ্দেশ্য নিহিত থাকে বলে সাধারণত মনে করা হয়: (১) নিজ অফুরন্ত মহিমা প্রকাশ, (২) বিশেষ কোনো মুজিযা প্রদর্শন। সুতরাং এক্ষেত্রে হয়তো বলা হবে যে, আল্লাহর অপরিসীম শক্তির প্রতীকরূপে হযরত ঈসার এই অস্বাভাবিক জন্ম হয়েছিল। কিন্তু তা-ই বা যুক্তিযুক্ত হবে কিভাবে? বলা বাহুল্য, অনস্তিত্ব থেকেই আল্লাহ গোটা দুনিয়া এবং যাবতীয় জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন। হযরত আদম (আ.)-কে তিনি পিতা-মাতা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। এ ঘটনাগুলো হযরত ঈসার বিনা পিতার জন্মগ্রহণের

---

৬৯. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৭।
৭০. সূরা আনআম, আয়াত-৬০।
৭১. জারুল্লাহ মাহমুদ যামাখশারী, 'তফছিরে কাশশাফ', ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণঃ (বাহিয়া প্রেস, মিসর ১৩৪৩ হিঃ), পৃ. ২৯৫।
৭২. সুরা নিসা, আয়াত ১৫৭-৫৮।
৭৩. সুরা 'আল-ইমরান': আয়াত ৫৪।

www.pathagar.com

চাইতেও আল্লাহর অধিকতর ক্ষমতার পরিচায়ক। সুতরাং অধিকতর ক্ষমতার পরিচয় প্রদানের পর ক্ষুদ্রতর ক্ষমতার মাধ্যমে আল্লাহর নিজ মহিমার পরিচয় দানের পেছনে কি যুক্তি থাকতে পারে? দ্বিতীয়ত, এ অস্বাভাবিক জন্মের মাধমে হযরত ঈসার মুজিযাও প্রতিষ্ঠিত হয় না। কারণ মুজিযার প্রয়োজন তখনি দেখা দেয়, যখন নবির নবুওয়াত অস্বীকার করা হয়। হযরত ঈসার জন্মের সন্ধিক্ষণে তাঁর নবুওয়াতকে স্বীকার বা অস্বীকার করার কোনো প্রশ্নই ওঠেনি। অস্বাভাবিক জন্মকে যদি মুজিযা বলে পরিগণিত করা হয়, তবে সেই দিক থেকে এ মুজিযা হযরত ঈসার মাতা মরিয়মের; ঈসার নয়। মুজিযা তো প্রকাশ্য বস্তুই হয়ে থাকে, তা হলে যেন সর্বসাধারণ মানুষ তা দেখতে পায়। অথচ হযরত ঈসার বিনা পিতার জন্মগ্রহণ মোটেও প্রকাশ্য ব্যাপার ছিল না।"[৭৪]

হযরত ঈসা বিনা পিতায় জন্মগ্রহণ করেন- এমন ধারণা প্রথম যুগীয় খ্রিষ্টানদের মধ্যেও ছিল না। ইঞ্জিলে মথি, ইঞ্জিলে লুক, ইঞ্জিলে যোহন, ইঞ্জিলে মার্ক-সকল ইঞ্জিলেই এটা স্বীকার করা হয়েছে যে, হযরত ঈসার মা হযরত মরিয়মের স্বামী ছিলেন ইউসুফ নামক জনৈক ব্যক্তি। ইঞ্জিলের মূল গ্রন্থগুলো লিখিত হয় হিব্রু ভাষায়। কিন্তু পরবর্তী যুগে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশে এ গ্রন্থগুলো 'হাওআরিদের' (হযরত ঈসার অনুগামী ও সাহায্যকারী) উদ্যোগে গ্রিক ভাষায় অনূদিত হয়।[৭৫]

গ্রিক সমাজে অত্যধিক পূতপবিত্র লোককে আল্লাহর পুত্র' বলে আখ্যায়িত করা হতো। এ ধারণা অনুসারেই তারা হারকিউলাস, প্লেটো প্রমুখকে আল্লাহর পুত্র' বলে আখ্যায়িত করেছিল। তাই হযরত ঈসার 'হাওয়ারিগণ' যখন গ্রিক ভাষার মাধ্যমে খ্রিষ্টধর্ম প্রচার করতে চাইলেন, তখন তাঁরা খুব সম্ভব আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে পূত-পবিত্রতার প্রতীক মনে করে হযরত ঈসাকেও গ্রিক ভাষায় আল্লাহর পুত্র' (ইবনুল্লাহ) বলে আখ্যায়িত করেন। হযরত ঈসা গ্রিকদের মধ্যে রূপক অর্থে আল্লাহর পুত্র নামে অভিহিত ছিলেন। গ্রিক ভাষায় অনূদিত ইঞ্জিলসমূহেও ইউসুফকে হযরত মরিয়মের স্বামী এবং হযরত ঈসাকে ইউসুফের পুত্র বলেই স্বীকার করা হয়।[৭৬]

'হাওয়ারিগণ' যে রূপক অর্থে হযরত ঈসাকে আল্লাহর পুত্র' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন, দীর্ঘকাল পর সেই রূপক ধারণাটি মানুষের মন থেকে মুছে গেল এবং পরবর্তী যুগের খ্রিষ্টানরা তাঁকে সত্যিকারভাবে আল্লাহর পুত্র' বলে মনে করতে লাগলো। অন্যদিকে, ইহুদিরা জিদের বশবর্তী হয়ে আল্লাহর পুত্র' এই আখ্যার সূত্র ধরে হযরত ঈসার প্রতি অবৈধ সন্তানের (নাউযুবিল্লাহ) অপবাদ দিতে আরম্ভ করে।[৭৭]

ইসলামের অভ্যুত্থানের পর দেখা গেল যে, কুরআনে হযরত ঈসার বিনা পিতায় জন্মগ্রহণ সম্পর্কে কিছুই নেই। কুরআন অবতরণের যুগে দু'টি পরস্পরবিরোধী ধর্মীয় সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল : এক সম্প্রদায় (ইহুদি) দীনতা ও হীনতাবশত হযরত ঈসার প্রতি জারজ সন্তানের অপবাদ দিতো। অপর সম্প্রদায় (খ্রিষ্টান) তাঁকে আল্লাহ, আল্লাহর পুত্র বা তৃতীয় আল্লাহ বলে আখ্যায়িত করতো। কুরআন মজিদ তাঁর প্রতি আনীত সকল অপবাদ খণ্ডন করে এবং খ্রিষ্টানদের ভুল ধারণা নিরসনের উদ্যোগ নেয়।

---

৭৪. মাকালাত (১৪), পৃ. ৩১০-২২।
৭৫. প্রাগুক্ত।
৭৬. তফছিরুল কুরআন (২), পৃ. ১৫-৩৫।
৭৭. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

কুরআন হযরত ঈসাকে অন্যান্য মানুষের ন্যায় আল্লাহর একজন বান্দা বলে ঘোষণা করে এবং তাঁর পবিত্রতা ও হযরত মরিয়মের নিষ্কলুষতা তুলে ধরে। কুরআন হযরত ঈসাকে 'কালেমাতুল্লাহ' ও 'রুহুল কুদুস' খিতাবে ভূষিত করে। 'কালেমা' মানে 'সুনিশ্চিত'। তাঁর আগমন সুনিশ্চিত ও একটি সুসংবাদ ছিল বলে তাঁকে কুরআনে এ খিতাব দেয়া হয়। 'রুহুল-কুদুস' মানে 'পবিত্র জীবন'। তিনি নিজ জাতির জন্য পবিত্রতার প্রতীক ছিলেন বলে এ বিশেষণে বিশেষিত হন। কিন্তু বিনা পিতায় তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন–এ কথা কুরআনে কোথাও বর্ণনা করা হয় নি। ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের মধ্যেও হযরত ঈসা মরিয়মের পুত্র বলে খ্যাত ছিলেন। তাই তাদের ধারণা মোতাবেক কুরআনেও হযরত ঈসাকে ইবনে মরিয়ম (মরিয়মের পুত্র) বলা হয়েছে।[৭৮]

মাওলানা আকরম খাঁ হযরত ঈসা (আ.)-এর নিহত বা ক্রুশবিদ্ধ হবার বিষয়টি স্যার সৈয়দের অনুরূপ ব্যাখ্যাই দিয়েছেন। তিনি ইমাম ইবনে হাযমের উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেছেন এভাবে:

> হযরত ঈসা নিহত হন নাই এবং ক্রুশে দিয়াও তাঁহাকে নিহত করা হয় নাই। পরন্তু আল্লাহ তাঁহার মৃত্যু ঘটাইয়াছিলেন এবং তাহার পর তাঁহাকে তুলিয়া নিয়াছিলেন নিজের পানে।[৭৯]

হযরত মুসা (আ.)-এর লাঠির আঘাতে ঝর্ণাসাগর বিদীর্ণ প্রসঙ্গে উভয়ের মতামত

হযরত মুসা (আ.)-এর লাঠির আঘাতে পাথর থেকে ঝর্ণা নির্গত হয়েছে বলেই আমাদের সমাজে প্রচলন থাকলেও উভয় মনীষীর মতামত হচ্ছে ঝর্ণা নির্গত হয়নি। এখানে স্যার সৈয়দের বিশদ ব্যাখা উপস্থাপনযোগ্য। স্যার সৈয়দ বলেন :

> এবং আপনি নিজ লাঠির উপর ভর ক'রে পাথরময় জায়গার উপর দিয়ে চলুন, তখন তিনি দেখতে পেলেন বারটি প্রবাহমান ঝর্ণা।[৮০]

এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সাধারণ তফছিরকারগণ হযরত মুসা (আ.) অলৌকিকত্ব প্রমাণ করার প্রয়াস পান এবং বলেন, তাঁর লাঠির আঘাতে পাথর থেকে বারটি ঝর্ণা সৃষ্টি হয়েছিল। বস্তুত ব্যাপারটি তা নয়। আরো পরিষ্কার ভাষায় : লোহিত সাগরের শাখানদী অতিক্রম করে হযরত মুসা ইসাম নামক উপত্যকায় উপস্থিত হলে বনি-ইসরাইলগণ তাঁর নিকট পানি চেয়েছিল। সেখানে পানীয় ছিল না। সে সময় আল্লাহ তাআলা হযরত মুসাকে বলেছিলেন :

> আপনি নিজ লাঠির উপর ভর ক'রে নিকটস্থ পাহাড়টির উপর দিয়ে চলুন।"

পাহাড়টি অতিক্রম ক'রে ইলম নামক স্থানে উপস্থিত হলে তিনি এবং তাঁর সঙ্গীরা সেখানে পাহাড় থেকে নির্গত বারটি ঝর্ণা দেখতে পেয়েছিলেন। সেই ঝর্ণাগুলো ছিল স্বাভাবিকভাবে সৃষ্ট। হযরত মুসার (আ.) লাঠির আঘাতে সেগুলো সৃষ্টি হয় নি।[৮১] মাওলানা আকরম খাঁও স্যার সৈয়দের উপরোক্ত ব্যাখ্যা সমর্থন করেন।

মাওলানা তাঁর তফছিরুল কুরআন-এ হযরত মুসা (আ.)-এর সাগর দ্বিখণ্ডন সম্পর্কিত মুজিযাকে অস্বীকার করে বলেন :

---

৭৮. মাকালাত (১৪), পৃ. ৩১০-২২।
৭৯. তফছিরুল কুরআন (১), পৃ. ৪৬৯।
৮০. এটি স্যার সৈয়দের উর্দু অনুবাদের বাংলা রূপান্তর।
৮১. তফছিরুল কুরআন (১), পৃ. ৯৫।

www.pathagar.com

> তিনি [মুসা (আ.)] লোহিত সাগরকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় অতিক্রম করেননি এবং তাঁর যষ্টির আঘাতে পাথর থেকে বারোটি প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়নি।[৮২]

তিনি বলেন :

> আমার মতে, হরত মুসার লোহিত সাগর পার হওয়ার অনুকূলে কোনোও যুক্তি-প্রমাণ নাই। তিনি নিজে স্বজাতীয়দিগকে নিয়া বাহির হইয়াছিলেন মিসরের গোশেন অঞ্চল হইতে এবং সম্মুখে তিমছাহ হ্রদের তীরবর্তী একটা শুষ্ক পথ ধরিয়া ছীনা অঞ্চলে উপস্থিত হইয়াছিলেন।[৮৩]

এই গোশেন[৮৪] অঞ্চলটি মিসরের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত।

মাওলানার বিরুদ্ধবাদী আলিমদের মতে, হযরত মুসা (আ.)-এর পূর্ব-বাসস্থান 'গোশেন' বা জাসান ছিল বটে, কিন্তু সে অঞ্চলটি অবস্থিত ছিল নীলনদের তীরে; তিমসাহ হ্রদের তীরে নয়। এর সঠিক মানচিত্রাংকন করে দেখিয়েছিলেন সাইয়েদ সুলাইমান নাদভী (১৮৮৪-১৯৫০) তাঁর আরদুল কুরআন' গ্রন্থে এবং মাওলানা হিফযুর রহমান (১৯০১-১৯৬২) তাঁর 'কাসাসুল কুরআনে'। এছাড়া অন্যান্য তফছির গ্রন্থেও বলা হয়েছে, মুসা (আ.) লোহিত সাগরই পার হয়েছিলেন, তিমসাহ হ্রদ নয়। এখানে মাওলানা 'বাহর' শব্দ দ্বারা তিমসাহ হ্রদকে বুঝিয়েছেন। যদি তা-ই হয়, তবে এখানে প্রশ্ন জাগে, তিমসাহ হ্রদের উভয় পার্শ্বে বিরাট শুষ্ক ও সমতল ভূ-ভাগ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ইস্রাইল বংশীয়রা সেই শুষ্ক সমতল ভূভাগের পথ পরিহার করে নল-খাগড়া ও মরা কোটাল বিশিষ্ট তিমসাহ হ্রদের খাদে পাড়ি জমাতে গিয়েছিল কেন? এছাড়া ভাটার সময়ে হ্রদ বা জলাশয়ের পার্শ্ববর্তী রাস্তা নল-খাগড়া ও প্যাক-কাদায় পূর্বের তুলনায় অধিকতর দূরতিক্রম্য হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায় লক্ষাধিক নর-নারীকে সঙ্গে নিয়ে মুসা (আ.) এই কষ্টসাধ্য রাস্তাটি অতিক্রম করার ঝুঁকি নিয়েছিলেন কেন? তাঁর পক্ষে হ্রদ বা জলাশয়ের পার্শ্ববর্তী সমতল ভূমির পথ কিছুটা দূরের হলেও বেছে নেয়াই যুক্তিযুক্ত ছিল?

এছাড়া কুরআনের ভাষায় মুসা ও ফিরআউনের দল পরস্পরের দৃষ্টিগোচরে থাকা সত্ত্বেও কেন তাঁর ন্যায় একজন খোদায়ি দাবিকারক প্রতাপান্বিত বিচক্ষণ নরপতি সে অঞ্চলে বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে গঠিত বিশাল বাহিনীসহ কেনই বা সেই তিমসাহ হ্রদের খাদে ঝাঁপিয়ে পড়ে অকাতরে প্রাণ হারায়? হ্রদের চতুষ্পার্শ্বস্থ সমতল ভূমির পথ চেয়ে দ্রুত হাতি-ঘোড়া হাঁকিয়ে যদি ফিরআউনের লোক-লশকর বনি ইস্রাইলকে ঐ খাদের মধ্যে অতর্কিত ঘেরাও করে ফেলতো তাহলে ফিরআউনের মনোবাঞ্ছা অতি সহজেই পূর্ণ হতো।

---

৮২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭।

৮৩. তফছিরুল কুরআন ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯।

৮৪. 'তাওরাতের' উর্দু সংস্করণের উল্লিখিত جشن জাসান আর মাওলানা সাহেবের বর্ণিত 'গোশেন' সম্ভবত. একই বস্তু (উর্দু তাওরাত ৪৭ বার, ৫-৬ আয়াত, সৃষ্টি পুস্তক (پیدائش) এখানে আরও উল্লেখ্য যে, মাওলানা সাহেব নিজে 'তাওরাত' গ্রন্থ থেকে প্রমাণ নিয়েছেন, অথচ অন্যান্য তফছিরকার তাঁদের তফছির গ্রন্থে যে ইয়াহুদি তাওরাতের যাত্রা পুস্তক (سفر الخروج) (The Book of Exodus) থেকে তথ্য নিয়েছেন। তিনি তাঁদের সমালোচনাও করেছেন।
বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬।

www.pathagar.com

উল্লেখ্য, লাঠির আঘাতে সাগর বিদীর্ণের কথা কুরআনের ছয় স্থানে বর্ণিত হয়েছে।[৮৫] তন্মধ্যে সুরা শুয়ারার নিম্নোক্ত আয়াত সবচাইতে স্পষ্ট :

واوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك الحجر فانفق فكان كل فرق كالطود العظيم.

মাওলানা সাহেব এই আয়াতের অনুবাদ করেছেন এভাবে :

মুছাকে অহি করিলাম তুমি নিজের মণ্ডলীসহ (জলাশয় বা) উপকূল ভূমি অতিবাহন করিয়া যাও, তখন (চড়া ভূমিগুলি) প্রকট হইয়া উঠিল এবং তাহাতে প্রত্যেক চড়াটি বৃহৎ বালুকাস্তূপের মত (দেখাইতে) লাগিল।[৮৬]

অন্যান্য তফছিরকারের তরজমার ভাব এরূপ : "আমি মুসা (আ.)-কে নির্দেশ দিলাম তুমি তোমার যষ্ঠি দ্বারা সাগরকে আঘাত কর। তদ্দরুন সেই সাগর খণ্ডিত হয়ে গেল এবং প্রতিটি খণ্ড বৃহৎ উঁচু পর্বতসম হয়ে উঠলো।[৮৭]

লক্ষণীয় যে, মাওলানা সাহেবের মতে, (اضرب) অর্থ 'তুমি অতিবাহন করিয়া যাও' আর অন্যান্য তফছিরকারের মতে, আঘাত কর'। শেষোক্ত দল স্বীকার করেন যে, (اضرب) শব্দের অর্থ 'অতিবাহন করা' ও আঘাত করা' উভয়ই হয়ে থাকে। তবে আলোচ্য আয়াতে যে এর অর্থ আঘাত করাই হবে' 'অতিবাহন করা' হতে পারে না-তার কারণগুলি নিম্নরূপ :

ক. আঘাত করা' হল (ضرب) শব্দের বহুল প্রচলিত অর্থ। এই অর্থ বাদ দিয়ে অন্য কোনো অর্থ গ্রহণ করতে হলে তার জন্য চাই কোনো قرينة صارفه ভিন্ন অর্থ নির্দেশক। আর যেহেতু এখানে তেমন কোনো قرينة নাই। তাই এর অর্থ হবে আঘাত করা।

খ. اضرب শব্দের পর তার صله - ب হয়, তখন তার একমাত্র অর্থ হয় আঘাত করা। আর যখন তার صله - فى হয়, তখন তার অর্থ 'অতিবাহন করা' নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

যেহেতু আলোচ্য আয়াতে ضرب-এর পর তার صله - ب হয়েছে, তাই তার অর্থ হবে আঘাত করা'।

মাওলানা সাহেব এই (فى - صله) আসার কথা অগ্রাহ্য-এর সমর্থনকারী আলিমদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন।[৮৮] অথচ কুরআনে (ضرب) পরিভ্রমণ করা অর্থে (في - صله) ছাড়া কোথাও ব্যবহৃত হয়নি।[৮৯]

---

৮৫. উক্ত ছয়টি স্থান হলো, ১) সুরা বাকারাহ, আয়াত-৬০, ২) সুরা 'আরাফ ঃ আয়াত-১৩৮, ৩) সুরা ইউনুস, আয়াত-৯০, ৪) সুরা তাহা ঃ আয়াত-৭৭, ৫) সুরা শু'আরা ঃ আয়াত-৬৩, এবং ৬) সুরা দুখান, আয়াত-২৪।

৮৬. 'তাঃ কুঃ' ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩।

৮৭. 'তফছির', ২৩শ খণ্ড, (বাহিয়া প্রেস, মিসর, পৃ. ১৩৮, 'তাঃ কাশশাফ', ২য় খণ্ড, ১ম সংস্করণ, বাহিয়া প্রেস, মিসর ১৯২৫), পৃ. ১২৪।

৮৮. তা. ক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৬।

৮৯. প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্যার সৈয়দ আহমদ তাঁর 'তফছিরুল কুরআন' এবং মাওলানা মুহাম্মদ আলীমি লাহোরি তাঁর 'তফছিরুল বায়ানে' যে এ ধরনের বিকৃত অর্থ করেছেন, সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন মাওলানা মীর আ. সালাম তাঁর 'কুরআন শরীফের মনগড়া অর্থ' শীর্ষক প্রবন্ধে (দ্র. এা. 'শরিয়তে ইসলাম': ১৩৩৮, কার্তিক সংখ্যা, পৃ. ২৩৪।

www.pathagar.com

তফছিরকার আরও উল্লেখ করেছেন যে, (اضرب) শব্দ صله-এর বিভিন্নতার কারণে মোট ২৯টি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন لام - صله আসলে এর অর্থ হয় 'বর্ণনা করা'।[৯০] ফি-ছেলা আসলে এর অর্থ হয় 'পরিভ্রমণ করা'[৯১] صله - ب আসলে এর অর্থ হয় আঘাত করা'[৯২] ইত্যাদি।

তাঁরা আরও উল্লেখ করেছেন যে, পবিত্র কুরআনের ব্যবহার অনুযায়ী (صل - ب) সহকারে ضرب শব্দটি শুধুমাত্র আঘাত করা' অর্থেই একাধিক স্থানে প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন- সুরা বাকারার ৭৩ আয়াতে[৯৩] اضربوه শব্দের অর্থ জমহুর তফছিরকার আঘাত কর' গ্রহণ করেছেন।[৯৪]

জমহুর তফছিরকারগণ এখানে হযরত মুসা (আ.)-এর পরিধেয় বস্ত্র নিয়ে পাথরের উধাও হওয়ার ঘটনা প্রসঙ্গে বুখারীর হাদিসটি উল্লেখ করেছেন:

فانفلق بالحجر ضربالعصاه

এখানে ضربا শব্দের صله - ب হওয়ায় মুহাদ্দিসদের সর্বসম্মত মতানুসারে এর অর্থ হচ্ছে আঘাত করা' ভ্রমণ বা অতিবাহন করা নয়। আলোচ্য আয়াতেও এর অর্থ হবে আঘাত করা'।[৯৫]

আয়াতের দ্বিতীয় শব্দ عصا-এর অর্থ মাওলানা সাহেব করেছেন 'মণ্ডলী' আর অন্য সবাই করেছেন 'লাঠি'। আরবি ভাষায় এ শব্দটি মণ্ডলী, যষ্ঠি, রসনা, হাঁটুর নিম্নস্থ অস্থি, একত্র সমাবেশ, একমত হওয়া ইত্যাদি অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যাঁরা এখানে এর অর্থ করেছেন লাঠি, তাঁদের বক্তব্য এই যে, লাঠি অর্থটাই ব্যাপক ও বহুল প্রচলিত। সুরা 'তা-হা'-এর মধ্যে মুসা (আ.)-এর যষ্ঠি সম্পর্কে বিস্তৃত ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। ইতোপূর্বে উদ্ধৃত বুখারির হাদিস এবং টীকায় উদ্ধৃত 'হামাসা' কাব্য-সংকলনের উল্লিখিত আসা' শব্দটি যষ্ঠি অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। যষ্ঠি অর্থ সমর্থনকারীরা আরও বলেন, মুসা

---

৯০. (ক) وضرب لنا مثلا আর (হে মানুষ) আমার সম্পর্কে অনুরূপ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে নিল।
সুরা ইয়াসিন, আয়াত-৭।
(খ) وتلك الامثال نضربها للناس আর আমরা এই শ্রেণীর উপমা প্রকাশ করে কি মানুষের কল্যাণার্থে।
সুরা হাসর, আয়াত-২১।

৯১. অন্যরা দেশে দেশে পরিভ্রমণ করে বেড়াবে।
সূরা মুযাম্মিল, আয়াত-২০।

৯২. فاضرب بعصاك الحجر 'তুমি তোমার যষ্ঠি দ্বারা সাগরকে আঘাত কর।
সুরা শু'য়ারা, আয়াত-৬৩।

৯৩. রুকু ৯, পারা ১।

৯৪. ضرب শব্দের صله - ب হলে তার অর্থ হয় 'আঘাত করা'-এর প্রসঙ্গে আরবি সাহিত্যের অনবদ্য কাব্যগ্রন্থ 'হামাসা'র নিম্নোক্ত কবিতা দু'টি প্রণিধানযোগ্য :
ক. ضربناكم حتى اذا قام ميلكم . ضربنا العدى عنكم ببيض صوارم
অর্থাৎ 'তোমাদেরকে প্রহার করতে করতে যখন তোমাদের সকল বক্রতা ও হঠকারিতা সংশোধন হয়ে আসলো তখন আমরা আবার তোমাদেরই পক্ষ থেকে তোমাদের দুশমনদের মারতে লাগলাম শুভ সুতীক্ষ্ণ তলওয়ার দ্বারা।'
খ. ونغشى فنغسى ثم ترمى فترمى. ونضرب ضربا بالعصا ويمان
অর্থাৎ 'আমরা অনুপ্রবেশ করে ছেয়ে ফেলি এবং পরস্পর তীর নিক্ষেপ করি আর যষ্ঠি ও সুতীক্ষ্ণ তলওয়ার দ্বারা আঘাত হানি।
এখানে উভয় পঙ্ক্তির ضرب এর صله -ب পর আসার কারণে অর্থ হয়েছে আঘাত করা।

৯৫. আ. সাত্তার, 'তফছিরের নামে সত্যের অপলাপ' (তা. বি.), পৃ. ১৩।

www.pathagar.com

(আ.) এবং লাঠি যেন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কারণ, এ লাঠিই ছিল তাঁর অন্যতম মু'জিযা। এর দ্বারাই তিনি ফিরআউন ও তার যাদুকর দলকে পরাভূত করেন। 'মুসার লাঠি' কথাটি আমাদের সমাজে প্রবাদবাক্য স্বরূপ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মুসার (আ.) عصا আসা' আরবি সাহিত্যে এত প্রসিদ্ধ, যেমন সংস্কৃত সাহিত্যে মহাদেবের ত্রিশূল। এছাড়া সুরা তা-হা-তে এর অর্থ যেমন লাঠি নেয়া হয়েছে, এখানেও তেমনি عصاك দ্বারা যষ্ঠিকে বুঝানো হয়েছে।[৯৬] আর যদি আলোচ্য عصا-এর অর্থ মণ্ডলী নেয়া হয়, তা'হলে সুরা তা-হা-তে উল্লিখিত عصاي-এর অর্থও 'মণ্ডলী' নিতে হবে, সে ক্ষেত্রে অর্থ দাঁড়াবে (اتوكؤ عليها واهش بها على غنمى)[৯৭] আমি মণ্ডলীর' উপর ভর দেই এবং 'মণ্ডলী' দ্বারা গাছের পাতা পেড়ে মেষকে খাওয়াই।

আলোচ্য আয়াতে তৃতীয় শব্দ আল-বাহর'। জমহুর তফছিরকারগণ এর অর্থ করেছেন 'সাগর'। মাওলানা সাহেব এর আভিধানিক অর্থ করেছেন 'জলাশয়' এবং এর মর্মার্থ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন 'তিমসাহ' হ্রদকে।

এ ব্যাপারে তফছিরকারদের বক্তব্য: ভূগোল-মানচিত্র, অভিধান ইত্যাদিতে এই তিমসাহ হ্রদকে 'বুহাইরা' বা উপসাগর হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই 'তিমসাহ'কে বড়জোর 'বুহাইরা' বলা যেতে পারে, 'বাহর' কোনোক্রমেই নয়।

জমহুর তফছিরকারগণ আরও বলেন: 'বাহর' শব্দটি কুরআনে বিভিন্ন স্থানে ২৪ বার এক বচনে, ৪ বার দ্বিবচনে এবং ২ বার বহুবচনে ব্যবহৃত হয়েছে।

মাওলানা 'বাহর' শব্দটির অর্থ করেছেন 'সাগর' ও 'দরিয়া'। কিন্তু মুসা (আ.)-এর ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি এর অর্থ করেছেন 'জলাশয়'। অথচ তিনি এই শেষোক্ত অর্থের কোনো ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত আরবি সাহিত্যে প্রদর্শন করেন নি।

আয়াতে 'ইনফালাকা', 'ফিরকুন' এবং 'তাওদুল' এই তিনটি শব্দের বেলায় মাওলানা সাহেব জমহুর মুফাসসিরিনের গৃহীত অর্থ হতে ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করেছেন। মাওলানা সাহেব শব্দত্রয়ের অর্থ করেছেন যথাক্রমে 'প্রকট হইয়া উঠিল', 'চড়াভূমিগুলি' এবং 'বৃহৎ বালুকাস্তূপ'।

পক্ষান্তরে জমহুর মুফাসসিরিন অর্থ করেছেন: 'খণ্ডিত হল', 'খণ্ড' 'বৃহৎ উঁচু পর্বতমালা'।

বিপক্ষীয় মুফাসসিরিনের মতে: মাওলানা সাহেব এই নব অর্থ ও নতুন নতুন অভিমত পোষণের মাধ্যমে শুধু স্বনামধন্য তফছিরকারদেরই নয় বরং লব্ধপ্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিকদেরও বিরোধিতা করেছেন।[৯৮]

---

৯৬. এখানে আরবি অলংকার শাস্ত্রের একটি সর্ববাদিসম্মত قاعده প্রণিধানযোগ্য। قاعده 'টি এই اسم المعرفة اذا الاولى অর্থাৎ اسم معرفة পুনরুল্লিখিত হলে তদ্বারা একই বস্তু বোঝায়, কিন্তু اسم نكرة পুনরুল্লিখিত হলে তদ্বারা বিভিন্ন জিনিস বোঝা যায়। যেমন, فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا
অর্থাৎ, নিশ্চয়ই সংকটের সঙ্গে রয়েছে একাধিক স্বাচ্ছন্দ্য। এখানে العسر দ্বারা যেমন একই অর্থে ব্যবহৃত একটি সংকটকেই বোঝায়, সেখানেও তেমনি عصاك ও عصاى একই বস্তু এবং একই যষ্ঠি অর্থে ব্যবহৃত এবং সেটা মুসার (আ) যষ্ঠি। তা-হা'র এবং অন্যান্য সুরার عصاك নির্দিষ্ট বিশেষ্য معرفة ব্যবহৃত হয়েছে تركيب হওয়ার কারণে।

৯৭. সুরা 'তা-হা': আয়াত-১৮।

৯৮. ইবনুল আসীর, 'আল-কামিল' (১ম সংস্করণ ঃ আযহারি প্রেস, মিসর, ১৩০১ হিঃ), পৃ. ১০৬। ইবনু কাসীর, 'আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ', ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৩।

www.pathagar.com

মাওলানা আকরম খাঁ ও স্যার সৈয়দ আহমদের এ মতের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাদৃশ্য থাকলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৈসাদৃশ্যও রয়েছে। স্যার সৈয়দ ও খাঁ সাহেবের মতের গরমিলের ক'টি বিষয় নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

ফিরিশতা সম্পর্কে মতামত

মাওলানা আকরম খাঁ 'তফছিরুল কুরআন' লেখার সময় পূর্বসূরি স্যার সৈয়দের ধ্যান-ধারণা থেকে অনেক কিছুই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ফিরিশতা সম্পর্কে স্যার সৈয়দ যে মতামত পোষণ করেন, মাওলানা তা অনুসরণ করেন নি। মাওলানা ফিরিশতার চিরাচরিত ধারণায় হাত দেন নি, নতুন কিছু ব্যাখা দেয়ার প্রয়াস পান নি। কিন্তু স্যার সৈয়দ এ সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অবতারণা করেন। স্যার সৈয়দের মতে, ফিরিশতা বলতে প্রকৃতির সেই শক্তিরাজিকেই বুঝায়, যার কল্যাণে বিশ্বভুবন সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হয়ে থাকে। এ ছাড়া আল্লাহর সেই মহান মহিমা ও অভিপ্রায়সমূহকেও ফিরিশতারূপে অভিহিত করা হয়, যা তাঁর যাবতীয় সৃষ্টির মধ্য দিয়ে প্রকাশ লাভ করে থাকে।[৯৯] জমহুর ওলামায়ে কিরাম ও মাওলানা আকরম খাঁসহ কেউ তাঁর এ মত গ্রহণ করেন নি।

খুনের বদলে খুন না ক্ষমা : মতের গরমিল

আকরম খাঁ সাহেব খুনের বদলা কিসে হবে- খুন না ক্ষমা? এ ক্ষেত্রে স্যার সৈয়দের মতের স্বপক্ষে যেতে পারেন নি। তাঁর মতে, নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশ পণ গ্রহণ করে ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীকে ক্ষমাও করতে পারে।[১০০]

স্যার সৈয়দ এ ব্যাপারে বলেন : "খুনের বদলে খুনিকে হত্যাই করতে হবে।"

সাধারণ উলামার মত হলো :

> "নিহত ব্যক্তির ওয়রিশ ইচ্ছা করলে বিনিময় গ্রহণ করে হত্যাকারীকে ক্ষমাও করতে পারে।"

জমহুর উলামা তাঁদের যুক্তিস্বরূপ কুরআনের এই আয়াত পেশ করেন :

> "কেউ যদি নিজ ভাইয়ের তরফ থেকে কোনো দাবি থেকে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়, তবে তার কর্তব্য হলো, আপন দায়িত্ব যথাযথ পালন করা এবং কৃতজ্ঞতা সহকারে তা আদায় করা।"

কিন্তু স্যার সৈয়দের মতে, এই আয়াতটি জাহেলি যুগের খুনের সাথে সম্পৃক্ত। তিনি বলেন : জাহেলি যুগে বিনিময় গ্রহণ করে হত্যাকারীকে ক্ষমা করার রেওয়াজ ছিল। তাই যারা জাহেলি যুগে খুনের ব্যাপারে কারো সাথে কোনোরূপ পণের চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল এবং তা পূর্ণ করার পূর্বেই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল, আল্লাহ তাদের এ মর্মে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে কেউ যদি তোমাদের ক্ষমা করে থাকে বা খুনের বিনিময়ে কিছু দিতে ওয়াদা করে থাকে তবে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তা অবশ্য পালনীয়। ইসলামের মতে, ইচ্ছাধীন হত্যাকাণ্ডের জন্য কোনো ক্ষমা নেই। খুনের একমাত্র দণ্ড হলো খুনিকে খুন করা। স্যার সৈয়দ তাঁর দাবি প্রতিষ্ঠায় এই আয়াতটি পেশ করেন :

---

৯৯. মাকালাত (১৩), পৃ. ১৬৬, ১৭৪।
১০০. তফছিরুল কুরআন (৩), ৪৪৪-৫৫।

www.pathagar.com

"এবং মৃত্যুদণ্ড বিধানের মধ্যে নিহিত রয়েছে তোমাদের জীবন।"

ভুলবশত হত্যা করা হলে স্যার সৈয়দের মতেও হত্যাকারীকে ক্ষমা করা এবং বিনিময় গ্রহণ করা অসমীচীন নয়।[১০১]

সুদ সম্পর্কে মতের গরমিল

কুরআন ব্যবসাকে হালাল ঘোষণা দিয়েছে, আর সুদকে করা হয়েছে হারাম। এ মাসআলাটি নিয়ে বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। স্যার সৈয়দ এবং আকরম খাঁ-ও এর উপর আলোকপাত করেছেন। খাঁ সাহেব প্রথমত তাঁর 'সমস্যা ও সমাধান' শীর্ষক গ্রন্থে মিসরীয় উলামার বরাতে সুদ সম্পর্কে স্যার সৈয়দের মতোই মতামত ব্যক্ত করেন। পরে অবশ্য তিনি সব ধরনের সুদকেই হারাম বলে মত প্রকাশ করেছেন এভাবে :

> সুরা বাকারার ৩৮ রুকু'র আয়াতগুলি দ্বারা সকল প্রকার সুদের আদান-প্রদানকে সম্পূর্ণ হারাম করিয়া দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে দ্বি-গুণ চতুর্গুণ বলিয়া সুদ গ্রহণ না করা মূল নিষেধটাকে Qualify করা বা কোনো শর্তে সীমাবদ্ধ করা হয় নাই; বরং সে সময় হেজাজ অঞ্চলে যে ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র।[১০২]

সুদ সম্পর্কে মাওলানা আরো বলেন :

> সুদ রহিত করার এই ব্যবস্থা দিয়া ইছলাম মাজলুম মানবতার যে উপকার করিয়াছে, দুনিয়ার ইতিহাসে তাহারও তুলনা নাই। কিন্তু এখানে উত্তমরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আল্লাহর প্রাকৃতিক ধর্ম ইসলাম, শুধু এই নেতিমূলক আদেশ দিয়া ক্ষান্ত থাকেন নাই; দুস্থ মানুষের অভাব দূর করার জন্য সঙ্গে সঙ্গে বাইতুল-মাল তহবিল গঠন করার নির্দেশও দিয়াছে। কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে, জাকাত দেওয়ার আদেশ ও সুদ লওয়ার নিষেধ একই আয়াত অঙ্গাঙ্গীভাবে বর্ণিত হইয়াছে।[১০৩]

আল্লাহর দর্শন সম্পর্কে দুই মনীষীর মতামত

আল্লাহ-দর্শনের বিষয়টি মানব সমাজে যুগ যুগ ধরে আশার আলো জ্বালালেও স্যার সৈয়দ ও খাঁ সাহেব এ ব্যাপারে মতানৈক্য পোষণ করেন। তাঁদের মতে, চর্মচোখে আল্লাহর দর্শন কোনো জগতেই সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে স্যার সৈয়দ বলেন :

> আল্লাহর দর্শন লাভ বাহ্য তথা চর্মচোখেও সম্ভব নয়, অন্তর-চোখেও সম্ভব নয়, দুনিয়াতেও নয়, পরকালেও নয়। কারণ আল্লাহ নিরাকার ও অতুলনীয়। তিনি আয়তনবিশিষ্টও নন। তবে পৃথিবীতে তাঁর অস্তিত্ব, শক্তির নিদর্শন ও কর্মতৎপরতা অবশ্যই লক্ষণীয়। পরকালে আল্লাহকে দেখা সম্ভব হবে–এ কথার অর্থ হলো সেই জাহানে তাঁর অস্তিত্বের বিশ্বাস অন্তরে সুদৃঢ় হবে।[১০৪]

মাওলানার এ সম্পর্কে দুটো মত আমরা দেখতে পাই :

---

১০১. মাকালাত (১৫), ৩৬৩-৬৭।
১০২. তফছিরুল কুরআন (১), পৃ. ৫৪৬।
১০৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৫।
১০৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৫।

www.pathagar.com

ক. কিয়ামতের দিনে মানুষ আল্লাহর নির্ধারিত কর্মফলগুলির সম্মুখীন হইবে, কিয়ামতে আল্লাহর সাক্ষাৎকার বলিতে ইহাই বুঝিতে হইব।[১০৫]

খ. আল্লাহকে দর্শন করা যে মানব চক্ষের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব, তা অস্বীকার করার কোনো উপায় নাই। কিন্তু আখেরাতে ইহা সম্ভবত হইবে, সহিহ হাদিছে ইহার প্রমাণ মওজুদ আছে।[১০৬]

এ ক্ষেত্রে মু'তাযিলাদের মতামতও প্রণিধানযোগ্য। তাদের মতে, আক্ষরিক অর্থে আল্লাহর দর্শন কখনো সম্ভব নয়।[১০৭]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মাওলানা তাঁর *তফছিরুল কুরআনে* আরবি ভাষার লীলাধর্ম, রীতিধারা, বাকপ্রণালী, বাচনভঙ্গি, ব্যবহারবিধি ইত্যাদির প্রতি যথাযথ দৃষ্টি রেখেছেন। এ প্রসঙ্গে মরহুম মুজীবুর রহমান খাঁর (১৮৬৯-১৯৪০ খ্রি.) মতামত আমরা উপস্থাপন করতে পারি :

> ... যে ভাষা থেকে অনুবাদ করা হয়, সে ভাষার রীতিনীতি ও লীলা ধর্মের সাথে অন্য কোনো ভাষার স্বভাবতই মিল থাকে না। এই গরমিলকে লক্ষ্য করে একটা প্রবচন গড়ে ওঠেছে যে, কোনো বড় গ্রন্থকেই ভাষান্তরিত করা যায় না। অনুবাদকের যদি তার মাতৃভাষায় অসাধারণ দখল থাকে– তবে তার রচনা চাতুর্যের দ্বারা এই অসুবিধাকে তিনি অনেকখানি অতিক্রম করে যেতে পারেন। এ ব্যাপারে বাংলা ভাষার সাধারণ দৈন্যের কথাও মনে রাখা দরকার। যা হোক, বাংলা ভাষায় অসাধারণ দখল থাকার দরুন মওলানা সাহেব অনুবাদের এই বাধা ও অসুবিধাকে অনেকখানি জয় করতে পেরেছেন।

মাওলানার বাংলা তরজমা ও তফছিরের যেমনি প্রশংসনীয় দিক রয়েছে, তেমনি একটি আপত্তিকর দিকও রয়েছে। সর্বত্রই মুক্তবুদ্ধি ও যুক্তিবাদিতার অনুসরণের পরাকাষ্ঠা দেখাতে গিয়ে তিনি মাঝে মাঝে অনেকটা সীমাও লঙঘন করে ফেলেছেন। স্যার সৈয়দ আহমদ প্রমুখের ন্যায় তিনি কুরআনের যে-সব জড়বাদধর্মী অভিনব ব্যাখ্যা করেছেন, সেগুলোর কোনো কোনোটি আধুনিকপন্থি ও প্রগতিবাদি আলিমগণ স্বীকার করে নিলেও, এখনও অধিকাংশ আলিম স্বীকার করেন নি।

তিনি কুরআনে যে-সব স্থানে নতুন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, উপরে তা দেখানো হয়েছে। নিম্নে বিরোধী আলিমদের জওয়াবসহ তার নমুনা পেশ করা হলো। হযরত আদম (আ.) প্রসঙ্গে মাওলানা সাহেবের মত :

> আদম (আ.) কোনো ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়; বরং গোটা মানব সমাজ ও গোষ্ঠীর নাম। তিনি যে জান্নাত থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন তা এই মাটির পৃথিবীরই একটি উদ্যানবিশেষ।[১০৮]

মাওলানার অভিমত পবিত্র কুরআন, সহিহ হাদিস, সাহাবা, তাবিয়িন এবং জমহুর উলামা ও মুফাসসিরিনদের মতের যে সম্পূর্ণ বিপরীত ও পরিপন্থী, তা তাঁর বিরুদ্ধ মতাবলম্বী আলিমগণ প্রমাণ করেছেন এভাবে :

---

১০৫. প্রাগুক্ত, (২), পৃ. ৩৪৬।
১০৬. প্রাগুক্ত (২), পৃ. ৫৬৩।
১০৭. সৈয়দ আমীর আলী, রূহে ইসলাম (উদ্ধৃতি), পৃ. ৬০৫।
১০৮. তফছিরুল কুরআন, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১-৬৫।

www.pathagar.com

কুরআন ও হাদিসের ভিত্তিতে একথার উপর জমহুর উলামা ও মুফাসসিরিনের ইজমা হয়েছে যে, আদম (আ.) এই গোটা মানব সমাজের নাম নয়; বরং মানব জাতির আদি পিতার নাম। সুরা 'নিসা'র প্রথম আয়াতে خلقكم من نفس واحدة দ্বারা আদি পিতা হযরত আদম (আ.) অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষকেই বুঝানো হয়েছে।[১০৯]

মাওলানা তাঁর অভিমত ও দাবির সমর্থনে বলেন :

আদম একটিমাত্র বিশেষ ব্যক্তিকে বুঝাইয়া থাকিলে সুরা বাকারা ৩৬ আয়াতে قلنا اهبطوا منها جميعا দ্বিবচনের পরিবর্তে বহুবচন ব্যবহার করা হইত না।[১১০]

বিপক্ষীয়দের মন্তব্য হলো, কুরআনে ব্যবহৃত সর্বনামের বহুবচন সব সময় তিন বা ততোধিক বস্তুকে বোঝায় না। প্রমাণস্বরূপ বলা যায় আল্লাহ' শব্দটির জন্যে কুরআন মজিদে সব সময়েই বহুবচন বিশিষ্ট সর্বনাম ব্যবহৃত হয়েছে। যদি বহুবচনের ব্যবহৃত সর্বনাম দ্বারা অপরিহার্য ও অবশ্যম্ভাবীরূপে তিন বা ততোধিক বস্তুকেই বোঝাতে হয়, তাহলে তো কুরআন মজিদকে বহু ঈশ্বরবাদের সমর্থন মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই।

এছাড়া আরবি ভাষায় সর্বনামের রূপান্তর সচরাচর এবং সর্বস্তরেই ঘটে থাকে। যেমন : (فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم) আয়াতে ماحوله স্থলে সর্বনাম একবচন এবং بنورهم স্থলে সর্বনাম বহুবচন ব্যবহার হয়েছে, যদিও উভয় সর্বনাম একই ব্যাক্তিকে বোঝাচ্ছে। এছাড়া 'দিউয়ানুল হামাসা' নামক আরবি সাহিত্যের শীর্ষস্থানীয় কাব্যগ্রন্থে কবি জা'ফর ইবনু উলবা আল-হারেসি বলেন :

فلا تحسبنى انى تخشعت بعدكم. لشئ من الموت افرق

এখানে (فلا تحسبنى) ক্রিয়াপদের অন্তর্নিহিত انت সর্বনামটি একবচন এবং স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অব্যবহিত পরে كم সর্বনামটি বহুবচন এবং পুংলিঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে। অবশ্য, উভয় সর্বনাম একই বস্তুনির্দেশক।

আরবি ভাষায় ব্যবহৃত صيغة جمع বহুবচন যে সর্বাবস্থায় তিন বা ততোধিক বস্তুর জন্যেই ব্যবহৃত হয়- মাওলানা সাহেবের এই যুক্তি সমর্থনযোগ্য নয়। বরং দুই বা ততোধিক বস্তুর জন্যেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে (الاثنان فما فوقها جمع) ব্যাকরণ ও অন্যান্য শাস্ত্রের এই নিয়মটি সর্বজনবিদিত।

আদম (আ.) কোনো ব্যক্তিবিশেষের নাম না হয়ে একটি গোষ্ঠীর নাম–একথা প্রমাণের জন্য মাওলানা সাহেবের দ্বিতীয় যুক্তি এই :

তফছিরকারগণের অনেকেই আদমকে আল্লাহর রাছুল বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এবং তিনি অন্ততঃ কবীরা গুনাহ হইতে মাছুম- একথাও তাহারা স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু যুগপৎভাবে এই আদমকে একটি মাত্র ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করায় তাহারা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছেন যে, তাহাদের কল্পিত আদম কুরআনের স্পষ্ট আদেশানুসারে আল্লাহর নাফরমান গোমরাহ।[১১১]

বিপক্ষীয়দের বক্তব্য হলো :

---

১০৯. সূরা 'আন-নিসা': ইমাম রাযী, 'তফছিরে কবীর' ১ম খণ্ড, (১ম সংস্কঃ মিসর, ১৯৩৮ খ্রীঃ) পৃ. ১৬০।
কাজী 'আবদুল্লাহ ইবন উমার, 'তফছিরুল বায়যাবী'।

১১০. তফছিরুল কুরআন, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত।

১১১. তফছিরুল কুরআন, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২।

www.pathagar.com

হযরত মুসা (আ.)-ও নবুওতের পর জনৈক কিবতীকে হত্যা করেছিলেন। নিঃসন্দেহে এটাও একটা কবিরা গুনাহ।[১১২] অথচ রসুলকে এই কবীরা গুনাহ থেকে নিস্পাপ হতেই হবে। তাই মাওলানা সাহেবের মতানুসারে মুসা (আ.) কোনো ব্যক্তিবিশেষের নাম না হয়ে এক গোষ্ঠী ও সমষ্টির নাম হওয়া চাই। নতুবা এই মুসা (আ.)-কে নবি এবং কবিরা গুনাহগার–দুই-ই হতে হয়। অনুরূপভাবে হযরত নূহ, ইউনুস, ইব্রাহিম (আ.)-কেও এক একটি গোষ্ঠীর নাম হওয়া চাই। কারণ এঁরা সকলেই নিজ নিজ যুগে যথাক্রমে আল্লাহর অবাধ্যতা, আদেশ লংঘন ও মিথ্যাভাষণের কারণে কবিরা গুণাহের ভাগী হয়েছেন। এ কথাও সত্য যে, নবি ও রসুলকে নিস্পাপ হওয়া চাই।"

উপরোক্ত যুক্তি প্রমাণ ছাড়াও হযরত আদম (আ.) সম্বন্ধে বিরোধীদের বক্তব্য হলো:

হযরত আদম (আ.) যে তখন ছিলেন তার কোনো প্রমাণ নেই। বরং অনেকেরই মতে তিনি নবুওয়াতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন এই মাটির পৃথিবীতে অবতরণ করার পর। এছাড়া কুরআনের স্পষ্ট نسى آدم او ঘোষণা [আদম (আ.) ভুলে গিয়েছিলেন] অনুযায়ী ভুলক্রমে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণের কারণে হযরত আদম (আ.) গুনাহগারও ছিলেন না।

হযরত আদম (আ.) সম্পর্কে সাধারণ তফছিরকারগণের মতামত হলো :

সৃষ্টির অব্যবহিত পর আল্লাহ পাক তাঁর বাসস্থান হিসেবে বেহেশতকে স্থির করেছিলেন। সুতরাং তিনি সেখানে কিছুদিন ধরে অবস্থান করার পর নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণের দরুন সেখান থেকে বহিষ্কৃত হন।

মাওলানা সাহেব বলেন:

আদম সেই আসমানে অবস্থিত জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হন নাই, বরং সেটা ছিল এই অস্থায়ী জগতেরই কোনো এক কাননবিশেষ।[১১৩]

মতের সমর্থনে তিনি বলেন : আছমানে স্থিত জান্নাতে' হযরত আদম (আ.)-এর অবস্থান সম্পর্কে কোনো প্রমাণ কুরআনের আয়াতে বা হাদিসে নেই।[১১৪]

বিপক্ষীয়দের মত হলো: আছমানে স্থিত জান্নাতে হযরত আদমের (আ.) অবস্থান সম্পর্কে শুধুমাত্র কুরআনের আয়াতেই নয়, হাদিসেও ভুরি ভুরি দলিল-প্রমাণ রয়েছে।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

فازلهما الشيطن عنها.......... قلنا اهبطوا بعضكم

"ইবলিস শয়তান তাঁদের উভয়কে জান্নাত থেকে বিচলিত ও পদস্খলিত করে দিল। আর যে সুখ-সম্পদের মধ্যে তাঁরা অবস্থান করছিল তা' থেকেও তাঁদের বের করে দিল। এবং আমি বললাম : জান্নাত থেকে মর্তের মাটিতে নেমে যাও, পরস্পর পরস্পরের দুশমন তোমরা।"[১১৫]

---

১১২. গুনাহ বা পাপ দু'ভাগে বিভক্ত। ১. কবিরা বা বড় গুনাহ, ২. ছগিরা বা ছোট গুনাহ। কবিরা গুনাহ যেমন- ব্যভিচার, হত্যা ইত্যাদি।
বুরহানউদ্দীন মুরগীনানী, হিদায়া, করাচি, পৃ. ৬৩।

১১৩. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, তফছিরুল কুরআন, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২-৬৩।

১১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।

১১৫. সুরা বাকারা, রুকূ ৪, আয়াত ৩৬।

www.pathagar.com

আল্লাহর আদেশ 'ইহবিতূ' দ্বারা কোনো উঁচু স্থান থেকে নিচে অবতরণ করার কথা বুঝায়। আদম (আ.)-এর জান্নাত ভূপৃষ্ঠে হলে সেখান থেকে নিচে অবতরণ করার প্রশ্নই ওঠে না। এ ছাড়া সহিহ মুসলিম শরিফে বর্ণিত হয়েছে:

يجمع الله الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون يا ابانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل اخرجكم من الجنة الا خطيئة ابيكم آدم الخ.

এ হাদিসে বলা হয়েছে :

> রোয কিয়ামতে আল্লাহ পাক সমগ্র মানবকুলকে একত্রিত করবেন। তখন তাদের মধ্যে ধর্মবিশ্বাসী মুমিন বান্দারা ওঠে দাঁড়াবেন, আর জান্নাতে তাদের সম্মুখপানে গোচরীভূত করা হবে। এ দেখে তারা হযরত আদমের কাছে গিয়ে বেহেশতের দ্বারোদঘাটনের জন্যে অনুরোধ জানাবেন। হযরত আদম (আ.) উত্তরে বলবেন : তোমাদের আদি পিতা আদমকে তাঁর আত্মকৃত পাপই তো উক্ত জান্নাত থেকে বহিষ্কার করেছিল।[১১৬]

প্রণিধানযোগ্য যে, আদম সন্তানরা যে 'জান্নাতে'র দ্বারোদঘাটন প্রার্থনা করবে, তা' হচ্ছে আসমানি বেহেশত'। কোনো পার্থিব উদ্যান নয়। অতএব আদম (আ.)-এর উল্লিখিত জান্নাতটিও কোনো পার্থিব কানন নয়।

দ্বিতীয়ত, আরবি অলংকার শাস্ত্রের নিয়মানুসারে (المعرفة اذا اعيدت كانت عين الاولى)[১১৭] অর্থাৎ, কোনো নির্দিষ্ট বিশেষ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটলে উভয় বিশেষ্য একই বস্তুকে বুঝায়। আলোচ্য হাদিসে الجنة (নির্দিষ্ট বিশেষ্য)-টি দু'বার উল্লিখিত হয়েছে। সুতরাং উভয় 'জান্নাত' একই বস্তুকে বুঝাচ্ছে। যেহেতু আদম-সন্তানদের প্রার্থিত 'জান্নাত' আসমানি বেহেশত, তাই আদমের উল্লিখিত 'জান্নাত'ও আসমানি বেহেশত।

উল্লেখ্য, স্যার সৈয়দের ধর্মনীতির মূল উৎস হচ্ছে একমাত্র কুরআন। ধর্মীয় বিধি-বিধান তথা নীতি-নির্ধারণের বেলায় হাদিস তাঁর কাছে গ্রহণীয় নয়।

মাওলানা সাহেব কুরআন মজিদ, সহিহ হাদিস, এমন কি প্রয়োজন বোধে ইজমা অর্থাৎ পূর্ববর্তী আলিমদের ঐক্যবদ্ধ মিলিত অভিমতকেও সর্বতোভাবে গ্রাহ্য বলে স্বীকার করেন। এছাড়া পাশ্চাত্য রীতি-নীতি ও সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ করে স্যার সৈয়দ যতোটা পাশ্চাত্য-প্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন, মাওলানা আকরম খাঁ ততোটা অতিভক্তি ও অন্ধ অনুকরণের শিকারে পতিত হন নি।[১১৮]

এ প্রসঙ্গে মাওলানা সাহেব বলেন :

> "একশ্রেণীর তফছিরকারগণ কুরআনকে আধুনিকতার সহিত খাপ খাওয়াইবার জন্য অতি নির্মমভাবে যথেচ্ছাচারের পরিচয় দিয়া থাকেন, ইহাও সংস্কারের দাসত্ব হুজুগের গড্ডালিকা প্রভাবে আত্মসমর্পণ।"[১১৯]

---

১১৬. 'সহিহ মুসলিম শরিফ', ১ম খণ্ড, পৃ. ১১২।

১১৭. হাফেজ আহমদ মোল্লাজিউন, নুরুল আনওয়ার, মাবহাসুল আ'ম ঃ (কালাম কোঃ মওঃ মুসাফির খানাঃ তাঃ বিঃ করাচী-১), পৃ. ৮৫ আহমদ মোল্লাজিউন (মৃঃ ১৭১৮ খ্রীঃ), তিনি ভারতের বাসিন্দা ছিলেন।

১১৮. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, 'ই, এ, প, 'মাওলানা আকরম খাঁ', দ্বাদশ বর্ষ, ১৯৭৪ সাল, এপ্রিল-জুন, পৃ. ২০৫।

১১৯. মাওলানা আকরম খাঁ, 'মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস', (১ম সংস্করণ, আজাদ এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৬৫), পৃ. ২০৫।

www.pathagar.com

মাওলানা সাহেব স্বীয় 'তাফসিরুল কোরআনের' মাধ্যমে ইসলামকে যুগোপযোগী পরিস্থিতি ও চাহিদার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে স্বাধীন চিন্তার অনুসরণ ও স্বাধীন মতামত ব্যক্তকরণের প্রতি জাতিকে উদাত্ত কণ্ঠে আহবান জানিয়েছেন। প্রতিদিনের উদ্ভূত নিত্য-নতুন সমস্যাবলীর সঙ্গে ইসলাম কিভাবে মুকাবিলা করবে ... আলিম সমাজকে তিনি সেই প্রজ্ঞা ও সবক দিয়ে গেছেন। তাঁর 'তাফসিরুল কোরআনে' যুক্তিমূলক ব্যাখ্যা ও টীকা-টিপ্পনী বস্তুত আধুনিক শিক্ষিত পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন লোককে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ও অনুরক্ত করেছে, অনাগত দিনেও করবে। বস্তুত, আধুনিকপন্থী ও পাশ্চাত্য ভাবধারায় প্রভাবান্বিত মুসলমানদের কাছে বাংলা ভাষায় কুরআনকে তুলে ধরার জন্যে এ ধরনের স্বচ্ছ, বোধগম্য ও যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যার প্রয়োজন চিরদিনই অনুভূত হতে থাকবে। মাওলানা সাহেব চেয়েছিলেন স্বীয় যুক্তি-বিচার, মুক্ত-বিবেক, বুদ্ধিবৃত্তি ও ইজতিহাদের নির্ভীক অনুশীলন দ্বারা বাঙালি মুসলিম মনীষার মূল্যবান ঐতিহ্য কায়েম করতে। তাঁর ইচ্ছা একেবারেই বিফলে যায় নি। তাই, সাম্প্রতিককালে কতিপয় আধুনিক উলামার লেখনিধারায় মাওলানা সাহেবের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বাধীন চিন্তার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়
বঙ্গীয় সমাজ-জীবনে চিন্তাধারার প্রভাব

মাওলানা আকরম খাঁ'র প্রতিভার মূল্যায়ন করতে হলে, তাঁর ব্যক্তিত্বের ও পাণ্ডিত্যের প্রভাবের কথা বলতে হলে, আমাদেরকে একটু পেছনে ফিরে যেতে হবে। অন্তত কয়েক শতাব্দীর ইতিহাসকে পর্যালোচনা করতে হবে। তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেন উপমহাদেশসহ মুসলিম বিশ্বের তখনকার পরিস্থিতি ছিল অশান্ত, হতাশাদীর্ণ ছিল মুসলিম মিল্লাত।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বিশ শতকের গোড়ার দিকে তুর্কি সাম্রাজ্য নামেমাত্র ইসলামি রাষ্ট্র ছিল। পূর্ব ইউরোপ থেকে ক্রমে ইসলাম নির্বাসিত হচ্ছিল। দক্ষিণ রাশিয়ার মুসলিম রাষ্ট্রগুলো একে একে রুশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি গ্রাস করছিল। চীনের মুসলমানরা ছিল হতাশাগ্রস্ত। মিসর করায়ত্ত করে রেখেছিল বৃটিশরা। ফ্রান্স ছিল মরক্কো দখল করার ফন্দিতে। ইরানও মুমূর্ষু অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিল। ওলন্দাজদের উৎপীড়নে ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানরাও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারছিল না।[১]

১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লবের পর থেকে পাক-ভারতীয় মুসলমানদের ভাগ্যেও নেমে এসেছিল চরম দুর্দিন।[২] এমনি পরাজয় ও নিঃসহায় অবস্থার মধ্যে পাক-ভারতীয় মুসলমানদের আশা-ভরসার উৎস ছিল ওসমানিয়া (অটোমান) সাম্রাজ্য। তুর্কিরাই তখন সীমিত পরিসরে কিছুটা নিজেদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হয়েছিল। অবশ্য, পাশ্চাত্য শক্তি সেখানেও গিয়ে পড়েছিল, মুসলমানদের এই শেষ সম্বল স্বাধীন রাষ্ট্রকেও তারা গ্রাস করার পাঁয়তারা করতে থাকে। বৃটিশ শক্তি তুর্কির বিরুদ্ধে গ্রিকদের লেলিয়ে দেয়। এতে পাক-ভারতীয় মুসলমান মাত্রেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের উপর রূঢ় হয়ে ওঠে।

এদিকে, স্যার সৈয়দ আহমদ ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লবের কঠোর বাস্তবতার কথা মনে করেন। তিনি ভাবলেন, তুর্কির প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে বৃটিশকে ক্ষেপিয়ে তুললে পাক-ভারতীয় মুসলমানরাও বৃটিশের রূঢ়তার শিকার হবে। ফলে, বৃটিশদের সাথে ভারতীয় মুসলমানদের মিতালীর সম্ভাবনাময় যে সৌধ রচিত হতে যাচ্ছিল তা ব্যাহত হয়ে যেতে পারে। সেহেতু, তিনি দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশের মুসলমানদের মুসলিম জাহানের রাজনীতিতে কোনরূপ সক্রিয় অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে উপদেশ প্রদান করেন। অনুরূপভাবে ১৮৮২ সালে বৃটিশ যখন প্রাচ্যের অগ্নিপুরুষ বীর মুজাহিদ জামাল উদ্দীন আফগানীকে মিসর থেকে নির্বাসিত করে পাক-ভারতে আটকিয়ে রাখে, তখনো স্যার সৈয়দ আহমদ ও তাঁর অনুসারীরা জামাল উদ্দীন আফগানীকে একই কারণে কোনরূপ সাহায্য করে নি। আফগানী মুসলিম বিশ্বে 'প্যান-

---

১. ড. জাভিদ ইকবাল, তাজকারে ইকবাল, ইকবাল একাডেমী, লাহোর, ১৯৮৯, পৃ. ৯-১১।
২. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫।

www.pathagar.com

ইসলামিজম' বা বিশ্ব মুসলিম ঐক্য আন্দোলন চালাচ্ছিলেন।[৩] তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, বিশ্বব্যাপী মুসলিম জাতির এই পতন রোধ করতে হলে সব মুসলমানকে এক কাতারে এসে দাঁড়াতে হবে। তা না হলে ইউরোপের বিশ্বগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ হতে মুসলমানদের রক্ষা করার দ্বিতীয় কোন পথ নেই। তিনি বিভিন্ন দেশে মুক্তি আন্দোলন দাঁড় করাতে সমর্থ হন।

উলেখ্য যে, স্যার সৈয়দের উপদেশ সত্ত্বেও পাক-ভারতের একদল মুক্তিকামী মুসলিম তরুণ জামাল উদ্দীনের বলিষ্ঠ ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠেন। এই তরুণদের একজন ছিলেন মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ। বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন। জনমত সংগঠনের জন্য তিনি যে পথ ও পন্থা অবলম্বন করেন তা ছিল সময়ের দাবি। একহাতে অসি এবং অপর হাতে.মসি নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে যে চেতনা সৃষ্টি করেছিলেন, সে ধারাবাহিকতা আজও চলছে। তিনি শিক্ষিত মুসলিম সমাজের চোখ খুলে দিতে সক্ষম হয়েছেন। ইতিহাস অধ্যয়ন করে, নিরীক্ষণ করে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, মুসলমানদের পৃথক আবাসভূমির কোনো বিকল্প নেই। সে জন্য তিনি রাজনীতি এবং সমাজ সংস্কারের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন, ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কলম ধারণ করেন। সাংবাদিকতার মাঠে নিজেকে আন-প্যারালাল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে অমর হয়ে আছেন।

বাঙালি মুসলমান সমাজের যে জাগরণ আমরা বিশ শতকে লক্ষ্য করি, তার মূলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নবাব সলিমুলাহ, এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখের যে অবদান, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে অবদান কাজী নজরুল ইসলাম, গোলাম মোস্তফা, আব্বাস উদ্দীন আহমদ, ফররুখ আহমদ প্রমুখের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি, ঠিক বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে অবদান যাঁরা রাখেন তাঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন মাওলানা আকরম খাঁ। তাঁর প্রকাশিত পত্রিকাগুলো, বিশেষ করে *মাসিক মোহাম্মদী* ও *দৈনিক আজাদ* বাঙালি মুসলমানের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে প্রায় একক অবদান রাখে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত *দৈনিক আজাদ* শুধুমাত্র একটি পত্রিকাই ছিল না, এটি ছিল বাঙালি মুসলমানের বুদ্ধিবৃত্তিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জাগরণের অনন্য প্রতিষ্ঠান এবং এটি ছিল একটি গতিমান আন্দোলন।

মাওলানা শুধু সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেই নেতৃত্ব দেন নি, মুক্তচিন্তা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক মননশীলতার ক্ষেত্রেও তিনি পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন।

তদানীন্তন সময়ে একজন মাদ্রাসা শিক্ষিত আলিম হওয়া সত্ত্বেও তাঁর রচিত *মোস্তফা চরিত, সমস্যা ও সমাধানের* ন্যায় এবং বিবিধ গ্রন্থাবলীতে যে মুক্তবুদ্ধির পরিচয় আমরা দেখতে পাই, এক কথায় তা সে যুগে অকল্পনীয় ছিল।

মাওলানা একদিকে যেমন *আহলে হাদিস* সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন,[৪] অন্যদিকে মুক্তবুদ্ধি চিন্তাধারার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন স্যার সৈয়দের যোগ্য উত্তরাধিকারী।[৫] ফলে, ধর্মীয় ক্ষেত্রে এ বিখ্যাত আলিম এবং অনুসন্ধিৎসু লেখক এক শ্রেণির লোকের নিকট বিতর্কিত ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। অবশ্য, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জাগরণের ক্ষেত্রে

---

৩. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২৯-৩০।

৪. ড. মুহাম্মদ আবদুলাহ, স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ'র ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।

৫. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

বাঙালি মুসলমান তাঁর অবদানকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেই শুধু আসছে না, বরং তাঁর পদাংক অনুসরণ করার জন্য অনেকেই উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। তাঁর মত এবং প্রচলিত পথ ধরেই পরবর্তীকালে অনেকেই মুক্তবুদ্ধি চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। উদাহরণস্বরূপ কয়েকজনের নাম নিম্নে উল্লেখ করছি :

এঁরা হলেন- কাজী আবদুল ওদুদ, সৈয়দ আলী আহসান, ড. হাসান জামান, ড. মুফাখ্‌খারুল ইসলাম, আবুল ফজল, মাওলানা মোহাম্মদ আবদুর রহীম, ড. আবদুল বারী, কবি আল মাহমুদ, আকবর উদ্দীন, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, ড. মুহাম্মদ শহীদুলাহ, কাজী নজরুল ইসলাম, ড. কাজী দীন মোহাম্মদ, শেখ হাবিবুর রহমান, সৈয়দ আবুল হোসেন, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, খোন্দকার 'আবদুল হামিদ, কবি ফররুখ আহমদ, কবি তালিম হোসেন, মোহাম্মদ মাহফুজ উলাহ, মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, মজিবুর রহমান খাঁ, মোহাম্মদ মোদাব্বের প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

সাহিত্য ক্ষেত্রে মাওলানার শ্রেষ্ঠতম অবদান হচ্ছে মোস্তফা চরিত'। ঐতিহাসিক গবেষণা, বিশ্লেষণের যুক্তিশীলতা এবং ভাষার ক্লাসিকধর্মিতা মোস্তফা চরিতকে বাংলা সাহিত্যে একটি অনন্য গ্রন্থ হিসেবে অমর করে রেখেছে। কিন্তু ধর্মীয় ক্ষেত্রে কতিপয় বিতর্কিত বক্তব্যের অবতারণা করার দরুন তাঁর *তফছিরুল কুরআন* ও *মোস্তফা চরিত*-এর ন্যায় গ্রন্থ দু'খানি সাধারণ পাঠক সমাজে উপযুক্ত সমাদর পায়নি। তবে, এক্ষেত্রে স্বীকার করতেই হবে যে, বাঙালি মুসলমান বুদ্ধিজীবী সমাজে ধর্মীয়চিন্তাধারার ক্ষেত্রে যুক্তিশীলতার যে ধারা পরিলক্ষিত হয়, এর নির্মাণে মাওলানার '*মোস্তফা চরিত*' ও *তফছিরুল কুরআন* এ দু'টি গ্রন্থের প্রচুর অবদান রয়েছে। বাঙালি মুসলমানের জাগরণের ক্ষেত্রে মাওলানার প্রধান অবদান দৈনিক আজাদ, সাপ্তাহিক ও মাসিক মোহাম্মদী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর রচনাবলী। মুসলমানদের সেই ঘোর দুর্দিনে মাওলানার সে-সব পত্রিকার মাধ্যমে গড়ে ওঠে একদল সচেতন কবি-সাহিত্যিক-সাংবাদিক, যাঁরা চিন্তার ক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমানের বহুদিনের অচলায়তন ভেঙ্গে বাঙালি মুসলমানকে আস্থা সহকারে সম্মুখপানে এগিয়ে যাবার জন্য উদ্বুদ্ধ করে, প্রেরণা যোগায়।

আজকের বাঙালি বুদ্ধিজীবী সমাজ মূলত মাওলানার পত্রিকাগোষ্ঠীর সৃষ্ট লেখক সমাজেরই যে উত্তরাধিকার তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

বাংলাদেশের স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রসত্তা নির্মাণের পেছনে দুটো অবদান ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত :

ক. ইসলাম;

খ. বাংলা ভাষা।

এ দু'টি ক্ষেত্রেই মাওলানার রয়েছে ঐতিহাসিক অবদান। তিনি ইসলামকে যুগের দাবির প্রেক্ষাপটে যুক্তিশীলতার মাপকাঠিতে কেবল উপস্থাপনই করেন নি, বাঙালি মুসলিম সমাজের বিকাশ ও বিবর্তনের পথে যে-সব অন্তরায় কাজ করেছে, তারও নিপুণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। *মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস* শীর্ষক তাঁর গ্রন্থ বাঙালি মুসলিম সমাজের আত্মসচেতন পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছে। অদ্যাবধি যাঁরাই বাঙালি

www.pathagar.com

মুসলমান সমাজ সম্পর্কে গবেষণা ও অধ্যয়ন করছেন- অনেকেই এ গ্রন্থের কাছে তাঁদের ঋণ স্বীকার করেছেন।

এমনও একটা সময় ছিল, যখন বাঙালি মুসলমানের মধ্যে একটি প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছিলো যে, তাদের মাতৃভাষা বাংলা না উর্দু? সে বিভ্রান্তিকালে মাওলানাই প্রথম ব্যক্তি, যিনি অবাক বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন এ প্রশ্নে। তাই তাঁকে ভাষা আন্দোলনের পুরোধা বলা যেতে পারে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের স্বাধীন, স্বতন্ত্র রাষ্ট্রসত্তা নির্মাণের পেছনে যে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কাজ করেছে, সে দু'টি ক্ষেত্রেই ঐতিহাসিক অবদান রেখে তিনি বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

শুধু আজকের বাংলাদেশের নয়, ১৯৪৭-এর স্বাধীনতা-পূর্ব অবিভক্ত বাংলা ও আসামের মুসলমান সমাজ মাওলানা আকরম খাঁ'র অবদানে শুধু সঞ্জীবিত নয়- বহুভাবেই সমৃদ্ধ হয়েছে। এই উপমহাদেশের মুসলিম জনগণের সর্বপ্রকার উন্নতির পেছনেও মাওলানার অবদান কম নয়। তিনিই মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতার জনক।[৬] তিনিই বাংলায় যুক্তিবাদী ইসলামি সাহিত্য রচনার পুরোধা। তিনি বাংলা ভাষায় মুক্তবুদ্ধির তাফসির প্রণয়নের ক্ষেত্রে অগ্রণী। আজ যে বাংলাদেশের মুসলমান বিশ্ব মুসলিম সভায় আপন আসন লাভে সমর্থ হয়েছে, তার পেছনে অন্যতম প্রেরণা যোগায় যে নামটি, সে নাম মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ।

মাওলানা আকরম খাঁ একটি নাম, একটি ইতিহাস। তিনি ছিলেন একটি জাতির অবকাঠামো গঠনের নির্মাতা। তিনি একাই ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান। বাংলার মুসলমানদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা দূরীকরণের লক্ষ্যে মাওলানা 'সমাজ হিতৈষী' 'আলিমদের একটি সংগঠনে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এর ফলে গঠিত হয় *আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা*। এটি ছিল প্রধানত 'আলিমদের সংগঠন। মাওলানার নেতৃত্বে সংগঠনটি গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতা পরিহারে সব সময় সচেষ্ট ছিল। তাই, প্রথম থেকেই এ সংগঠনে অনেক ইংরেজি শিক্ষিত মুসলমানকেও যুক্ত হতে দেখা যায়। তাদের মধ্য থেকে সংগঠনের কর্মকর্তাও নির্বাচিত হন। সংগঠনটি কেবলমাত্র ধর্মপ্রচার করেই কর্তব্য পালন শেষ করে নি। সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণে কর্তব্য সীমাবদ্ধ রাখেনি। শিক্ষার আধুনিকীকরণ এবং নারী শিক্ষা বিস্তারেও এ সংগঠন ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করে। আধুনিক প্রণালীতে মুসলমানদের মধ্যে জ্ঞান ও ধর্মের প্রসারকে অব্যাহতগতিতে এগিয়ে নিয়ে যায়। এর ধারাবাহিকতা বর্তমানেও চলছে। আলিম সমাজ আজ পাঠদানের মধ্যেই নিজকে সীমাবদ্ধ রাখছেন। আলিম সমাজ বাংলা ও ইংরেজি ভাষা শিক্ষায়ও এগিয়ে আসছেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখছেন, লেখার জগতে, সাংবাদিকতায়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পদে, বিভিন্ন কমিটিতে আজ তাঁরা কাজ করছেন। এসব কিছুর মূলে মাওলানার অবদানকে অস্বীকার করার উপায় নেই। তাঁকে 'বাংলাদেশের আল গায্যালি' বলেও কেউ কেউ অভিহিত করেছেন। মুক্তবুদ্ধি চর্চায় তিনি ছিলেন অগ্রণী।

৬. অধ্যাপক আবদুল গফুর, প্রকাশকের কথা, মওলানা আকরম খাঁ, আবু জাফর সম্পাদিত, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

তাঁর তাফসিরের কথাই ধরা যাক, তাফসির তথা পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যাদান, অভিনব বিষয় নয়। নবি করিম (স.)-এর জীবদ্দশায়ই এ কাজ শুরু হয়। পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা ও এর দর্শন উপলব্ধির জনই তাফসির সাহিত্যের সূচনা। সাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকে আরম্ভ করে অদ্যাবধি বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্ন ইসলামি চিন্তাবিদ তাফসির রচনা করেন। তাফসির সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারা দীর্ঘদিন থেকে চলছে, তবে আধুনিক যুগজিজ্ঞাসার আলোকে বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার প্রয়োজনীয়তা এখনও রয়েছে।

লক্ষ্য করা যায়, গত শতকে কিছু তাফসির লেখা হয়েছে দেরায়াত বা বুদ্ধিবৃত্তিক পদ্ধতিতে। এ ধরনের তাফসিরের ক্ষেত্রে উর্দু ভাষায় স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ'র *তাফসিরুল কুরআন* এবং বাংলা ভাষায় রচিত মাওলানার *তাফসিরুল কুরআন* বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। গতানুগতিকতার পথ পরিহার করে মাওলানা যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই-বাছাই করে কুরআনের ব্যাখ্যা করেন। এক্ষেত্রে তাঁর প্রভাব প্রভূত লক্ষণীয়।[৭]

মাওলানা আকরম খাঁ ছিলেন শতাব্দীর প্রতিনিধি। তিনি দেখলেন, মুসলমানরা তাদের ঐতিহ্য ও উৎপত্তির উৎস সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত। মুসলমানরা অবগত নয়, কেন তারা ইংরেজদের পদানত বা হিন্দু সম্প্রদায়ের চেয়ে অনগ্রসর। মুসলমানরা নানা প্রকার কুসংস্কারে মোহগ্রস্ত। সমাজকে তারা অনেকটা সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রেখেছে। ধর্মের শাসন-অনুশাসনে চার ইমামের মাজহাবকেই তারা শেষ ব্যাখ্যা এবং রক্ষাকবচ হিসেবে বেছে নিয়েছে। ইজতিহাদের দরওয়াজা যে উন্মুক্ত সর্বযুগে, তা তারা বেমালুম ভুলেই বসেছে। মাওলানা এ সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে মুসলমানদের সচেতন করে সঠিক পথনির্দেশ করেন, আত্মসচেতন করে তোলার প্রচেষ্টায় নিজকে নিমগ্ন করেন। তিনি প্রথমে সমাজ-সংস্কারের লক্ষ্যে হাদিস শাস্ত্র ঘেঁটে প্রমাণ করতে সক্ষম হন যে, কুরআন-হাদিসের বাণী ব্যাখা-বিশ্লেষণ করার অধিকার শিক্ষিত ও যোগ্য সব মুসলমানের রয়েছে। এতে করে মুসলমানরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারে। মুসলমানরা নিজের বুদ্ধি-বিবেক দিয়ে ধর্মকে উপলব্ধির শিক্ষা গ্রহণে এগিয়ে থাকে। ফলে, ধর্মীয় কূপমণ্ডুকতা ও কুসংস্কারমুক্ত হয়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রগতিতে তাদের অনেকেই পরবর্তীকালের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। মাওলানার ন্যায় একজন লেখক, চিন্তাবিদ, গবেষক, অনুসন্ধিৎসু সাংবাদিক ও উদার মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিত্বের সার্বিক গুণের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয় এদেশের মানুষ। তারা তাদের স্বকীয়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতে সক্ষম হয়। তিনি ছিলেন যুগের নকিব, শতাব্দীর বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর, সফল চিন্তানায়ক।

আবুল মনসুর আহমদের ভাষায় :

> শতাব্দীকালের একটা বিরাট মহীরুহ, বিস্তীর্ণ ছায়াদার একটা বিশাল বটগাছ ভূমিস্যাৎ হইল। দেশ হারাইল একটা আলোকস্তম্ভ। দেশবাসী হারাইল বাড়ীর মুরুব্বী, সাংবাদিক-সাহিত্যিকরা হারাইলেন উপদেষ্টা, রাজনীতিবিদরা হারাইলেন একজন দিশারী, আলিম সম্প্রদায় হারাইলেন একজন অনুপ্রেরণাদাতা।[৮]

জাতীয় জাগরণে মাওলানার অবদান কতখানি – তার মূল্যায়ন সহজসাধ্য নয়। প্রখ্যাত সাংবাদিক-গবেষক জনাব সানাউলাহ নূরী বলেছেন :

---

৭. ড. মুহাম্মদ আবদুলাহ, সাক্ষাৎকার, শ্যামলী, ঢাকা, তারিখ : ১০/৩/৯৭।
৮. আবু জাফর (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

www.pathagar.com

আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে সাংবাদিক, রাজনীতিক বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন এবং ইতালীর বিপ্লবে মহান মনীষী মাতসিনা যে ভূমিকা গ্রহণ করেন, আমাদের সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক বিপ্লবে মাওলানা আকরম খাঁও একই ভূমিকা গ্রহণ করেন। জাতির ওপর বুদ্ধিবৃত্তির প্রভাব বিস্তারের দিক থেকে ভলতেয়ারের সঙ্গে তাঁকে তুলনা করা যায়।[৯]

আজকের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মাওলানা বিচরণ করছেন। মাওলানা মুক্তবুদ্ধির তূর্যবাদক হওয়া সত্ত্বেও উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন : "আমাকে যদি কোন বিশেষ চিন্তাধারার লোক বলে চিহ্নিত করতে চাও তাহলে আমাকে 'ওহাবী' বলো।[১০]

তাই বলা যায়, মাওলানাকে ঘিরে সেদিন চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিকদের এক উজ্জ্বল পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে মুসলিম বাংলায় নবদিগন্তের উন্মোচন হয়েছিল ত্বরান্বিত। তাঁর গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে বাঙালি মুসলমানরা নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশ করতে পেরেছিল, নিজেকে চিনতে ও বুঝতে পেরেছিল। বৃটিশ ও পাকিস্তান যুগের রাজনীতিক, সমাজবিদ, গল্পকার, কবি, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবিদ সবাই ছিলেন মাওলানার সাথে সম্পৃক্ত। তাঁদের মত ও পথ যা-ই হোক না কেন, কর্মক্ষেত্র যা-ই থাকুক না কেন, আজ কেউ স্বীকার করুক আর না-ই করুক, প্রত্যেকেই মাওলানার শিষ্য, প্রশিষ্য বা ভাবশিষ্য। সমাজ ও স্বদেশ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা যাঁরা করেন, তাঁরা এ কথা অস্বীকার করলে অকৃতজ্ঞতারই পরিচায়ক হবে।

আজকের বাঙালি মুসলমান বুদ্ধিজীবী সমাজ মাওলানার এবং তাঁর সহকর্মীদের উত্তরাধিকার বহন করছেন। উত্তরাধিকার বহন করাই বাস্তবতা। কিন্তু আমাদের সমাজের কেউ কেউ উত্তরাধিকার বহন করলেও সত্য-বাস্তবতাকে স্বীকার করতে তাঁরা নারাজ। তারপরও দেখা যাচ্ছে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মাওলানার প্রভাব আমাদের জীবনে ছায়ার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে- এটাই বাস্তবতা।

উপসংহার

পলাশীর বিপর্যয়ের পর বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয়, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনে অমানিশার অন্ধকার নেমে এসেছিল। এর কবল থেকে মুক্তির জন্য যে-সব মুসলিম নেতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন- মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮ ইং) তাঁদের অন্যতম। দীর্ঘ এক শতাব্দীর প্রত্যক্ষ সাক্ষী এই মনীষী। মাওলানা আকরম খাঁ একটি নামই নয় – এক শতাব্দীর ঘটনাপঞ্জির বাস্তব ইতিহাস। তিনি বাংলার মুসলমানের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, সাংবাদিকতা বিষয়ক ও রাজনৈতিক গগনের দিকপাল। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন মাওলানা আকরম খাঁ। মাওলানার ন্যায় প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব খুব বেশি জন্মায় না। মুসলিম সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন পথিকৃৎ, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ছিলেন আদর্শ নীতিবান নেতৃত্বের অধিকারী। তিনি এক সময় শেরে বাংলার রাজনীতির সহকর্মী ছিলেন, আবার তাঁর সাথে বিরোধিতাও করেছেন। ধর্মীয় ক্ষেত্রে ছিলেন মুক্ত ও স্বাধীন চিন্তার অধিকারী। এক কথায়, তিনি তৎকালীন বাংলার মুসলমানের আদর্শবাদী নেতা ছিলেন। কখনও

---

৯. সানাউলাহ নূরী, সাহিত্যিক-সাংবাদিক আকরম খাঁ, আবু জাফর সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪।
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭।

www.pathagar.com

তিনি মন্ত্রিত্ব বা রাষ্ট্রীয় উচ্চ পদমর্যাদা গ্রহণ করেন নি। এ দিক দিয়ে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

মাওলানা আকরম খাঁ'র জীবনকালকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

১। ধর্মীয় চিন্তাধারা : ওহাবী মোহাম্মদী ও যুক্তিবাদী।

২। প্যান ইসলামে বিশ্বাস।

৩। সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ।

৪। লেখক-সাহিত্যিক।

৫। মৃত্যু।

শিক্ষা জীবন সমাপ্তির পর থেকে ১৯১৯ পর্যন্ত আকরম খাঁ'র জীবনকে তিনটি অংশে ভাগ করা যায়। প্রথমত, তিনি ওয়াহাবী মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর পূর্ব-পুরুষেরা ছিলেন বালাকোটের মুজাহিদ বাহিনীর সদস্য। তাঁরা ওয়াহাবী মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। সে কারণে আকরম খাঁ'র জীবনও শুরু হয় ওয়াহাবী মতাদর্শের উপর। তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন : আমাকে যদি কোন মতাদর্শে চিহ্নিত করো তাহলে ওয়াহাবী বলো।

অবশ্য, পরবর্তী পর্যায়ে আকরম খাঁ নিজকে 'মোহাম্মদী' বলেও পরিচয় দিয়েছেন। এটা হয়ত এ জন্য যে, ওহাবী মতাদর্শ যাঁর নামকে কেন্দ্র করে প্রচলিত, তাঁর পুরো নাম 'মুহাম্মদ বিন্ আবদুল ওয়াহহাব'। মাওলানা সম্ভবত তাঁর মূল নাম মুহাম্মদ'কে কেন্দ্র করে নিজেকে মুহাম্মদী আখ্যায়িত করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত একটি পত্রিকার নামও তিনি 'মোহাম্মদী' রাখেন।

মাওলানা সাহেব কোরআন-হাদিস উদ্ভূত বিষয়কে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে সমস্ত দলিল ও রিওয়ায়াত'কে যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই-বাছাই করে গ্রহণ করেছেন। অযৌক্তিক কিছু তিনি গ্রহণ করতেন না। এ সময় তিনি যুক্তিবাদী হিসাবেও পরিচিত হন।

এ ক্ষেত্রে ড. কাজী দীন মোহাম্মদের উক্তি প্রণিধানযোগ্য :

> মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ'র সময়কালটা এমন ছিল, একদল ছিল যাঁরা ধর্মের প্রাচীনত্বের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিত। ধর্মের ব্যাপারে তারা ছিল গোঁড়াপন্থি। কোন প্রকার আধুনিকত্ব তারা পছন্দ করতো না। অপরপক্ষ ছিল স্বাধীন ও মুক্তমনের অধিকারী। তারা ধর্মের মৌলিকত্ব সম্পর্কে তেমন কোন খোঁজ-খবর রাখতো না। তারা যুক্তিবাদীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ইসলামকে নিছক যুক্তির মানদণ্ডেই বিচার করতো। এদেরকে উদারপন্থিও বলা যেতে পারে। তবে এরা নিজেদেরকে প্রগতিবাদী বলে দাবি করে। আসলে সত্যি কথা হলো, প্রকৃত ধর্মানুসারীদের জন্য গোঁড়ামি যেমন সঠিকভাবে ধর্মের মানদণ্ড হতে পারে না। তেমনি, উদারপন্থির নামে তথা প্রগতির নামে ধর্মকে বিসর্জন দেয়া তার চেয়েও মারাত্মক অপরাধ।[১১]

মূলত আকরম খাঁ ছিলেন এ দু'য়ের মধ্যে মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বনকারী। তিনি গোঁড়ামি পছন্দ করতেন না। তথাকথিত উদারনীতির দোহাই দিয়ে ধর্ম থেকে যাঁরা নিজেদের আলাদা করতে চান, তাদের বিরুদ্ধেও তিনি তেজোদ্দীপ্ত লেখনী ধারণ

---

১১. সাক্ষাৎকার, ড. কাজী দীন মোহাম্মদ, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, তারিখ ১০/১/৯৭।

www.pathagar.com

করেছেন। তাঁকে বলা যায় সমন্বয়বাদী। তিনি এই দুই চরমপন্থীর মাঝামাঝি পর্যায় থেকে ধর্মের আসল রূপ তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। 'মাসিক মোহাম্মদী' প্রাচীনপন্থিদের 'কাঠমোল্লা' ও নব্যপন্থিদের 'অকাট পণ্ডিত' অবখ্যা দেয়। মোহাম্মদী পত্রিকার মতে, প্রথম দল কুসংস্কারে জর্জরিত অদূরদর্শী 'আলিম সমাজ যাঁরা প্রকৃত ইসলাম থেকে সরে এসেছেন, এবং দ্বিতীয় দল নিজেদের ধর্ম বিষয়ে অজ্ঞ, ইউরোপীয় ও হিন্দু-সমাজের অন্ধ অনুকরণে অভ্যস্ত।[১২]

ড. আনিসুজ্জামানের ভাষায়:

"প্রাচীনপন্থীদের তুলনায় মাওলানা আকরম খাঁর ভূমিকা ছিল প্রগতিশীল, আর আধুনিকদের তুলনায় তিনি ছিলেন রক্ষণশীল।'[১৩]

মাওলানা আকরম খাঁ ছিলেন শাহ্ ওয়ালী উল্লাহর (র.) চিন্তাধারায় উজ্জীবিত। বিশেষ কোনো মতবাদের অন্ধ অনুসারী না হয়ে তিনি কুরআন ও হাদিসের সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী গ্রহণ করতেন। এ মুক্ত চিন্তাধারার জন্য তিনি যথেষ্ট সমালোচিতও হয়েছেন। এরপরও দেখা যায়, কুরআন ও হাদিসের জটিল কোনো সমস্যার জন্য অনেক বিরোধী আলিমও তাঁর কাছে সমাধানের জন্য আসতেন।

মাওলানা সাহেব আহলে হাদিস সমাজভুক্ত ছিলেন কী? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন :

কেউ যদি নিজেকে আহলে হাদীছ বলে পরিচিত করতে চান তবে আজকাল যে-সব নব্যপন্থীরা নিজেদেরকে আহলে কুরআন হিসেবে পরিচিত করে হাদিস অস্বীকার করতে চান, তাদের সে মতবাদকে ভ্রান্ত বলার অবকাশ থাকে কোথায়? সরাসরি হাদীছ শরীফ থেকে নির্দেশ আহরণ করার প্রতি জোর দিলেই যদি কেউ আহলে হাদীছ হতে পারেন, তবে আমার মতে, ইমাম আবু হানীফা ছিলেন সর্বাপেক্ষা বড় আহলে হাদীছ। কারণ তার চূড়ান্ত অভিমত ছিল, সহীহ্ হাদীছ দ্বারা যা প্রমাণিত হয়, সেটি আমার মাযহাব। তাই নিজেদের হানাফী, শাফেয়ী বা আহলে হাদীছ প্রভৃতি নামে অভিহিত না করে সরলভাবে মুসলমান নামে পরিচিত করাই উত্তম। এতে অনর্থক মাযহাবী ফেরকাবন্দীর পথ রুদ্ধ হবে। মুসলিম মিল্লাতের বন্ধন সুদৃঢ় হবে।[১৪]

মাওলানা সাহেবের দৃষ্টিতে প্রচলিত যেকোন মতবাদের প্রতি অন্ধ আবেগ এক ধরনের মানসিক গোলামি। কুরআন-সুন্নাহ'র প্রমাণ উপস্থিত না করে 'বুযুর্গানে দ্বীন-এর অভিমত' নামক অস্পষ্ট যে কোন প্রমাণকে তিনি 'তাগুত' বা বাতিল পুরস্তি মনে করতেন।

মতবাদের ক্ষেত্রে স্বাধীন মতামতের ফলেই মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ'র পক্ষে মুক্ত ও উদার চিন্তাধারায় উজ্জীবিত একটা বুদ্ধিজীবী সমাজ তৈরি করার সুযোগ হয়েছিল। মুসলিম বুদ্ধিজীবী সমাজকে তিনি একটি স্বতন্ত্র-স্বাধীন আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে নিয়েছেন।

---

১২. ড. ইমরান হোসেন, বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবী ঃ চিন্তা ও কর্ম, ১৯৯৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৯৩, পৃ. ৮৮।

১৩. ড. আনিসুজ্জমান, (আবু জাফর, প্রাগুক্ত), সাহিত্যিক সাংবাদিক, পৃ. ১৭৯।

১৪. মুহিউদ্দীন খান, (আবু জাফর সম্পাদিত, প্রাগুক্ত) মনীষার আলোকে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, পৃ. ১৯৫।

www.pathagar.com

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, মাওলানা ধর্মীয় ক্ষেত্রে অনেকটা মুজতাহিদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। অবশ্য, তিনি নিজেকে মুজতাহিদ বলে দাবি করেন নি। তিনি ছিলেন মুহাক্কিক বা বিশ্লেষক। উপমহাদেশীয় মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে স্যার সৈয়দ আহমদের ও আমীর আলীর পর তিনিই প্রথম কলম ধারণ করেন। নিখাদ যুক্তি ও মুক্তবুদ্ধির আলোকে তিনি ধর্মীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিষয়াদির প্রচলিত চিন্তা খণ্ডন করে, কোরআন-হাদিসের আলোকে তা ব্যাখ্যার প্রয়াস পান। অবশ্য, এক্ষেত্রে আলিমদের বৃহদাংশ তাঁর বিরোধিতাও করেন। তবুও তিনি পিছপা হননি। এ ব্যাপারে তাঁর সুস্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে,

"কেউ সাথে না এলে সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য একাই পথ চলতে হবে।"[১৫]

হিন্দু ও খ্রিস্টান মিশনারীদের অপপ্রচারের প্রভাবে মুসলমান সমাজে যে-সব অনৈসলামিক চিন্তাধারা ও প্রথার অনুপ্রবেশ ঘটে, তার বিরুদ্ধে তিনি মাসিক মোহাম্মদীতে ক্ষুরধার লেখনী পরিচালনা করেন। বস্তুত সে সময় মুসলমান সমাজে ধর্মের নামে বিধর্মী কাজ চলছিলো পরিকল্পিতভাবে। এসব বিদেশী সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবান্বিত বিধর্মী কার্যকলাপ ও সামাজিক কুসংস্কার দূর করার জন্য দৃঢ় প্রত্যয়সম্পন্ন নীতিবান প্রভাবশালী বলিষ্ঠ নেতার প্রয়োজন ছিল। এই ঝাণ্ডা তুলে ধরার জন্য নির্ভীক সৈনিকের ভূমিকায় এগিয়ে আসেন মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ। তিনিই ছিলেন সে সময় সত্য প্রতিষ্ঠার আপোষহীন ব্যক্তিত্ব।

রাজ্য এবং সম্পদহারা বাংলার মুসলিম সমাজ তখন আত্মবিস্মৃতির অতল গহ্বরে নিমজ্জিত। মুসলমানরা শাসকের পদমর্যাদা থেকে গোমস্তা, পাইক, পেয়াদা তথা সমাজের নিম্নশ্রেণির পদে নেমে এসেছিল। সে সময় মুসলমানদের খবরের কাগজ পড়ার মানসিকতা ছিল না বললেই চলে। মুসলমানদের জন্য তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো খবরের কাগজও ছিল না। মাওলানা উপলব্ধি করেন, অবহেলিত মুসলিম সমাজকে আত্মসচেতন করে তুলতে হলে সংবাদপত্রের প্রয়োজন। তাই, তিনি অর্ধ ডজনেরও বেশি খবরের কাগজ তাঁর সম্পাদনায় ও তত্ত্বাবধানে বের করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি মুসলমানদের দ্বারে দ্বারে খবরের কাগজ পৌঁছে দিতেন। এ সমস্ত পত্রিকায় মুসলমানদের অতীত ইতিহাস, ঐতিহ্য, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা থাকতো। তিনি আত্মসচেতনতামূলক রচনার দ্বারা পত্রিকার মাধ্যমে গণ-সচেতনতা গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। কেবলমাত্র এ উপমহাদেশই নয়, মুসলিম বিশ্বের উলেখযোগ্য ঘটনাবলিও তাঁর পত্রিকায় স্থান পেতো। প্যান-ইসলামের সমর্থক হিসেবে বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কেও তাঁর পত্রিকায় ইঙ্গিত থাকতো। এ জন্যই তাঁকে মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতার পথিকৃৎ আখ্যায়িত করা হয়।

১৯১৯ সালের খিলাফত আন্দোলনের মধ্যদিয়ে আকরম খাঁ'র মধ্যে প্যান ইসলামি ধ্যান-ধারণা গড়ে ওঠে। খিলাফত কমিটির বাংলা শাখার প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি ছিলেন মাওলানা আকরম খাঁ। খিলাফত কমিটির দাবি ছিল গোটা জাযিরাতুল আরব। অর্থাৎ আরব, ইরাক, সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের উপর তুর্কি খলিফার শাসনাধিকার থাকতে হবে। মুসলমানদের পবিত্র স্থানসমূহের তত্ত্বাবধানের ভার তাঁর উপর ন্যস্ত করতে হবে।[১৬] এ আন্দোলনের কারণে বৃটিশ পণ্য বয়কট করা হয়।

---

১৫. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, কোরআন শরীফ, ১ম খণ্ড, সুরা বাকারার ভূমিকা দ্র.।
১৬. ড. মুহাম্মদ আবদুলাহ, খিলাফত আন্দোলনে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।

www.pathagar.com

মাওলানা আকরম খাঁ 'প্যান ইসলামি' ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর এ দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটে ত্রিপোলি ও বলকান যুদ্ধের সময় তুরস্কের স্বার্থে তাঁর সম্পাদিত পত্রিকায় লেখনী ধারণ এবং বাংলাদেশ থেকে সাহায্য প্রেরণের মাধ্যমে। তাঁর প্রকাশিত উর্দু পত্রিকায় তিনি বলেন :

> আমরা ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ও ধর্মীয় বন্ধনকে সব সময় ভৌগোলিক সীমারেখার উর্দ্ধে স্থান দিয়ে থাকি। আমার মতে এ উদারতা ইসলামের অগণিত বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে অন্যতম। মহান বৈশিষ্ট্য অন্ধকারাচ্ছন্ন কন্টকাকীর্ণ বরফের দেশ হোক বা উত্তপ্ত মরুভূমি হোক যেখানেই লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালেমাধারী আছে তারা আমাদের ভাই। আল্লাহ না করুন যদি এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়, যাতে মুসলমানদের ধর্মীয় দায়িত্বের সাথে তাদের দেশীয় স্বার্থের সংঘাত দেখা দেয়, তখন দেশের স্বার্থকে হেয় মনে করে ইসলামের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র আদর্শ রক্ষার জন্যও তাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।[১৭]

প্যান ইসলামি ধ্যান-ধারণার অনুপ্রেরণাই মাওলানাকে খিলাফত আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করে। তিনি ছিলেন নির্ভীক, স্বাধীনচেতা সংগ্রামী পুরুষ, অনুনয়-বিনয় ও তোষামোদের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করার পক্ষপাতি তিনি ছিলেন না। মুসলিম লীগের কোনো কোনো নেতা বৃটিশ তোষণনীতির মাধ্যমে দাবি আদায়ের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি এরূপ তোয়াজকে সম্পূর্ণরূপে অপছন্দ করতেন। তিনি মাওলানা মোহাম্মদ আলি ও শওকত আলি ভ্রাতৃদ্বয়, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মাওলানা যাফর আলি, মাওলানা হাসরত মোহানী প্রমুখের মতো যুক্তি, বুদ্ধি এবং প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করে স্বাধীনতা অর্জন করার প্রয়াসী ছিলেন। তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন-আজাদি মানুষের জন্মগত অধিকার। এই অধিকার কারও দয়া বা দানে গ্রহণ করা গোলামিরই নামান্তর।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন, উপমহাদেশের আজাদি আন্দোলনে যেসব ভূমিকা প্রভূত কাজ করেছে, তন্মধ্যে মাওলানার প্রতিষ্ঠিত আজাদ পত্রিকা, মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, আব্বাস উদ্দিন আহমদ ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের গানের অবদান ছিল অন্যতম।

কর্মক্ষেত্রে আসার সাথে সাথে মাওলানা সাংবাদিকতাকেই পেশা হিসেবে বেছে নেন। স্বজাতি ও স্বদেশপ্রেমই তাঁকে সাংবাদিকতা পেশা বেছে নিতে উদ্বুদ্ধ করে। তখন মুসলমানদের কোনো সংবাদপত্র ছিল না। আকরম খাঁ মুসলমানদের মধ্যে সচেতনতা, স্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদা জাগিয়ে তোলার জন্য সংবাদপত্রকেই আসল মাধ্যম মনে করে জীবনের প্রথম প্রভাতে সাংবাদিকতায় জড়িয়ে পড়েন। তিনি সাপ্তাহিক মোহাম্মদী, দৈনিক মোহাম্মদী, মাসিক মোহাম্মদী এবং দৈনিক আজাদসহ অন্যান্য পত্রিকা প্রকাশ করেন।

সাংবাদিকতার এক পর্যায়ে তিনি ভাবলেন, শুধু সাংবাদিকতা করেই মুসলিম জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করা যাবে না, এর জন্য প্রয়োজন প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। এই সংগ্রামের বাস্তবায়নই হলো রাজনীতি। এ জন্য ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মধ্য

---

১৭. ড. মুহাম্মদ আবদুলাহ, মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক, প্রাগুক্ত। উর্দু জামানা পত্রিকার প্রথম সম্পাদকীয়।

www.pathagar.com

দিয়ে তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। একাধারে তিনি ১৯২৮-১৯৫৪ সাল পর্যন্ত উপমহাদেশের রাজনীতিতে প্রথম শ্রেণীর রাজনীতিবিদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। বৃটিশ শাসকদের নিকট থেকে উপমহাদেশের স্বাধীনতা লাভের জন্যও তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা পর্যন্ত তিনি অবিস্মরণীয় অবদান রাখেন। ১৯৫৪ সালে তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এ সময় তিনি পবিত্র কুরআনের তাফসির এবং অন্যান্য গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন। ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত সর্বশেষ *মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস* গ্রন্থটি লিখে গ্রন্থ লেখার ইতি ঘটান। অবশ্য ১৯৬২ সালে কিছুদিনের জন্য তিনি পুনরায় রাজনীতিতে ফিরে আসেন। আইয়ুব খানের প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স আইনের প্রতিবাদে ঢাকার রাজপথে সাংবাদিকদের মিছিলে এই অশীতিপর বৃদ্ধ নেতা নেতৃত্ব দেন। এক কথায়, ১৯২৮-১৯৬৫ সাল পর্যন্ত তিনি সাংবাদিকতা, রাজনীতি ও লেখায় তাঁর জীবন অতিবাহিত করেন। ১৯৬৮ সালের ১৮ আগস্ট এই মহান সংগ্রামী নেতা ইনতেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া-ইন্না ইলাইহি রাজিউন) এবং ঢাকার বংশালে আহলে হাদিস মসজিদের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।

মুসলিম সমাজ কেন বিজাতীয় আচার-আচরণ ও সংস্কৃতিকে অনুসরণ করে – তার কারণ অনুসন্ধান করে তিনি বুঝতে পারেন যে, এর একমাত্র কারণ স্বীয় সত্তা সম্বন্ধে অজ্ঞতা। তারা জানে না, তাদের সাহিত্যের উৎস কোথায়? তারা জানে না, তাদের উত্থান কোথায়, শেষ কোথায়? জানে না, তারা কেন ইংরেজদের গোলাম এবং হিন্দুদের পদানত। কাজেই, এ ক্ষেত্রে প্রকৃত দরদির সর্বপ্রধান কর্তব্য হচ্ছে, এ অচেতন দুর্ভাগা মানুষগুলোকে আত্মসচেতন করে তোলা। এ গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করে তিনি ইসলামের মৌলিক ধর্মবিশ্বাসের আলোকে সংস্কৃতির ব্যাখ্যায় অবতীর্ণ হন। তিনি মুসলিম সমাজের মধ্যেই দেখতে পান, সংস্কৃতির নামে অপসংস্কৃতির ধূম্রজালে মুসলিম সমাজ আষ্টেপৃষ্ঠে গাঁথা।

কোলকাতার মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনে সাংস্কৃতিক শাখার সভাপতির ভাষণে আকরম খাঁ মুসলমানদের সংস্কৃতির রূপ কেমন হবে তার ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন :

> জাতি হিসেবে মুসলমানদেরও একটা নিজস্ব ও অন্য নিরপেক্ষ সংস্কৃতি আছে। দীর্ঘকালের শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কারের মধ্য দিয়া, ইতিহাসের নানা সুখ-দুঃখ পূর্ণ স্মৃতির মধ্য দিয়া, জীবনরহস্যের বিবিধ সাধনা ধারার স্বাতন্ত্র্যের মধ্য দিয়া, শিল্প ও সাহিত্য সেবার অভিনব রূপ রসের অনুভূতি ও আস্বাদনের মধ্য দিয়া, অতীতের বহু সঞ্চয় ও ভবিষ্যতের বহু সম্ভাবনাকে অবলম্বন করিয়া মুছলমানের এই সংস্কৃতি সৃষ্ট পুষ্ট ও জীবন্ত হইয়া আছে।[১৮]

এদেশে ইসলাম প্রচারের সূচনা অষ্টম শতকে। ব্যাপকভাবে এখানকার মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে দ্বাদশ শতক থেকে। ফলে, আটশ' বছর ধরে হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বাস করলেও ধর্মীয় কারণেই তাদের সাংস্কৃতিক পার্থক্য বজায় থাকে। মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যবোধ জোরদার করার রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ হয় পাকিস্তান প্রস্তাব বা লাহোর প্রস্তাবের সাথে। কিন্তু, সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য চেতনা জন্মলাভ করে আরও বহু

---

১৮. মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ, ১৯৮৫, পৃ. ৪৫৪।

www.pathagar.com

পূর্বে। এর মধ্যেও বাংলার মুসলমান সমাজে হিন্দু মুসলিম মিলিত সাধারণ সমন্বয়বাদী ধারাও কম শক্তিশালী ছিল না।

রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আল্লামা আবুল হাশিম, মাওলানা ভাসানী এবং লেখকদের মধ্যে এস. ওয়াজেদ আলী, কবি নজরুল ইসলাম, কবি জসীম উদ্‌দীন, কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হোসেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সমন্বয়বাদী।

বাংলার সবুজ শ্যামল ভূমিতে যেসব বরেণ্য ব্যক্তিত্ব জন্মগ্রহণ করেছেন, মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ তাঁদেরই একজন। বাল্যকালে মাতা-পিতাকে হারিয়ে অসহায় অবস্থার মধ্যেও স্বীয় সাধনায় জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে প্রমাণ করেছেন, নিতান্ত অসহায় অবস্থা থেকেও মানুষ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এক সময়ের হাকিমপুরের ইয়াতিম অজানা-অচেনা অখ্যাত ছেলেটি পরবর্তী পর্যায়ে উপমহাদেশের স্বনামধন্য নেতা হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন। ১৯৪১-১৯৫১ সাল পর্যন্ত তিনি প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট থাকাকালে জাতিকে সুযোগ্য নেতৃত্ব দান করেন। নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ও পরে পাকিস্তান মুসলিম লীগেরও ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং গণপরিষদের সদস্য ছিলেন।

তিনি ছিলেন ইসলাম নির্দেশিত গণতন্ত্রের পরম ভক্ত। এই মনোভাবের কারণে তিনি পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের অগণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভির পথ অনুসরণ করে বাংলার মুসলিম সমাজের সংস্কার সাধন করা এবং খাঁটি ইসলামি আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা। স্যার সৈয়দ আহমদ ও তাঁর সহযোগীরা যেভাবে *তাহযিবুল-আখলাক* পত্রিকার মাধ্যমে উত্তর ভারতে সমাজ সংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন, তেমনি আকরম খাঁ মোহাম্মদীর পাতায় পাতায় মুসলিম বাংলার সামাজিক গলদ শোধরাবার চেষ্টা করেন। এই ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন হাজী শরিয়ত উল্লাহ ও মাওলানা কারামত 'আলীর যোগ্য উত্তরসূরি।

ইসলামি তাহযিব-তমদ্দুন এতদঞ্চলে প্রচার ও প্রসার লাভ করুক – এটাই ছিল আকরম খাঁ'র কাম্য। তিনি বিদেশী তাহযিব-তমদ্দুনের অন্ধ অনুকরণকে ঘৃণার চোখে দেখতেন। তাঁর মতে, সামাজিক জীবন ধর্মীয় জীবন হতে আলাদা নয়। তাঁর ধর্মীয় ভাবধারা ছিল অনেকটা স্যার সৈয়দ আহমদ, মুফতি মোহাম্মদ 'আবদুহু ও রশীদ রিযা'র চিন্তাধারার মতো। এঁদের ন্যায় তিনিও যুক্তিবাদ, মুক্তবুদ্ধি ও ইজতিহাদের অনুসারী ছিলেন। এ জন্যেই কোরআন-হাদিসের ব্যাখ্যায় তিনি কিছুটা মুজতাহিদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ধর্মীয় ও সামাজিক ভাবধারার দিক হতে আকরম খাঁকে বাংলার স্যার সৈয়দ বলেও কেউ কেউ মত ব্যক্ত করেন।

ইসলাম নিশ্চল নয়, বরং প্রগতিশীল, মাওলানা এই সত্যের বলিষ্ঠ প্রবক্তা ছিলেন। তাঁর মতে, যুগ দেশ স্তর ও অবস্থা নির্বিশেষে মানব সমাজের জন্য এই স্থায়ী, শাশ্বত ও আদর্শভিত্তিক ব্যবস্থাই ইসলাম। আকরম খাঁ ইসলাম ও প্রকৃতিকে অভিন্ন বর্ণনা করেছেন। ইসলাম স্বাভাবিক ধর্ম বলেই তিনি প্রাকৃতিক বিধি-বিধানের আলোকে কুরআনের মর্ম অনুধাবনের প্রয়াস পান। আকরম খাঁ ছিলেন অন্ধ অনুকরণের দুশমন। তিনি কোরআন-হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করেন। তিনি বলতেন, পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব এবং পূর্বসূরিদের অন্ধ অনুকরণের ফলে মানুষের জ্ঞান,

www.pathagar.com

বিবেক ও স্বাধীন চিন্তাধারা বিকৃত ও বিপথগামী হয়ে পড়ে। স্বাধীন মুসলিম জাতিসত্তা বিনির্মাণে তাঁর অবদান অতুলনীয়।

মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ-কে আল্লাহ্ তা'আলা তীক্ষ্ণ মেধা ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তিনি যদি তাঁর এই মেধা ও প্রতিভা সাংবাদিকতা, রাজনীতি, সমাজনীতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যয় না করে শুধুমাত্র ইসলামের প্রচার-প্রসার এবং রচনায় আত্মনিয়োগ করতেন তা হলে তিনি দেশজাতি ও মিল্লাতকে আরো বেশি কিছু দিতে পারতেন। পরিশেষে বলতে হয়, যুগ-জিজ্ঞাসার আলোকে বর্তমান প্রজন্মের জন্য তাঁর রচনাবলির একান্ত প্রয়োজন। এই মনীষীর রচনাবলিকে পাঠ্যভুক্ত করার এবং এসব রচনা প্রকাশের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

www.pathagar.com

জীবনপঞ্জি

জন্ম : ৭ জুন, ১৮৬৮/৬৯, ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৫, ১৩ সফর ১২৮৬ হিজরি।

মৃত্যু : ১৮ আগস্ট, ১৯৬৮, ২ ভাদ্র, ১৩৭৫ , ২৩ জমাদিউল আওয়াল, ১৩৮৮।

১৮৮৬ : স্যার সৈয়দের All India Muslim Conference-এ আকরম খাঁ'র যোগদান।

১৮৭৯ : একই দিন পিতা-মাতার ইনতিকাল, নানার তত্ত্বাবধানে লালিতপালিত।

১৮৯৬ : কোলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি।

১৮৯৭ : কোলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় বাংলা ভাষা প্রচলন-এর জন্য আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।

১৮৯৮ : মাদ্রাসায় ছাত্রাবস্থায় খ্রিষ্টান ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচারপত্র বিলি করেন।

১৮৯৯ : বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ বিষয়ক মুসলমান সমিতি সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯০০ : ফাযিল (জমাতে উলা) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মোসলেম স্পোর্টিং ক্লাবের সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯০১ : 'আহলে হাদীছ' ও 'আখবার' পত্রিকা সম্পাদনা করেন (সাংবাদিকতা জীবন শুরু)।

১৯০২ : মাসিক মোহাম্মদী প্রথম প্রকাশিত হয়।

১৯০৩ : মাসিক মোহাম্মদীর সম্পাদক নিযুক্ত (পত্রিকাটি বেশ কয়েক বছর বন্ধ থাকার পর আবার ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয়)।

১৯০৪ : মুহাম্মদী আখবার বা আখবারে মোহাম্মদী সাপ্তাহিক হিসাবে বের হয় (এ পত্রিকায় ছাত্রাবস্থায়ই তিনি খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে লিখতেন)।

১৯০৫ : পবিত্র কুরআ'ন শরিফের অনুবাদ করেন (প্রকাশক : আব্বাস আলী)। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে অংশগ্রহণ ও কংগ্রেসের সাথে যুক্ত হন।

১৯০৬ : ঢাকায় মুসলিম লীগের জন্ম। মাওলানা আকরম খাঁ'র সক্রিয় অংশগ্রহণ।

১৯০৮ : সাপ্তাহিক মোহাম্মদীর আত্মপ্রকাশ।

১৯১০ : মি. রসের সৌজন্যে কবিতা প্রকাশ করেন।

১৯১১ : বঙ্গবিভাগ আন্দোলন বাতিল, মাওলানার সক্রিয় অংশগ্রহণ ১২ ডিসেম্বর।

১৯১২ : বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী মুসলিম কনফারেন্সে অংশগ্রহণ, বক্তব্য প্রদান।

১৯১৩ : আঞ্জুমানে উলামে বাঙ্গালা গঠন (বগুড়ার ধানিয়া গ্রামে)।

১৯১৪ : আল এছলাম-এর প্রকাশক ও যুগ্ম সম্পাদক। বৃটেন-জার্মানির মধ্যকার যুদ্ধে তুরস্ক জার্মানির পক্ষে গেলে মাওলানা তুর্কির পক্ষাবলম্বন করেন।

১৯১৫ : বোম্বেতে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অষ্টম অধিবেশনে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার কমিটির ১১ সদস্যের অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হন। মাসিক আল এছলাম প্রকাশ (পত্রিকাটি ৬ বছর প্রকাশিত হয়)। 'যীশু কি নিষ্পাপ' বইটি প্রকাশিত হয়। 'এছলাম প্রচারক' ও 'আল এছলাম' পত্রিকা প্রকাশ করেন।

১৯১৬ : লক্ষ্ণৌতে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান।

১৯১৭ : 'এছলাম মিশন' গ্রন্থ প্রকাশ।
বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সংসদের সহ-সভাপতি, (১৯১৭-১৮) নির্বাচিত।

১৯১৮ : ৩য় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সভাপতি (২৯ ও ৩০ ডিসেম্বর), চট্টগ্রামে।

১৯১৯ : হাই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা (বর্তমানে হাই স্কুল)।
জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ১৩ এপ্রিল।
চট্টগ্রামের কাঁহার পাহাড়ে সৈন্যদের অত্যাচার : আকরম খাঁ'র ভূমিকা।

www.pathagar.com

১৯২০ : ২৪ অথবা ২১ মে 'দৈনিক যামানা' প্রকাশ।
বঙ্গীয় খেলাফত কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত।
আহসান মঞ্জিলে খেলাফত কমিটির সভায় ভাষণ দান।
স্বদেশী পণ্য প্রসারের জন্য স্বদেশী খেলাফত স্টোর্স লি. প্রতিষ্ঠা করেন।
ডিসেম্বর মাসে 'সাপ্তাহিক সেবক' দৈনিকে রূপান্তরিত হয়।

১৯২১ : ১০ ডিসেম্বর ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ও ১৫৩ (ক) ধারামতে রাজদ্রোহ ও অন্য জাতির প্রতি হিংসা ও ঘৃণা প্রচারের অভিযোগে ধৃত ('অগ্রসর' শীর্ষক প্রবন্ধের জন্য)।

১৯২২ : কারাগারের সওগাত, আমপারার অনুবাদ প্রকাশ।
দৈনিক মোহাম্মদী প্রকাশ।

১৯২৩ : কারাগার থেকে মুক্তি, বেঙ্গল প্যাক্ট গঠন।
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সহ-সভাপতি নির্বাচিত।

১৯২৪ : ১ জুন সিরাজগঞ্জে কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতি নির্বাচিত।
'ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য' গ্রন্থ প্রকাশিত।

১৯২৫ : ২৯ সেপ্টেম্বর 'মোস্তফা চরিত' প্রকাশ।
চট্টগ্রামের আঞ্জুমানে বাঙ্গালার সম্মেলনের সভাপতি মনোনীত।

১৯২৬ : কুরআ'ন শরিফ আমপারার প্রকাশ।
বেঙ্গল কংগ্রেসের সভাপতি মনোনয়ন।
কুরআ'ন শরিফ ২য় সংস্করণ অনুবাদ প্রকাশ।

১৯২৭ : ৬ নভেম্বর সাপ্তাহিক মোহাম্মদীকে মাসিক মোহাম্মদীতে প্রকাশ করেন।
'শ্রী পদ্ম' ও 'বন্দে মাতরম' আন্দোলন আরম্ভ হয়। মাওলানা এর বিরুদ্ধে আপোষহীন লেখনি পরিচালনা করেন।

১৯২৮ : হজ্জ্ব পালন।
হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন।
সুরা বাকারার তাফসির প্রকাশ।

১৯২৯ : নেহেরু-রিপোর্টবিরোধী আন্দোলনে যোগদান।
বেঙ্গল প্যাক্ট বাতিল হলে কংগ্রেসের সাথে সম্পর্কোচ্ছেদ করেন।
উম্মুল কিতাব সুরা ফাতিহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়।
নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি গঠন : সম্পাদক নির্বাচিত।

১৯৩০ : ১০ জুন সুরা বাকারা ও ফাতিহার তাফসির প্রকাশ।
সুরমা ভেলি মুসলিম কনফারেন্সের সভাপতি মনোনয়ন।
পকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা মহাকবি আলামা ইকবালের সভাপতিত্বে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ সম্মেলনে যোগদান ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন।
'মুক্তি ও ইসলাম' পুস্তিকা প্রকাশ (সুরমা ভেলি কনফারেন্সের ভাষণ)।

১৯৩১ : ১৮ মার্চ 'সমস্যা ও সমাধান' গ্রন্থ প্রকাশ।

১৯৩২ : 'মোস্তফা চরিতের বৈশিষ্ট্য' গ্রন্থ প্রকাশ।

১৯৩৩ : 'বারোয়ারী' উপন্যাস প্রকাশ।

১৯৩৪ : এই বছর পর্যন্ত কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন।

১৯৩৫ : বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৩৬ : ৩১ অক্টোবর দৈনিক আজাদ প্রকাশিত হয়।
মুসলিম লীগে যোগদান। লক্ষ্ণৌতে মুসলিম লীগের ঐতিহাসিক অধিবেশনে অংশগ্রহণ। উক্ত অধিবেশনে মাওলানা হাসরত মোহানী ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করেন।
নিখিল ভারতীয় লীগের বাংলার পার্লামেন্টারি বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হন।

www.pathagar.com

১৯৩৭ : বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।
এ. কে. ফজলুল হক বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ।
বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন।
মুসলিম ঐতিহ্য ধ্বংস করার জন্য মহাত্মা গান্ধীর সমালোচনা করেন।

১৯৩৮ : 'মিশ্র স্বতন্ত্র নির্বাচন' বই প্রকাশিত হয়।
কুরআন শরিফ ২য় খণ্ড সুরা আল ইমরানের তাফসির প্রকাশিত হয়।

১৯৪০ : লাহোরে গৃহীত পাকিস্তান প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন।
সাপ্তাহিক কমরেড প্রকাশ।

১৯৪১ : মাওলানা আকরম খাঁ বেঙ্গল মুসলিম লীগের সভাপতি এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সেক্রেটারি নির্বাচিত হন।
নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ও পরে পাকিস্তান মুসলিম লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।
গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।
পাকিস্তান পল্লী প্রচার কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

১৯৪২ : পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি গঠিত হয়।

১৯৪৩ : 'পাকিস্তাননামা' শীর্ষক পুঁথিকাব্য প্রকাশিত হয়।
বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯৪৫ : মুসলিম লীগের পার্লামেন্টারি বোর্ডের সদস্য মনোনীত হন।
জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম গঠন করেন।
নিখিল ভারত জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের কোলকাতা সম্মেলনে আকরম খাঁ'র গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ।

১৯৪৬ : ৮ নভেম্বর আকরম খাঁ মুসলিম লীগের সভাপতি পদ থেকে পদত্যাগ করেন।

১৯৪৭ : ৮ নভেম্বর ১৯৪৬ সালে দাখিলকৃত মুসলিম লীগের সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগপত্র ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭ সালে কমিটির অনুরোধে প্রত্যাহার করেন।
বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের গড়ের মাঠে শোকরিয়া দিবসে মাওলানার গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ।
১৯ জুন সিলেটকে পাকিস্তানের সঙ্গে থাকার জন্য আকরম খাঁ'র জোরালো প্রচেষ্টা।
২০ জুন বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
১৪ আগস্ট পাকিস্তান স্বাধীন হয়।

১৯৪৮ : পাকিস্তানের স্বাধীনতা লাভের পর ঢাকার উদ্দেশ্যে কোলকাতা ত্যাগ।
সরকার কর্তৃক ৯ মার্চ বাংলা ভাষা কমিটির চেয়ারম্যান মনোনীত হন।
আঞ্জুমানে তরক্কীয়ে উর্দুর সভাপতি মনোনীত হন।
১২ অক্টোবর পর্যন্ত দৈনিক আজাদ কোলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। এক সপ্তাহ বন্ধ থাকার পর ১৯ অক্টোবর ঢাকা থেকে পুনরায় আজাদ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রথমদিকে পলাশীতে তাঁবু গেড়ে আজাদ পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন।

১৯৪৯ : পূর্ব বাংলার শিক্ষা সংস্কার কমিটি ও ভাষা সংস্কার কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯৫১ : প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ।
নিখিল পাকিস্তান উর্দু কনফারেন্সের সভাপতি নির্বাচিত।

১৯৫২ : East Bengal Educational Systems Reconstruction Committee- এর প্রেসিডেন্ট হিসেবে সরকারের নিকট Report পেশ করেন।

১৯৫৩ : বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠার জন্য মাওলানার নেতৃত্বে 'কাণ্ডারী সাহিত্য মজলিস'-এর পক্ষে 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকা প্রথম দাবি উত্থাপন করে।
বাংলা একাডেমীর প্রথম সদস্য নির্বাচিত।

www.pathagar.com

১৯৫৪ : মুসলিম লীগ ত্যাগ।
১৯৫৮ : আবার রাজনীতিতে ফিরে আসেন।
১৯৫৯ : মার্চ-তফছীরুল কুরআন ১ম খণ্ড প্রকাশ।
জুন-তফছীরুল কুরআন ২য় খণ্ড প্রকাশিত হয়।
আগস্ট-তফছীরুল কুরআন ৩য় খণ্ড প্রকাশিত হয়।
ডিসেম্বর-তফছীরুল কুরআন ৪র্থ খণ্ড প্রকাশিত হয়।
১৯৬০ : ফেব্রুয়ারি- জুন-তফছীরুল কুরআন ৫ম খণ্ড প্রকাশিত হয়।
১৯৬১ : বাংলা একাডেমীর সভাপতি নির্বাচিত হন
১৯৬২ : আবার সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ।
'বাইবেলের নির্দেশ ও প্রচলিত খৃষ্টান ধর্ম' বইটি প্রকাশিত।
পুনরায় দৈনিক আজাদের সম্পাদক হিসাবে তাঁর নাম মুদ্রিত হয়।
প্রেসিডেন্ট আইয়ুব কর্তৃক তফছীরুল কুরআনের জন্য পুরস্কৃত।
১৯৬৩ : প্রেস আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিলে নেতৃত্ব দান।
১৯৬৪ : পেশোয়ারে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান ইতিহাস সমিতির সম্মেলনের সভাপতি মনোনীত হন।
১৯৬৫ : 'মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থ প্রকাশ।
১৯৬৬ : বাংলা একাডেমীকে মাওলানার সমস্ত পাণ্ডুলিপি দেয়ার চুক্তি হয়। কিন্তু পরে তা কার্যকর হয় নি।
১৯৬৮ : ২২ জানুয়ারি চট্টগ্রাম রেডিও'র দু'জন বিশেষ প্রতিনিধি মাওলানার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন।
১৮ আগস্ট মাওলানা আকরম খাঁ ইন্তিকাল করেন। ঢাকার বংশাল আহলে হাদিস মসজিদের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।
১৯৮১ : স্বাধীনতা দিবসে মাওলানা আকরম খাঁকে মরণোত্তর পদক প্রদান।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-১

১৯৪৫ সালে নিখিল ভারত জমিয়ত-এ-উলামা-এ-ইসলামের ঐতিহাসিক অধিবেশনে মাওলানা আকরম খাঁ'র বক্তৃতা

"বেরাদরানে মিল্লাত! আজ আপনারা একটি বিপথগামী জমিয়তে ওলামা নিস্তনাবুদ করিয়া তাহার ধ্বংসস্তূপের উপর আর একটি নূতন জমিয়ত গড়িয়া তুলিয়াছেন এবং আপনারা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছেন- ইহা আশার কথা, সন্দেহ নাই। নূতন জামানার নূতন এমারত গড়িয়া তোলার দায়িত্ব যখন আপনারা গ্রহণ করিয়াছেন, তখন আপনাদিগকে বাধ্য হইয়া ঘুণে ধরা পুরাতন জমিয়তকে ধ্বংস করিতে হইবে, কেননা ধ্বংস ব্যতীত নূতন এমারত তৈয়ার করা কঠিন ব্যাপার।

আমাদের মিল্লাতের বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, আমরা অন্য জাতির সহিত সদ্ব্যবহার করিতে জানি। বিশেষ করিয়া প্রতিবেশীর সহিত সদ্ব্যবহার করার জন্য আমাদের ধর্মে বহু নির্দেশ রহিয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া আমরা অন্যান্য জাতির সহিত মিশ্রিত হইয়া একেবারে লোপ পাইতে পারি না। আমাদের জাতীয় শিক্ষা অনুযায়ী আমাদের প্রত্যেক পদক্ষেপ আমাদিগকে অন্যান্য জাতি হইতে আলাদা করিয়া রাখে। যদি কোন জাতি আমাদিগকে আত্মবিস্মৃত হইয়া তাহাদের দাসত্ববরণ করিতে বলে, তবে তাহা আমরা কিছুতেই বরদাশ্‌ত করিব না, করিতে পারি না। আমাদের ধর্মের শিক্ষা অনুযায়ী আমাদিগকে সর্বপ্রথমে প্রতিবেশীর সহিত সদ্ব্যবহার করিয়া চলিতে হইবে। কিন্তু তাহারা যদি আমাদের উপর জুলুম আরম্ভ করিয়া দেয়, অন্যায়ভাবে আমাদিগকে যদি ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চেষ্টা করে, তখনও কি আমাদিগকে কাপুরুষের মত বসিয়া থাকিতে হইবে? কোরআন মজীদের শিক্ষানুযায়ী তখন আমাদিগকে আত্মরক্ষার জন্য সংঘবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে হইবে। জুলুম ও অন্যায় অবিচারের হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য তখন আমাদিগকে জেহাদ করিতে হইবে।"

মাওলানা সাহেব মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবির সার্থকতা সম্পর্কে তাঁর বক্তৃতায় বলেন :

> ইংরেজ একদিন এই দেশ হইতে চলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু ইংরেজ চলিয়া যাওয়ার পর কংগ্রেস এই দেশে হিন্দু রাজত্ব কায়েম করিয়া আমাদিগকে দাস জাতে পরিণত করার চেষ্টা নিশ্চয়ই করিবে। তখন এই দেশে এই দুই জাতির মধ্যে অবাঞ্ছিত রক্তারক্তির অনুষ্ঠান হইতে পারে। দেশকে সেই দুর্দিনের হাত হইতে রেহাই দেওয়ার জন্যই মুসলিম লীগ পাকিস্তান দাবী করিয়াছেন। এই দাবী ভারতবর্ষের ভবিষ্যতকে সুন্দর ও সুখময় করার জন্যই করা হইয়াছে। দেশের হিতসাধনই রহিয়াছে এই দাবীর মূলে। আমরা পাকিস্তান দাবী করিয়া অন্যায় কি করিলাম? আমরা আমাদের একান্ত কাম্য প্রাপ্যটুকু চাহিয়াছি। আমরা পাকিস্তান চাহিয়া যদি গোটা ভারতবর্ষের দাবী করিতাম, তবেই অন্যায় হইত। কাহারও প্রতি অবিচার করার দুরভিসন্ধি এবং সম্ভাবনা যদি থাকিত, তবেই উহাকে জরবদস্তি বলা

www.pathagar.com

> চলিত। আমরা একান্ত স্বাভাবিক এবং ন্যায়সংগত কথাই বলিয়াছি। পাকিস্তান দাবীর বিরুদ্ধে যাহারা ক্ষেপিয়া উঠিতেছেন, তাঁহাদের মতের স্বপক্ষে কোন যুক্তি আছে কি? আমার মনে হয়, এই বিরুদ্ধাচরণ দুরভিসন্ধিমূলক এবং উহার স্বপক্ষে কোন যুক্তিই নাই। আপনারা বিশ্বাস করিবেন- দশ কোটি মুসলমান কখনও মরিতে পারে না, মরিবে না। তাহাদের ন্যায্য দাবী কেহই ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না। আজ মুসলিম জাহানে বিরাট বিপ্লবের সূচনা হইয়াছে। এই বিপ্লবের প্রতিফলস্বরূপ মুসলিম জগত নিশ্চয়ই নূতন রূপ ধারণ করিবে। আর সেই ইনকেলাবের ভিতর আমরা ইনশাল্লাহ পাকিস্তান লাভ করিব।

উলেখ্য যে, উক্ত ঐতিহাসিক অধিবেশন ১৯৪৫ সালের ২৬-২৯ অক্টোবর পর্যন্ত কোলকাতা মোহাম্মদ আলী পার্কে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ উপলক্ষে একটি প্যান্ডেল নির্মিত হয়। সম্মেলনের অধিবেশনকালে বাইরের পার্কে ও রাস্তায় বহু লোক দাঁড়িয়ে রেডিওযোগে তাদের ওলামায়ে দ্বীনের বক্তৃতা শ্রবণ করেন। বাংলা, আসাম, বিহার, পাঞ্জাব, যুক্ত প্রদেশ এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হতে বহু বিশিষ্ট আলিম, ফাজিল এই সম্মেলনে যোগদান করেন। এইরূপ সাফল্যমণ্ডিত সম্মেলন এবং বিপুল জনসমাবেশ কোলকাতাবাসিগণ বহুদিন দেখে নি। এ ছাড়া সমগ্র ভারতের শীর্ষস্থানীয় আলিম মনীষীদের একত্রে সমাবেশ ছিল অভূতপূর্ব।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-২

কারাগারে যাওয়ার প্রাক্কালে মাওলানা'র বিবৃতি

১৯২১ খ্রিষ্টাব্দের ১০ ডিসেম্বর মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ-কে ভারতীয় দণ্ডবিধি ১২৪(ক) ১৫৩(ক) ধারামতে রাজদ্রোহ ও অন্য জাতির প্রতি হিংসা ও ঘৃণা প্রচারের অভিযোগে আটক করে। কোলকাতার চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট মি. সুইনহোর বিচারে উক্ত দুই ধারা অনুসারে তিনি এক বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। বিচারকালে মাওলানা তেজস্বিতার সাথে বলেছিলেন :

> তোমরা আমাদের আন্দোলনটাকে গলা চেপে মারবার জন্য আমাদিগকে ধরচ। দণ্ড যে দেবেই তাতে সন্দেহ নেই। এ জন্য তোমরা এত ব্যস্ত যে, অপরের একটা প্রেরিত পত্র উপলক্ষ্য করে আমাকে ধরতে হ'ল। একটু সময় পেলে বা স্থির হয়ে চিন্তা করতে পারলে তোমাদের কাজের মত অনেক জিনিস পেতে। বাংলাদেশে আমি শত শত বক্তৃতা দিয়েছি, তিনখানা কাগজে নিয়মিতভাবে আমার লেখা বের হচ্ছে। কিন্তু ধরলে একখানা পরের পত্রে এবং প্রিন্টার স্বরূপে। কাজেই তোমাদের মনের যখন এই অবস্থা, তখন নিতান্ত বাতুল না হলে তোমাদের কাছে কেহ স্টেটম্যান্ট করতে যাবে না- এই আমার স্টেটম্যান্ট (Statement)।[১]

১. আবু জাফর (সম্পাদিত), মওলানা আকরম খাঁ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২, পৃ. ২৩৫।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-৩

ঢাকেশ্বরী বিদ্যাপীঠ : মোহাম্মদ আকরম খাঁ

"বঙ্গভঙ্গ রহিত করার অব্যবহিত পরেই তখনকার বড়লাট লর্ড কার্জন ঘোষণা করেন : তিনি শীঘ্রই ঢাকায় গমন করিবেন এবং সেখানকার দরবারে মুসলমানদিগের সম্বন্ধে এমন একটি 'Boon' বা বরদানের ঘোষণা প্রচার করিবেন যাহাতে মুসলমান সমাজের বঙ্গভঙ্গ রহিত হওয়ার সমস্ত ক্ষোভ ও অভিমানের প্রতিকার হইয়া যাইবে। এই ঘোষণা অনুসারে লর্ড কার্জন অবিলম্বে ঢাকায় উপস্থিত হইলেন এবং মুসলমানদিগের মর্মবেদনার প্রতিকার কল্পে তিনি সেখানে যে ঘোষণা প্রচার করিলেন তাহার সারমর্ম এই যে, গভর্নমেন্ট বাংলার মুসলমান সমাজের প্রকৃত অভিযোগের প্রতিকারের জন্য ঢাকা নগরে একটি মোছলেম ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করিয়া দিবেন। মোছলেম বঙ্গের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা চিরকালই আশুতোষ বিশেষতঃ এই ঘোষণা দ্বারা তাঁদের উপস্থিত মুখ রক্ষারও একটা সহজ উপায় সম্ভবপর হইয়া গেল। কাজেই তাঁহারা দিল্লি দরবারে সমস্ত আঘাত-অপমান অম্লান বদনে হজম করিয়া লইয়া ভারত সরকারের জয়গান এবং মোছলেম ইউনিভার্সিটির মোবারকবাদে একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন।"

"তখনকার সেই প্রতিশ্রুত ও বঙ্গভাসে বন্দি মোছলেম ইউনিভার্সিটি হইতেছে আমাদের আজিকার আলোচ্য ঢাকা ইউনিভার্সিটি কি কারণে জানি না হিন্দুরা তাহার নাম দিয়াছেন মক্কা ইউনিভার্সিটি বলিয়া, লর্ড কার্জনের সেই গোড়ার ঘোষণার এবং হিন্দু সাংবাদিকদের অন্যায় রটনার ফলে অনেকেই মনে করিয়া থাকেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়টি সম্পূর্ণভাবে মুসলমানদের সমাজের অধিকারভুক্ত হইয়া আছে, হিন্দু সমাজের কোন প্রভাব প্রতিপত্তি তাহাতে রাখা হয় নাই। এমন কি একদল গোঁড়া সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী সময়ে অসময়ে উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিয়া থাকেন যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অতি অসঙ্গতভাবে পক্ষপাত ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হইয়া থাকে। কিন্তু হিন্দুর প্রতি অন্যায়-নিগ্রহ ও মুসলমান সম্পর্কে অনুগ্রহের এই অভিযোগটির মূলে কতটুকু সত্য নিহিত আছে না আছে, যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা তাহার বিচার আজ পর্যন্ত কেহ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর মহাশয় তাহাদের ১৯৩৫-৩৬ সালের একখানা রিপোর্ট অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। এই রিপোর্ট পাঠে জানা যায় যে, কলিকাতার কাশী বিদ্যাপীঠ'-এ পৈত্রিক ইজারা মহলের ন্যায় মুছলমানের প্রবেশ নিষেধ কঠোরভাবে প্রতিপালিত না হলেও ঢাকা ইউনিভার্সিটিকে মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তে 'ঢাকেশ্বরী বিদ্যাপীঠ' বলিয়া অভিহিত করাই অধিক সঙ্গত হইবে। ইহার প্রমাণ হিসাবে আলোচ্য রিপোর্ট হইতে একটা তথ্য নিম্নে অতি সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক ও কর্মচারীদের সংখ্যা। ১৯৩৫-৩৬ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী)।

www.pathagar.com

(১) Administrative বা পরিচালক বিভাগ

মোট অফিসার	হিন্দু	মুসলমান	অন্যান্য
১৪	৯	৪	১

বর্তমানে হিন্দু ১০ জন মুসলমান ৩ জন মাত্র।

(২) Feculty of Arts

মোট অধ্যাপক	হিন্দু	মুসলমান
১৪	৯	৫

মুসলমান পাঁচজনের মধ্যে তিনজন আরবি ও উর্দুর অধ্যাপক।

(৩) ইংলিশ বিভাগ

মোট অধ্যাপক	হিন্দু	মুসলমান
১০	৯	১

(৪) আরবি ও ইছলামিক শিক্ষা

মোট অধ্যাপক	হিন্দু	মুসলমান
৮	০	৮

দ্র. এই বিভাগেও পূর্বেও একজন সাহেব অধ্যাপক ছিলেন।

(৫) ফার্সী ও উর্দ্দু

মোট অধ্যাপক	হিন্দু	মুসলমান
৪	১	৩

(৬) সংস্কৃত ও বাংলা

মোট অধ্যাপক	হিন্দু	মুসলমান
১০	৬	১

(৭) Philosophy বা দর্শন

মোট অধ্যাপক	হিন্দু	মুসলমান
৭	৬	১

(৮) অর্থ ও রাজনীতি শাস্ত্র বা Economics & Politics

মোট অধ্যাপক	হিন্দু	মুসলমান
১১	১১	০

(৯) Commerce বা বাণিজ্য

মোট অধ্যাপক	হিন্দু	মুসলমান
৬	৬	০

(১০) অংক শাস্ত্র

মোট অধ্যাপক	হিন্দু	মুসলমান
৬	৬	০

www.pathagar.com

(১১) Phisics বা পদার্থ

মোট অধ্যাপক	হিন্দু	মুসলমান
১১	১০	১

(১২) Chemistry বা রসায়ন

মোট অধ্যাপক	হিন্দু	মুসলমান
১১	১১	০

(১৩) কৃষি রসায়ন বায়োকেমিস্ট্রি

মোট অধ্যাপক	হিন্দু	মুসলমান
৭	৭	০

(১৪) Department of Education

মোট অধ্যাপক	হিন্দু	মুসলমান
৯	৭	২

(১৫) হিন্দু ধর্ম

মোট অধ্যাপক	হিন্দু	মুসলমান
৭	৭	০

হাছেল কালাম এই যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা ও অধ্যাপনা বিভাগে মেম্বার ও অধ্যাপকের মোট সংখ্যা হইতেছে (গভর্নর সাহেব বাদে) মোট ১৪১ জন মাত্র। বর্তমান হিন্দু ও মুছলমানের সংখ্যা একটি করিয়া যথাক্রমে বাড়িয়া ও কমিয়া গিয়াছে, ১৪১ জনের মধ্যে ২৮ জন মুসলমান। সুতরাং মুছলমানের অনুপাত দাঁড়াইতেছে মাত্র শতকরা ২০ জন হিসাবে। তবুও হিন্দু সাংবাদিকদের প্রোপাগান্ডার ফলে ইহার নাম ঢাকিয়া গিয়াছে মক্কা ইউনিভার্সিটি বলিয়া। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রের হিসাব খতাইয়া দেখা যাইতেছে যে, কলিকাতা ইউনিভার্সিটিকে অবস্থাগতিকে যেমন কাশী বিদ্যাপীঠ বলা হয়, ঢাকা ইউনিভার্সিটিকে সে হিসাবে ঢাকেশ্বরী বিশ্ববিদ্যালয় বলা যাইতে পারে।"

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-৪
জাতীয় আরবি বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষাক্ষেত্রে মাওলানা আকরম খাঁ চিরাচরিত প্রথাকে অনুসরণ না করে সম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। কারণ, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা[১] পূর্ণাঙ্গ ও বাস্তবমুখী নয়। এই শিক্ষাব্যবস্থায় একদল হয় স্রষ্টাবিমুখ। অন্যদল হয় কর্মবিমুখ। আকরম খাঁ উভয় দলের সমন্বয় সাধনকল্পে শিক্ষিত একদল আলিম ও যোগ্য প্রচারক সৃষ্টির নিমিত্তে একটি 'জাতীয় আরবি বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। অবশ্য, ১৯০৩ সালের জুলাই মাসে সৈয়দ আমীর আলীর সভাপতিত্বে লন্ডনস্থ প্রবাসী ছাত্রদের আয়োজিত এক সভায় মুসলমানদের জন্য একটি 'মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন।[২] এছাড়া আরও অনেকেই মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবি জানান।[৩] তবে কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ-প্রকৃতি সম্পর্কে কোনো বিশদ পরিকল্পনা পেশ করেন নি। আকরম খাঁ ও মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী 'আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালার' মাধ্যমে একটি 'জাতীয় আরবি বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলেন :

> সরকার পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে গোলাম প্রস্তুত ও গোলাম নীতির প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশ সমাজের মঙ্গল বিধান দেশাত্মবোধ জাতীয়তা ও ধর্মানুরাগ হৃদয়ে জাগাতে হলে জগতের সর্বাংশে ইসলাম ধর্মের প্রভাব ও প্রাধান্য বিস্তার করাই প্রধান কর্তব্য। আর এর জন্য প্রয়োজন একমাত্র 'জাতীয় আরবি বিশ্ববিদ্যালয়'।

মাওলানা ইসলামাবাদী এর গুরুত্ব সম্পর্কেও বলেন :

> "আরবি বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা আমরা মানুষের মত মানুষ গড়াইতে চাই। স্বজাতিবৎসল, সমাজহিতৈষী, দেশগত প্রাণ, ধার্মিক, চরিত্রবান লোক গড়ানই আমাদের অভিপ্রেত। বড় দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, ব্যরিষ্টার, সিভিলিয়ান, শিল্পী তৈয়ার করা আমাদের প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের

---

১. আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।
২. ডঃ ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙ্গালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা, ২য় খণ্ড, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ১২৩।
৩. নবনূর সম্পাদক সৈয়দ এমদাদ আলী কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে 'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়' আখ্যা দিয়ে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবি জানান। সৈয়দ নওয়াব আলীও অনুরূপ দাবি করেন। ইসলাম প্রচারক সম্পাদক মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি তুলে বলেন, "বিধর্মী হিন্দু দেশে, বিধর্মী খৃষ্টান গভর্নমেন্ট প্রবর্তিত পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রণালীর গতি কে রোধ করিবে? যতদিন না আমাদের মনের মত বিশ্ববিদ্যালয় হইবে ততদিন আমাদের এই সর্বনাশের পথ কিছুতেই রুদ্ধ হইবে না।"
ড. ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত।
মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত, ঢাকা ১৯৭৭, পৃ. ৩৬-৩৭।
আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।

www.pathagar.com

উদ্দেশ্য নহে। এক কথায় বলিতে গেলে, জগতে এছলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাকল্পে আধুনিক ধরনের উপযুক্ত ধর্মপ্রচারক গড়ানই আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য।"[৪]

আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালার 'জমিয়তে ওলামায়ে বাঙ্গালা' বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। মাওলানা আকরম খাঁ ও আঞ্জুমানের রাজশাহী বিভাগের সেক্রেটারি মাওলানা আবদুল্লাহ হেল বাকীসহ বেশ কিছু কর্মীকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের তহবিল সংগ্রহের জন্য উত্তর ও পূর্ব বঙ্গের বিভিন্ন জায়গা ভ্রমণ করেন। আকরম খাঁ তাঁর মোহাম্মদী পত্রিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রচুর লেখা প্রকাশ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজে তৎকালীন হক্কানী ওলামায়ে কিরামসহ সমাজহিতৈষী বহু গণ্যমান্য সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন।[৫]

১৯১৯ সালের মধ্যে জাতীয় আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সমর্থনে শক্তিশালী মুসলিম জনমত গড়ে ওঠে। ১৯২০ সালে চট্টগ্রামের পটিয়া থানার অন্তর্গত সমুদ্র তীরবর্তী দেয়াং পাহাড়ে ৬ শত বিঘা জমি সংগ্রহ করে সেখানে জাতীয় আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নেয়া হয়। দেয়াং পাহাড়ের এ জমির জঙ্গল পরিষ্কার ও জমি তৈরির জন্য 'আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা'র চট্টগ্রাম শাখার কর্মীবৃন্দ কঠোর পরিশ্রম করেন।[৬] গৃহনির্মাণ ও আনুষঙ্গিক খরচ নির্বাহের জন্য অর্থ সংগ্রহের কাজও চলতে থাকে। প্রাথমিকভাবে ১০ লাখ রুপীর তহিবল গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৭] বাংলার প্রতি জেলায় আরবি বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড গঠন করে মোটা অংকের চাঁদা আদায় এবং গ্রামে গ্রামে চাল উঠানোর মাধ্যমে তহবিল গঠনের পরিকল্পনা নেয়া হয়। কিন্তু যথাসময়ে তহবিল গঠন না হওয়ায় ১৯২৪ সালের এপ্রিল মাসে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রাথমিকভাবে ট্রেনিং ক্লাস বা প্রচারক তৈরি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মপরিচালনার জন্য একটি বোর্ড গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ফান্ড সংগ্রহ না হওয়ায় এবারও নির্ধারিত সময়ে ভিত্তি স্থাপন করা সম্ভব হয় নি। জানা যায়, ১৯৩৫ সালের পরে উপরোক্ত দেয়াং পাহাড়ে আরবি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। তখন এর নামকরণ হয় 'মওলানা শওকত আলী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়'। আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক প্রসিদ্ধ আলিম চাকরি ছেড়ে দিয়ে এই কর্মকাণ্ডে শরিক হন। মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী এ স্থানে পরীক্ষামূলকভাবে একটি বিদ্যালয়, মুরগী ও মৎস্য খামারও প্রতিষ্ঠা করেন।[৮]

---

৪. এছলামাবাদী, 'আরবী বিশ্ববিদ্যালয়, আল-এসলাম, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩২৭।
উদ্ধৃতি, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত, পৃ. ৩৭।

৫. বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় যাঁরা সহযোগিতা করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন- শাহ বদিউল আলম, ফররুখ আহমেদ নেজামপুরী, নুর আহমদ চেয়ারম্যান, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, আবদুর রশীদ সিদ্দিকী, খান বাহাদুর আবদুল আজিজ, পীর বাদশা মিয়া, আলহাজ্ব মাওলানা নেছারউদ্দীন আহমদ (ছারছীনার পীর), লোকমান খান শেরওয়ানী, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ও হাকিম আজমল খাঁ প্রমুখ।
আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪।

৬. আল এছলাম, পৌষ ১৩২৭, পৃ. ৫১১-১২।

৭. সোলতান, ২৫ মাঘ, ১৩৩০, পৃ. ৬।

৮. সৈয়দ মোস্তফা জামাল সম্পাদিত, মাওলানা ইসলামাবাদী, চট্টগ্রাম, ১৯৮০, পৃ. ৫৯-৬০, ৮৬-৮৭।

www.pathagar.com

তবে, এর কোনটিই স্থায়ী হয়নি। তথাপিও নিঃসন্দেহে বলা যায়, মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ও মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী এবং তাঁদের প্রতিষ্ঠিত 'আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা'র কর্মীবৃন্দের এই উদ্দেশ্য মহৎ ও দুঃসাহসী বটে। তৎকালীন প্রতিকূল আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে পুরোপুরি সাফল্য লাভ করতে পারে নি। তাঁদের এ প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ বলা যায় কী? পরবর্তী পর্যায়ে পাকিস্তান আমলে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের যে গণদাবি উচ্চারিত হয়েছিল- তা এরই ফসল। মাওলানা আকরম খাঁ ও ইসলামাবাদী ১৯১৯ সালে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বীজ বপন করেছিলেন, পাকিস্তান আমলে তা-ই অঙ্কুরিত হয়ে বাংলাদেশ হওয়ার পর ফলে-ফুলে সুশোভিত হয়ে বাস্তব রূপ লাভ করে। গাজীপুরস্থ বোর্ড বাজারে 'ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়' প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বর্তমানে কুষ্টিয়ায় শান্তিডাঙ্গাস্থ 'ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়' তারই উজ্জ্বল সাক্ষী।

মাওলানা আকরম খাঁ তাঁর অতীত স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করার সুযোগ পেয়েছিলেন ১৯৪৯ সালে East Bengal Educational System Reconstruction Committee. গঠনের মাধ্যমে। ১৬ মার্চ ১৯৪৯ সালে সর্বপ্রথম এদেশে 'শিক্ষা পদ্ধতি সংস্কার কমিশন' গঠিত হলে মাওলানা আকরম খাঁকে কমিটির সভাপতি এবং মরহুম আবু সাঈদ মাহমুদকে সচিব নিয়োগ করা হয়। ১৯৫২ সালে আকরম খাঁ শিক্ষা কমিশনের বিস্তারিত রিপোর্ট গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।[৯] এতে অন্যান্য বিষয়াবলীর মধ্যে ঢাকাতে একটি ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশও ছিল।[১০]

মোহাম্মদ মোদাব্বের, ইতিহাস কথা কয়, ঢাকা ১৯৮১, পৃ. ৩১৮।
উদ্ধৃতি, আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা, পৃ. ৬৬।

৯. Report of the East Bengal Educational System Reconstruction Committee. 1952.

১০. মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মাওলানা ইয়াকুব শরীফ, সাবেক অধ্যক্ষ, মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা ও সিলেট। সাক্ষাৎকার, ২৩/১১/৯৬।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-৫

খেলোয়াড় আকরম খাঁ

এক সময় ভারতের বুকে 'বন্দে মাতরম' ও 'শ্রী পদ্ম'-বিরোধী আন্দোলন যেমন মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীর জাতীয় চেতনা নিয়ে এসেছিল, তেমনি কোলকাতার মাঠে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব বিপ্লবী চেতনায় মুসলমানদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। এই ক্লাব ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন খেলায় কৃষ্টিতত্ত্ব রেখে মুসলমানদের মধ্যে জাতীয় জাগরণ সৃষ্টি করেছিল। মাওলানা আকরম খাঁও একজন নামকরা খেলোয়াড় হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি কোলকাতা মোসলেম স্পোর্টিং ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন।[১] এই ক্লাবটি পরে: মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়। মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবটি ১৮৯৪ সালের ১৯ জানুয়ারি কোলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্লাবের সভাপতি ছিলেন নবাব সৈয়দ আলী হোসেন, সম্পাদক আবদুল গনি ছিলেন এ ক্লাব প্রতিষ্ঠার কেন্দ্রবিন্দু। ১৮৯৫ সালের ৯ জানুয়ারি কোলকাতা মাদ্রাসা হলে এর প্রথম বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সৈয়দ আমীর আলী। ১৮৯৮ সালে সৈয়দ আহমদের মৃত্যুতে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ঐ বছর থেকে স্যার সৈয়দ আহমদ লীগ কম্পিটিশন কাপ-এর প্রচলন করে। ১৯৩৪ সালে প্রতিষ্ঠিত মোসলেম স্পোর্টিং ক্লাবটি এই মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সাথে একত্র হয়ে যায়- যার সদস্য ছিলেন মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ।[২] প্রিন্স দারা শিকোহও এই ক্লাবেরই প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

কোলকাতার মুসলিম শাহজাদা ও নবাবরা ক্লাবের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। এই ক্লাবের কয়েকজন খেলোয়াড় ছিলেন- গজনফর মীর্জা, বড় সাঈদু, ছোট সাঈদু, মোহাম্মদ আকরম খাঁ।

মাওলানা সাধারণত গোল কীপার হিসাবে খেলতেন। অবশ্য কখনো কখনো হাফ লাইনেও তাঁকে দেখা যেতো। আব্বাস মীর্জা ছিলেন তখন এই দলের ক্যাপটেন।[৩]

'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী', 'মাসিক মোহাম্মদী' এবং 'দৈনিক আজাদ' খেলার মাঠের মুসলমান খেলোয়াড়দের এই বিজয় কাহিনী জনসাধারণের ঘরে ঘরে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। আজাদ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন বলেন :

> মোহামেডান দলের এই অভূতপূর্ব বিজয় অভিযানের চমকপ্রদ বিবরণ তখন বাঙলার হাটে-মাঠে ছড়িয়ে দিয়েছিল সাপ্তাহিক মোহাম্মদী ও মাসিক মোহাম্মদী। এ ক্লাবের খেলা মুসলমান ছাত্র, যুবক, জনসাধারণ, বুদ্ধিজীবী ও কবি-সাহিত্যিক

---

১. মোহাম্মদ কাসেদ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭।
বি: দ্র: দেওয়ান আবদুল হামিদ, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৭০, পৃ. ৪১।

২. ড. ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতহকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ১৯২।

৩. কাসেদ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।

www.pathagar.com

পর্যন্ত আনন্দে উল্লসিত হতেন। কবি গোলাম মোস্তফা এ ক্লাবের বিজয় অভিযান সম্পর্কে 'লীগ বিজয় না দিগ্ বিজয়' নামে একটি সুন্দর কবিতা লিখে সাপ্তাহিক মোহাম্মদীতে তা প্রকাশ করেন।[৪]

ক্লাবের সে সময়ের ক্যাপটেন জনাব আব্বাস মীর্জা বলেন:

আজাদ পত্রিকা আমাদের টিমের নির্বাচন, আমাদের খেলা এবং কোন সমস্যা সমাধানের প্রশ্নে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির ভ্রান্তি সম্পর্কে গঠনমূলক আলোচনা করেছে। সেদিনের আজাদ ছবিসহ যে-সব বিবরণ প্রকাশিত হতো, সেগুলোকে এখনো আমি মূল্যবান সম্পদ হিসাবে সংগ্রহ করে রেখেছি।

প্রসঙ্গক্রমে তিনি আরও বলেন:

"অতি স্বাভাবিকভাবেই আমি আজাদের প্রতিষ্ঠাতা মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ'র ফুটবল খেলার দিনগুলোকে স্মরণ করতে পারি। সম্ভবত পাঠক সমাজ শুনে খুশী হবেন যে, সেকালে ইংরেজ খেলোয়াড়দের বুটের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যে স্বল্পসংখ্যক ভারতীয় খেলোয়াড় ফুটবল মাঠে নেমেছিলেন, মওলানা আকরম খাঁ ছিলেন তাঁদের অন্যতম।[৫]

---

৪. আবদুল হামিদ, প্রাগুক্ত।
৫. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-৬

দৈনিক আজাদকে অভিনন্দন জানিয়ে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের বাণী

"মুমূর্ষু রোগীকে বাঁচাইতে হইলে যেমন অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও ঔষধের আবশ্যক, মৃতপ্রায় সমাজকে বাঁচাইতে হইলে তেমনি আবশ্যক শক্তিশালী সংবাদপত্রের। বাংলার নিপীড়িত জাতিগুলি যখন অত্যাচারের চাপে ওষ্ঠাগতপ্রাণ হইয়া মুক্তি লাভের জন্য আকুলতা প্রকাশ করিতেছিল, সেই সন্ধিক্ষণে আশার দীপ্ত মশাল হস্তে হইল আজাদের আবির্ভাব। আজাদ বাহির হইল সঙ্গে সঙ্গে কোটি কোটি মৌন মূক জনসাধারণ কণ্ঠে ভাষা পাইল, বুকে পাইল আশা, বন্দী আবার জিন্দানখানার আগল ভাঙ্গিয়া বাহির হইল মুক্তির নির্মল আলোকে। ... আজাদ কোন সম্প্রদায় বিশেষের মুখপাত্র নহে,

ইহা জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে উৎপীড়িতদের মুক্তিকামী ....।"[১]

এ, কে, ফজলুল হক

প্রধানমন্ত্রী, বাংলা

১লা নভেম্বর, ১৯৩৮।

১. মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতা ও আবুল কালাম শামসুদ্দীন, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ১০৯-১১০।

www.pathagar.com

মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ-এর বংশ পরিচিতি-(শাজরা)।[২]

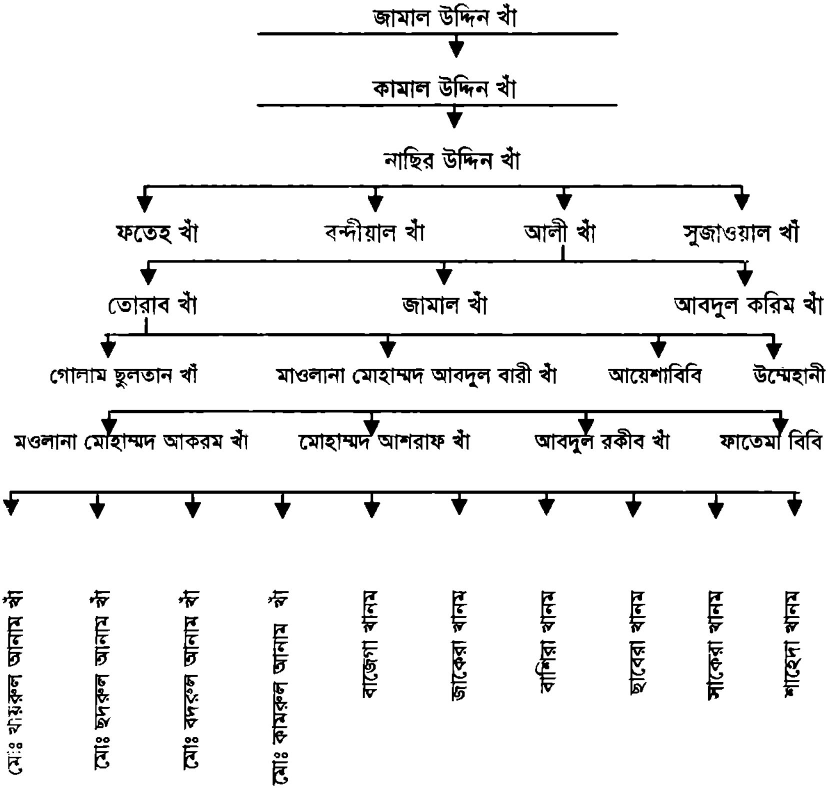

---

২. ২৩ ডিসেম্বর ১৯২২ সালের লাহোর থেকে প্রকাশিত উর্দু দৈনিক 'নকুশ' পত্রিকা হতে সংগৃহীত।

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জি

১.	কোরআন শরীফ	বঙ্গানুবাদ, (কোলকাতা, ১৯০৫), প্রকাশক: মৌলভী আব্বাস আলী, ৩ হুকলেন, কোলকাতা।
২.	যীশু কি নিষ্পাপ	কোলকাতা, ১৯১৫, প্রকাশক: মুজাফ্‌ফর আহমদ, ৩৩ ফুলবাগান রোড, কোলকাতা।
৩.	এছলাম মিশন	কোলকাতা, ১৯১৭, প্রকাশক: মোহাম্মদ আকরম খাঁ, ২৯ আপার সার্কুলার রোড, কোলকাতা।
৪.	কোরআন শরীফ	আমপারা- বঙ্গানুবাদ ও টীকা, (কোলকাতা, ১৯২৪), প্রকাশক: মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ, ২৯ আপার সার্কুলার রোড, কোলকাতা।
৫.	মোস্তফা চরিত, উপক্রম ও ইতিহাস ভাগ	কোলকাতা, ১৯২৫, প্রকাশক: মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ, ২৯ আপার সার্কুলার রোড, কোলকাতা।
৬.	উম্মুল কেতাব	সুরা ফাতিহার বঙ্গানুবাদ ও টীকা, (কোলকাতা, ১৯২৯), প্রকাশক: মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ, ২৯ আপার সার্কুলার রোড, কোলকাতা।
৭.	কোরআন শরীফ	সুরা ফাতিহা ও সুরা বাকারার তফসীর, (কোলকাতা, ১৯৩০), প্রকাশক: মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ, ৯১ আপার সার্কুলার রোড, কোলকাতা।
৮.	সমস্যা ও সমাধান	কোলকাতা, ১৯৩৯, প্রকাশক: মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ, ৯১ আপার সার্কুলার রোড, কোলকাতা।
৯.	মোস্তফা চরিতের বৈশিষ্ট্য	কোলকাতা, ১৯৩১, প্রকাশক: মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ, ৯১ আপার সার্কুলার রোড, কোলকাতা
১০.	কোরআন শরীফ	সুরা আল-এমরানের বঙ্গানুবাদ ও টীকা, (কোলকাতা, ১৯৩৮), প্রকাশক : মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ, ৯১ আপার সার্কুলার রোড, কোলকাতা।
১১.	পাকিস্তাননামা বা নয়া রাহে নাজাৎ	পুঁথিকাব্য, (কোলকাতা, ১৯৪৩), প্রকাশক : মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ, ৯১ আপার সার্কুলার রোড, কোলকাতা।
১২.	তফছিরুল কোরআন	প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড (ঢাকা, ১৯৫৯-৬০), প্রকাশক: মোহাম্মদ বদরুল আনাম খাঁ ও মোহাম্মদ কামরুল আনাম খাঁ, ২৭বি ঢাকেশ্বরী রোড, ঢাকা।
১৩.	বাইবেলের নির্দেশ ও প্রচলিত খৃস্টান ধর্ম	ঢাকা, ১৯৬২, প্রকাশক: মোহাম্মদ বদরুল আনাম খাঁ, ২৭বি ঢাকেশ্বরী রোড, ঢাকা।
১৪.	মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস	ঢাকা, ১৯৬৫, প্রকাশক : মোহাম্মদ আকরম খাঁ, আজাদ অফিস, ঢাকেশ্বরী রোড, ঢাকা।

www.pathagar.com

১৫. এছলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য্য — কোলকাতা, ১৯২৪. প্রকাশক : মোহাম্মদী বুক এজেন্সি।

১৬. এছলামের রাজ্য শাসন বিধান — (Basic Principles of Islami constitution ইংরেজিঅনুবাদক : এ চক্রবর্তী এম. এ, বাংলা ১৩৫৮ সন), প্রকাশক : মোঃ ছদরুল আনাম খাঁ, মোহাম্মদী বুক এজেন্সী, রমনা, ঢাকা।

১৭. আবুল কালাম শামসুদ্দীন — অতীত দিনের স্মৃতি নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৬৮।

১৮. আবদুর রাকিব — সংগ্রামী নায়ক আবুল কালাম আযাদ মল্লিক ব্রাদার্স, কোলকাতা, ১৯৯২।

১৯. আবুল মনসুর আহমদ — বাংলাদেশের কালচার
আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৬৬।

২০. আবু সাঈদ নূরুদ্দীন, ড. — মহাকবি ইকবাল
আল্লামা ইকবাল সংসদ, ঢাকা, ১৯৯৬।

২১. আমীনুল ইসলাম — মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি
বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪।

২২. আবু জাফর (সঙ্কলিত ও সম্পাদিত) — মাওলানা আকরম খাঁ
ইস. ফাউ. বা. ঢাকা, ১৯৮২।

২৩. আবদুল মান্নান তালিব — সাহিত্য সংস্কৃতি ভাষা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট,
বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা, ১৯৯১।

২৪. আবুল মনসুর আহমদ — আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর
খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৯৫।

২৫. আবুল হাসান আলী নদভী — ধর্ম ও কৃষ্টি (অনুবাদ মাও. লিয়াকত আলী)
কাসেমিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯৫।

২৬. আব্বাস আলী খান — বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ১৯৯৪।

২৭. আবদুল মওদুদ — ওহাবী আন্দোলন
আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৮৫।

২৮. আবুল মনুসর আহমদ — আত্মকথা
খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৭৮।

২৯. আবুল কালাম আজাদ — তরজুমানুল কুরআন
দোস্ত কিতাব মহল, উর্দু বাজার,
লাহোর, ১৯৯৪।

৩০. ইউসুফ আল কারযাভী — ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা
সৃজন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯১।

৩১. ইমরান হোসেন — বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবী : চিন্তা ও কর্ম
বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩।

৩২. ইবনে খালদুন — মোকাদ্দামায়ে ইবনে খালদুন
নফীস একাডেমী, লাহোর।

৩৩. এ টি এম আতিকুর রহমান — বাংলার রাজনীতিতে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ,
বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫।

৩৪. এস এ সিদ্দিকী, বার এট ল' — ভুলে যাওয়া ইতিহাস
আল-হেলাল প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ১৯৭৫।

www.pathagar.com

৩৫. এম এ রহিম — বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস
আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৭৬।

৩৬. ওয়াকিল আহমদ, ড. — উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের চিন্তা চেতনার ধারা (১ম ও ২য় খণ্ড)
বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩।

৩৭. কাজী দীন মুহম্মদ, ড. — জীবন সৌন্দর্য
ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৮২

৩৮. কাজী দীন মুহম্মদ, ড. — আমি তো দিয়েছি তোমাকে কাউসার,
প্রীতি প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৩

৩৯. গোলাম মোস্তফা — বিশ্বনবী
আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৪২।

৪০. গোলাম সাকলায়েন — বাংলাদেশের সূফী-সাধক ই. ফা. বা. বা., ঢাকা, ১৯৯৩।

৪১. বশীর আল হেলাল — বাংলা একাডেমীর ইতিহাস
বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৬।

৪২. বশীর আল হেলাল — ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস
বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৬।

৪৩. বদরুদ্দীন উমর — ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ (২য় খণ্ড) কতিপয় দলিল
বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪।

৪৪. বদরুদ্দীন উমর — ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন নওরোজ
কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৮৭।

৪৫. মুফতী আমীনুল ইহসান — হাদীস সংকলনের ইতিহাস
কুতব খানায়ে রাশিদিয়া, ১৩৮০ হিজরী ।

৪৬. মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম — আল কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার
খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৮।

৪৭. মোহাম্মদ আকরম খাঁ — মোস্তফা চরিত ঝিনুক পুস্তিকা, ঢাকা, ১৯৭৫।

৪৮. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ড. — রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা ই. ফা. বা., ঢাকা, ১৯৯৫।

৪৯. মুহাম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান — বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত
আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৫৬।

৫০. মোহাম্মদ ওসমান গনী — আনোয়ারুল মুকাল্লেদীন
ই. ফা. বা., ঢাকা, ১৯৯১।

৫১. মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব — আহলে হাদীছ আন্দোলন
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ রাজশাহী, ১৯৯৬।

৫২. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ড. — মওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর
ই. ফা. বা., ঢাকা, ১৯৮৭।

৫৩. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, ড. — বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা
ই. ফা. বা., ঢাকা, ১৯৮৬।

৫৪. মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, অধ্যাপক — সুদ সমাজ অর্থনীতি
ইসলামিক ইকোনমিকস রিসার্চ ব্যুরো, ঢাকা, ১৯৯২।

৫৫. মুহিউদ্দীন খান (অনূদিত) — আযাদী আন্দোলন
মদীনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৪।

www.pathagar.com

৫৬. মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ — আমাদের মুক্তি সংগ্রাম
বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৮।

৫৭. মোঃ সোলায়মান আলী সরকার — ইবনুল আরাবী ও জালালুদ্দীন রুমী
বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫।

৫৮. মোহাম্মদ আজরফ, দেওয়ান — জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম
ই. ফা. বা., ঢাকা, ১৯৯১।

৫৯. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ড. — স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা
ই. ফা. বা., ঢাকা, ১৯৮২।

৬০. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক — ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন
বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩।

৬১. মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ — মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতা আবুল কালাম শামসুদ্দীন
ই. ফা. বা., ঢাকা, ১৯৮৩।

৬২. মুস্তফা নূরউল ইসলাম, ড. — সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭।

৬৩. মরিস বুকাইলি — কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান
আলীগড় লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯৩।

৬৪. মোহাম্মদ মোবারক আলী (অনূদিত) — গুলিস্তাঁ
ই. ফা. বা., ঢাকা, ১৯৯৩।

৬৫. মোহাম্মদ মাকছুদুর রহমান (সম্পাদিত) — মওলানা মোস্তাফীজুর রহমান জীবন ও সাহিত্য
ক্লাসিক পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৩।

৬৬. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ড. — মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক
ই. ফা. বা., ঢাকা।

৬৭. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম — হাদীস সংকলনের ইতিহাস
ই. ফা. বা., ঢাকা, ১৯৮০।

৬৮. মরিস বুকাইলি — বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান
ই. ফা. বা., ঢাকা, ১৯৮৬।

৬৯. মোহাম্মদ মুজীবুর রহমান, ড. — কুরআনের চিরন্তন মু'জিযা
ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৯১।

৭০. মোহাম্মদ মজিবর রহমান — মুসলিম ও পারিবারিক আইন পরিচিতি
বাদশা পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৮৯।

৭১. মমতাজুর রহমান তরফদার — বাংলাদেশের সংস্কৃতির স্বরূপ ও সম্ভাবনা
বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪।

৭২. মুহাম্মদ বিন জামাল যাইনূ — আরকানুল ইসলাম ওয়াল ঈমান ও আল আক্বীদাহ আল-ইসলামিয়াহ
আল-মাইমানা কম্পিউটার গ্রাফিক্স, ঢাকা, ১৯৯৩।

৭৩. মুফতি মুহাম্মদ শফী — ইসলামের অর্থবন্টন ব্যবস্থা
ই. ফা. বা., ঢাকা, ১৯৮৩।

৭৪. মুফতি মুহাম্মদ শফী — মাআরেফুল কোরআন (১-৮ খণ্ড)
ই. ফা. বা., ঢাকা।

৭৫. মাওঃ মুহিউদ্দীন খান অনূদিত মরিস বুকাইলি — মানুষের আদি উৎস (The Origin of Man)
জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৮।

www.pathagar.com

৭৬. মুহাম্মদ কুতুব — ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম
আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৮।

৭৭. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ড. — পশ্চিমবঙ্গে ফার্সী সাহিত্য
ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
ঢাকা, ১৯৯৪।

৭৮. মাযহার উদ্দীন সিদ্দীকী — কুআনের ইতিহাস দর্শন
ই. ফা. বা., ঢাকা, ১৯৮৭।

৭৯. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম — সুন্নাত ও বিদয়াত
খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৬৭।

৮০. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম — ইসলামের অর্থনীতি, প্রাগুক্ত, ১৯৯৫।

৮১. রেজোয়ান সিদ্দিকী, ড. — পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক
আন্দোলন বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬।

৮২. স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ — তাফসীরুল কুরআন
দোস্ত কিতাব মহল, উর্দু বাজার,
লাহোর, ১৯৯৪।

৮৩. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) — বাংলাদেশের ইতিহাস
এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ,
ঢাকা, ১৯৯২।

৮৪. সিরাজুল ইসলাম — ইতিহাস কথা কও
খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৭৪।

৮৫. অনিল চন্দ্র বান্দ্যোপাধ্যায় — ভারতের ইতিহাস (ইন্ডিয়া ১৯৪৪)।

৮৬. আবদুল মান্নান তালিব — বাংলাদেশে ইসলাম
আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮০।

৮৭. অধ্যাপক আবদুল গফুর — আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম
ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৮৭।

৮৮. আবদুল হক চৌধুরী — শহর চট্টগ্রামের ইতিকথা
কথামালা প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৮৫।

৮৯. আবদুল মওদুদ — মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ : সাংস্কৃতিক রূপান্তর
ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৮১।

৯০. আবুল হাশিম — ইসলামের মর্মকথা
ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৮১।

৯১. আব্বাস আলী খান — ইসলাম ও জাহেলিয়াতের চিরন্তন দ্বন্দ্ব
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ১৯৯২।

৯২. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারি — বুখারি বুখারি শরিফ (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)
মকতবায়ে রহমানিয়া, উর্দু বাজার,
লাহোর, ১৯৮৫।

৯৩. আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান — তায়সিরুল আলাম (১ম খণ্ড)
মকতবাতু ওয়া মাতবুয়াতুন নাহযাতুল হাদিস,
মক্কা-মুকাররমা, ১৯৮৪।

৯৪. অব্‌দুর রহমান রাফাত পাশা, ড. — সাহাবীদের বিপ্লবী জীবন
আশ-শেফা রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩।

৯৫. এনায়েত রসূল — মনীষীদের জীবনকথা
নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ঢাকা, ১৯৯২।

www.pathagar.com

৯৬. এ এম এম আবদুল জলীল এডভোকেট দেওবন্দ আন্দোলন একটি জিহাদ
ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৮৩।
৯৭. কামরুদ্দীন আহমদ পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি
স্টুডেন্টস্ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৭৬।
৯৮. সৈয়দ আবুল মকসুদ জীবনী গ্রন্থমালা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৭।
৯৯. গ্রিগোরি কতোভস্কি ভারতবর্ষের ইতিহাস, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো।
১০০. গোলাম মোস্তফা বিশ্বনবীর বৈশিষ্ট্য
আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৯৩।
১০১. দিলওয়ার হোসেন মোহাম্মদী পত্রিকার মুসলিম সমাজ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৪।
১০২. মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী বাংলাদেশের সংগ্রামী ওলামা পীর-মাশায়েখ
(১ম ও ২য় খণ্ড) প্রগতি প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৮।
১০৩. জালালুদ্দীন সুয়ুতী (রহ.) আল-ইতকান এদারায়ে ইসলামিয়া,
লাহোর, ১৯৮৬।
১০৪. মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী মুয়াত্তা ইমাম মালিক (র.) ১ম খণ্ড
ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৮২।
১০৫. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ড. মুসলিম সম্পাদিত বাংলা সাময়িক পত্রে
ধর্ম ও সমাজ চিন্তা
বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫।
১০৬. মুজিবুর রহমান খাঁ সাহিত্যের সীমানা
ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৮০।
১০৭. মুহম্মদ ইকবাল ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন
ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৫৭।
১০৮. মুফতি মুহাম্মদ শফী (রহ.) খতমে নবুওয়ত
ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৮৬।
১০৯. মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক
বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭০।
১১০. মুহাম্মদ আলী আস্ সাবুনী ইসলামে উত্তরাধিকার আইন
আধুনিক প্রেস, ঢাকা, ১৯৮৮।
১১১. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ নওয়াব সলীমুলাহ
ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৮৬।
১১২. মুফতি মুহাম্মদ শফী (রহ.) সীরাতে খাতিমুল আম্বিয়া
ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৮৬।
১১৩. মুহাম্মদ বিন জামীল যাইনু ব্যক্তি ও সমাজ সংশোধনে ইসলামী দিক-নির্দেশনা
আল-মুনতাদা আল-ইসলামী, ঢাকা, ১৯৯৪।
১১৪. মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ সাহিত্য ও সাহিত্যিক মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৮।
১১৫. মুফতি মুহাম্মদ শফী (রহ.) গুনাহে বে-লযযত দারুল ইফতা প্রকাশনী,
ঢাকা, ১৯৯২।
১১৬. মুহাম্মদ রিজাউল করীম মুয়াত্তা ইমাম মালিক (র.) ১ম খণ্ড
ই. ফা. বা. , ঢাকা, ১৯৯৫।
১১৭. মাওলানা মুহাম্মদ তক্বী ওছমানী দরসে তিরমিযী (১-৩ খণ্ড)
মকতবায়ে দারুল উলুম, করাচি ১৪১৬ হি.।
১১৮. মোজাহেদে আযম মাওলানা শামছুল হক হাক্কানী তফছীর
খাদেমুল ইসলাম পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৮২।

www.pathagar.com

১১৯. মাওলানা মহীউদ্দীন — হামাসাহ বাবুল আদব
এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা।
১২০. মওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম — তফসীরে নূরুল কোরআন (১ম পারা)
ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৮৮।
১২১. রশীদ আল ফারুকী (সম্পাদিত) — কাজী আবদুল ওদুদ প্রসঙ্গ
বাংলাদেশ সাহিত্য পরিষদ, চট্টগ্রাম, ১৩৯৪।
১২২. রশীদ আল ফারুকী — মুসলিম মানস : সংঘাত ও প্রতিক্রিয়া
জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮১।
১২৩. রায়হান শরীফ — সমাজ ও সংস্কৃতি
বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫।
১২৪. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — জিন্না : পাকিস্তান নতুন ভাবনা
মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি.
কোলকাতা, ১৩৯৪।
১২৫. সাঈদ-উর রহমান — পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি, কবিতা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৮৩।
১২৬. সামসুদ্দীন — ইসলামী সংস্কৃতির ইতিহাস
ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৯৩।
১২৭. সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী — সীরাতে সাইয়িদ আহমদ শহীদ (রহ.) (২য় খণ্ড)
ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৯১।
১২৮. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, ড. — আল্লামা ইকবাল (তৃতীয় খণ্ড)
(সম্পাদনা কমিটির চেয়ারম্যান) — আল্লামা ইকবাল সংসদ, ঢাকা, ১৯৯১।
১২৮. স্যার সৈয়দ আমীর আলী — দ্য স্পিরিট অব ইসলাম
মল্লিক ব্রাদার্স, কোলকাতা, ১৯৮৭।
১২৯. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী — সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং
আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৯।
১৩০. সুপ্রকাশ রায় — ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম
বুক ওয়ার্ল্ড, কোলকাতা, ঢাকা, ১৯৭০।
১৩১. সৈয়দ আবদুল মান্নান — পাকিস্তানের ঐতিহাসিক পটভূমিকা
ইকবাল একাডেমী, করাচি, পাকিস্তান, ১৯৫৯।
১৩২. হাসান জামান, ড. — সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য
ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৬৭।
১৩৩. শিবলী নুমানী সৈয়দ সোলায়মান নদভী — সীরাতুন্নবী (১-৬), লাহোর, পাকিস্তান।
১৩৪. Abdul Hamid Abu Solayman Dr. — ISLAMIZATION OF KNOWLEDGE
International Islamic Publishing House,
Riyadh, Saudi Arabia, 1402/1982
১৩৫. Sayeed Ameer Ali — THE SPIRIT OF ISLAM
Pak Publishers Limited, Pakistan, 1969.
১৩৬. Mr. Ali Ahmed Rushdi — THOUGHTS ON ISLAMIC BANKING
Adhunik Prakashani, Dhaka.
১৩৭. Mr. Ali Ahmed Rushdi — THOUGHTS ON ISLAMIC ECONOMICS
Bangladesh Islamic Centre, Dhaka, 1980.
১৩৮. Philip K. Hitti — HISTORY OF THE ARABS
Macmillan, London, 1939.

www.pathagar.com

১৩৯. S. M. Hasan, Dr. THE ADINA MASJID
The Amina Art Printers, Dhaka, 1970.
১৪০. Syed Sajjad Husain A YOUNG MUSLIM'S GUIDE TO RELIGIONS IN THE WORLD
Bangladesh Institute of Islamic Thought, Dhaka, 1992.
১৪১. Salahuddin Ahmad THOUGHTS ON ECONOMICS
Islamic Economics Research Bureau, Dhaka, 1995.
১৪২. Shamsul Huq Md. Biblio on The Works of AKRAM KHAN MOULANA Moulana Mohammad
Dhaka University, 1961.
১৪৩. Abdullah Ahmed THE HISTORICAL BACKGROUND OF PAKISTAN AND ITS PEOPLE
Karachi, 1973.
১৪৪. Abul Hasim IN RETROSPECTION Dhaka, 1984.
১৪৫. Abul Monsur Ahmed END OF A BETRAYAL AND RESTORATION OF LAHORE RESOLUTION
Dhaka, 1975.
১৪৬. A.H.M. Nooruzzaman RISE OF THE MUSLIM MIDDLE CLASSES AS A POLITICAL FACTOR IN INDIA AND PAKISTAN 1858-1947
Dhaka, 1970.
১৪৭. Chaudhuri Muhammad Ali THE EMERGENCE OF PAKISTAN
New York, 1967.
১৪৮. E. W. R. Lumby THE TRANSFER OF POWER IN INDIA, 1945-1947 London, 1954.
১৪৯. বাংলা বিশ্বকোষ (১ম খণ্ড) খান বাহাদুর আবদুল হাকিম
নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৭২।
১৫০. বাংলা বিশ্বকোষ (২য় খণ্ড) খান বাহাদুর আবদুল হাকিম
মুক্তধারা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৫।
১৫১. বাংলা বিশ্বকোষ (৩য় খণ্ড) খান বাহাদুর আবদুল হাকিম
নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৭৩।
১৫২. বাংলা বিশ্বকোষ (৪র্থ খণ্ড) খান বাহাদুর আবদুল হাকিম আবদুল
মুক্তধারা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৬।
১৫৩. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (১ম ও ২য় খণ্ড) সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত
ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৮২।
১৫৪. ইসলামী বিশ্বকোষ (১-২০ খণ্ড) সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, ই. ফা. বা.।
১৫৫. সংসদ বাঙ্গালা অভিধান সংকলক : শৈলেন্দ্র বিশ্বাস
Samsad English-Bengali Dictionary
শ্রী শৈলেন্দ্র বিশ্বাস আগস্ট, ১৯৫৯।
১৫৬. মিসবাহুল লুগাত সাঈদ এইচ এম কো.
করাচি, পাকিস্তান, ১৯৫০।

www.pathagar.com

মাওলানার কিছু প্রবন্ধ

১. আল-এছলাম, কোলকাতা, ১৯১৫।
২. এছলাম ও মোহামেডান ল'।
৩. মূল বাইবেল কোথায়?
৪. এছলামের শাসননীতি।
৫. এছলাম মনীষার আলোকে।
৬. গুলিস্তাঁ (বঙ্গানুবাদ)।
৭. হেজায ভ্রমণ (পাণ্ডুলিপি)।
৮. বারোয়ারী (উপন্যাস, সংকলন গ্রন্থ)।
৯. মুক্তি ও এছলাম (সুরমা ভেলি কনফারেন্সে প্রদত্ত ভাষণ)।
১০. কাদিয়ানী ফেরকা (মূল, মাফায়েদুল মছীহ)।
১১. কোরআনে হযরত ঈছা ও বাইবেলে যীশুখৃষ্ট।

মাওলানা সম্পাদিত প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা

১. মাসিক মোহাম্মদী (১৯০৩)
২. সাপ্তাহিক মোহাম্মদী (১৯১০)
৩. আল-এছলাম (১৯১৪-১৫)
দৈনিক যামানা (১৯২০)
৪. সাপ্তাহিক সেবক
৫. দৈনিক সেবক (১৯২১)
৬. দৈনিক মোহাম্মদী (১৯২২)
৭. মাসিক মোহাম্মর্দী (১৯২৭)
৮. দৈনিক আজাদ (১৯৩৬)
৯. সাপ্তাহিক কমরেড (১৯৪৩)

পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী

দৈনিক আজাদ : যথাক্রমে ০৭-০৬-৬৮, ১৮-০৮-৬৯, ১৮-০৮-৭০, ১৮-০৮-৭১, ১৮-০৮-৭৩, ১৮-০৮-৭৪, ১৮-০৮-৭৬, ১৮-০৮-৭৭, ১৮-০৮-৭৮, ১৮-০৮-৭৯, ১৮-০৮-৮০, ১৮-০৮-৮১, ১৮-০৮-৮২, ১৮-০৮-৮৩, ১৮-০৮-৮৪, ১৮-০৮-৮৫, ১৮-০৮-৮৬, ১৮-০৮-৮৭, ১৮-০৮-৮৮, ১৮-০৮-৮৯, ১৮-০৮-৯০, ১৮-০৮-৯১ এবং ১৮-০৮-৯৪ সংখ্যাসমূহ।

১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ১৯৯০ : ফেব্রুয়ারি
২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ১৯৯২ : জুন
৩. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ১৯৮৭/এপ্রিল-জুন চৈত্র ১৩৯৩ আষাঢ়, ১৩৯৪।
৪. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা ১৯৮৭ : জানুয়ারি- মার্চ পৌষ-চৈত্র ১৩৯৩।
৫. আলামা ইকবাল সংসদ পত্রিকা, জানুয়ারি-মার্চ, ১৯৯৫।
৬. বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা ১৯৯৬ : আষাঢ় ১৪০৩ চতুর্দশ খণ্ড সাইয়্যারা ডাইজেস্ট, কুরআন সংখ্যা : লাহোর, পাকিস্তান।
৭. কাওমী ডাইজেস্ট : লাহোর, পাকিস্তান, ১৯৯৫।
৮. Bangladesh Institute of Islamic Thought : 1993, Dhaka.
৯. Thoughts on Economics : 1995, January-June, Vol. 5
১০. Journal of the Asiatic Society of Bangladesh: 1994, December, Vol. 39.
১১. Journal of the Asiatic Society of Bangladesh: 1995, December, Vol. 40.
১২. The Ethics of Disagreement in Islam : (1414-1993)
১৩. Clio Journal of History Department (J. U.) : 1991, Vol. IX.
১৪. The Jahangirnagar Review : 1991, Vol. V.

www.pathagar.com

মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ
জন্ম : ৭ জুন, ১৮৬৮
মৃত্যু : ১৮ আগস্ট, ১৯৬৮

২৭/ক ঢাকেশ্বরী রোডে আজাদ-এর নিজস্ব প্রেসের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করতে দেখা যাচ্ছে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ'কে।

মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ'র অন্তিমকালে রোগ শয্যার পাশে (বামে) ফকির আবদুল মান্নান-এবং (ডানে) আবুল হাসেমকে দেখা যাচ্ছে

২৭/ক ঢাকেশ্বরীস্থ দৈনিক আজাদ অফিসে মাওলানা আকরম খাঁ'র ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আইয়ুব খানকে আকরম খাঁ'র সাথে আলাপরত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে।

তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের জারিকৃত প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স-এর প্রেস কর্মচারীদের **মিছিলে** মাওলানা আকরম খাঁকে নেতৃত্ব দিতে দেখা যাচ্ছে।

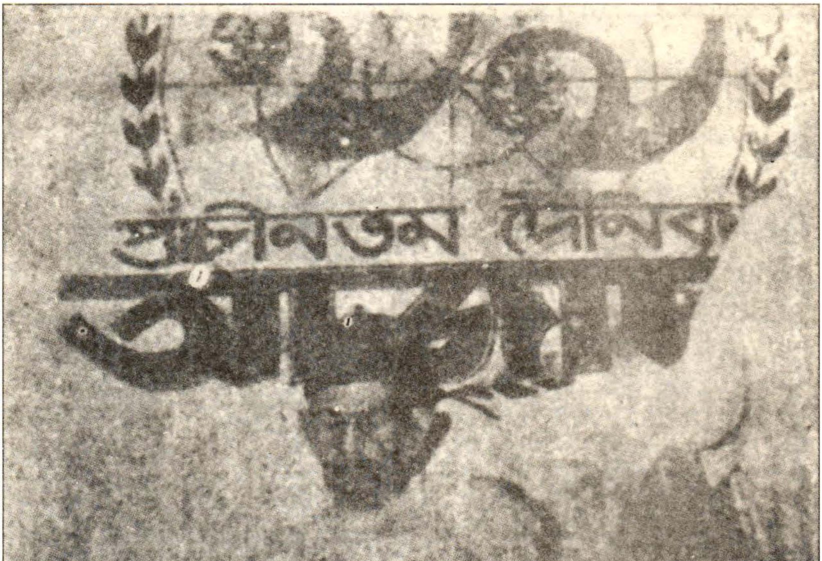

মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ'কে ১৯৬৮ সালের ৭ জুন ৯৯তম জন্ম বার্ষিকীর সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে দেখা যাচ্ছে।

উদ্বোধনী খাম FIRST DAY COVER

মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ
২৮তম মৃত্যুবার্ষিকী (১৯৬৮-১৯৯৬)

28TH DEATH ANNIVERSARY OF MAULANA MOHAMMAD AKRUM KHAN (1968-1996)

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ BANGLADESH POST OFFICE

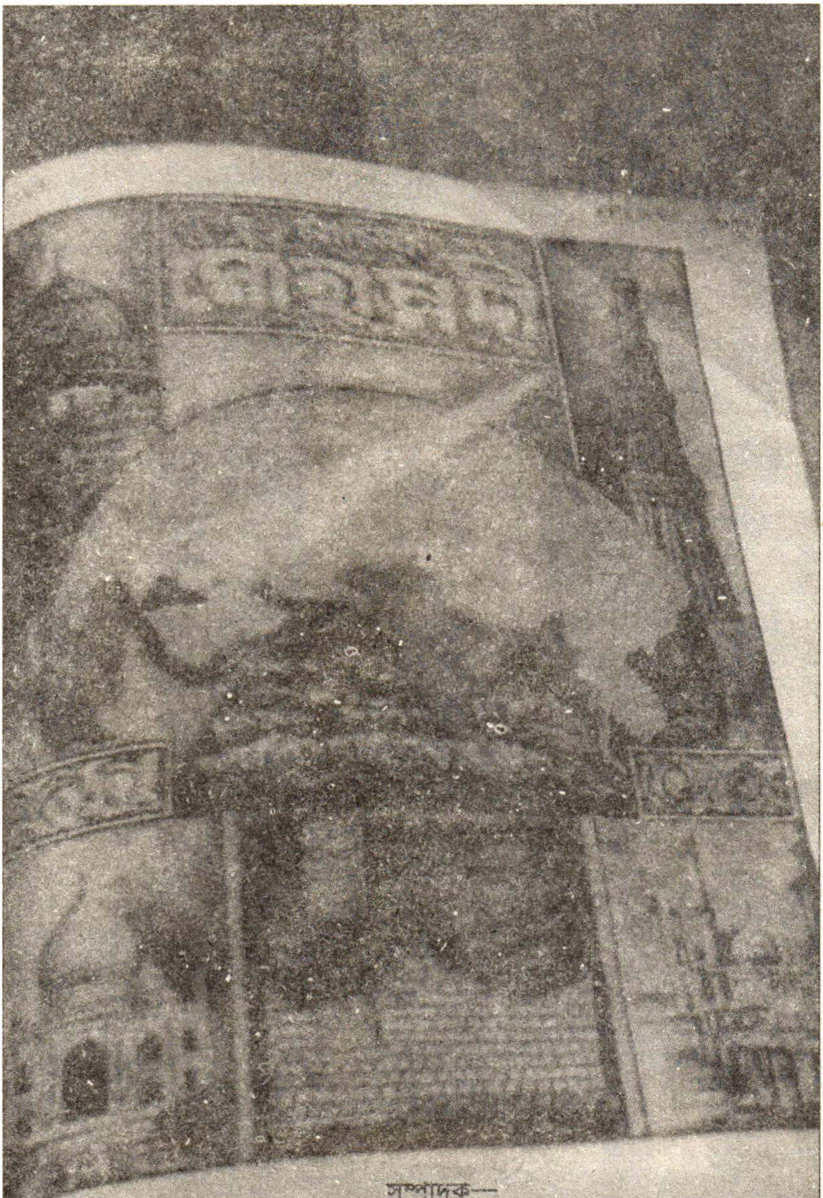

মাসিক মোহাম্মদী - ৩য় সংখ্যা

মোস্তফা চরিত

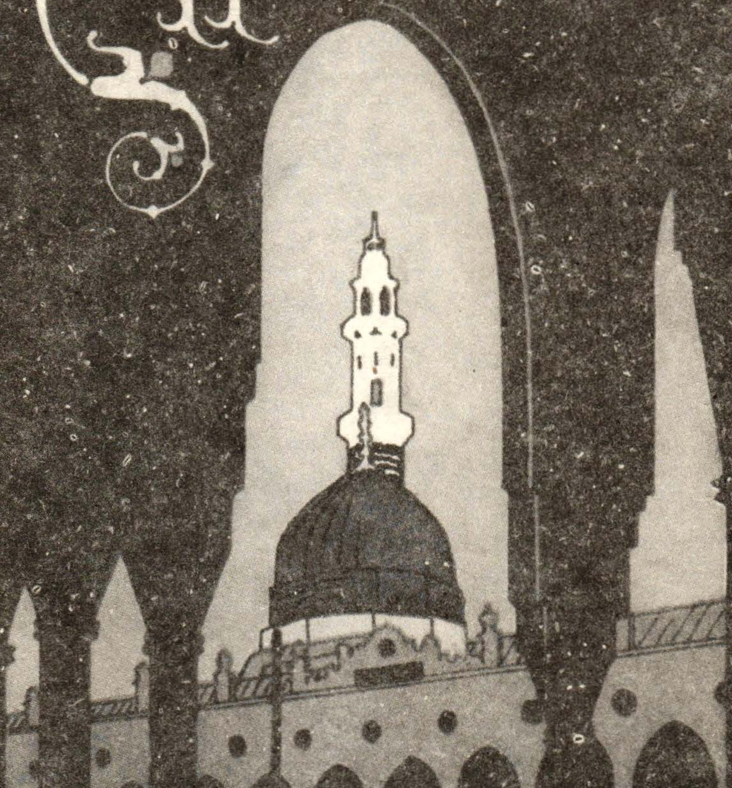

মোহাম্মদ আকরম খাঁ

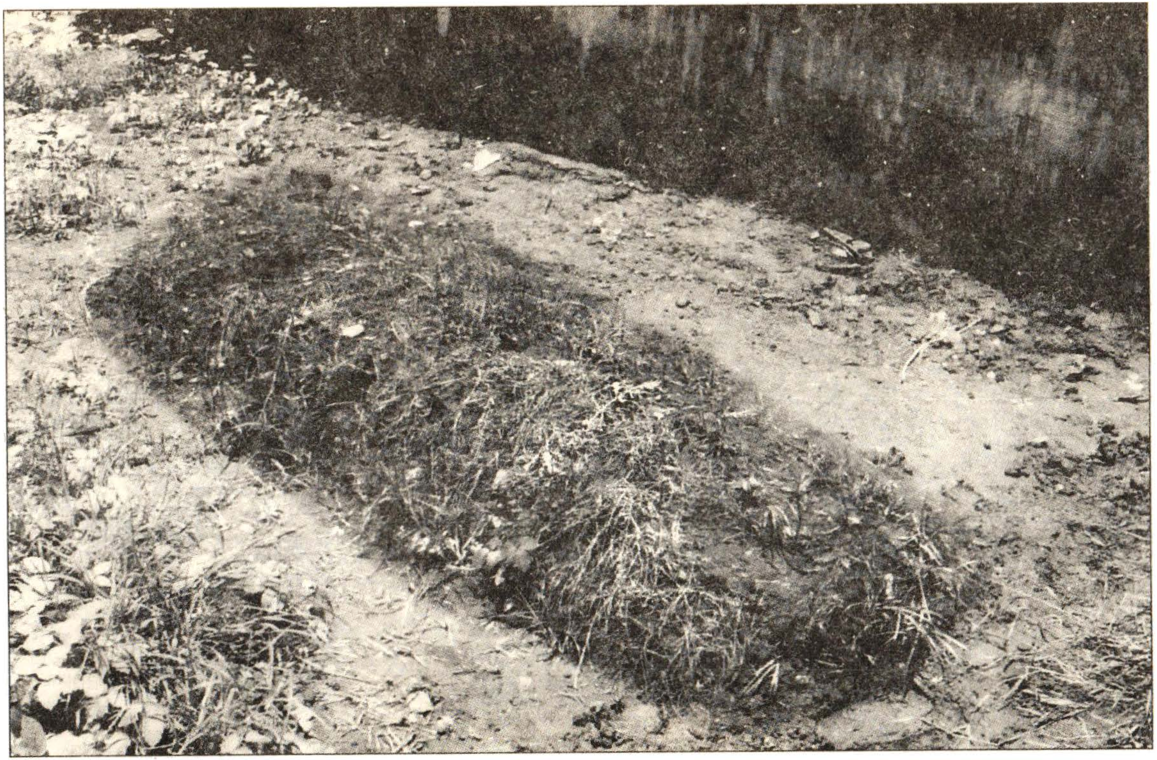

মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ'র কবর। পিয়ালা ওয়ালা মসজিদ (আহলে হাদিস মসজিদ) ১৮২, বংশাল রোড, ঢাকা।
উল্লেখ্য যে, কবরে কোন নাম ফলক বা ইটের গাথুঁনি নেই।

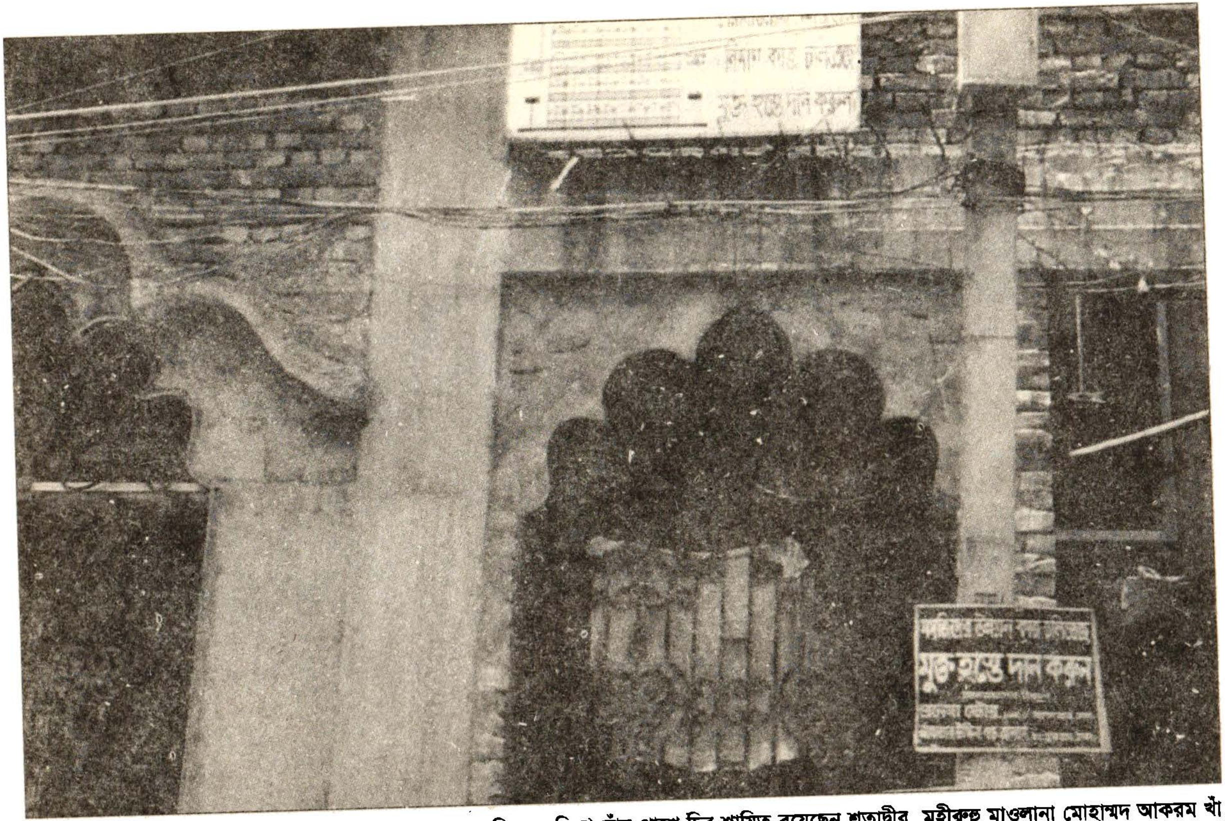

এই সে ঢাকাস্থ বংশালের পিয়ালা ওয়ালা মসজিদ (আহলে হাদিস মসজিদ) যাঁর পাশে চির শায়িত রয়েছেন শতাব্দীর মহীরুহ মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ

রোগ শয্যায় মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ'র চিকিৎসক টীম জানিয়ে দিলেন যে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ আর মাত্র কয়েক ঘন্টা জীবিত থাকবেন।

মাওলানা আকরম খাঁ'র অন্তিম শয্যায় চিকিৎসারত অবস্থায় শায়িত। তাঁর পিছনে আতাউর রহমান খান ও আবুল কাশেমকে দেখা যাচ্ছে।

মোস্তফা-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য

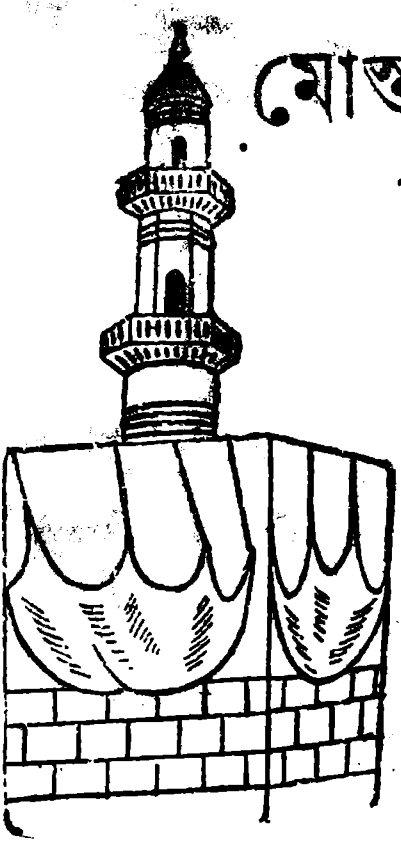

প্রণীত—

মাওঃ মোহাম্মদ আকরম খাঁ

মূল্য—১০-০০ টাকা

www.pathagar.com

এই

কারাগারের সওগাত

শিক্ষিত মুছলমান যুবকগণকে

উপহার

দিলাম।

তাঁহারা যথাযথ ভাবে গ্রহণ করিলে

শ্রম সার্থক বলিয়া

মনে করিব।

www.pathagar.com

কোরআন শরীফ

বাঙ্গলা অনুবাদ ও বিস্তারিত তফছির

প্রথম খণ্ড

মোহাম্মদ আকরম খাঁ

মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস

www.pathagar.com

বাইবেলের নির্দেশ
ও
প্রচলিত খৃষ্টান ধর্ম

মোহাম্মদ আকরম খাঁ

সমস্যা ও সমাধান

মোহাম্মদ আকরম খাঁ